অন্ধকারে চিতা - ১

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২
রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১,২
লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১, ২
বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১, ২
মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১, ২
চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১, ২

সেবা প্রকাশনী

অন্ধকারে চিতা-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা—১৩৭

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৈয়দ ইকবাল

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দুরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

ANDHAKAREY CHITA
By Qazi Anwar Husain
Rana-137

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সেই কালাহারি মরুভূমি থেকে আসছে বাতাস। পর্বতমালার ভেতর ঢুকে পড়ছে, পাথুরে পাঁচিল আর মাটির উঁচু-নিচু কিনারায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙছে, ছোটো ছোটো ঝাপটা আর ঘূর্ণি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে জাম্বেজি উপত্যকার চার-দিকে।

একটা পাহাড় চূড়ার খানিকটা নিচে দাঁড়িয়ে আছে সর্দার। জানে, চূড়ায় উঠলে বহু দূর থেকেও আকাশের গায়ে দেখতে পাওয়া যাবে তার কাঠামো। মাসাসা গাছের নতুন গজানো পাতায় তার বিশাল ধড় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, পিছনের কালচে খয়েরি পাথুরে ঢালের সাথে মিশে এক হয়ে গেছে গায়ের রঙ।

আরো বিশ ফিট ওপরে উঠলো সর্দার। চওড়া, লোম ঘেরা নাক দিয়ে বাতাস টানলো, তারপর গুটিয়ে নামিয়ে আনা শুঁড় দিয়ে নিজের হাঁ করা মুখে সেই বাতাস ছাড়লো। ওপরের ঠোঁটের ঝুলে থাকা অংশে, ফিকে লালচে গোলাপ কুঁড়ির পাপড়ি মেলার ভঙ্গিতে, উন্মুক্ত হলো এক জোড়া ঘ্রাণ যন্ত্র—বাতাসের স্বাদ নিলো সে।

সুদূর মরুভূমি থেকে আসছে ঝাঁঝালো, অতি মিহি ধুলো। তার

সাথে মিশে আছে সহস্র ফুলের রেণু। নিচের উপত্যকা থেকে আসছে পাঁঠা-পাঁঠা দুর্গন্ধ, ওখানে এক পাল মোষ চরছে। ঠাণ্ডা একটা স্বাদ পেলো সে, মনে পড়লো পিছনে ফেলে আসা ওই জলাশয়ে পানি খেয়েছে তারা, কাদায় গড়াগড়ি দিয়েছে। আরো কিছু গন্ধের স্বাদ নিলো সে, প্রত্যেকটি পরিচিত, প্রত্যেকটির উৎস জানা আছে তার।

কিন্তু এসব গন্ধ নিয়ে তার কোনো উদ্বেগ নেই। আরো একটা তীব্র গন্ধ খুঁজছে সে, সবগুলোকে ম্লান করে দেয় যার ঝাঁঝ। এটা মাংসাশী প্রাণীর গন্ধ, তার সাথে মিশে আছে তামাক, ঘাম, উল, প্যারাফিন, আর কারবোলিক সাবানের ঝাঁঝ মানুষের গন্ধ। হ্যাঁ, আছে সেটা ; সেই যে ধাওয়া শুরু হবার সময় যেমন জোরালো আর কাছাকাছি ছিলো, এখনও তেমনি আছে।

ঘৃণায়, রাগে ফুঁসতে লাগলো বুড়ো সর্দার। শত সহস্র বছর ধরে তাদেরকে তাড়া করে আসছে এই গন্ধ। পূর্ব-পুরুষরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, মানুষের হাতে কাতারে কাতারে মারা পড়েছে তারা। সেই ছোটোবেলা থেকে এই গন্ধটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে, শিখেছে ভয় পেতে। প্রায় সারাটা জীবন তাকে ধাওয়া করে আসছে এই বৈরী ঝাঁঝ।

কিছুদিন খুব নিরুপদ্রব জীবন কেটেছে। জাম্বেজি নদীর দু'ধারে শান্তিতে ছিলো পালগুলো। বুড়ো সর্দারের জানার বা বোঝার কথা নয়, এই সময়টায় কালো আর সাদা চামড়ার মানুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত ছিলো। এগারো বছরে একটা হাতিও মারা পড়েনি মানুষের হাতে, গোটা এলাকায় নিশ্চিন্তে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখন আবার শুরু হয়েছে ধাওয়া,

ফাঁদে ফেলে আবার তাদের খুন করার জন্যে ছুটে আসছে নিষ্ঠুর মানুষগুলো।

শুঁড় তুলে আবার একবার বাতাস টানলো বুড়ো সর্দার। আতংকে অস্থির হয়ে উঠলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে পাথুরে কিনারা টপকালো সে—পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে থয়েরি একটা আকৃতি ফুটে উঠেই নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

গাছপালার ভেতর প্রায় তিনশো হাতি রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যুবতী প্রায় সব হস্তিনীর সাথেই বাচ্চা, কোনো কোনোটা এতো ছোটো যে মায়ের পেটের নিচে জায়গা করে নিতে পারে। বাচ্চাগুলো তাদের ক্ষুদে শুঁড় গুটিয়ে কপালের কাছে তুলছে, সেখান থেকে বাঁকা করে ওপর দিকে, মায়ের সামনের দু'পায়ের মাঝখানে ঝুলে থাকা স্তনের বোঁটায় নিয়ে যাচ্ছে। আরো একটু বড় যারা, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে অস্থির করে রেখেছে বয়স্কদের, ভাই-বেরাদারদের কেউ হয়তো শুঁড় তুলে গাছের নরম এক-আধটা ডাল ভেঙে ফেলছে তাদের সামনে। ছোঁড়াছুঁড়িগুলো তবু যদি শান্ত হতো, নিজেদের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া লেগেই আছে ওদের।

যুবক-যুবতী আর বয়স্করা ধীরেসুস্থে খাওয়া সারলো। কাঁটা ঝোপের ভেতর সাবধানে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে আনলো, সেই ফল গলার অনেক ভেতরে এমনভাবে রাখলো যেন বুড়ো মানুষ অ্যাসপিরিন গিলছে। কেউ কেউ দাঁতের চোখা ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে মাসাসা গাছের ছাল আলগা করলো, ফিট দশেক বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুলে থাকা নিচের তেকোণা ঠোঁটের ভেতর ঠেসে দিলো। লম্বা কোনো গাছের কচি পাতা নাগালের মধ্যে না

এলে শরীরের সমস্ত ভার পিছনের দু'পায়ে চাপিয়ে খাড়া হলো তারা, লম্বা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছিঁড়ে নিলো সবুজ পাতা। সমবয়েসী কয়েকজনের দেখাদেখি এক যুবক একা একটা গাছের সামনে দাঁড়ালো, গাছের গায়ে চওড়া কপাল ঠেকিয়ে চার টন ওজনের শরীর দিয়ে ঝাঁকি দিতে শুরু করলো সে। গাছের মগডালগুলো চাবুকের মতো সপাং সপাং আওয়াজ তুলে দুলতে লাগলো, মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো পাকা ফলগুলো। ঢালের আরো নিচে দুই মরদ দু'জনের শক্তি এক করে ষাট ফুট লম্বা একটা গাছকে ফেলে দিচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দের সাথে ধরাশায়ী হলো গাছটা, আর ঠিক এই সময় পাহাড়ের চূড়া টপকালো দলপতি। আনন্দ-কোলাহল আর উল্লাস ধ্বনি এমন হঠাৎ করে থেমে গেল, যেন দাঁড়িয়ে পড়লো সময়। অটুট নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো বাজছে কানে।

বাচ্চারা মায়ের গায়ের সাথে সেঁটে এলো, বয়স্করা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে গেল। প্রত্যেকে যে যার কান বাইরের দিকে মেলে দিয়েছে, ঘন ঘন কোঁচকাচ্ছে শুধু শুঁড়ের ডগা।

হলুদ আইভরি উঁচু করে, হেলে দুলে নেমে এলো সর্দার। তার উদ্বেগ আর অস্থিরতা টের পাওয়া যায় ফুটো হয়ে যাওয়া কান খাড়া হয়ে আছে দেখে। এখনো সে মানুষের গন্ধ নিয়েই আছে। সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে মেয়েদের একটা দল, সামনে এসে শুঁড় লম্বা করলো সে, তাদের গায়ের ওপর বাতাস ছাড়লো।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো ওরা, অভ্যেসবশে বাতাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলো, বিপদের গন্ধ যাতে সরাসরি পেতে পারে। দলের বাকি সব হাতি দৃশ্যটা দেখলো, সাথে সাথে ছুটলো তারা, গোটা পাল ছুটন্ত একটা ঝাঁকের আকৃতি পেলো। বাচ্চাদের কাছে টেনে

নিয়ে মায়েরা থাকলো ঝাঁকের মাঝখানে, তাদেরকে ঘিরে থাকলো বৃদ্ধা রাণী মাতারা। যুবকরা থাকলো ঝাঁকের মাথার দিকে, তীর চিহ্নের আকৃতি নিয়ে পথ দেখিয়ে ছুটছে তারা, তাদের দু'পাশে থাকলো অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধরা। গোটা দলটা মাটি কাঁপিয়ে, হেলেদুলে ছুটছে, কোথাও মুহূর্তের জন্যে না থেমে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা এভাবে ছুটতে পারবে ওরা।

পাল নিয়ে পালাতে শুরু করলেও, বিমূঢ় ভাবটা বুড়ো সর্দারের মনে থেকেই গেল। এরকম ধাওয়া তার অভিজ্ঞতার বাইরে। আজ আট দিন ধরে তাড়া করা হচ্ছে তাদের, অথচ একবারও কাছাকাছি আসছে না শত্রুরা। দক্ষিণে রয়েছে তারা, ওকে তাদের গন্ধ শুঁকতে দিচ্ছে, কিন্তু প্রায় সারাক্ষণ ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকছে। মনে হচ্ছে সংখ্যায় তারা অনেক, দক্ষিণের সবটুকু পথে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা জাল তৈরি করে রেখেছে। মাত্র একবার তাদের দেখেছে ও। ধাওয়া শুরু হবার চারদিন পর, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে, পাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ও, লাইন ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হলুদ ঘাসের ভেতর থেকে লাঠি আকৃতির অনেক মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, খালি প্যারাফিনের টিনে বাড়ি দিয়ে আর রঙিন কাপড় নেড়ে ভয় দেখাতে শুরু করে ওদের। সাহস হারিয়ে ফেলে সর্দার, ঘুরে দাঁড়িয়ে, পাল নিয়ে চলে আসে পর্বতমালার দিকে।

উঁচু-নিচু পর্বতমালার ভেতর দিয়ে হাজার বছর ধরে আসা-যাওয়া করছে হাতির পাল। পূর্ব-পুরুষদের রেখে যাওয়া পথ চলার চিহ্ন ধরে দুর্গম এলাকাটা পেরিয়ে এসেছে ওরা। সরু গিরিখাদের ভেতর দিয়ে কখনো একজনের পিছনে একজন লাইন দিয়ে আসতে হয়েছে,

কখনো নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে অতি সাবধানে এক পা এক পা করে উঠতে হয়েছে ঢালের মাথায়।

দলটাকে রাতের বেলাও বিশ্রাম দিলো না সর্দার। আকাশে চাঁদ না থাকলেও, জ্বলজ্বলে তারা আছে, অন্ধকার আফ্রিকান জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চললো ওরা। একবার, মাঝরাতে, ট্রেইলের একপাশে দাঁড়িয়ে পালটাকে এগিয়ে যেতে দিলো সর্দার। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার মানুষের গন্ধ এলো ওর নাকে। অনেক দূরে, অস্পষ্ট, কিন্তু আছে। আছে, সব সময় আছে।

সকালে এমন একটা এলাকায় পৌঁছুলো সর্দার, যেখানে গত দশ বছরে একবারও আসেনি সে দল নিয়ে। নদী বরাবর সরু কিন্তু দীর্ঘ একটা বিস্তৃতি জুড়ে কোনো গাছপালা নেই, সব কেটে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধের সময় এখানে সৈন্যদের ঘাটি ছিলো। লোকজনের বসবাস, তাই এতোদিন এলাকাটাকে এড়িয়ে এসেছে সর্দার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাড়া খেয়ে আজ ওকে আসতে হলো এখানে।

পালটা এখন আর আগের মতো অস্থির নয়। ধাওয়ারত মানুষ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ছোটার গতি কমিয়ে দিয়ে পথের দু'পাশে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে ওরা। এদিকে, উপত্যকার সমতলে, বনভূমি অনেক বেশি সবুজ আর রসালো। মাসাসা জঙ্গল মোপানি আর বেওব্যাব গাছকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। সামনে পানির আভাস পেয়ে বুড়ো সর্দারের বিশাল পেট থেকে ভরাট আওয়াজ উঠে এলো—তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বাচ্চা আর মেয়েদের কথা ভেবে অস্থির বোধ করলো সে। কিন্তু তার মন খুঁত খুঁত করছে। পিছনে তো বিপদ আছেই, তার ধারণা, বিপদ সামনেও আছে। বার বার থামলো সে, বিশাল কালো মাথা এদিক ওদিক

দোলালো, কান দুটো টান টান করে বাইরের দিকে মেলা। আবার চলতে শুরু করার আগে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বিপদের আভাস পেতে চাইলো।

হঠাৎ করে সে থমকে দাঁড়ালো। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কিছু একটা চোখে পড়েছে। সকালের রোদে ঝিক করে উঠেছে সেটা। চমকে উঠে পিছিয়ে এলো সে, তার পিছনে গোটা পাল পিছু হটলো। তার ভয় নিমেষের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে ওদেরকেও।

চকচকে ধাতব জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সর্দার। ধীরে ধীরে তার ভয় কেটে যেতে লাগলো। কারণ বাতাসের মৃদু ফিসফিসানি, পাখির কলগুঞ্জন, পোকামাকড়দের ঝাঁ-ঝাঁ ঝিঁ-ঝিঁ ডাক ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। তবু অপেক্ষা করলো বুড়ো দলপতি, তাকিয়ে থাকলো সামনে। রোদ জায়গা বদল করায় দেখতে পেলো হুবহু একই রকম ধাতব বস্তু তার সামনে লাইন করে রাখা হয়েছে। সামনের এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার চাপালো সে, অস্বস্তি আর দ্বিধার মধ্যে পড়ে গলার ভেতর ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে। গালভ্যানাইজড শীটমেটালের তৈরি ছোটো, চারকোণা ফলক দেখে ঘাবড়ে গেছে সর্দার। মাটিতে লোহার একটা নল গাঁথা হয়েছে, নলের মাথায় ফলক। প্রতিটি ফলকে দুটো বাক্য লেখা—'ডেঞ্জার। মাইন ফিল্ড।' লাল রঙের লেখাগুলো কালের আঁচড়ে কালচে হয়ে গেছে, কোনো কোনো ফলকের লেখা পড়াই যায় না। লেখাগুলোর ওপর আঁকা রয়েছে একটা করে মানুষের মাথার খুলি, আর ক্রস চিহ্নের আকৃতি নিয়ে একজোড়া হাড়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাম্বিয়া থেকে নদী পেরিয়ে রোডেশিয়ায় ঢুকছিল মুক্তিযোদ্ধারা, তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে স্মিথ সরকারের

শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী এই মাইন পুঁতেছিল। লক্ষ লক্ষ অ্যান্টি-পারসনেল মাইন, এবং তারচেয়ে কিছুটা ভারি ক্লেমোর মাইন বিশাল একটা জায়গা জুড়ে পোঁতা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর জিম্বাবুই সরকারের পক্ষে এই মাইনফিল্ড পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

বুড়ো সর্দার ইতস্তত করছে, এমনি সময় তীব্র ঝড়ের আওয়াজ উঠলো। পালের পিছন থেকে আসছে শব্দটা, সেই দক্ষিণ থেকেই। ক্ষেপে গিয়ে মাইনফিল্ডের দিকে দ্রুত পিছন ফিরলো সর্দার।

জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে গাঢ় রঙের একটা আকৃতি, বিকট আওয়াজ করা রূপালি একটা চাকতির নিচে ঝুলে আছে। ঝড় নয়, কিন্তু ঝড়ের বেগেই পালের দিকে নেমে এলো সেটা। গাছের ডালপালা বাতাসের ধাক্কায় নুয়ে পড়লো, শুকনো মাটি থেকে উঠলো লাল ধুলোর পাহাড়।

দিশেহারা সর্দার ঘুরে দাঁড়ালো, একটা ফলকের গা ঘেঁষে ছুটে ঢুকে পড়লো মাইনফিল্ডে। আতংকিত গোটা পাল দৌড় দিলো তার পিছু পিছু।

মাঠে ঢুকে পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে ঘাড় ফেরাতে যাবে সর্দার, ঠিক তখনই প্রথম মাইনটা বিস্ফোরিত হলো। মোটা চামড়ায় মোড়া তার পিছনের ডান পা ফুঁড়ে ওপর দিকে উঠে এলো আগুনের একটা ঝলক, যেন কুঠারের এক কোপে দু'ভাগ করে দিলো পা-টাকে। তিন পায়ে ছুটলো সর্দার, আহত পায়ের সাদা চকচকে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কাঁচা লাল মাংস ঝুলছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের মোটা একটা ধারা। দ্বিতীয় মাইনটা আঘাত করলো সামনের ডান পায়ে, গোড়ালি পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিলো। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো সর্দার, কেঁপে উঠলো মাটি, বিধ্বস্ত পা দুটো হাঁটুর

কাছে গুঁজে খেয়ে পেরেকের মতো গেঁথে রেখেছে তাকে। তার চার-দিকে উন্মত্ত হাতির পাল, মাইনফিল্ডের আরো ভেতরে ঢুকে পড়ছে তাকে পাশ কাটিয়ে।

প্রথম দিকে বুম বুম বিস্ফোরণের আওয়াজে কোনো ছন্দ থাকলো না, শুধু মাঠের কিনারা থেকে খানিক পর পর দু'একটা করে মাইন ফাটলো। কিন্তু একটু পরই ঘন ঘন বিস্ফোরণে অপার্থিব একটা ছন্দের সৃষ্টি হলো, কারা যেন নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠে ড্রাম বাজাচ্ছে। মাঝেমধ্যে চার কি পাঁচটা মাইন একসাথে ফাটছে, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শতগুণ হয়ে ফিরে আসছে প্রতিধ্বনি-গুলো।

সেই সাথে রয়েছে হেলিকপ্টারের গর্জন। ঘুড়ির মতো গোত্তা দিয়ে নেমে এলো সেটা, মুহূর্তে দিক বদলালো, মাইনফিল্ডের দিকে আরো একটু নামলো—পালটাকে তাড়া করছে ওটা। দু'একটা হাতি ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে দৌড় দিলো, ধাওয়া করে আবার তাদের-কে মাইনফিল্ডে ফিরিয়ে আনলো হেলিকপ্টার। বাচ্চা একটা হাতি কোথাও একটু চোট না খেয়ে, বহাল তবিয়তে পৌঁছে গেছে মাইন-ফিল্ডের ওপারে, নদীর নিরাপদ কিনারায়, তাকেও খেদিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো —এবার একটা মাইনে পা পড়লো তার, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পিছনের দুই পা। অবশিষ্ট পা দুটো আকাশের দিকে ঘন ঘন ছুঁড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো অবোধ শিশু।

প্রতিটি মাইনের সাথেই বিস্ফোরিত হচ্ছে ধুলো, উপত্যকার স্থির বাতাসে লালচে কুয়াশার মতো ধুলোর পর্দা বীভৎস দৃশ্যের খানিক-টা অন্তত আড়াল করতে পারছে। ধুলোর পাহাড় মোচড় খাচ্ছে, পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে গাছগুলোর মাথার কাছাকাছি। এক-

সময় গোটা দৃশ্য প্রায় ঢাকা পড়ে গেল লালচে পর্দায়, শুধু বিস্ফোরণের মুহূর্তে এক ঝলক তীব্র আলোয় দেখা গেল কয়েক শো হাতি গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তের বন্যায়।

এক বুড়ি, তার চারটে পা-ই উড়ে গেছে, শক্ত মাটিতে মাথা দিয়ে খাড়া হবার চেষ্টা করছে। এক যুবতী মাটিতে পেট ঘষে ঘষে সামনে এগোচ্ছে, অসাড় পিছনের পা দুটো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, পাশের বাচ্চাটাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার তাগিদে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। একটা ক্লেমোর তার পেটের নিচে বিস্ফোরিত হলো, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো নাড়িভুড়ি, সেই সাথে ছিঁড়ে নিয়ে গেল বাচ্চাটার গোটা মুণ্ডু।

বেশ অনেকগুলো বাচ্চা হাতি মায়েদের কাছ থেকে সরে এসেছে। ধুলোর ভেতর দিয়ে দিকবিদিক ছুটছে তারা, আতংকে মাথার সাথে সেঁটে আছে কান। হেলিকপ্টার থেকে ব্রাশ-ফায়ার করে ধরাশায়ী করা হলো তাদের।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই হত্যাযজ্ঞ, একসময় বিস্ফোরণের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এলো। তারপর নিস্তব্ধতা নামলো মাঠে। ফলকের এদিকে, নিরাপদ ঘাসে, যান্ত্রিক দানবের মতো বসে আছে হেলিকপ্টার। ইঞ্জিন বন্ধ, রোটর থেমে গেছে। এখনো শুধু শোনা যাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী পশুদের গোঙানি। হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজ হ্যাচ খোলা হলো, ওখান থেকে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো এক লোক।

লোকটা কালো, রঙচটা ডেনিম জ্যাকেট আর ধূসর রঙের জিনস্ পরে আছে—জ্যাকেটের আস্তিন দুটো সযত্নে কাটা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ডেনিম ছিলো গেরিলা যোদ্ধাদের আনঅফিশিয়াল

ইউনিফর্ম। তার পায়ে সৌখিন, পশ্চিম ইউরোপে তৈরি জুতো, মাথার উপর তোলা রয়েছে সোনালি রিমের পোলারয়েড অ্যাভিয়েটর'স সানগ্লাস। এগুলো এবং তার বুক-পকেটে আটকানো বল-পয়েন্ট পেনের সারি, প্রত্যেকটি এক একটা ব্যাজ—অভিজ্ঞ গেরিলারা দেখলেই তার পদমর্যাদা বুঝে নেবে। তার ডান বগলের নিচে এ-কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। মাইন ফিল্ডের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো সে, ঝাড়া পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বীভৎস দৃশ্যটা উপভোগ করলো, তারপর ঠোঁটে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে ফিরে এলো 'কপ্টারের কাছে।

চেহারায় শ্রদ্ধা আর চোখে সতর্ক ভাব নিয়ে অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে পাইলট। কিন্তু অফিসারের মনোযোগ রয়েছে, 'কপ্টারের ফিউজিলাজের দিকে।

সমস্ত প্রতীক চিহ্ন আর আইডেনটিফিকেশন নাম্বার ঢেকে রাখা হয়েছে মাস্কিং টেপ দিয়ে, তারপর টেপের ওপর স্প্রে করা হয়েছে অ্যারোসল ক্যান থেকে কালো এনামেল। এক জায়গায় আলগা হয়ে গেছে টেপ, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আইডেনটিফিকেশন লেটারিঙের একটা কোণ। তালু দিয়ে টেপটা আবার বসিয়ে দিলো অফিসার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা মোপানি গাছের ছায়ার দিকে এগোলো।

গাছের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখলো সে, মাটিতে রুমাল বিছিয়ে বসলো, তারপর আয়েশ করে ডানহিল ধরালো একটা।

তিনশো হাতি।—ভাবলো সে।—কতো লোক আর বিস্ফোরক লাগতো? অথচ বলতে গেলে কোনো খরচই হলো না। নাহ, স্বীকার করতে হবে, জেনারেলের মাথায় বুদ্ধি আছে। আর কারো মাথায় এই মতলব আসতোই না।

অফিসারের চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। সিগারেট শেষ করে আগুন নেভালো সে, শেষ অংশটুকু তালুর ওপর ফেলে ডলে ডলে পাউডার বানিয়ে ফুঁ দিলো। গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে এলো তার মাইন ফিল্ডের গোঙানি আর কাতরানি তার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না।

লোকজনের কথা বলার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো তার। গাছের গা থেকে পিঠ তুলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠেছে—চট করে একবার সূর্যের দিকে তাকালো। ঢলে পড়েছে সূর্য, বিকেল হয়ে এসেছে।

হেলিকপ্টারের কাছে এসে পাইলটের ঘুম ভাঙালো অফিসার। বললো, 'ওরা আসছে।' 'কপ্টারে উঠে হাতে লাউড হেইলার নিয়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালো সে। তাচ্ছিল্য ভরা কৌতুকের সাথে তাকিয়ে থাকলো জঙ্গলের দিকে।

গাছপালার আড়াল থেকে দলের প্রথম লোকটি বেরিয়ে এলো। 'বেবুন!' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করলো অফিসার। এক উপজাতির লোক আরেক উপজাতির লোককে দু'চোখে দেখতে পারে না, পরস্পরকে সাধারণত তারা কুকুরমুখো বানর বলেই সম্বোধন করে। অবশ্য পেটে খানিকটা বিদ্যে পড়লে স্বগোত্রের লোকদেরও বেবুন বলতে দ্বিধা করে না অনেক আফ্রিকান।

লম্বা একটা লাইন ধরে এলো ওরা, এলো হাতিদের পথ অনুসরণ করে। আড়াইশোর ওপর লোক, পরনে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি আলখেল্লা। পুরুষরা আগে পৌঁছুলো, পিছু পিছু মেয়েরা। মেয়েদের অনেকেরই বুক ঢাকা নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুবতী—হাঁটার ছন্দে গুরু নিতম্বে ঢেউ উঠলো। বেশির ভাগ যুবতীর পরনে এক

টুকরো চামড়া, তাতে শুধু নাভির নিচে খানিকটা জায়গা লুকানো গেছে। মেয়েদের দিকে চোখ পড়তে অফিসারের চেহারা বদলে গেল, লোভে চকচক করে উঠলো দৃষ্টি। জিনসের হ্ু'পকেটে হাত ভরে নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিলো, সময় পেলে গুরু নিতম্বিনীদের একজনকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসা যাবে। মাইন ফিল্ডের কিনারা জুড়ে সার বেঁধে দাঁড়ালো ওরা, পাখির মতো কিচিরমিচির করছে। কেউ কেউ হেসে গড়িয়ে পড়লো, আঙ্গুল তুলে পরস্পরকে দেখালো আহারের কি বিপুল সমারোহ।

উল্লাসে আত্মহারা হবার জন্মে ওদেরকে খানিকটা সময় দিলো অফিসার। আট দিন ধরে হাঁটার ওপর রয়েছে ওরা, প্রায় কোনো বিশ্রাম ছাড়াই, পালা করে প্যারাফিন টিন বাজিয়ে পর্বতমালা থেকে নামিয়ে এনেছে হাতির পালটাকে।

অপেক্ষা করার সময় আরো একবার জেনারেলের কথা ভেবে শ্রদ্ধা বোধ করলো অফিসার। এই অসভ্য লোকগুলোকে জেনারেল তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক দৃঢ়তার সাহায্যে বশ করেছেন। গোটা অপারেশনের সমস্ত কৃতিত্ব ওই একজনেরই।

পনেরো মিনিট পর মুখের সামনে লাউডহেইলার তুলে হুংকার ছাড়লো অফিসার। 'চুপ। সবাই চুপ!' ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে কাজের ফিরিস্তি দিলো সে, কে কি কাজ করবে তাও বলে দিলো।

যাদের কাছে কুঠার আর ধারালো অস্ত্র আছে শুধু তারা কসাইয়ের দলে থাকবে। মেয়েদের একটা দল স্মোকিং র‍্যাক তৈরি করবে, আরেকটা দল মোপানি গাছের ছাল দিয়ে বানাবে ঝুরি। বুড়ো আর নিরস্ত্রদের পাঠানো হলো কাঠ আর গাছের ডালপালা সংগ্রহ করার জন্মে, আগুন জ্বালতে হবে। এরপর আবার কসাইদের

দিকে ফিরলো অফিসার।

উপজাতিদের কেউ কখনো প্লেন বা 'কপ্টারে চড়েনি। প্রথম লোকটাকে 'কপ্টারে তোলার জন্যে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারতে হলো অফিসারকে। মাইন ফিল্ডের ওপর উড়ে এসে শূন্যে ঝুলে থাকলো 'কপ্টার। ঠিক নিচেই একটা প্রকাণ্ড হাতির ধড়।

দরজায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে বুড়ো হাতিটার দিকে তাকালো অফিসার। মোটা, বাঁকানো আইভরি দেখে গালভরা হাসি ফুটলো মুখে। মারা গেছে হাতিটা। পাইলটকে ইঙ্গিত দিলো সে, 'কপ্টার আরো নিচে নামাতে হবে।

বয়স্ক একজন লোকের কানের কাছে মুখ নামিয়ে অফিসার চিৎকার করে বললো, 'সাবধান, মাটিতে যেন পা না পড়ে।' সারা শরীর ঝাঁকি খেলো লোকটার। 'প্রথমে দাঁত, তারপর মাংস।' লোকটা আবার শরীর ঝাঁকালো। হ্যাঁ, বা না বলার এটাই তার ধরন। অফিসার তার পিঠ চাপড়ে দিলো, লাফ দিয়ে হাতির পেটে নামলো সে। পেটটা এরই মধ্যে ফুলতে শুরু করেছে। লোকটার পিছু পিছু কুঠার হাতে নিয়ে নামলো আরো কয়েকজন।

এবার অন্য একটা হাতির ওপর চলে এলো 'কপ্টার, এটারও ঠোঁট থেকে ভারি সুন্দর আইভরি বেরিয়ে রয়েছে। এই হাতিটা বেঁচে আছে এখনো, মাটিতে নিতম্ব দিয়ে বসার ভঙ্গিতে ছিলো, ধুলো আর রক্ত মাখা শুঁড় দিয়ে ঝুলে থাকা 'কপ্টারকে ধরতে চেষ্টা করলো সে।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে এ-কে ফরটিসেভেন তাক করলো অফিসার, হাতির ঘাড়ের পিছনে একটা মাত্র গুলি করলো। বাচ্চার পাশে মুখ থুবড়ে পড়লো মা। কসাইদের দ্বিতীয় দলটাকে নামতে

বললো সে।

হাতির মাথার ওপর সাবধানে বসে কাজ শুরু করলো কসাইরা। সাদা হাড় থেকে এক এক করে দাঁতগুলো আলগা করলো তারা কুঠারের মাপা কোপ দিয়ে। এরা সবাই এই কাজে দক্ষ, জানে, অজায়গায় একটা কোপ পড়লে আইভরির আর প্রায় কোনো দামই থাকবে না। অফিসারের হাবভাব দেখে তারা বুঝে নিয়েছে, আইভরি নষ্ট হলে এই লোক আস্ত রাখবে না। কাজেই অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজ করে চললো সবাই। একটা করে দাঁত তোলা হয়, বাঁধা হয় রশি দিয়ে, তোলা হয় 'কপ্টারে। কাজ শেষ হলে কসাইয়ের দলটাকে নামানো হয় আরেকটা হাতির ওপর।

রাত নামার আগেই বেশিরভাগ হাতি মারা গেল, নয়তো গুলি করে মেরে ফেলা হলো। তারপরও কিছু হাতি বেঁচে থাকলো, তাদের করুণ কাতরানির সাথে যোগ হলো শেয়াল আর হায়েনার অবিরাম হাঁক-ডাক। টর্চ লাইটের আলোয় কাজ চালিয়ে গেল কসাইরা। ভোরের দিকে সমস্ত আইভরি সংগ্রহ করা হয়ে গেল।

কসাইরা এবার হাতীর শরীর নিয়ে ব্যস্ত হলো। রোদের তাপ বাড়ার সাথে সাথে আরো সহজ হয়ে গেল ওদের কাজ। রক্ত আর কাঁচা মাংসের গন্ধ তো আছেই, নাড়িভুঁড়িতে জমে থাকা গ্যাসের সাথে এবার যোগ হলো চর্বি আর মাংস পচা দুর্গন্ধ। একটা করে নিতম্ব বা কাঁধ আলাদা হওয়া মাত্র সেটাকে মাইন ফিল্ড থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল 'কপ্টার। ওখানে মেয়েরা মাংসগুলোকে ফালি ফালি করে কাটছে, কেটে স্মোকিং র‍্যাকের গনগনে আগুনের ওপর সার সার ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

কাজ তদারক করছে অফিসার, আর মনে মনে অপচয়ের হিসেব

করছে। দুঃখের ব্যাপার, চামড়াগুলো রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটা চামড়ার জন্যে হাজার ডলার করে পাওয়া যেতো। কিন্তু ব্যবস্থা নেই, পচন ঠেকানো যাবে না। মাংস এক-আধটু পচলে কিছু এসে যায় না, আফ্রিকানদের জিভে ওগুলো বরং বেশি মজা লাগবে।

পাঁচশো টন ভিজে মাংস আগুনে ঝলসানোর পর কমে অর্ধেক হয়ে যাবে ওজনে। এই শুকনো মাংস কিনবে প্রতিবেশী দেশ জাম্বিয়ার তামা খনির মালিকরা, খনি শ্রমিকদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাবার জন্যে। ইতিমধ্যে দর-দাম হয়ে গেছে, প্রতি পাউণ্ড স্মোকড মিটের জন্যে দুই মার্কিন ডলার। তারপর, আইভরি তো আছেই।

পাহাড়ের ওপর, নির্জন একটা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আইভরিগুলো। লাইন করে রাখা হয়েছে সব। বাছাই করা দক্ষ একদল লোক পরিষ্কার করছে ওগুলো। প্রতিটি দাঁতের এক প্রান্তে গর্ত রয়েছে, ভেতরে একগাদা শিরা আর নার্ভ জড়াজড়ি করে মোচার আকৃতি নিয়েছে। ওগুলো পরিষ্কার করার পর, দাঁতের গা থেকে সাফ করা হচ্ছে রস, রক্ত, মাংসের কণা ইত্যাদি। কাস্টমস অফিসারদের নাক বড় সাংঘাতিক, একটু গন্ধ পেলেই ধরে ফেলবে সদ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এগুলো।

সব মিলিয়ে চার শো দাঁত। এর মধ্যে কিছু রয়েছে মাত্র পাউণ্ড কয়েক ওজনের, নেয়া হয়েছে কিশোর হাতীর মুখ থেকে। তবে বয়স্ক হাতিগুলোর এক একটা দাঁত কম করেও আশি পাউণ্ড হবে। গড়পড়তায় প্রতিটা বিশ পাউণ্ড ধরা চলে। হংকঙের বাজারে প্রতি পাউণ্ড আইভরির দাম একশো ডলার, তার মানে সব মিলিয়ে আট লাখ ডলার। মাত্র দু'চার দিনের কাজ, লাভের অংক এক মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। অথচ এদেশে বয়স্ক একজন পুরুষের সারা

বছরের আয় ছয় শো ডলারেরও কম।

অবশ্য এই অপারেশনে খুচখাচ কিছু খরচা আরো আছে। একটা হাতির আধ-কাটা ধড় থেকে পড়ে গেল একজন কসাই, সরাসরি একটা অ্যান্টি পারসনেল মাইনে পড়লো সে।

'ব্যাটা বেবুনের লেজ।' গাল পাড়লো অফিসার। লোকটা মারা যাওয়ায় তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি, রেগে গেছে কাজ পিছিয়ে যাবে বলে। লাশটা সরিয়ে এনে কবর দিতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এই একটা ঘণ্টা কাজ থেকে হাত গুটিয়ে রাখলো সবাই।

আরেকজন লোক কুঠারের কোপ খেয়ে একটা পা হারালো। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অল্প-বিস্তর আহত হলো আরো দশ-বারো জন। রাতের বেলা গুলি খেয়ে মারা গেল এক কসাই। তার বউকে জঙ্গলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল অফিসার, সে প্রতিবাদ করায় মরতে হলো তাকে। তবে, লাভের কথা ভাবলে, খরচ একেবারে নগণ্য বলে মনে হয়। অফিসারের মনে আনন্দ ধরে না—জেনারেল ভারি খুশি হবেন।

তিন দিনের দিন আইভরি পরিষ্কারের কাজ শেষ হলো। পরীক্ষা করে দেখলো অফিসার, সন্তুষ্ট হলো। শ্রমিকদের ওখান থেকে সরিয়ে সমতল মাঠে পাঠিয়ে দেয়া হলো, স্মোকিং র‍্যাকে কাজ করার জন্যে। গোটা ক্যাম্প খালি করা হলো, গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর যিনি আসছেন তাঁকে যেন কেউ দেখতে না পায়।

হেলিকপ্টারে চড়ে এলেন তিনি। চকচকে আইভরি সার সার রাখা রয়েছে, পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে থাকলো অফিসার। রোটরের বাতাসে তার জ্যাকেট ফুলে উঠলো কাছাকাছি এক জায়গায় নামলো হেলিকপ্টার, একজন কর্তা গোছের

ব্যক্তিকে দেখা গেল দরজায়। সুদর্শন চেহারা, শক্ত সমর্থ শরীর, কালো মেহগনি রঙের মুখে চৌকো সাদা দাঁতগুলো মুক্তার মতো আলো ছড়াচ্ছে। কোঁকড়ানো আফ্রিকান চুল খুলি কামড়ে আছে। পরনে দামী-গ্রে রঙের স্যুট, ইটালি থেকে তৈরি করে আনা। স্যুটের নিচে সাদা শার্ট, গাঢ় নীল রঙের টাই। দুর্লভ চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো জোড়া চকচক করছে।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কর্তাকে স্যালুট করলো অফিসার। 'জেনারেল' আপনি এসেছেন সেজন্যে আমি ধন্য।'

'না-না,' ভারি গলায় হেসে উঠলেন জেনারেল। 'জেনারেল নয়, শুধু জেনারেল নয়। এখন আমি একজন মন্ত্রীও।'

একজন মন্ত্রী। সফল একজন আইভরি পোচারও বটে।

দুই

সুস্থ হবার পর গোজো থেকে বেরিয়েছে মাসুদ রানা।

গোজোয় থাকতেই বি. সি. আই. হেড কোয়ার্টার, ঢাকার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল ওর। সি. আই. এ. এখন আর ওর জন্যে কোনো বিপদ নয়, এই মেসেজটা হেড কোয়ার্টার থেকে পায় ও। জানতে পারে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স রানা এজেন্সীর শাখা অফিস-গুলোয় হামলা চালাবার চেষ্টা করেছিল বটে, তবে বি. সি. আই-কে নাক গলাতে হয়নি, এজেন্সীর অপারেটররাই ওদেরকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কিন্তু এজেন্সীর লোকজনেরা অনেকদিন ধরে চীফের

সাক্ষাৎ না পেয়ে হতাশায় ভুগছে, ওদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে শাখাগুলোয় একবার করে ঢুঁ মারা দরকার রানার।

ছনিয়া ঘুরে নিউইয়র্কে এসে থামলো রানা। এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। লম্বা একটা ছুটি দরকার ওর, সোহেলের মাধ্যমে পটিয়ে বুড়োর অনুমোদন আদায় করতে হবে। ছুটি পাওয়া গেলে জিম্বাবুইয়ে যাবে ও। রেবেকার বিশাল একটা জায়গা আছে ওখানে, বুনো হাতি থেকে শুরু করে গণ্ডার, বাঘ সব আছে সেখানে। রেবেকাকে কথা দেয়া ছিলো, ওই জায়গায় বেড়াতে যাবে ও, যখনই মন খারাপ করবে, কদিনের জন্যে হলেও যাবে ওখানে।

মন ভালো নেই রানার। লুবনাকে ভুলতে চায় ও। প্রতিশোধে হয়তো গায়ের জ্বালা কিছুটা মেটে, কিন্তু তাতে প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়া যায় না।

আসলে প্রকৃতির সঙ্গ চাইছে রানা। সঙ্গ চাইছে কোনো প্রিয়-জনের। কিছুটা সময় হাসি আনন্দে কাটানো দরকার, এমন এক-জনের সঙ্গ দরকার যে তাকে লুবনার কথা ভুলিয়ে দেবে।

চিন্তার এই সূত্র ধরে সোহানার কথাই প্রথমে মনে পড়েছিল, টেলিফোনে কথা বলার সময় সোহেলকে সোহানার কথা জিজ্ঞেসও করেছিল ও। কিন্তু সোহেল দায়সারা গোছের একটা উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গ থেকে সরে যায়। সোহানা নাকি বিদেশে কী একটা গোপন মিশন নিয়ে ব্যস্ত। মাসকয়েকের মধ্যে তার সাথে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা রানার নেই।

আজই প্লেনের টিকেট কাটবে রানা। ইচ্ছে কালকের ফ্লাইটে ঢাকা রওনা হবে। কিন্তু টিকেট কাটার আগে আরো একটা কাজ বাকি রয়েছে নিউইয়র্কে। বিশ্ব ব্যাংকের একজন অফিসারের সাথে

দেখা করতে হবে ওকে।

নির্দেশটা ঢাকা থেকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আন-অফিশিয়ালি। সোহেল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, আন-অফিশিয়াল হলেও ভদ্রলোকের সাথে দেখা করাটা নাকি খুবই জরুরী। ব্যাপারটা কি নিয়ে, কিছুই জানা যায়নি। সোহেল বলেছে, সে-ও কিছু জানে না।

খুব যে জরুরী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গত তিনদিনে ছয়-বার টেলিফোন এসেছে রানার হোটেলে, প্রতিবার জানতে চাওয়া হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের ওই অফিসারের সাথে দেখা করার জন্যে কখন সময় দিতে পারবে রানা।

আজ বিকেলে সময় দিয়েছে রানা। আর আধ ঘণ্টা পর অ্যাপ-য়েন্টমেন্ট। তৈরি হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো ও।

বিশ্ব ব্যাংকের এই অফিসটা সেণ্ট্রাল পার্ক এভিনিউয়ে। এলি-ভেটরে চড়ে সাতাশ তালায় উঠে এলো রানা। এলিভেটর থেকে বেরোতেই রিসেপশন হল। ডিম আকৃতির বিশাল কাঁচ ঘেরা কামরা, চারদিক থেকে বেড় দিয়ে রেখেছে সাদা করিডর। রিসেপশনে পা দিয়ে থতমত খেয়ে গেল ও। চারদিকে ফুল আর মেয়ে। ভুল করে অন্য কোথাও চলে এলো নাকি?

এক এক করে ওদের দেখলো রানা। চারটে টেবিলে চার ললনা। ছ'জন নীল নয়না, একজন সবুজ নয়না, অপরজনের কালো হরিণ চোখ। প্রতিটি টেবিলে ফুলদানি আর ফুল। দু'জন টেলিফোনে কথা বলছে, সুশ্রী চেহারায় কৌতুক বা তরল কোনো ভাব নেই। বাকি দু'জন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সুন্দর চেহারায় মিষ্টি আর ভদ্র হাসি, কিন্তু আমন্ত্রণ বা প্রশ্রয় নেই। নিজেদের কাজে সিরিয়াস এরা, কারো মনোরঞ্জন করতে বসেনি।

কৃষ্ণনয়নাকে এশিয়ার মেয়ে বলে মনে হলো। পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে তার সামনে ধরলো রানা। কার্ডের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালো মেয়েটা, হাত চলে গেছে ইণ্টারকমের সুইচে। 'স্যার—মাসুদ রানা।' এক সেকেণ্ড পর ইণ্টারকমের সুইচ অফ করে কলিং বেলের সুইচ টিপলো মেয়েটা। প্রায় সাথে সাথে উর্দি পরা এক যুবক ঢুকলো রিসেপশনে। 'মিঃ মাসুদ রানা, ওর সাথে যান, প্লিজ—মিঃ জাসটিন চ্যাপেল আপনার অপেক্ষা করছেন।'

ধন্যবাদ দিয়ে যুবকের পিছু নিলো রানা। রিসেপশন থেকে বেরুবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েগুলোর দিকে একবার তাকালো ও। উঁহুঁ, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই।

করিডর থেকে সরু একটা প্যাসেজে, তারপর আবার একটা করিডরে চলে এলো ওরা। একটা দরজার সামনে থামলো যুবক, পর্দা সরিয়ে এক পা ভেতরে ঢুকলো। 'মিঃ মাসুদ রানা, স্যার।'

দরজার মাথায় নেমপ্লেট দেখে রানার চক্ষু চড়কগাছ। লেখা রয়েছে—জাসটিন চ্যাপেল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট। এতোক্ষণে ওর টনক নড়লো, আন-অফিশিয়াল হোক আর যাই হোক, সিরিয়াস কিছু একটা না হয়েই পারে না। বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট মস্ত একটা ব্যাপার। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, তিনি শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আর্দালী। প্রথমেই নজরে পড়লো কাকের বাসা—এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল, হলদেটে কপালটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। ঘন ভুরুর নিচে বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ, খুঁটিয়ে দেখছে ওকে।

'আসুন, মিঃ রানা,' রিভলভিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, মুখে স্মিত হাসি।

মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা কয়েকটা জানালা। একটা পর্দার দু'পাশ দিয়ে এক ফালি করে রোদ ঢুকেছে, বাইরে বেরিয়ে গেছে এক প্রস্থ তার, আকাশের গায়ে ক্ষুদে একটা জালের মতো অ্যান্টেনা।

'জাসটিন চ্যাপেল,' বললেন ভদ্রলোক, 'সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আফ্রিকান ডিভিশন।' রানার হাত ছেড়ে দিয়ে গদি মোড়া একটা চেয়ার দেখালেন তিনি। 'বসুন, মিঃ রানা।' পরনে সার্জের স্যুট, বয়স্ক, কিন্তু ভারি চটপটে এবং স্মার্ট। 'হুইস্কি?'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা। বসলো চেয়ারে। ক্ষুদে বার থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন জাসটিন চ্যাপেল। একটা গ্লাস রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন। দু'জনেই যে যার গ্লাসে চুমুক দিলো, তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

'বিশ্ব ব্যাংকের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে,' বললো রানা। 'রানা এজেন্সীকে তাদের দরকার পড়লো কেন?'

মোটা একটা এনভেলাপ ডেস্ক থেকে তুলে রানার দিকে ঠেলে দিলেন চ্যাপেল। 'এগুলো একটু দেখুন, মিঃ রানা, প্লিজ।'

এনভেলাপটা খুলে ভেতরে অনেকগুলো ফটোগ্রাফ দেখলো রানা। ছবিগুলো মুহূর্তে ওর দৃষ্টি এবং মনোযোগ কেড়ে নিলো। আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফের ছবি, যে-ই তুলে থাকুক বিস্তর ঝুঁকি নিয়ে তুলতে হয়েছে। হাতি, গণ্ডার, সিংহ, চিতা থেকে শুরু করে খরগোস, বেজী, সাপ কিছুই বাদ নেই। কোনো কোনোটা অনেক উঁচু থেকে তোলা হয়েছে, হেলিকপ্টার বা প্লেন থেকে। দারুণ হাত ফটোগ্রাফারের, শুধু আফ্রিকার বন্য প্রাণীদের ছবিই তোলেনি,

প্রকৃতিকেও নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে। উর্বর লাল মাটি, বাতাসের অবিরাম ধাক্কায় এবড়োখেবড়ো, কোথাও কড়া রোদে ফেটে চৌচির, কোথাও খরার কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ন্যাড়া। একটা ছবিতে গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো গাঢ় সবুজের উত্থান। আরেকটা ছবিতে শ খানেক হরিণ নদীর ঢালে চরছে, সামনে আদিগন্ত নীল, উদার আকাশ।

তেরো নম্বর ছবিটা দেখে সারা শরীর শক্ত পাথর হয়ে গেল রানার। কোনো প্রাণীর ছবি নয়, শুধু হাড়ের ছবি। প্রকাণ্ড খুলি, মস্ত পা, বিশাল পাঁজর। উজ্জ্বল আফ্রিকান রোদে ধবধবে সাদা সব। শিকারীদের মুখে মুখে ফেরা কিংবদন্তীর কথা মনে পড়ে গেল রানার। হাতির সমাধিক্ষেত্র। গোপন কোনো জায়গা, হাতিরা যেখানে মরতে যায়।

মুখ তুলতেই রানা দেখলো এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন জাসটিন চ্যাপেল। তাঁর মুখে এখন হাসি নেই। 'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়, মিঃ রানা।'

'পোচারদের কাণ্ড?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ। দুশো ছিয়াশিটা হাতি।'

সংখ্যাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। 'একবারে?'

'ওগুলোকে তাড়া করে একটা মাইন ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'মাই গড!' রানার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। এতোক্ষণ ভুলে ছিলো, মনে পড়তে গ্লাসটা তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিলো। অবৈধভাবে বন্য প্রাণী নিধন সব দেশেই নিন্দনীয়, এর বিরুদ্ধে কড়া

আইনও আছে। অবৈধ যে-কোনো ব্যবসার মত পোচিংও অত্যন্ত লাভজনক, তাই সব দেশেই পোচার আছে। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ ঠিকই তারা উদ্ধার করে। আরেক বার ছবিটার দিকে তাকালো রানা, তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলো, 'কিন্তু এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন জাসটিন চ্যাপেল। 'লোকে যেমন বলে, বিশ্ব ব্যাংক একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমাদের একটা আদর্শ আছে, এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করা হবে জেনেই কেবল ঋণ বা সাহায্য দিই আমরা।'

রানার কথায় ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ থাকলো, 'আপনাদের আদর্শ মানে তো কমিউনিজম ঠেকানো...'

বাধা দিয়ে চ্যাপেল বললেন, 'ঠিক তা বলা চলে না। আফ্রিকার অর্থনীতি সম্পর্কে ভাবুন। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ দেশ খাবি খাচ্ছে। জাম্বিয়া, তানজানিয়া আর মাপুতো-র আশা ছেড়ে দিয়েছি আমরা। ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, আর ইডিয়োলজিক্যাল ফ্যান্টাসী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের মরণ ডেকে এনেছে ওরা। কিন্তু কেনিয়া, জিম্বা-বুই আর মালয়ি, এদের ব্যাপারে এখনো আমরা আশা ছাড়িনি। ফার্মগুলো এখনো মরুভূমি হয়ে যায়নি, কৃষকদের ফসল ফলাবার উৎসাহ আছে, রেল লাইন তুলে ফেলা হয়নি—তামা, ক্রোম, আর ট্যুরিজম থেকে কিছু বিদেশী টাকাও আয় করে। উঠে পড়ে চেষ্টা করলে, আর ভাগ্য যদি একটু সহায়তা করে, এখনো হয়তো এই দেশগুলোকে বাঁচানো যায়।'

রানার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য এড়িয়ে গেছে চ্যাপেল, কিন্তু খোঁচা

দেয়ার সুযোগ পেয়ে আবার সেটা সদ্ব্যবহার করলো ও। 'এই বললেন বিশ্ব ব্যাংক দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, তাহলে কেউ মরলো কি বাঁচলো তা নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা কেন?'

'কারণ আমরা যদি ওদের না খাওয়াই, কিছুদিনের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের—ব্যাপারটা এই রকম সহজ সরল। ওরা যদি উপোস্ থাকতে শুরু করে, ভেবে দেখুন কার খাবার ভেতর গিয়ে পড়বে।'

পরিষ্কার জানিয়ে দিলো রানা, 'কেউ যদি আশা করে ক্যাপিটালিস্ট ব্লকের পক্ষ নিয়ে কমিউনিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে, বা কমিউনিস্ট ব্লকের পক্ষ নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে কাজ করবে রানা এজেন্সী, মস্ত বোকামি করবে সে। আমরা কারো পক্ষেও নেই, বিপক্ষেও নেই—আসলে আমরা এতো দুর্বল আর ছোটো যে রুই-কাতলাদের এইসব বিরোধে জড়িয়ে পড়া আমাদের সাজে না।'

'চমৎকার,' মৃদু হেসে বললেন চ্যাপেল। 'কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে?'

'আমরা ন্যায়ের পক্ষে—কিন্তু ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার আমরাই করবো।'

'ভেরি গুড,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন চ্যাপেল। 'এবার আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে দেশগুলোর কথা বললাম—কেনিয়া, জিম্বাবুই, আর মালয়ি—এদের মাটিতে সোনার খনি নেই, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস্ আছে। ট্যুরিজম। ধনী দেশগুলো থেকে লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর বেড়াতে যায় আফ্রিকায়। আফ্রিকার প্রকৃতি ট্যুরিস্টদের চুম্বকের মতো টানে। টাকা আমরা সাহায্য বা ধার দিই ফিরে পাবার আশা নিয়ে, আর ফিরে পেতে হলে লক্ষ্য রাখতে

হবে দেশগুলো যেন সত্যি সত্যি আকর্ষণীয় থাকে। ট্যুরিজম থেকে আয় হলে তবেই আমাদের টাকা ফেরত দিতে পারবে ওরা।'

'ট্যুরিস্টরা যাতে দেশগুলোয় যায় সে-ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত হতে চান, কিভাবে তা সম্ভব?'

'কেনিয়ার কথা ধরুন,' বললেন চ্যাপেল, 'রোদ আর সৈকত আছে ওখানে, কিন্তু তা তো গ্রীস বা সারডিনাতে আছে—প্যারিস কিংবা বার্লিন থেকে ওগুলো অনেক কাছেও। আসলে ওখানে যা নেই তা হলো, আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ। বেশি সময় আর টাকা খরচ করে ট্যুরিস্টরা কেনিয়ায় যাবে ওই একটা কারণে, ওখানে ওয়াইল্ড লাইফ আছে। ওটা আছে বলেই আমরা কেনিয়াকে টাকা দিই। এখন আমাদের শুধু দেখতে হবে, সেখানকার ওয়াইল্ড লাইফ যাতে ধ্বংস না হয়।'

'বেশ, বুঝলাম,' বললো রানা। 'রানা এজেন্সী এর মধ্যে কিভাবে আসছে?'

'একটু ধৈর্য ধরুন, সে প্রসঙ্গে আমরা আসবো,' বললেন চ্যাপেল। 'শ্বেতাঙ্গরা বিদায় নেয়ার পর কালোরা চারদিকে চোখ বুলিয়ে প্রথমেই তিনটে জিনিস দেখতে পেলো—আইভরি, গণ্ডারের শিং, আর গাদা গাদা মাংস। একজন কালো লোক দশ বছরে যা আয় করবে, একটা গণ্ডার বা বয়স্ক হাতির দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের স্বার্থেই এই সম্পদ রক্ষা করেছে। কিন্তু কালোদের সামনে এখন মস্ত টোপ—গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরি একটা ছোরা পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনে নেবে আরবের একজন শেখ। গণ্ডার মারা, কোনো অসুবিধে নেই। বিজয়ী গেরিলা ফাইটারের হাতে রয়েছে এ-কে ফরটিসেভেন

রাইফেল।'

'হ্যাঁ, এ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা আছে আমার,' বললো রানা।

'কেনিয়াতে আমরা এই সমস্যাতেই পড়েছিলাম,' বললেন চ্যাপেল। শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করলেন তিনি। 'পোচিং ওখানে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্যবসাটা চালাচ্ছিল ওপর মহলের লোকজন। পনেরো বছর ধরে এর বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা—একজন প্রেসিডেন্টকে মরতে পর্যন্ত হয়েছে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেনিয়ায় এখন সবচেয়ে কড়া 'গেইম ল' রয়েছে। আইনের ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে যাবে তার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু এর জন্যে সব রকম প্রভাব খাটাতে হয়েছিল আমাদের, এমনকি হুমকি দিয়ে বলতে হয়েছিল পাওনা টাকা ফেরত চাইবো, নতুন লোনও দেবো না। কিন্তু এখন আমাদের ইনভেস্টমেন্টে কোনো ঝুঁকি নেই—ওয়েল প্রোটেকটেড।' একটু থেমে সিধে হয়ে বসলেন চ্যাপেল, তারপর রানার দিকে সামান্য ঝুঁকলেন। 'সেই একই ব্যবস্থা জিম্বাবুয়ের ব্যাপারে নিতে হবে আমাদের। মাইনফিল্ডে নিয়ে গিয়ে কিভাবে হাতির পালকে মারা হয়েছে, নিজের চোখেই তো দেখলেন। গোটা ব্যাপারটা খুব গোছালো, তারমানেই ওপর মহলের কেউ জড়িত এই পোচিঙের সাথে। তাকে আমাদের থামাতে হবে।'

'আমি কিন্তু এখনো অপেক্ষা করছি...।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন, 'সোজা কথায়, ফিল্ডে আমরা একজন এজেন্ট চাই। এমন একজন, আফ্রিকা সম্পর্কে যার ধারণা আছে, স্থানীয় ভাষা মোটামুটি ভালোই বলতে পারে, বন্য প্রাণীদের ওপর দরদ আছে। সে যদি একজন সাংবাদিক হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা—এটা সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে

কেউ তাকে কোনো রকম সন্দেহের চোখে দেখবে না।'

'আমি সাংবাদিক, সে-খবরও তাহলে জানা আছে আপনাদের?'

চ্যাপেলের চেহারায় বিনয় প্রকাশ পেলো। 'হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে প্রায় সবই জানি আমরা। ঠিক যে-ধরনের লোক দরকার আমাদের, আপনি তাই। তুটো প্রধান ভাষার একটা জানেন আপনি—সিনডেবেল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে এই রকম একটা ইংরেজী দৈনিকের রিপোর্টার আপনি। বেশ কয়েকবার আফ্রিকায় গেছেন, ওখানকার ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা আছে। আরেকটু হুইস্কি, মিঃ রানা?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লো রানা।

'ইচ্ছে করলে তুটো পরিচয়ই আপনি কাজে লাগাতে পারেন,' আবার বললেন চ্যাপেল। 'রিপোর্টার হিসেবে আপনি আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ বা আর কিছুর ওপর একটা বই লিখবেন, সেটা সচিত্র হলে ভালো হয়। বিশ্ব ব্যাংক পাবলিশার নয়, তবে নাম করা কোনো পাবলিশারকে দিয়ে ওটা আমরা পাবলিশ করাতে পারবো। আরেকটা পরিচয়—ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর অভ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। রানা এজেন্সী থেকে ধার করছি আপনাকে, ফি যাই হোক না কেন। আপনার কাজ, ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট করা।'

'বিশ্ব ব্যাংক যখন,' মৃত্যু হেসে বললো রানা, 'প্রতি মাসের জন্যে বিশ হাজার ডলার ফি চাইবো।' তারপরই তাড়াতাড়ি বললো ও, 'তারমানে এই নয় যে কাজটা নিচ্ছি। ভেবে দেখতে হবে...।'

'বিশ হাজার কেন, চল্লিশ হাজার দেবো আমরা,' সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কিন্তু সময় খুব কম, মিঃ রানা। আপনি যদি

দয়া করে···।'

ভদ্রলোকের কথা শুনছে না রানা। যতো সহজ শোনালো, ব্যাপারটা ততো সহজ নয়—এর মধ্যে আরো জটিল কিছু ঘাপলা নিশ্চই আছে। চাপ দিলে সেটা বেরিয়ে আসবে। কারো বা কোনো ব্লকের বিরুদ্ধে অন্যায় কিছু করবে না সে। বিশ্ব ব্যাংক ওকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে ভুল করবে। সমস্যা আসলে অন্যখানে। অনেক দিন হলো, দেশের বাইরে আছে ও। কাজের পাহাড় জমে আছে। তাছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের মতো একটা প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে হলে বসের অনুমোদন দরকার। লোকে বলাবলি করে, বিশ্ব ব্যাংক সি. আই. এ.-রই একটা অংগ সংগঠন।

'মিঃ রানা?' চ্যাপেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

মুখ তুললো রানা। 'আমার বসের সাথে আলাপ না করে কিছু বলতে পারবো না,' বললো ও। 'আপনাদের ওয়্যারলেস সেটটা একবার ব্যবহার করতে পারি?'

'ঢাকার সাথে কথা বলবেন?' চ্যাপেল একটুও অবাক হলেন না। তিনি যেন জানতেন, রানা ওয়্যারলেস সেট ব্যবহার করতে চাইবে।

'হ্যাঁ।'

ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখালেন চ্যাপেল। 'গো অ্যাহেড।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো রানা, সেটের সামনে বসলো। হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে ওর। অনেক মাস পর সরাসরি বসের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে ও। তাঁর অনুমতি না নিয়ে ইটালিয়ান মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছে, প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে জানা নেই। ধেত্তেরি, এতো নার্ভাস হয়ে পড়লে চলে! মুশকিল হলো, বুড়োর মন মেজাজ কখন কেমন থাকে কেউ বলতে পারে না। চোখের

সামনে ভেসে উঠলো কাঁচা পাকা ভুরু, কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এক জোড়া অন্তর্ভেদী চোখ। নাগালের বাইরে, কয়েক হাজার মাইল দুরে রয়েছে ও, তা সত্ত্বেও বুকটা ধড়ফড় করতে লাগলো।

প্রথমে অপারেটরের সাথে কথা বললো রানা। বস অফিসেই আছেন।

কয়েক সেকেণ্ড ঘামলো রানা। তারপর কানে এলো সেই জলদ গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর, 'রানা?'

ঢোক গিললো রানা; হড়বড় করে বললো, 'জ্বী, স্যার।'

'ওয়েল ডান, মাই বয়। মানুষের কাজ করেছো তুমি। ফুলের একটা কুঁড়িকে ছিঁড়ে পায়ে দললে দানবের এই শাস্তিই পাওনা হয়। ...আমি খুশি হয়েছি। তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত।'

সেটের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো রানা। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পাষাণ হৃদয় মেজর জেনারেল রাহাত খান এ কোন্ ভাষায় কথা বলছেন।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন মেজর জেনারেল। 'তোমার ছুটি আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে...।

'স্যার,' বলে চুপ করে থাকলো রানা; কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।'...বিশ্ব ব্যাংক থেকে ওরা...'

'জানি,' বলে রানা কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষায় থাকলেন রাহাত খান।

'কাজটা কি নেবো, স্যার?'

'অবশ্যই। গোটা একটা উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এ আমরা হতে দিতে পারি না। মানবতার প্রশ্ন। চ্যাপেলের সব কথায়

তোমার কান দেয়ার দরকার নেই—ওরা অফার দেয়ার আগেই অন্য এক সূত্রে বি. সি. আই. ওখানে নাক গলিয়েছে। ফটোগ্রাফার আমাদের এজেন্ট। আর কিছু জানতে চাও?'

'ন্-না, স্যার!'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাথা ঝাড়া দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলো রানা, এতোক্ষণ যেন সম্মোহিত ছিলো ও। অনেক কথা ভিড় করে এলো মনে। অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেল। সবশেষে ভাবলো, ফটোগ্রাফার কে? সোহেল হতে পারে না। জাহেদ? নাকি রাশেদ? বি. সি. আই.-এর সব এজেন্টই দক্ষ ফটোগ্রাফার। আচ্ছা, কোনো মেয়ে এজেন্ট নয় তো?

নিজের আশার বহর দেখে নিজেই লজ্জা পেলো রানা। গাল দিলো, 'ওরে, শালা!'

'ইয়েস, মিঃ রানা?' রানা অফিসে ফিরে আসতেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন চ্যাপেল।

'তার আগে ঝেড়ে কাশুন, মিঃ চ্যাপেল,' বললো রানা। 'সব কথা আপনি আমাকে বলেননি।'

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন চ্যাপেল, গ্লাসে হুইস্কি ভরে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। 'আপনার খুঁত-খুঁতে স্বভাবই বলে দেয় লোক নির্বাচনে আমরা ভুল করিনি। হ্যাঁ, মিঃ রানা, আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে। ভেতরে ভেতরে কি চলছে, আমাদের জানা দরকার, পুঁজি ফিরে পাবার স্বার্থেই। কিন্তু জিম্বাবুইয়ে আমাদের সেট-আপ মার খেয়েছে। আমরা একজন কী-ম্যানকে হারিয়েছি—মোটরকার অ্যাক্সিডেন্ট—অন্তত দেখে তাই মনে হয়েছে। সর্বশেষ রিপোর্টে সে আমাদেরকে আভাস দিয়ে

বলেছিল, ওখানে একটা কু করার চেষ্টা চলছে। এবার বলুন, মিঃ রানা, আপনার সাহায্য আমরা পাবো ?'

'ফি নিয়ে কথা হয়ে গেছে, কিন্তু খরচাপাতি ?'

'সব আমাদের।'

'তার মধ্যে কি ফার্স্ট ক্লাস এয়ার টিকেটও আছে ?' সকৌতুকে জানতে চাইলো রানা। 'বুঝতেই পারছেন কাজটা আমি নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!' খুশিতে উঠে দাঁড়িয়ে রানার সাথে আরেকবার করমর্দন করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'একটা ফাইল আর একটা সারভাইভাল কিট আপনার হোটেলে আজই পৌছে যাবে। আমাদের লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে ফাইলটা পড়বেন, তারপর ফেরত পাঠাবেন। কিটটা আপনার কাছে থাকবে।'

সারভাইভাল কিটে পাওয়া গেল অনেকগুলো প্রেস কার্ড, TWA অ্যামব্যাসাডর ক্লাবের সদস্য কার্ড, একটা আন লিমিটেড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভিসা ক্রেডিট কার্ড, আর একটা ধাতুর ওপর এনামেলের নকশা করা তারকাচিহ্ন—ছোট একটা চামড়ার কেসের গায়ে ফিট করা; তার ওপর লেখা রয়েছে: 'ফিল্ড অ্যাসেসর—ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'।

লোকটাকে সিটিং রুমে বসিয়ে রেখে এক ঘণ্টা ধরে ফাইলটা পড়লো রানা। ফাইলের সাথে এক গাদা বই আর ম্যাগাজিনও নিয়ে এসেছে লোকটা। সেগুলো রেখে শুধু ফাইলটা ফেরত দিলো ও। বই আর ম্যাগাজিনগুলো আফ্রিকার ওপর প্রতিবেদন লিখতে সাহায্য করবে ওকে।

বুলাওয়ায়ো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি থেকে একটা ফোক্সওয়াগেন

ভাড়া করেছে রানা। শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে এসে বাঁক নিলো, হলুদ মেটো পথ ধরে উত্তর দিকে ছুটলো গাড়ি। এক মাইল পেরোতেই পাঁচিলটা দেখা গেল। গেটের অবস্থা দেখে ভুরু কোঁচকালো—মাতালের মতো কাত হয়ে আছে একদিকে, হাঁ হাঁ করছে। গাড়ি থামিয়ে গেট বন্ধ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না—ফ্রেমটা তুবড়ে গেছে, মরচে ধরেছে কব্জাগুলোয়। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কয়েক পা সামনে এগোলো ও, ওখানে ঘাসের ওপর সাইন বোর্ডটা পড়ে রয়েছে।

তিনটে লোহার রডের মাথায় ছিলো বোর্ডটা। টিনের চারপাশে তামার বর্ডার ছিলো। তামা আর রড গায়েব হয়েছে, গায়ে অসংখ্য ফুটো নিয়ে শুধু পড়ে আছে টিনের পাতটা। ধরে সেটাকে উল্টো করলো রানা। লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে, তবু পড়া যায় এখনো।

কিং'স হেভেন

প্রোপাইটার ঃ রেবেকা সাউল

বোর্ডের গায়ে প্রকাণ্ড একটা সিংহের মাথা আঁকা ছিলো, রঙ চটে গিয়ে সেটা এখন চেনা যাচ্ছে না। গাড়িতে ফিরে এসে বসলো রানা, মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে চারদিকে তাকালো। সামনে ছিলো আদিগন্ত ঘাস—ঘন, সবুজ, কোথাও কোথাও সোনালি। এখন প্রৌঢ় এক লোকের টাক, সম্পূর্ণ ন্যাড়া। সত্তর দশকের তীব্র খরাতেও কিং'স হেভেনের ঘাস মরেনি, মনে পড়লো ওর। ব্যাপারটা কি? কিং'স হেভেন দেখাশোনা করছে যারা তারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়? ঘাসের এ অবস্থা হলো কি করে?

মাইল কয়েক এগিয়ে ক্যামেল থর্ন ঝোপের পাশে আবার গাড়ি

থামালো রানা, ঝোপগুলো রাস্তার ওপর ছায়া ফেলেছে। ঝোপের ওদিক থেকে ব্যা ব্যা ডাক শুনে চমকে উঠলো ও। 'ছাগল।' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। 'কিং'স হেভেনে ছাগল চরছে!' গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। রেবেকার প্রিয় গ্রাসল্যাণ্ডে ছাগল। নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর, মাঝে মধ্যে লোক পাঠিয়ে হলেও খোঁজ-খবর নেয়া উচিত ছিলো। সে অধিকার তাকে দিয়ে গেছে রেবেকা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানি দেখাশোনা করছেন রেবেকার চাচাতো ভাই রুবেনসন। ভদ্রলোক কি অন্ধ হয়ে গেছেন? হোক একবার দেখা।

ঝোপ পেরোতেই আবার ফাঁকা মাঠ, এক পালে অন্তত দুশো ছাগল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালো, সাদা-কালো, বাদামি, সাদা-বাদামি, কালো-বাদামি— সব রঙেরই আছে। কোনোকোনোটা উঠে গেছে গাছের ওপর, বাকল আর কচি পাতা মুচড়ে খাচ্ছে। বাকিগুলো গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে খাচ্ছে ঘাস, তারমানে ওগুলো আর নতুন করে গজাবে না। অল্প বয়েসী দু'জন রাখালকে দেখা গেল। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে পাখির খোঁজে হাঁ করে তাকিয়ে আছে গাছগুলোর দিকে। তাদের কাছে ডেকে চকলেট দিলো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে একজন সাদা চাষী ছিলো, সে এখন কোথায় জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো একজন রাখাল। 'নেই। চলে গেছে। কোথায় জানি না।' রানার পিছু পিছু রাস্তা পর্যন্ত এলো ওরা, আরো চকলেট চায়। কিং'স হেভেনের অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেলেও, নতুন করে এদের প্রতি স্নেহ আর টান অনুভব করলো

রানা। এই এলাকায় ম্যাটাবেল উপজাতিদের বসবাস। ছেলে-বুড়ো সবাই মাটির মানুষ, যেমন সরল তেমনি নিরীহ। রেবেকা এদের ভালোবাসতো, তার সাথে বার কয়েক এখানে এসে রানারও এদেরকে ভালো লেগে যায়। মুঠো ভরা চকলেট নিয়ে ছেলে ছুটো এমনভাবে হাত নেড়ে বিদায় জানালো ওকে, যেন কতো কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে ওদের মধ্যে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে আবার গাড়ি থামালো রানা। বাড়ি-টার দিকে করুণ চোখে তাকালো। অযত্নে সবুজের একটা কণা পর্যন্ত নেই লনে। ফুল-বাগানেও ছাগল চরছে। এতো দূর থেকেও পরিষ্কার বোঝা গেল, বাড়ির বড় অংশটায় কেউ বসবাস করছে না। কোনো জানালায় কবাট নেই, ছাদের বেশির ভাগ অ্যাসবেসটস শীট চুরি হয়ে গেছে। ছাদের টালি-গুলো দিয়ে দখলকারীরা আস্তাবলের কাছে চৌকো আকৃতির খোপ বানিয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে এসে বিশাল, গভীর কুয়াটার পাশে গাড়ি থামালো রানা। উঁকি দিয়ে দেখলো, কুয়া শুকিয়ে গেছে, নিচে রাজ্যের আবর্জনা। খোপগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো ও। আট দশটা পরিবার বাস করছে এখানে। ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো একটা লেজকাটা কুকুর, কয়েকটা পাথর ছুঁড়ে তাকে ভাগালো ও। আগুনের সামনে বসে আছে বুড়ো এক ম্যাটাবেল, রানাকে দেখে একগাল হাসলো সে। অচেনা লোককেও সাদর অভ্যর্থনা জানায় এরা। বুড়োর সামনে, আগুনের এপারে, শক্ত মাটির ওপর পদ্মাসনে বসে পড়লো রানা।

সিনডেবেল ভাষায় কথা বলতে গিয়ে প্রথম দিকে জড়তা বোধ করলেও, ধীরে ধীরে শব্দগুলো সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসতে

লাগলো।

'দেশ তো স্বাধীন হলো, কিন্তু আমাদের অবস্থা ভালো হওয়া দূরের কথা, দিনে দিনে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে...' ভালো একজন শ্রোতা পেয়ে মনের দুঃখ প্রকাশ করছে বুড়ো। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। সেখানেও তো এই একই অবস্থা...।

ঘণ্টাখানেক কথা বললো ওরা। না, সাদা কৃষক লোকটা কোথায় গেছে বুড়ো জানে না।

বুড়োকে আগুনের ধারে রেখে বাড়ির দিকে এগোলো রানা। দু'ফোঁটা কফির মতো এক জোড়া চোখ মানস পটে ভেসে উঠলো। বিষণ্ণ। রেবেকা যেন বলছে, দেখো রানা, দেখো; আমার কিং'স হেভেনের কি অবস্থা করেছে ওরা! হঠাৎ একটা খসখস আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরালো রানা।

এই অপরূপ সৌন্দর্যের বুঝি কোনো তুলনা নেই। প্রায় ছয় ফিট লম্বা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী চঞ্চলা হরিণীর মতো প্রায় ছুটে আসছে ওর দিকে। খুঁত বলতে ছোটো চুল, বাতাসে উড়ছে। শরীরে কোথাও এক ছটাক মেদ নেই, নগ্ন উরুতে মখমলের মসৃণতা। সরু কোমর, সেখানে ছোট এক টুকরো চামড়া, দ্রুত হাঁটছে বলে লাফাচ্ছে টুকরোটা কোমর থেকে ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে ধড়। স্তনে কোথাও কোনো টোল নেই, ভরাট আর ছুঁচালো—হাঁটার ছন্দে ঘন ঘন লাফাচ্ছে, মাঝে মধ্যে পুঁতির মালার আড়াল থেকে প্রায় সম্পূর্ণটাই বেরিয়ে আসছে বাইরে। নিষ্পাপ এক জোড়া চোখ, দৃষ্টিতে সমীহ, কৌতুহল, কৌতুক মিলেমিশে একাকার। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

কোনো জড়তা নেই, সোজা হেঁটে এসে রানার একটা হাত ধরলো মেয়ে। 'অতিথি খালি মুখে ফেরে নাকি?' চিবুক তুলে নিজের ক্ষুদে খোপটা দেখালো সে। 'শুকনো একটু গোশতো মুখে দিয়ে এক মগ লেবুর সরবত অন্তত খেয়ে যা।'

আগুনের কাছ থেকে বৃদ্ধ কুয়াকোপা মিটি মিটি হাসছে, চিৎকার করে বললো, 'ও আমার দস্যি মেয়ে নিলি। যা বলছে শোনো, বাপু, ওর সাথে তুমি পারবে না।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। ইচ্ছে করলো জিজ্ঞেস করে, এতো রূপ-যৌবন নিয়ে তুমি মাটিতে থাকো কিভাবে, নিলি? কিংবা জানতে চায়, তুমি জানো তুমি সুন্দর? আড়ষ্ট একটু হেসে বললো, 'নিলি, সুন্দর নাম। আমি এখন একটু ব্যস্ত, পরে তোমার হাতে পানি খাবো, কেমন?'

মিষ্টি হেসে রাজি হলো নিলি। বললো, 'তখন কিন্তু আমার সাথে গল্প করতে হবে তোকে। বলতে হবে কোন্ মুলুক থেকে এলি। কোথায় শিখলি আমাদের ভাষা। তুই সাদা বাবু না, আবার কালো বাবুও না—তাহলে কোন্ বাবু?'

হেসে ফেললো রানা। 'আমি বাদামি বাবু।' হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ও। 'ঠিক আছে, সময় করে একদিন গল্প করা যাবে, কেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড পর পিছন থেকে ডাকলো নিলি, 'বাবু!'

ঘাড় ফিরিয়ে কাউকে দেখলো না রানা। আরে, গেল কোথায়! তারপর চোখে পড়লো। গাছের মগডালে বসে দোল খাচ্ছে, হাতে পাকা একটা পেয়ারা। মস্ত একটা কামড় বসালো সে, ঘন ঘন পা দোলাচ্ছে, তারপর পেয়ারাটা ছুঁড়ে দিলো রানার দিকে।

লুফে নিয়ে পেয়ারার এক ধারে ছোট্ট একটা কামড় দিলো রানা,

তারপর ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে। খিলখিল করে হাসতে লাগলো নিলি।

বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে চারদিকে চোখ বুলালো রানা। এখানে সেখানে ছাগল-নাদা, চেরা কাঠ, গাছের শুকনো পাতা, ইঁদুরের গর্ত। বিশ্বাসই হয় না এই বারান্দায় বসে জ্যোছনা রাতে রেবেকার সাথে গল্প করেছে ও। জোড়া দরজার দু'পাশে দুটো হাতির দাঁত ছিলো, নেই। লাইব্রেরীতে ছিলো বাঘ, সিংহ আর হরিণের চামড়া, একটাও নেই। বই তো নেই-ই, বুক শেলফগুলো পর্যন্ত উধাও।

গোটা বাড়ি ঘুরে দেখার ইচ্ছেটা আর থাকলো না। যতোই দেখবে ততোই মন খারাপ হবে। কিন্তু কিং'স হেভেনের এই হাল হলো কি করে?

ফোক্সওয়াগেনের দিকে ফিরে আসার পথে আবার মেয়েটাকে দেখলো রানা। সেই গাছের ওপরই বসে গোগ্রাসে পেয়ারা খাচ্ছে। একটা পেয়ারা উঁচু করে রানাকে দেখালো নিলি, রানা মাথা নাড়লো।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠে এলো রানা। ভিউ মিররে চোখ পড়তে নিলিকে আবার দেখতে পেলো। গাছ থেকে নেমে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন বিষণ্ণ, করুণ দেখালো মেয়েটাকে। একদৃষ্টে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আবার দেখা হবে, মৃদু হেসে ভাবলো রানা।

তিন

পাঁচটার আগেই শহরে ফিরে এলো রানা, স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের পাশে এস্টেট অ্যাণ্ড অকশনিয়ারিং কোম্পানির অফিসটা খোলা দেখলো। ভেতরে ঢুকতেই হৈ হৈ করে উঠলো কালিচরণ ডিক্রু। খাকি শর্টস আর হাফ-হাতা বুক খোলা শার্ট পরে আছে সে, আগের মতোই নাদুস-নুদুস, বেঢপ ভুঁড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে।

'অ্যাদ্দিন পর মনে পড়লো আমাদের কথা, অ্যাঁ? কেমন আছেন, মিঃ রানা?' বাড়ির জন্যে সমস্ত আসবাব এই ডিক্রুর কাছ থেকেই কিনতো রেবেকা।

'ভালো,' বললো রানা। হ্যাণ্ডশেক করলো ওরা। 'তুমি কেমন, ডিক্রু? এদিকের সব খবর ভালো তো?'

অফিসে লোকজন নেই, চালু হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান খুলে ফেললো কালিচরণ ডিক্রু। 'এই চলছে এক রকম। আগের দিন কি আর আছে!'

চেয়ারে বসে বিয়ারে চুমুক দিলো রানা। 'এইমাত্র কিং'স হেভেন থেকে ফিরলাম, একেবারে যা তা অবস্থা করে রেখেছে। মিঃ রুবেন-সনকেও ওখানে দেখলাম না।'

'আপনি জানেন না?' আকাশ থেকে পড়লো ডিক্রু। 'কিং'স হেভেন তো বিক্রি হয়ে গেছে।'

'বিক্রি হয়ে গেছে!' একটা ধাক্কা খেলো রানা।

'সে কি আজকের কথা, প্রায় এক যুগ হয়ে এলো!'

'কিন্তু কিং'স হেভেন⋯ !'

'শুধু কিং'স হেভেন? গোটা সাউল র‍্যাঞ্চিং কেম্পানী বিক্রি হয়ে গেছে—কিং'স হেভেন, কুইন'স হেভেন, শিজারিরা এস্টেট, স-ব। বলতে গেলে পানির দরে, আড়াই লাখ ডলারে। আপনি কিছুই জানেন না?' ডিক্রুর চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

বিড়বিড় করে বললো রানা, 'আড়াই লাখ ডলার⋯সে তো দান করে দেয়ার মতো!'

'সাথে পুরো স্টক ছিলো—সেরা জাতের আফ্রিকান ষাঁড়, পোয়াতী গাভী, যা ছিলো সব।'

'কিন্তু কেন?' শুধু বিস্ময় নয়, দুঃখ হচ্ছে ওর। সম্পত্তিটা রেবেকার, চাচাতো ভাই রুবেনসনের অবস্থা ভালো নয় বলে তাঁকে এক রকম দানই করেছিল সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী। রুবেনসনকে ভারি শ্রদ্ধা করতো রেবেকা, তাঁকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্ণি-ও দিয়েছিল। এই সম্পত্তি রেবেকার একটা স্মৃতি, সেটা ভুলে গিয়ে সব একেবারে বিক্রি করে দিলেন ভদ্রলোক।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডিক্রু। 'মিঃ রুবেনসন কি আর সাধে বিক্রি করেছেন! সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে কলজের পানি এখনো শুকিয়ে আসে⋯'

'কেন, কি হয়েছিল?'

'দেশ স্বাধীন হবার পরপরই শুরু হয়ে গেল রায়ট। সাদারা এতো-

দিন অত্যাচার করেছে, এবার শুরু হলো কালোদের বদলা নেয়ার পালা। সাদাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো, যাকে যেখানে পাওয়া গেল তাকে সেখানেই গুলি করে মারা হলো…'

'মিঃ রুবেনসন ?' রানা জানে, অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন ভদ্রলোক, রাজনীতির সাথে নিজেকে কখনো জড়াননি, কালোদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন তিনি।

'পাইকারী খুন-খারাবি যখন শুরু হয়, তখন ভালো মানুষটিরও কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মিঃ রুবেনসনের ভাই, জেমিসনের কথা নিশ্চই আপনার মনে আছে। কালোদের ওপর সে কি রকম অত্যাচার করতো, সে তো আপনিও কিছু কিছু জানেন। জেমিসন তো যুদ্ধের সময় মারা গেল, কিন্তু কালোরা খুঁজতে শুরু করলো তার আত্মীয়-স্বজনকে। কোনো রকমে পালিয়ে এসে আমার বাড়িতে উঠলেন তিনি।'

'তারপর ?'

'ঠিক হলো, প্রথম সুযোগেই ওনাকে আমি একটা প্লেনে তুলে দেবো, অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবেন উনি। কোম্পানীটা উনি বিক্রি করতে চাননি। আমিই বললাম, এই যাওয়া আপনার শেষ যাওয়া, আর কখনো ফিরে আসতে পারবেন না—বিদেশী একটা পার্টি র‍্যাঞ্চ কিনতে চাইছে, বিক্রি করে দেন, কম-বেশি যা পান তাই লাভ। কথাটা শুনে সে কি কান্না তাঁর! বললেন, এখানে আমি জন্মেছি, এটা আমার ছোটো বোনের সম্পত্তি, তার একটা স্মৃতি—এ আমি কি করে বিক্রি করি!' সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলো ডিক্রু।

রানা হাত বাড়াতে ওকেও একটা সিগারেট দিয়ে আবার শুরু

করলো সে, 'অনেক করে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম। পার্টি হাতেই ছিলো, বিক্রি হতে দেরি হয়নি। টাকাটা ইচ্ছে করলে জুরিখে গিয়ে পার্টির কাছ থেকে নিতে পারতেন তিনি, কিন্তু রাজি হলেন না ; বললেন, এ টাকায় আমি হাত দেবো না, এখানকারই কোনো বিদেশী ব্যাংকে রেখে যাবো। রাখলেনও তাই। ক'দিন পর, পরিস্থিতি একটু শান্ত হতে, প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম, যাবার সময় বললেন, আবার আমি ফিরে আসবো…'

'কিনলো কে ?'

'একটা সুইস-জার্মান কনসরটিয়াম।'

'কেন, ওরা র‍্যাঞ্চ কিনলো কি মনে করে ?'

'ওরা ব্যবসা বোঝে,' বললো ডিক্রু। 'প্রথম চোটেই গরুগুলোকে নিয়ে চলে গেছে। বড় কোনো অফিসারকে ঘুষ দিয়ে এক্সপোর্ট পারমিট যোগাড় করে, তারপর ওগুলোকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাচার করে দেয়। ওগুলো বিক্রি করেই প্রায় পনেরো লাখ ডলার কামিয়েছে। আপনি তো জানেনই, দুনিয়ার সেরা জাতের গরু ছিলো ওগুলো।'

'তারপর র‍্যাঞ্চটাকে সেই থেকে খালি করে ফেলে রেখেছে ?'

'ফেলে রাখবে না তো কি, আর কি আছে র‍্যাঞ্চে ? কোনো কাজে আসবে না, তাই বেচে দেয়ার তালে আছে।

'আর মিঃ রুবেনসন ? চিঠিপত্র লেখেন ?'

'ওহ হো! বলতেই ভুলে গেছি! মিঃ রুবেনসন তো আজ প্রায় এক মাস ধরে এখানে। বেচারা অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। কাল সকালেই ওনার ফ্লাইট… '

'হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে মানে ?' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার।

'এখানকার পরিস্থিতি এখন ভালো, সাদারা নতুন করে র‍্যাঞ্চ করার সুযোগ পাচ্ছে। আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে সেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটে এলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সম্পত্তি ফিরে পাওয়া তাঁর কপালে নেই।'

'কেন, অসুবিধেটা কি? এইতো তুমি বললে কনসরটিয়াম আবার র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিতে চাইছে।'

'অসুবিধে কি একটা!' ম্লান গলায় বললো ডিক্রু। 'যুদ্ধের সময় যারা কালোদের বিরুদ্ধে লড়েছে তাদের পরিবারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। এ-ধরনের পরিবারের কোনো সদস্য জিম্বাবুয়ে-তে জমি-জমা কিনতে পারবে না।'

চুপ করে থাকলো রানা। একটু পর জানতে চাইলো, 'আর কি অসুবিধে?'

'অস্ট্রেলিয়ায় ছোটোখাটো একটা চাকরি করেন মিঃ রুবেনসন,' বললো ডিক্রু। 'সংসারই ভালো করে চলে না, সঞ্চয় করবেন কোত্থেকে। ব্যাংকের টাকাটা অবশ্য আছে। কনসরটিয়াম দাম হাঁকছে বিশ লাখ।'

রানা বুঝলো, রুবেনসনের সম্পত্তি ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। দুঃখই লাগে, রেবেকার একটা স্মৃতি এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালো ও। 'বিয়ারের জন্যে ধন্যবাদ, ডিক্রু।'

'মিঃ রুবেনসন আপনার অনেক খোঁজ করেছেন,' বললো ডিক্রু। 'সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানীর পাওয়ার অভ অ্যাটর্ণি তাঁকে দেয়া হলেও, তিনি মনে করেন মিস রেবেকা মারা যাবার পর সম্পত্তির মালিকানা আপনার ওপর বর্তেছে। টাকাটা সেজন্যেই তিনি খরচ করছেন না। আপনি কোন্ হোটেলে উঠেছেন জানলে··· ।

মাথা নাড়লো রানা। 'পাগল নাকি! মিঃ রুবেনসনকে রেবেকা কি রকম শ্রদ্ধা করতো আমি জানি না! কোম্পানীটা রেবেকা এক-রকম দানই করেছিল তাঁকে। কালই চলে যাচ্ছেন উনি, তাই না? যদি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়, তাঁকে বলবে, এই টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই। টাকাটা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় র‍্যাঞ্চ বা আর কিছু করলে আমি খুশি হবো।'

ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল রানা, হোটেলের ঠিকানা না দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

হোটেলে ফিরে শাওয়ার সারলো রানা, ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। নিজের স্যুইটে বসে ডিনার সারলো। এবার রাতের বুলাওয়ায়ো শহর দেখতে বেরুবে।

জুতোর ফিতে বেঁধে সিধে হতে যাবে, নক হলো দরজায়। তির্যক দৃষ্টিতে বন্ধ কবাটের দিকে তাকালো ও। কেউ জানে না এই হোটেলে উঠেছে ও। রুম-সার্ভিস এভাবে ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক করে টোকা দেবে না। 'কে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ও।

'দরজা খোলো, ভাই,' ইংরেজীতে বললো একজন। কিন্তু উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল, লোকটা ইংরেজ নয়। কার গলা? একটু যেন চেনা চেনা লাগছে।

দরজা খুললো রানা। বছর পঞ্চাশেক বয়স ভদ্রলোকের, পাক ধরেছে চুলে। আগের সেই স্বাস্থ্য নেই, গাল বসে গেছে, চোখের নিচে কালি। অবাক হয়ে বললো রানা, 'মিঃ রুবেনসন!'

চৌকাঠ পেরিয়ে রানাকে আলিঙ্গন করলেন ভদ্রলোক। তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে হাত দুটো রানার কাঁধে রাখলেন, খুঁটিয়ে লক্ষ্য

করলেন ওকে। 'ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, চোখে বিস্ময় ভরা আনন্দ, 'ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছে।'

'কেমন আছেন, মিঃ রুবেনসন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। তার হাত ধরে একটা চেয়ারের দিকে এগোলো ও। 'আমি এসেছি আপনি জানলেন কিভাবে?'

'তোমার দেখা পেয়েছি, তারপর আর ভালো না থেকে পারি।' ভদ্রলোকের চোখ থেকে উপচে পড়লো সন্তুষ্টির হাসি। 'কিভাবে জানলাম...' ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালেন তিনি।

করিডরে বেঢপ ভুঁড়ির খানিকটা দেখা গেল শুধু। 'ডিক্রু?'

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে কামরায় ঢুকলো কালিচরণ ডিক্রু।

'কিন্তু কোথায় উঠেছি জানলেন কিভাবে?'

উত্তর দিলো ডিক্রু, 'আমি শুধু আপনার আসার খবরটা দিয়েছি মিঃ রুবেনসনকে। সাথে সাথে উনি বড় হোটেলগুলোয় টেলিফোন করতে শুরু করলেন...'

'আমাদের দেখা হবে, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছে,' বললেন রুবেনসন। 'কতো খোঁজ করেছি তোমার, কেউ বলতে পারেনি কোথায় আছো তুমি। কাল সকালে আমার ফ্লাইট, এই সময় খবর পেলাম তুমি জিম্বাবুয়ে এসেছো—একে আর কি বলা যায়।'

'কষ্ট করে দেখা করতে এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি,' বললো রানা। 'আপনাদের জন্যে কি আনাবো বলুন।'

'আরে বসো, ওসব পরে হবে'খন,' তাড়াতাড়ি বললেন রুবেনসন। 'তার আগে কাজের কথাটা সেরে নিই। তুমি, ভাই, না বলতে পারবে না, আমার এই অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। কথা দাও, রাখবে?'

'র‍্যাঞ্চ বিক্রির টাকা নিতে বললে, দুঃখিত, সে অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না,' বললো রানা। 'ডিক্রুকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, ওই টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই।'

কিছু না বলে কোটের পকেট থেকে চেক বই আর কলম বের করলেন রুবেনসন। চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। চেক লেখা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়লেন, তারপর বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'তোমাকে আমি চিনি, রানা। একবার কিছুতে না বললে হাঁ করানো সম্ভব নয়। তাই টাকা নেবার অনুরোধ আমি করবো না। ধরো, এটা তোমার কাছে রাখো।'

'চেক? কেন?'

'আহা, ধরোই না—বলছি।'

অগত্যা নিলো রানা। দেখলো, রুবেনসন ওর নামেই লিখেছেন চেকটা—পাঁচ লাখ ডলারের। 'এর মানে কি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো ও।

'মানে, র‍্যাঞ্চ বিক্রির আড়াই লাখ টাকা এই ক'বছরে সুদসহ পাঁচ লাখে দাঁড়িয়েছে।' মিটি মিটি হাসছেন রুবেনসন।

'কিন্তু আমার নামে চেক লিখলেন কেন?'

'বলছি। তার আগে তুমি কথা দাও, আমার অনুরোধ রাখবে।'

রানা হাসলো না। 'সম্ভব হলে নিশ্চই রাখবো। কিন্তু সবটা না শুনে কি করে কথা দিই, বলুন।'

'একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব,' জোর দিয়ে বললেন রুবেনসন। 'পর্যটন মন্ত্রী তোমার বন্ধু, তুমি কালোদের পক্ষে লড়েছো—সরকার খুশি হয়ে তোমাকে ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন দেবে।'

'তারমানে?'

'আমার দুঃখটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, রানা, প্লিজ,' বললেন রুবেনসন। 'এই দেশে জন্মেছি আমি, এখানের আলো-বাতাসে বড় হয়েছি, ভালোবেসেছি এ-দেশের মাটিকে, মানুষকে। আমি সম্পত্তি চাই না, মালিকানা চাই না, শুধু আমার জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার চাই। আমাদের পরিবারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে, ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন আমি পাবো না। জানি, এই টাকায় র‍্যাঞ্চ কেনা যাবে না। কারো সাথে শেয়ারে কিনতে হবে। কিন্তু শেয়ারে কিনলেও, দলিলে আমার নাম রাখা যাবে না। তারমানেই দাঁড়াবে, যার বা যাদের সাথে শেয়ারে কিনবো তারা ইচ্ছে করলে আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারে, মেরে দিতে পারে আমার অংশটুকু। তাই বলছি...'

দ্রুত এক নাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন রুবেনসন।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'তোমার সাথে ওপর মহলের যোগাযোগ আছে, রানা,' আবার শুরু করলেন রুবেনসন। 'ইচ্ছে করলে ব্যাংক লোনও পেতে পারবে তুমি। আমার অনুরোধ, সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী তোমার নামে কেনো তুমি। আমাকে শুধু ম্যানেজারের চাকরিটা দিয়ো, যাতে বাকি জীবনটা এই মাটিতে বসবাস করতে পারি।'

অস্বস্তি বোধ করলো রানা। 'তা কি করে হয়...।'

'কেন হয় না?' ব্যাকুল চেহারা নিয়ে জানতে চাইলেন রুবেনসন। 'অসুবিধেটা কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন করলেই ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন পেয়ে যাবে তুমি...।'

'কিন্তু...'

'আমি একজন অভাগা, রানা,' কাতর কণ্ঠে বললেন রুবেনসন,

'আমাকে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে, কোনো অপরাধ করিনি তা সত্ত্বেও ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। এ দেশ থেকে চলে গিয়ে আমি শান্তিতে নেই, রানা—একটা রাতও ভালো করে ঘুমাতে পারি না। এই উপকারটুকু তুমি যদি না করো, বুঝবো, রেবেকার পর সবচেয়ে বেশি যাকে স্নেহ করতাম সে একটা পাষাণ···'

পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন রুবেনসন। এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখলো ডিক্রু, চোখে রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। অনেক চিন্তা ভিড় করে এলো মনে। অনুরোধটা রাখতে যাওয়া মানে নিজেকে একটা ঝামেলায় জড়ানো। কিন্তু রেবেকার একটা স্মৃতি যদি রক্ষা পায়, সেটাও কম কথা নয়। ক্ষীণ একটু পুলকও অনুভব করলো ও। অনেকদিনের শখ, গম ফলাবে ও, গরু পালবে। জমিজমা কিনে নিজের জন্যে এ-সব করা হয়তো কোনোদিনই হয়ে উঠবে না। সুযোগ যখন এসেছে, একজনের একটা উপকারের মাধ্যমে নিজের শখটা মিটিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। তাছাড়া, রুবেনসনকে নিরাশ করাটা এক ধরনের নিষ্ঠুরতাই হয়ে যাবে।

খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করলো ও। বললো, 'কথা দিচ্ছি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন রুবেনসন। আবার তিনি রানাকে বুকে টেনে নিলেন। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম...' আনন্দের আতিশয্যে এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। রানাকে ছেড়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

রানার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে বিয়ারের অর্ডার দিলো ডিক্রু। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' আবার বললো রানা, 'তবে শর্ত আছে।'

চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলেন রুবেনসন, টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জানতে চাইলেন, 'কি শর্ত, রানা?'

'আপনার এই র‍্যাঞ্চে বছরে দু'বছরে দু'চারদিনের জন্যে বেড়াতে আসবো আমি,' বললো রানা। 'তখন কিন্তু মুখ ভার করতে পারবেন না।'

'তোমার র‍্যাঞ্চে তুমি আসবে না তো কে আসবে!'

'শর্ত আরো একটা আছে।'

'বলো!' ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রুবেনসন।

'কেনার পর, হাতে যে-কদিন সময় পাবো, র‍্যাঞ্চটাকে নিজের পছন্দ মতো গড়ে তুলবো আমি। নিজের পছন্দ মতো গরু কিনবো, ঘর-বাড়ি তৈরি করবো...'

অসহায় ভঙ্গিতে ডিক্রুর দিকে তাকালেন রুবেনসন। 'ওর র‍্যাঞ্চ, ও যেভাবে খুশি সাজাবে, তাতে কার কি বলার থাকতে পারে—আপনিই বলুন?'

'কিচ্ছু বলার নেই,' সায় দিলো ডিক্রু।

'এবার শেষ একটা শর্ত।'

হেসে ফেললেন রুবেনসন।

ডিক্রু গলা লম্বা করে দিয়ে বললো, 'শোনা যাক, এটাও শোনা যাক।'

'শেষ পর্যন্ত কোনো কারণে যদি সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনা

সম্ভব না হয়,' বললো রানা, 'টাকাটা দিয়ে আপনি অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্য কোথাও একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে বাধ্য থাকবেন।'

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে চুপ করে থাকলেন রুবেনসন।

'এই শর্ত মেনে না নিলে,' বললো রানা, 'আমি এর মধ্যে নেই।'

ধীরে ধীরে মাথা কাত করলেন রুবেনসন। 'বেশ, তাই হবে।'

রুম-সার্ভিস নক করে ভেতরে ঢুকলো। ওদের জন্যে বিয়ার সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা। যার যার ভাবনায় মগ্ন থেকে বিয়ারের মগে চুমুক দিল তিনজন।

'আপনি এখন কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে,' বললেন রুবেনসন। 'কাল সকালের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। চাকরিটা এখুনি খোয়াতে চাই না। এদিকের সব কাজ গুছাতে বেশ সময় লাগবে তোমার। তুমি চিঠি লিখলে সবাইকে নিয়ে চলে আসবো।'

একটু চিন্তা করলো রানা। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো। আপনার ঠিকানা তো ডিক্রুর কাছে আছেই।'

'আমি তাহলে এখন উঠি,' বললেন রুবেনসন। 'খুব ভোরে ফ্লাইট, গোছগাছ রাতেই সেরে রাখতে হবে।'

ভদ্রলোককে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো রানা। বিদায় নেয়ার আগে আবার একবার রানাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলো রানা। 'কনসরটিয়াম দাম চাইছে বিশ লাখ, কতো হলে ছাড়বে বলে মনে হয়?'

খানিক চিন্তা করলো ডিক্রু। 'আপনি যদি জুরিখে পেমেন্ট করেন, তাহলে হয়তো দশ বা পনের লাখে রাজি হতে পারে।'

'আড়াই লাখে?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো রানা।

বোবা বনে গেল ডিক্রু। শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লো।

'ফোন করে দেখোই না,' মৃদু হেসে বললো রানা। 'বলো, র‍্যাঞ্চ জবরদখল হয়ে গেছে। ওদেরকে সরাতে গেলে রাজনৈতিক হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। বলো, গ্র্যাসল্যাণ্ডে ছাগল চরছে, এক বছরের মধ্যে মরুভূমি হয়ে যাবে গোটা এলাকা। বলো, অনুপস্থিত মালিক-দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়েছে সরকার। এখুনি বিক্রি করতে না পারলে হারাতে হবে সব।'

'সবই সত্যি, কিন্তু তাই বলে আড়াই লাখ!'

'আহা, ফোন করতে তোমার অসুবিধে কি...'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ডিক্রু। 'ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছেন!'

একটা সিগারেট ধরালো রানা। তারপর হঠাৎ করেই বললো, 'কাল আমি শিঙ্গারিরায় যাচ্ছি। দশ বছরে এই দ্বিতীয়বার।'

আঁতকে উঠলো ডিক্রু। 'সেকি! কেন!'

'কেনাই যখন হবে, ভালো করে দেখে আসি আরেকবার। ফিরে এসে শুনবো কনসরটিয়াম কি বললো।'

'না! মিঃ রানা, প্লিজ, শিঙ্গারিরায় যাবেন না!' ডিক্রুর চেহারায় আতংক। 'ওখানে ডাকাতদের আস্তানা, যাকে দেখে তাকেই গুলি করে মেরে ফেলে। প্লিজ, মিঃ রানা...'

'কে বললো ডাকাত ওরা?' বিস্ময় প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'তুমি আসলে বিদ্রোহীদের কথা বলতে চাইছো, তাই না? গেরিলা ফাইটার যারা অস্ত্র জমা দেয়নি?'

'হ্যাঁ, মানে...ওই হলো আর কি!' মাথার পিছনটা চুলকাতে শুরু করলো ডিক্রু। সে ম্যাটাবেলও নয়, ম্যাশোনাও নয়, বাপ-

দাদারা এসেছিল ভারত থেকে। দুই প্রধান উপজাতির কোনো-টার সাথেই এদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। শ্বেতাঙ্গরা যখন ছিলো, তাদের সাথে এরা খুব ভালো মানিয়ে চলতে পারতো। 'আপনি, মিঃ রানা, এতো বড় ঝুঁকি নেবেন না, প্লিজ। বাইরের লোক ওদিকে কেউ যায় না, গেলে আর ফিরে আসে না।'

'এ-কথা শোনার পর তো না গেলেই নয়,' বললো রানা। বিদ্রোহীরা সত্যি যদি ওখানে আস্তানা গেড়ে থাকে, তাদের সাথে একটা সমঝোতায় আসা দরকার, ভাবলো ও। তা না হলে পরে বিপদে পড়বেন রুবেনসন। 'দেরি করছো কেন?' ডিক্রকে জিজ্ঞেস করলো ও। 'জুরিখে ফোন করবে না?'

ডিক্র বিদায় নেয়ার পর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো রানা। সেই বিশাল অরণ্যে রেবেকার সাথে শিকার করেছে ও, সে স্মৃতি ভুলবার নয়। যেতে মন চাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

এ এক বিস্ময়কর অরণ্য, এখনো বুনো, স্পর্শ করা হয়নি—বেড়া নেই, কর্ষিত মাটি নেই, বাড়ি-ঘর নেই—জাম্বেজি উপত্যকা থেকে শুরু হয়ে পাহাড় বরাবর জঙ্গলের গভীর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ৎসেৎসি মাছিদের একটা পর্দা গৃহপালিত পশু আর গ্রাম্য চাষীদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। বিশাল এলাকাটার একদিকের সীমানায় শিজারিরা গেইম রিজার্ভ, আরেকদিকে মজোলো ফরেস্ট রিজার্ভ, দুটোই বুনো প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়, অভয়ারণ্য। রেবেকার বাবার বাবা, ফ্রেডারিক ডানকান সাউল উনিশ শো ত্রিশ সালে এই জায়গা প্রতি একর ছয় পেন্স দরে কিনেছিলেন। এক লাখ একর, দু'হাজার

পাঁচশো পাউণ্ডে। 'দাদা বা বাবা এখানে কখনো গরু-ছাগল চরতে দেয়নি,' রানাকে বলেছিল রেবেকা। সেবার শিকারিরা নদীর কাছাকাছি একটা ডোবার ধারে, বুনো ডুমুর গাছের নিচে ক্যাম্প ফেলেছিল ওরা, শেষ বিকেলের রোদে নদীর পাড়ের সাদা বালি চিকচিক করছিল, বহুরঙা বুনো মোরগের একটা দল উড়ে এসে বসলো, অমনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মাঝখানে পড়লো একটা ডোরাকাটা চিতাবাঘ।

পাহাড়ী নালাটা নেমে এসে চলে গেছে নদীর দিকে, শুকনো অবস্থায় এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। শেষবার দশ বছর আগে এই পথ ধরে রেবেকার সাথে গেছে ও। তারপর এই রাস্তা আর বোধহয় ব্যবহার করা হয়নি। পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও বোধহয় নালার মুখ বেঁধে দেয়া হয়েছে, এখন আর বর্ষাকালেও পানি আসে না। নালার দু'পাশে আর মাঝখানে ঝোপ-ঝাড় গজিয়েছে, চলার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মোপানি গাছ উপড়ে পথের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে বুনো হাতি। ফোক্সওয়াগেন ছোটো বলে তবু রক্ষে, রোডব্লক গলে প্রতিবার বেরিয়ে যেতে পারছে রানা। কোথাও কোথাও ঝুরঝুরে হয়ে আছে বালি, চাকার নিচে গাছের ডাল ফেলে জায়গাটুকু পেরিয়ে আসতে হলো। পাঁচ-সাতবার পথ হারিয়ে ফেললো ও, গাড়ি থেকে নেমে খোঁজাখুঁজি করে নতুন করে আবিষ্কার করতে হলো প্রতিবার। একবার অ্যান্ট-বিয়ারের গর্তে ঢুকে গেল চাকা, জ্যাক ব্যবহার করে গাড়ির সামনের অংশ তুলতে হলো। একসময় গাড়ি ফেলে এগোতে হলো ওকে, শেষ ক'মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সেই ডোবা, আর ডুমুর গাছের নিচে পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো।

ঘাসের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রানা, এ-পাশ ও-পাশ না করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো পাখিদের কলরবে, আফ্রিকার পুবাকাশে তখন গোলাপি আভা ফুটতে শুরু করেছে। টিন খুলে বেক করা ঠাণ্ডা বীন আর কফি খেলো ও। ব্যাগটা ডুমুর গাছের তলায় রেখে পা বাড়ালো নদীর দিকে।

পায়ে হেঁটে এই বিশাল অরণ্যের খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব নয়, অতো সময় নেই রানার। তার আসলে কোনো দরকারও নেই। শিকারিরা নদীর পাড়ে পৌঁছুলেই সমস্ত খবর জানা যাবে। এই নদীই গোটা এলাকার হৃৎপিণ্ড। নদীর পাড়ে যা সে পাবে তা থেকে আন্দাজ করা যাবে কতোটুকু কি বদলেছে।

পাড়ে পৌঁছেই টের পেলো রানা, সাধারণ বুনো প্রাণী আগের মতোই প্রচুর রয়েছে। নদীর ওপারে, সাদা বালির ওপর ঝাঁকঝাঁক বুনোহাঁস। এপারে ছড়ানো শিংওয়ালা হরিণের পাল। তারপর দুর্লভ প্রাণীদের উপস্থিতিও টের পেলো ও। কাল রাতে এখানে ওরা পানি খেতে এসেছিল। নদীর পাড় ঘেঁষে এগোলো রানা, পায়ের ছাপগুলো দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলো। এক শো গজের মধ্যে এক জোড়া চিতার ছাপ পাওয়া গেল। হাতির পাল বেশ ক'দিন আগে এই জায়গা হয়ে গেছে। কিন্তু গণ্ডার, মোষ, আর সিংহের পায়ের দাগগুলো পরশু রাতের।

লাঞ্চের সময় ছুরি দিয়ে কেটে শুকনো মাংসের ফালি আর বেওব্যাব গাছের ফল পেড়ে তার রসালো টক শাঁস খেলো রানা। আবার হাঁটা শুরু করে ঘন, গভীর, বুনো একটা আবলুস ঝোপের সামনে চলে এলো ও। সরু, আঁকাবাঁকা গেইম ট্রেইল ধরে ঝোপের ভেতর ঢুকলো। এক শো গজও এগোয়নি, ছোটো একটা ফাঁকা

জায়গা দেখতে পেলো, চারদিকে নিশ্ছিদ্র উঁচু পাঁচিলের মতো ঝোপ। বোঁটকা একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে, খোঁয়াড়ে যেমন থাকে, কিন্তু আরো বেশি ঝাঁঝালো। চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, চোখে খানিকটা কৌতূহল। গন্ধটা সাথে সাথে চিনতে পেরেছে ও, গোবর-গাদা থেকে আসছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ফিরে আসে অনেক বুনো জন্তু। বিষ্ঠার ধরন দেখে জানোয়ারটা কালো গণ্ডার হবে বলে মনে করলো রানা। হজম করা কচি পাতা, রসালো ডালপালা, বাকল চিনতে অসুবিধে হলো না —ছড়িয়ে আছে চারদিকে, মাড়ানো হয়েছে পা দিয়ে।

কালো গণ্ডার আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্লভ, এবং বিপজ্জনক প্রাণী। যুদ্ধের আগে জ্যাম্বেজি উপত্যকা ঘেঁষে পাহাড়ে কুখ্যাত একটা কালো-গণ্ডার ছিলো। ওখানটায় ঢাল বেয়ে রাস্তা আর রেললাইন, দুটোই ভিক্টোরিয়া ফলের দিকে নেমে গেছে। গণ্ডার মহাশয়, রাস্তাটা যেখানে খুব বেশি খাড়া, তার কাছাকাছি অপেক্ষা করতো। গাড়ি-গুলো ওখানে কাছিমের মতো এগোতো। শিং নিচু করে ছুটে আসতো সে, সংঘর্ষের সাথে সাথে রেডিয়েটর ফুটো হয়ে গরম বাষ্প বিস্ফোরিত হতো। তারপর, ভারি তৃপ্ত হয়ে, কদম চালে ছুটে ঢুকে পড়তো ঝোপের ভেতর, গলা দিয়ে বিজয়সূচক ঘড় ঘড় উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে আসতো। সব মিলিয়ে আঠারোটা বাস-ট্রাক ধ্বংস করে সে।

সাফল্যের গর্বে অহংকারী হয়ে ওঠে গণ্ডার, নিজের ক্ষমতাকে বড় করে দেখতে শুরু করে। শেষে একদিন ভিক্টোরিয়া ফলস এক্স-প্রেসের ওপর হামলা চালিয়ে বসলো। সামন্ত যুগের একজন নাই-টের মতো রেললাইন ধরে সগর্বে ছুটে এলো সে। ট্রেনটা ঘণ্টায়

বিশ মাইল গতিতে ছুটছিল, আর গণ্ডারের ওজন ছিলো দুই টন— উল্টোদিকে সে-ও ওই একই গতিতে ছুটছিল। সংঘর্ষের সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল ট্রেন, লাইনের ওপর বিকট শব্দে ঘষা খেলো চাকাগুলো, তীব্র বেগে ছুটলো লক্ষ লক্ষ আগুনের ফুলকি। কিন্তু রেডিয়েটর ধ্বংসকারী হিসেবে বেচারা গণ্ডারের ক্যারিয়ার ওখানেই খতম হয়ে গেল।

বিষ্ঠার রঙ আর ভিজে ভাব লক্ষ্য করে রানা বুঝলো, বারো ঘণ্টা আগে এখানে ছিলো গণ্ডারটা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। নতুন একটা পথ ধরে এগোলো ও। সাধ, গণ্ডারটাকে একবার দেখবে। আধ মাইলও এগোয়নি, সরু ট্রেইলের ডান পাশ থেকে আচমকা একটা খসখস আওয়াজ হলো। ঘন, কালো, দুর্ভেদ্য ঝোপ নিরেট পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। ঝোপ থেকে খয়েরি রঙের এক দল কাঠঠোকরা ঝটপট ঝটপট পাখা ঝাপটে আকাশে উঠলো, রানার মাথার ওপর ছোট্ট আকাশ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। বড়সড় বুনো প্রাণীদের ধারেকাছেই থাকে এগুলো, মহারথীদের গায়ে বসে থাকা পোকা-মাকড় ধরে খায়, বিনিময়ে সংকেত দিয়ে আগেভাগে জানিয়ে দেয়, বিপদ আসছে।

হঠাৎই শোনা গেল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, যেন কোনো স্টিম ইঞ্জিন বাষ্প ছাড়ছে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো ঝোপ, পথের ওপর বেরিয়ে এলো বিশাল এক কালো গণ্ডার, রানার মাত্র বিশ গজ দূরে। পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে একবার ডানে, একবার বামে। ঘন ঘন ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাকাচ্ছে, লম্বা চকচকে জোড়া শিং দিয়ে কাকে গুঁতো মারা যায় খুঁজছে যেন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, জানে, গণ্ডারের দৃষ্টিসীমা মাত্র

দশ-বারো গজ। তবে, তৈরি হয়ে আছে ও, গণ্ডারটা ওকে দেখতে পেলেই ঝোড়ে দৌড় দেবে। বিশাল খড়টা আশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গিতে এদিক ওদিক দোলাচ্ছে গণ্ডারটা, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে চ্যালেঞ্জ করছে অদৃশ্য শত্রুকে। রানার মনে হলো, প্রতি মুহূর্তে ওটার শিং জোড়া আরো লম্বা, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। আস্তে করে পকেটে হাত ভরে ছুরির বাঁটটা ধরলো ও। নড়াচড়াটা দেখতে না পেলেও, অনুভব করতে পারলো প্রতিপক্ষ, ফোঁস ফোঁস করতে করতে পাঁচ-সাত পা এগিয়ে এলো। এবার রানাকে তার দেখতে পাবার কথা। তার মানে সিরিয়াস বিপদ হতে পারে।

ছোট্ট করে, কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে হাত নেড়ে ছুরিটা গণ্ডারের মাথার ওপর দিয়ে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিলো রানা। একটা ডালে ঠক্ করে বিঁধলো সেটা। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো গণ্ডার, বিশাল খড় নিয়ে ঝড়ের মতো ছুটলো নাক বরাবর। ঝোপ খুলে গেল, যেন একটা সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক ঢুকলো ভেতরে। মট মট করে ভাঙলো ডালপালা। শত্রুর খোঁজে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপর দিকে ছুটলো গণ্ডারটা।

আরো দু'তিন ঘণ্টা ঘুরে কয়েকটা ক্ষুদে ডোবা দেখলো রানা। প্রতিটির পানি পচা, নোংরা—কিন্তু গণ্ডারগুলো নদীর পানির চেয়ে এই নোংরা পানিই কি কারণে যেন বেশি পছন্দ করে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো। এই এক লক্ষ একরকে ট্যুরিস্টদের জন্যে লোভনীয় করে তোলা যায় না? দুষ্প্রাপ্য বুনো প্রাণী আছে জানলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বহু লোক ছুটে আসবে এখানে। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত মাত্র এক ঘণ্টার পথ, এখানে আসতে হলে ট্যুরিস্টদের অতিরিক্ত তেমন কোনো খরচ

লাগবে না।

ডোবার ধারে, একটা ধরাশায়ী গাছের ওপর বসলো রানা। প্রাণী-গুলোকে একেবারে কাছ থেকে দেখাবার ব্যবস্থা রাখা চাই, ট্যুরিস্ট-দের মনে তাহলে একটা ভয় ভয় ভাব থাকবে। ক্যাম্পগুলো হবে ছোটো ছোটো, প্রচুর ওয়াইন থাকবে সেখানে, আর পরিবেশনের জন্যে থাকবে সুন্দরী মেয়েরা। ডোবার পাশেই হবে ক্যাম্প, তারের জাল দিয়ে ঘেরা, বন্য প্রাণীগুলো জালে মুখ ঠেকিয়ে ভেঙচাবে, আক্রোশে ফুঁসবে, আর ট্যুরিস্টরা কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি তুলবে তাদের।

এ-ধরনের ট্যুরিস্ট স্পট আফ্রিকায় নেই, কাজেই মাথা পিছু মোটা টাকা আদায় করা যাবে। শুধু অসম্ভব ধনী লোকেরাই আসতে চাইবে এই স্পটে।

সূর্য ডুবে যাবার আরো খানিক পর ডোবার ধারে, ডুমুর গাছের নিচে ফিরে এলো রানা। ওর মুখ আর হাত রোদে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে, ৎসেৎসি মাছির কামড়ে ফুলে গিয়ে জ্বালা করছে ঘাড়। এতো ক্লান্ত যে খেতে বসার ইচ্ছে হলো না। দুই চুমুক হুইস্কি গিলে চাদর মুড়ি দিলো ও, প্রায় সাথে ঘুমিয়ে পড়লো। রাতে একবার উঠলো ও, চোখে ঘুম থাকলেও বহুদূর থেকে ভেসে আসা সিংহের গর্জন সারা দেহ-মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দিলো।

ঘুম ভাঙলো পাখিদের কিচিরমিচিরে, ওর মাথার ওপর ঝাঁক বেঁধে বসে পাকা ডুমুর খাচ্ছে। নিজেকে সুখী মনে হলো রানার। জীবনে যেন দুঃখ বলতে কিছু নেই।

নাস্তা সেরে দিগম্বর অবস্থায় নদীতে নামলো ও, হাতে ফার্মার'স উইকলি। আফ্রিকান কৃষকদের বাইবেল বলা হয় পত্রিকাটিকে। অল্প

পানিতে নেমে চিনির দানার মতো কর্কশ বালিতে বসলো ও, পানির ওপর জেগে থাকলো শুধু গলা আর মাথা। ঠাণ্ডা পানি ঘাড়ের ব্যথা কমিয়ে দিলো। পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো পড়লো রানা। দেখছে ভালো জাতের গরুর কোথায় কি দাম।

কিং'স হেভেন আর কুইন'স হেভেন, দুটো র‍্যাঞ্চের জন্যে গরু কিনতে হবে। সেরা জাতের ষাঁড় না হলে ভালো জাতের বাচ্চা দেবে না গাভীগুলো। দাম দেখে মাথা ঘুরে গেল রানার। এক এক করে আরো সব খরচের কথা মনে পড়লো। র‍্যাঞ্চের জন্যে যাবতীয় ইকুইপমেণ্ট আবার নতুন করে কিনতে হবে সব। শিকারিরা নদীর ধারে ট্যুরিস্ট ক্যাম্প তৈরি করার জন্যেও বিস্তর টাকা দরকার। ছাগল সহ দখলকারীদের সরাতে হবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওদেরকেও টাকা দিতে হবে। ভাবলো, এতো বড় বড় প্ল্যান করছি, কিন্তু রুবেনসনের অতো টাকা কোথায়? পানি থেকে উঠে পাড়ের দিকে এগোলো ও। এবার ফিরতে হয়।

'হল্ট। নড়লে গুলি করবো।' জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো গেরিলারা।

পরনে রঙ-চটা ডেনিম, হাতে এ-কে রাইফেল, মুখে সিনবেবেল—রানা বুঝতে পারলো, কারা এরা। রেগুলার জিম্বাবুই সৈন্যরা এ-ধরনের ইউনিফর্ম ব্যবহার করে না, তাদের অস্ত্রও ন্যাটো দেশগুলো থেকে আমদানী করা, কথা বলে শোনা (SHONA) ভাষায়। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা এরা, নিষিদ্ধ ঘোষিত জিম্বাবুই পিপলস রেভলিউশন আর্মি-র সদস্য। বঞ্চিত ম্যাটাবেল উপজাতির বিদ্রোহী তরুণরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অস্ত্র জমা দেয়নি, পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আইন মানে না, সরকারকে ভয় করে না, প্রত্যেকে এক

একটা নির্দয় খুনী। প্রথমে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী, পরে সরকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে সবাই এক একজন দক্ষ গেরিলা।

'কোথাও নিয়ে যাবার দরকার নেই,' ডান পাশ থেকে বললো একজন। 'এখানেই মেরে দিই।'

'চোখ বন্ধ করো,' দ্বিতীয় গেরিলা নির্দেশ দিলো রানাকে।

এদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে রানা। ভিক্টোরিয়া ফলসের কাছে মাইক্রোবাস ভর্তি একদল শ্বেতাঙ্গ স্কুল ছাত্রকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় ওরা, মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা। তিন দিন পর একটা ঢালের নিচে পাওয়া যায় বাসটাকে। বাচ্চা ছেলেগুলোকে খুন করেনি ওরা, কিন্তু করলেই বোধহয় ভালো হতো। বাসটা উদ্ধার করে শহরে নিয়ে আসে পুলিশ। ছাত্রদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের সবার চোখ উপড়ে নিয়েছিল ম্যাটাবেল গেরিলারা। চল্লিশ জন ছাত্রের চল্লিশ জোড়া চোখ।

শ্বেতাঙ্গরা এদেশে এখনো কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। আসলে শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে সরকারকে হেয় করতে চায় গেরিলারা, প্রতিপক্ষকে উত্যক্ত করার জন্যেই এ ধরনের কাণ্ড করে বেড়ায়। আরেকটা উদ্দেশ্য নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করা, দুনিয়ার মানুষ যাতে জানতে পারে বঞ্চিত ম্যাটাবেলরা তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে লড়ছে।

তিনজনের মধ্যে যে একটু বয়স্ক, তার দিকে তাকালো রানা। বোধহয় সে-ই এদের লিডার। সিনডেবেল ভাষায় বললো ও, 'কিন্তু গুলি করার আগে আমার একটা কথা ছিলো।'

গেরিলারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর লিডার

জানতে চাইলো, 'কে হে তুমি, আমাদের ভাষা শিখলে কোত্থেকে?'

মুচকি একটু হাসলো রানা। 'যদি বলি, আমিও একজন মুক্তি-যোদ্ধা, এই মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, বিশ্বাস করবে?'

'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!' একজন গেরিলা চেঁচিয়ে বললো। 'শালা ভারি চালাক, আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।'

লিডার গম্ভীর গলায় বললো, 'মিথ্যে বললে তোমাকে আমরা কষ্ট দিয়ে মারবো। কোথায় যুদ্ধ করেছো তুমি? কোন্ সেক্টরে? তোমার কমাণ্ডার কে ছিলো?'

সেক্টর আর কমাণ্ডিং অফিসারের নাম জানালো রানা।

'তারমানে বলতে চাইছো তুমি আমাদের নেতা জেনারেল টস মাজুলেটের সাথে যুদ্ধ করেছো?'

মৃদু হাসলো রানা। 'জেনারেল মাজুলেট আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আরেকটা ধাপ্পা!' লাফিয়ে উঠলো তৃতীয় গেরিলা। 'স্রেফ গুল মারছে। আমাদের নেতা একজন বিদেশী ক্যাপিটালিস্টের বন্ধু হতে পারেন না।'

'অনুমতি পেলে,' শান্ত গলায় বললো রানা, 'তোমাদের আমি একটা ফটো দেখাতে পারি। তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'শালার পকেটে নিশ্চই গ্রেনেড আছে!'

লিডার ধমক দিলো সঙ্গীদের। রানাকে বললো, 'কার ফটো?' হাত বাড়ালো সে। 'দেখি!'

মাটিতে পড়ে থাকা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে লিডারের হাতে ধরিয়ে দিলো রানা। ভেতর থেকে বের

করে ফটোটা দেখলো ওরা। প্রায় দশ বছর আগের তোলা ছবি, রানার চেহারা বদলেছে একটু। টস মাজুলেটের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

'নেতার সাথে এ-লোক তুমি নও!' ঘোষণা করলো একজন গেরিলা। 'তোমাকে আমরা জ্যান্ত কবর দেবো।'

খুঁটিয়ে রানাকে দেখলো লিডার। ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলালো সে। 'হ্যাঁ, নেতার সাথে এটা সম্ভবত তোমারই ছবি। ঠিক আছে, ন্যাংটো দেখতে খারাপ লাগছে, কাপড় পরো।'

সাবধানে কাপড়-চোপড় পরলো রানা। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলাপ করছে গেরিলারা। লিডার রানাকে মারতে চায় না, সঙ্গী দু'জন তাকে পটাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু লিডার নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। রানার দিকে ফিরে বললো, 'আমি মেজর কুকি,' ডান পাশের লোকটাকে দেখালো সে, 'লেফটেন্যান্ট মোয়ান-তাজ,' সবশেষে দেখালো বাঁ পাশের লোকটাকে, 'ক্যাপ্টেন কিন-কিনি। তোমার নাম বলো। বলো এখানে কেন এসেছো।'

নিজের নাম-ধাম জানিয়ে রানা বললো, 'আমি আসলে তোমাদের সাথে দেখা করতেই এখানে এসেছি।'

'মিথ্যে কথা!' সমস্বরে চিৎকার করলো লেফটেন্যান্ট আর ক্যাপ্টেন।

চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো রানার। 'ফের যদি আমাকে মিথ্যে-বাদী বলো, আমি তোমাদের রাইফেল কেড়ে নেবো।'

পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো ওরা দু'জন। লিডার রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'হয়তো কেড়ে নিতে পারবে না, কিন্তু এ-লোক যে চেষ্টা করবে

তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমি একটা বই লিখছি,' বললো রানা। 'বইটা ইংরেজীতে লেখা হবে, সারা দুনিয়ার লোক যাতে পড়তে পারে। সেই বইতে আমি তোমাদের কথাও লিখতে চাই।'

লেফটেন্যান্ট আর ক্যাপ্টেন এবার একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকালো।

'ম্যাশোনা কুকুরদের কথা লিখবে না?' জানতে চাইলো মেজর কুকি। 'যারা ম্যাটাবেল উপজাতিকে জিম্বাবুই থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে?'

ম্যাশোনা আর ম্যাটাবেল, দুই প্রধান উপজাতি। যুগ যুগ ধরে পরস্পরের সাথে লড়ে আসছে ওরা। ম্যাশোনারা সংখ্যায় অনেক বেশি, শিক্ষা-দীক্ষায়ও তারা এগিয়ে আছে। ম্যাটাবেলরাই বঞ্চনার শিকার, তারাই অত্যাচারিত।

'লিখবো,' মিথ্যে আশ্বাস না দিয়ে সত্যি কথাই বললো রানা। 'কিন্তু তারা যে তোমাদের ওপর অত্যাচার করছে তার প্রমাণ পেতে হবে আমাকে।'

'রাজা মজিলিকাজির কিরে,' লেফটেন্যান্ট মোয়ানতাজ বললো, 'ম্যাশোনারা আমাদেরকে দেশ ছাড়া করতে চাইছে।'

ক্যাপ্টেন কিনকিন্নি বললো, 'তোমার বইতে লিখে দাও, আমরা ম্যাশোনাদের কর্তৃত্ব মানি না। মন্ত্রীসভায় একজন বাদে সবাই ম্যাশোনা, কেন?'

'গণতন্ত্রের নিয়ম হলো সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরকার গঠন করবে···'

'গণতন্ত্রের···মারি!' অশ্রাব্য একটা গাল দিলো মেজর। 'আমি একজন ম্যাটাবেল, শুধু একজন ম্যাটাবেল রাজার নির্দেশ মানবো। ওরা আমাদের নেতা নকোমোকে জেলে পুরেছে···।'

নকোমোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, বিদ্রোহীদের সাহায্য করছেন তিনি। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তাঁকে।

লেফটেন্যান্ট বললো, 'জঙ্গলের ভেতর ম্যাশোনা সরকার জেলখানা তৈরি করেছে। ম্যাটাবেল নেতাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে টরচার করা হয়। তোমার বইতে এ-সব কথা না থাকলে…'

মেজর কুকি বললো, 'নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নেই আমাদের, অস্ত্রের অভাব, নেতা নেই—আর এই সুযোগে ম্যাশোনাদের স্পেশাল ইউনিট গ্রামে গ্রামে ঢুকে আমাদের মা-বোনকে রেপ করছে, পুরুষদের গুলি করে মেরে ফেলছে।'

কিন্তু সরকারী পত্রিকায় ছাপা হয় ঠিক উল্টো খবর। উলঙ্গ, রক্তাক্ত ম্যাশোনা তরুণীর ছবি ছেপে দিয়ে নিচে ক্যাপশন দেয়া হয়ঃ ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা একে ধর্ষণ করেছে।

'যে কাজ করিনি সেই কাজ করেছি বলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা,' বললো মেজর। 'তাই এবার ওরা যা ভাবতেও পারে না তাই করবো। সামনে যাকে পাবো তাকেই খুন করবো আমরা।'

ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা টেরোরিস্ট, কোনো সন্দেহ নেই। আপন মনে নিঃশব্দে হাসলো রানা। রবিন হুডও একজন টেরোরিস্ট ছিলো। 'তোমরা তাহলে সত্যি ছাত্রদের…?'

'না,' রানাকে বাধা দিয়ে বললো মেজর কুকি। 'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্য সব মিথ্যে অভিযোগ রটিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ বা বিদেশীদের ওপর আমাদের কোনো রাগ নেই। কোনো মেয়েকেও আমরা কখনো রেপ করিনি। আমাদের স্বর্গবাসী রাজা মজিলিকাজি তাতে অসন্তুষ্ট হবে।'

'কোনো কারণ ছাড়া খুন-খারাপি করলে মানুষ তোমাদের ভুল

বুঝবে,’ বললো রানা।

‘উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ অ্যাডভাইজার,’ বললো মেজর কুকি। ‘ভালো কথা, জেনারেল মাজুলেটের সাথে তোমার দেখা হবে?’

‘হ্যাঁ, দু’একদিনের মধ্যেই হবে।’

‘নেতাকে আমাদের কথা বলবে। বলবে, আমরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি।’

ভিক্টোরিয়া ফলস পর্যন্ত রানার সাথেই গাড়িতে চড়ে এলো ওরা, গেরিলাদের অন্য কোনো গ্রুপের সামনে পড়ে গেলে রানার যাতে কোনো বিপদ না ঘটে। বিদায় নেয়ার সময় মেজর আবার বললো, ‘নেতাকে বলবে, আমাদের অস্ত্র দরকার। বলবে, আমাদের একজন নেতা দরকার।’

‘বলবো,’ কথা দিলো রানা।

পরদিন সকালে মোটেল থেকে কয়েক জায়গায় ফোন করলো রানা, জাসটিন চ্যাপেলের ফাইল থেকে টোকা কিছু নোট রয়েছে সামনে।

প্রথমে কথা বললো কালিচরণ ডিক্রুর সাথে। ‘জুরিখ থেকে কোনো জবাব এলো?’

‘টেলেক্স পাঠিয়েছি,’ বললো ডিক্রু, ‘কিন্তু জবাব আসবে বলে মনে হয় না।’

‘বিকেলে কথা হবে।’

এরপর বুলাওয়ায়োও থেকে তিন শো মাইল উত্তর-পুবে রাজধানী হারারে, ফ্রেঞ্চ দুতাবাসে ফোন করলো ও। ‘মশিয়েজ্য মন্টিপিলার, আপনাদের কালচারাল অ্যাটাশে, প্লিজ।’

'মন্টিপিলার।'

'মাসুদ রানা। আমাদের দু'জনেরই বন্ধু তিনি, ফোন করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ। আপনার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। দয়া করে আমার সাথে একবার দেখা করুন না, খুশি হবো।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে দিলো রানা। জাসটিন চ্যাপেল নির্বাচনে নিশ্চই ভুল করেননি। মন্টিপিলারকে কোনো মেসেজ দেয়া হলে সেটা বারো ঘণ্টার মধ্যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে সোজা তাঁর টেবিলে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

এরপর ট্যুরিজম অ্যাণ্ড ইনফরমেশন মিনিস্টারের অফিসে ফোন করলো রানা, প্রিয় বন্ধুর সাথে কথা বলবে। অনেক চেষ্টা করার পর মন্ত্রী মহোদয়ের সেক্রেটারীকে পাওয়া গেল, সে জানালো, মিনিস্টার এখন পার্লামেন্টের অধিবেশনে রয়েছেন, পরে যোগাযোগ করতে হবে। রানাকে মন্ত্রীর বাড়ির ফোন নম্বর দিলো সে।

চারবার চেষ্টা করার পর একজন পার্লামেন্টারিয়ান সেক্রেটারীকে পেলো রানা। মন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চায় শুনে লোকটা রূঢ় ভঙ্গিতে জেরা শুরু করে দিলো ওকে। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে বললো, 'মিনিস্টারের শিডিউল চেক করতে হবে, পরে যোগাযোগ করবেন।'

এরপর সরকারের কোম্পানী রেজিস্ট্রি অফিসে ফোন করলো ও। সাউল র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেডের শেয়ার রেজিস্ট্রার, আর্টিকেলস, এবং মেমোরেনডাম দরকার রানার। রেজিস্টার ভদ্রলোক ওকে জানালেন, 'চারটের দিকে এসে কপিগুলো নিয়ে যাবেন, পনেরো ডলার ফি দিতে হবে।'

এরপর সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস। এখান থেকেও দলিল-পত্রের কপি চায় ও।

বিকেলে আবার পার্লামেন্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হলো। সেক্রেটারী জানালো, 'মিনিস্টার আপনার সাথে শুক্রবার সকাল দশটায় দেখা করতে রাজি হয়েছেন, দশ মিনিটের জন্যে।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। রাজি আর দশমিনিট, এই শব্দ দুটো ওর পছন্দ হলো না। মন্ত্রী হবার পর টস মাজুলেট বদলে গেছে নাকি? গুরুত্ব দিতে চাইছে না ওকে? ব্যাপার কি?

সন্ধ্যের দিকে আবার কালিচরণ ডিক্রুকে ফোন করলো রানা। 'এখনো কোনো জবাব আসেনি?'

অপর প্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডিক্রু।

বৃহস্পতিবার সকালে তার অফিসে নিজেই হাজির হলো রানা। 'এখনো কোনো সাড়া নেই?'

একগাল হাসলো ডিক্রু। 'এই ঘণ্টাখানেক আগে টেলেক্স পেয়েছি।'

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়লো রানা। সই করার সাথে সাথে জুরিখে বসে দশ লাখ মার্কিন ডলার দিলে সাউল ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কেনা যাবে। সময় সীমা, এক মাস।

ডিক্রু আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিল রানাকে, জিজ্ঞেস করলো, 'এক মিলিয়ন ডলার, পারবেন যোগাড় করতে?'

'ব্যাংক ডাকাতির প্ল্যানটা যদি সফল হয়,' হাসতে হাসতে বললো রানা। 'দেখা যাক, এক মাস তো আর কম সময় নয়। আমিই যোগাযোগ করবো।'

সেদিনই ফোক্সওয়াগেন নিয়ে ম্যাশোনাল্যাণ্ড, হারারে-র উদ্দেশে

রওনা হয়ে গেল রানা। শহর থেকে বেরিয়ে দশ মাইল এগিয়েছে, প্রথম রোডব্লকের সামনে থামতে হলো। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ঘাসের ওপর নেমে দাঁড়াতে হলো ওকে। ক্যামোফ্লেজ ব্যাটলম্মক পরা তু'জন কালো ট্রুপার অযথা প্রচুর সময় নিয়ে অস্ত্রের খোঁজে সার্চ করলো ফোক্সওয়াগেন। একজন লেফটেন্যাণ্ট রানার পাসপোর্ট দেখতে চাইলো। লোকটার ক্যাপ ব্যাজ দেখে বোঝা গেল, থার্ড ব্রিগেডের অফিসার সে।

তিনশো মাইল যেতে আট দশ বার রোডব্লকের সামনে পড়তে হলো। শহরে পৌঁছে হিলটনে উঠলো ও। ঠাণ্ডা শাওয়ার সেরে ডিনার খেলো, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফের ওপর বইয়ের প্রথম কয়েক পাতা লিখে ফেললো। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় পার্লামেণ্ট ভবনে পৌঁছুলো রানা।

ওয়েটিং রুমে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মন্ত্রীর অফিসে ডাক পড়লো। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ও, দেখলো, রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছে জেনারেল টস মাজুলেট। কোনো অভ্যর্থনা না, এমনকি মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত।

সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার, ভাবলো ফিরে যাবে কিনা। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো, দেখাই যাক না, কতোটুকু বদলেছে ও।

এই লোকের অস্তিত্বের মধ্যেই আশ্চর্য একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। ম্যাটাবেল রাজাদের রক্ত বইছে ওর শরীরে, ওর প্রপিতামহ বাজো ছিলেন ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের নেতা। আঠারো শো ছিয়া-নব্বই সালে শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলায়। বাজোর বাবা গানডাং ছিলেন লোবেনগুলার সৎ ভাই। আর লোবেনগুলা ছিলেন

ম্যাটাবেলদের শেষ রাজা।

রানার চেয়েও লম্বা মাজুলেট, শরীরে এতোটুকু মেদ জমেনি। ইটালিয়ান সিল্ক স্যুট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চওড়া কাঁধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে উঠেছিল এই লোক।

টস মাজুলেটকে প্রথম রানা দেখেছিল রেবেকার র‍্যাঞ্চে, আস্তাবলের চার্জে ছিলো সে। প্রভুভক্ত, বিনয়ী, পরিশ্রমী, সৎ। লোকটার ব্যক্তিত্ব ছিলো, সেই ব্যক্তিত্বই আকৃষ্ট করে রানাকে। রানা বা রেবেকা, কেউ তার সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করতো না। মনে পড়লো, ওদের নির্দেশ পালন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো মাজুলেট।

গুণী লোক, অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এতোটা ওপরে উঠে এসেছে। তাই বলে এরকম বদলে যাবে? যুদ্ধের সময় যার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, মুখ তুলে তার দিকে তাকাবার গরজটুকুও দেখাবে না? আনাড়ি এক যুবক, কে তাকে ট্রেনিং দিয়েছিল? শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর টরচার-চেম্বার থেকে কে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল? সব ভুলে গেছে?

এগিয়ে এলো রানা, অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে একটা চেয়ার টেনে বসলো ডেস্কের সামনে।

আরো প্রায় তিন মিনিট পর ফাইল বন্ধ করে মুখ তুললো টস মাজুলেট। 'জিম্বাবুইয়ে কেন এসেছো আবার?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। নির্লিপ্ত চেহারা, মুখে হাসি নেই।

'কেমন আছো?' জানতে চাইলো রানা, মাজুলেটের কথা যেন শুনতে পায়নি ও।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!' মাজুলেটের চেহারা কঠোর হয়ে

উঠলো।

'কেন এসেছি তোমাকে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

'তুমি বিদেশী,' রানার চোখে চোখ রেখে বললো মাজুলেট, 'এ-দেশে জমিজমা কিনতে হলে সরকারের অনুমতি লাগবে।'

'ও, তুমি জানো...'

'জানি বৈকি,' রানাকে বাধা দিয়ে বললো মাজুলেট। 'জিম্বাবুইয়ে ঢোকার পর কোথায় গেছো, কি করেছো সব আমি জানি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করছো তুমি, রানা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনার অনুমতি তুমি পাবে না। যাতে না পাও সেটা আমি দেখবো।'

'কারণটা জানতে পারি?' প্রচণ্ড রেগে গেছে রানা, কিন্তু চেহারায় বা গলার স্বরে সেটা প্রকাশ পেতে দিলো না।

'কারণ আর কিছুই নয়, বিদেশীদের আমরা চাই না। শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম, বাঁচা গেল। কিন্তু তারপর দেখি, ভারতীয়, মিশরীয় আর ফিলিপিনোরা চারপাশে জাঁকিয়ে বসছে। এই বিদেশী র‍্যাঞ্চাররা একশো ম্যাটাবেলকে চাকর হিসেবে রাখে, কোনো রকমে খেতে পরতে দেয়, কিন্তু নিজেদের ট্যাঁকে ভরে লাখ লাখ ডলার। এবার বাংলাদেশ থেকে তুমিও এসে হাজির হয়েছো। কিন্তু এই অবস্থা আমরা চলতে দিতে পারি না।' রিস্টওয়াচ দেখলো সে। 'আমার কাজ আছে। এবার তুমি আসতে পারো।'

অনেক কষ্টে শরীরের কাঁপুনিটা দমিয়ে রাখলো রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও। 'যাবার আগে তোমাকে একটা মেসেজ দেয়ার আছে আমার। তুমি জানো শিজারিরায় গিয়েছিলাম আমি। ওখানে তিনজন লোকের সাথে দেখা হয় আমার। তাদের নাম—

মেজর কুকি, লেফটেন্যাণ্ট মোয়ানতাজ, ক্যাপ্টেন কিনকিনি…'

'চোপ।' চাপা গলায় হিস হিস করে উঠলো টস মাজুলেট, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে শুরু করলো। হাত দু'টো শক্ত মুঠো হয়ে গেছে।'খবরদার, যা বোঝো না তা নিয়ে মুখ খুলবে না। এই মাটি, এই দেশ সম্পর্কে কি জানো তুমি? জড়িয়ে পড়লে স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নাউ, গেট আউট।'

ঘুরে দাঁড়ালো রানা, অপমানে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

পিছন থেকে মন্ত্রীর কঠোর গলা ঢুকলো কানে, 'আশা করি দু'একদিনের মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে তুমি। এবং আর কখনো ফিরে আসবে না।'

দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা, তারপর ফিরলো। 'কথা দিতে পারছি না। আগে আমার র‍্যাঞ্চ কেনার আবেদন অফিশিয়ালি প্রত্যাখ্যান করা হোক।'

'তোমার আবেদন যাতে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয় সে-ব্যবস্থা করবো আমি,' প্রতিজ্ঞা করলো যেন টস মাজুলেট।

রানার একবার ইচ্ছা হলো 'অকৃতজ্ঞ' বলে চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু ঝোঁকটাকে দমন করে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ও। কেমন যেন দম আটকে আসতে চাইছে। কল্পনাও করতে পারেনি এমন ব্যবহার পাবে সে মাজুলেটের কাছে।

হোটেল রুমে ফিরে এসে আধ ঘণ্টা উত্তেজিতভাবে পায়চারী করলো রানা। এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। মাজুলেট কি সত্যিই এতোটা বদলে গেছে, নাকি এই জঘন্য আচরণের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে তার? বিদেশীদের র‍্যাঞ্চ করতে দেবে না, সেটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেই তো পারতো।

গেরিলা তিনজনকে নিশ্চই চিনতে পেরেছে মাজুলেট। কিন্তু ওদের প্রসঙ্গে কথাই বলতে চাইলো না। নামগুলো শুনেই কেমন যেন আতংকিত হয়ে পড়লো। কেন? কি কারণ?

হয়তো সত্যিই বদলে গেছে মাজুলেট। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত, স্বজাতির ভালো-মন্দ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। আরো অনেক কিছু জানতে হবে তাকে, সিদ্ধান্ত নিলো রানা। তার প্রথম রিপোর্টে জাসটিন চ্যাপেলের জন্যে চিন্তা-ভাবনার অনেক খোরাক থাকবে, সন্দেহ নেই।

লাঞ্চের পর ক্ষুদে টেবিলটার সামনে বসলো রানা। চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিয়ে প্রথম রিপোর্টটা লিখতে বসলো ও। জিম্বাবুইয়ে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, পরিস্থিতির যে আভাস পাওয়া গেছে, এমন কি ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে মাজুলেটের সম্পর্ক, র‍্যাঞ্চ কিনতে না দেয়ার ব্যাপারে তার প্রতিজ্ঞা, ইত্যাদি সহ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত লিখলো ও।

দু'নম্বর রিপোর্টে একটা ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করলো রানা। প্রথমে শিজারিরা এস্টেটের বর্ণনা দিলো, তারপর লিখলো এই বনভূমিকে ট্যুরিস্টদের জন্যে একটা আকর্ষণ করে তুলতে পারলে বছরে কি পরিমাণ ফরেন কারেন্সি আয় করবে জিম্বাবুই সরকার। বিশ্ব ব্যাংক এ-দেশের ট্যুরিজম সম্পর্কে আগ্রহী, এই প্রকল্পটা নিয়ে চিন্তা করতে পারে তারা। এরপর কিংস হেভেন আর কুইন'স হেভেনকে র‍্যাঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলো রানা। লিখলো সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী পানির দরে কেনা সম্ভব, এক মিলিয়ন ডলারে। সব মিলিয়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দরকার হবে।

রিপোর্ট দুটো একজোড়া ম্যানিলা এনভেলাপে ভরলো রানা,

বিকেলের রোদে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের উদ্দেশে। দূতাবাসে ঢোকার মুখে ফ্রেঞ্চ নৌ-বাহিনীর দু'জন অফিসার সার্চ করলো রানাকে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছে ও, কালচারাল অ্যাটাশে মন্টিপিলার নিজে বেরিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলো ওর সাথে। মন্টিপিলারের অফিসে বসলো ওরা। রানা লক্ষ্য করলো, লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, শরীরের গড়ন দেখে মনে হয় কলেজ অ্যাথলেট। কফি খেলো ওরা, কোনো মন্তব্য ছাড়াই রানার কাছ থেকে এনভেলাপ দুটো নিয়ে দেরাজে ভরলো মন্টিপিলার। 'আমাকে বলা হয়েছে,' বললো সে, 'লোকজনের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি আছে, শুরু হিসেবে মন্দ হয় না। ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে, পৌছুতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'হিলটনে।'

'সেভেনটিন আওয়ার্সে আপনাকে আমি তুলে নেবো।'

সেভেনটিন আওয়ার্স। এটা একটা সামরিক প্রকাশ ভঙ্গি। আপন মনে হাসলো রানা, কালচারাল অ্যাটাশে?

গাঢ় লাল রঙের ফেজ টুপি পরে ছুটোছুটি করছে ম্যাশোনা চাকরবাকররা। রুশ আর চীনা কূটনীতিকরা সংখ্যায় এতো বেশি যে যেদিকে তাকাও আছে ওরা। যদিও অ্যামব্যাসাডর বা সেক্রেটারী পর্যায়ের কেউ আসেনি। কালো আফ্রিকান দেশগুলোর অ্যামব্যাসাডররা সস্ত্রীক এসেছেন, প্রতিটি দম্পতিকে রঙচঙে জোড়া

প্রজাপতির মতো লাগছে। কোনো কোনো অ্যামব্যাসাডরের কোমরে ঝোলানো মধ্যযুগীয় তলোয়ারও দেখা গেল। রানাকে প্রথমে মার্কিন অ্যামব্যাসাডর, তাঁর স্ত্রী, তারপর বাকি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো মন্টিপিলার। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের বয়স যদি ষাট হয়, তাঁর স্ত্রীর বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, আন্দাজ করলো রানা। ভদ্রমহিলা রানার হাত ধরে ছাড়তেই চান না, শেষ পর্যন্ত মন্টিপিলারের স্ত্রী এসে উদ্ধার করলো রানাকে। পার্টি শুরু হলো সবুজ ঘাস মোড়া লনে, আটটার দিকে রিসেপশন হলরুমে ডাক পড়লো মেহমানদের। হাতে হুইস্কির গ্লাস, পাশে সস্ত্রীক মন্টি-পিলার, হলরুমে ঢুকলো রানা। হঠাৎ একজনকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো ও, গ্লাস থেকে লাফ দিয়ে খানিকটা হুইস্কি পড়লো দামী কার্পেটে। হলরুমের এক কোণ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। প্রথমে একটু খটকা লাগলো, চিনতে ভুল করছে না তো? একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, ও তাকাবার পরও চোখ ফিরিয়ে নিলো না। সুতীর একটা স্কার্ট পরে আছে সে, স্কার্টের গায়ে অনেকগুলো পকেট, হাঁটু জোড়া উন্মুক্ত। গায়ে সাধারণ একটা টি-শার্ট, পায়ে খোলা স্যাণ্ডেল। বব কাট চুল রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে ঘাড়ের পিছনে বাঁধা, ঝুঁটির মতো লাগলো দেখতে। সাধারণ বেশ ভূষা, কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী। আলোর নিচ থেকে একটু সরে দাঁড়ালো মেয়েটা, এইবার পরিষ্কার চিনতে পারলো রানা। হৃদ-স্পন্দন বেড়ে গেল ওর, সারা শরীরে পুলক অনুভব করলো।

মেয়েটা কোনো মেকআপ ব্যবহার করেনি, অথচ ঠোঁট জোড়া গোলাপ কুঁড়ির মতো লাল। শ্বেতাঙ্গিনীর মতো ফর্সা, কাপড়ের ভেতর মেদহীন স্বাস্থ্য, ভরাট যৌবন। তার এক কাঁধ থেকে একটা

নিকন এফ-থ্রি, ঝুলছে, মটর-ড্রাইভ সহ। দুটো হাতই স্কার্টের পকেটে কব্জি পর্যন্ত ঢোকানো।

তার পাশে প্রকাণ্ডদেহী এক মিলিটারী অফিসার দাঁড়িয়ে। লোকটা আফ্রিকান, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, একজন ম্যাশোনা—কারণ, পরনে রেগুলার জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। ব্যাজ আর স্টারগুলো দেখে বোঝা গেল, একজন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল। আফ্রিকান আর্মি অফিসাররা খুব কম বয়সে জেনারেল হতে পারে, এই লোকও তার ব্যতিক্রম নয়। অত্যন্ত সুদর্শন আর স্মার্ট, মেয়েটা গভীর মনোযোগের সাথে তার কথা শুনছে।

'দূর থেকে দেখে কি সাধ মেটে?' রসিকতা করলো মন্টিপিলার। 'চলুন, ওদের সাথেও আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো সে। 'জেনারেল রট উমাঙ্গো, আসুন, আপনার সাথে একজন সাংবাদিকের পরিচয় করিয়ে দিই। মাসুদ রানা...।'

'হাউ ডু ইউ ডু, মিঃ রানা।' জেনারেল হ্যাণ্ডশেক করলো রানার সাথে। হাসিখুশি, ভদ্র, বিনয়ী—ম্যাশোনাদের মধ্যে সাধারণত যা দেখা যায় না।

মন্টিপিলার ব্যাখ্যা করলো, 'জেনারেল উমাঙ্গো একজন মিনিস্টার, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন উনি।' মেয়েটার দিকে ফিরলো সে। 'আর ইনি একজন ফটোগ্রাফার, মিস সোহানা চৌধুরী।'

সোহানা মৃদু একটু হাসলো, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'হাউ ডু ইউ ডু, মিঃ রানা।' তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মন্টিপিলারের সাথে অন্য প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো। 'ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আপনার

সাথে দেখা করতে পারিনি, মিঃ মন্টিপিলার। আমার ফটোর এগজিবিশনের জন্যে এতো খাটলেন, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। অসংখ্য চিঠি পেয়েছি আমি...'

'আগামী সপ্তায় আমার সাথে লাঞ্চ খান, ধন্যবাদ দেয়া হয়ে যাবে,' বললো মন্টিপিলার। রানার দিকে ফিরলো সে। 'মিস সোহানার ফটো এগজিবিশনের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা, আমাদের সব ক'টা আফ্রিকান কনস্যুলার অফিসে দেখানো হয়েছে। চমৎকার কাজ, মিঃ রানা, আপনার দেখা উচিত।'

'ওনার হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে,' বললো সোহানা। রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার সে মুখ খুললো, 'মিঃ মন্টিপিলার, আপনাকে বলাই হয়নি। জেনারেল উমাঙ্গো দারুণ একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আমাকে। উনি আমাকে একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে নিয়ে যাবেন, ইচ্ছেমতো ছবি তুলতে পারবো আমি।'

সোহানার এই অবহেলা, কারণটা আন্দাজ করতে পারলো রানা। দু'জনের কোনো সম্পর্ক নেই, কেউ কাউকে চেনে না, সবাইকে বোঝাতে চাইছে সেটা।

ওরা কথা বলছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রানা। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ফেরালো ও। ওকে একটু দূরে সরিয়ে আনলো জেনারেল উমাঙ্গো। মিটি মিটি হাসছে সে। নিচু গলায় বললো, 'মন খারাপ করবেন না, মিঃ রানা। অনেক সময় দেখা যায় অবহেলার পরপরই ভালোবাসা আসে।'

হেসে ফেললো রানা। 'আপনি তাহলে বলছেন, একেবারে নিরাশ হওয়া উচিত হবে না?'

'নারী বলুন, ব্যবসা বলুন, কোনো ব্যাপারেই হতাশ হতে নেই,' এখনো মিটিমিটি হাসছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'অনেক দিনের পুরনো বন্ধু হঠাৎ শত্রু হয়ে উঠতে পারে, তবু ভেঙে পড়লে চলবে না।'

দ্রুত চিন্তা করলো রানা। কার কথা বলছে জেনারেল? সোহানা, নাকি টস মাজুলেট। মুখে হাসি টেনে বললো ও, 'আপনি অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'রাখতে হয়,' মস্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো জেনারেল। 'কি জানেন, এদেশের এখন প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন দরকার। যে যাই বলুক, এজন্যে বিদেশী পুঁজি আর উদ্যোক্তাও আমাদের দরকার। আমরা ব্যবসা করে রাতারাতি মিলিওনিয়ার হতে চাইছি, কৃষি বা খামারের কাজে মন দিচ্ছি না। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।' একজন বেয়ারাকে ডেকে রানার গ্লাসটা ভরে দিতে বললো জেনারেল। 'জমি কেনার জন্যে অনুমতি চেয়ে আবেদন করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। আপনি বোধ হয় জানেন না, কৃষি মন্ত্রী আমার ভগ্নীপতি।'

'ধন্যবাদ…।'

'শুনলেনই তো, মিস সোহানাকে নিষিদ্ধ একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আমি,' বললো জেনারেল। 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস বড় বেশি চেঁচামেচি করছে, গোপন জেলখানায় আমরা নাকি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রচণ্ড টরচার করছি। আপনি একজন সাংবাদিক, আপনিও আমাদের সাথে চলুন না, নিজের চোখে দেখে আসবেন সব!'

চার

সূর্য ওঠার আগেই নিউ সারাম এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছুলো রানা। একটা হ্যাঙ্গারের পিছনে ফোক্সওয়াগেন থেকে নামলো ও, দেখলো এয়ার ফোর্সের দু'জন নন্-কমিশনড অফিসারের সাথে কথা বলছে জেনারেল উমাঙ্গো। ওকে দেখে তাদের বিদায় করে দিলো জেনারেল, হাসি মুখে এগিয়ে এলো রানার দিকে। পরনে ব্যাটল-স্মক, লাল বেরেট, চিতার মাথা আকৃতির ক্যাপ-ব্যাজ—থার্ড ব্রিগেডের ইউনি-ফর্ম। হোলস্টারে রিভলভার রয়েছে, হাতে চামড়া দিয়ে মোড়া স্টিক।

'গুডমর্ণিং, মিঃ রানা।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখলো জেনারেল, হ্যাঙ্গারের সামনের দিকে চলে এলো ওরা। কাছেই এক জোড়া পুরনো ক্যানবেরা বম্বার পার্ক করা রয়েছে। ওগুলোর পিছনে নীল আর রূপালি রঙের একটা সেসনা দুশো দশ। ওটার দিকে এগোচ্ছে ওরা, ডানার তলা থেকে বেরিয়ে এলো সোহানা। ঘুরে ফিরে প্লেনটা চেক করছে সে, রানা বুঝলো সে-ই প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাবে ওদেরকে। মনে মনে একজন সামরিক পাইলট আর হেলিক-প্টার আশা করেছিল ও।

উইণ্ড-চিটার, ব্লু জিনস, আর নরম চামড়ার মসকুইটো বুট পরেছে

সোহানা। চুলগুলো সিল্ক স্কার্ফে ঢাকা। 'গুডমর্ণিং, জেনারেল। আপনি ডান দিকের সিটে বসতে চান?'

'সবই তো আমার দেখা আছে,' জেনারেল বললেন, 'সামনে মিঃ রানাকে বসতে দিলে কেমন হয়?'

'আপনি যা বলেন,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে, ইঙ্গিতে সিঁড়ি দেখালো সোহানা। 'মিঃ রানা।' সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল সে, পিছু পিছু রানা আসছে কিনা দেখলো না।

টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি নিলো সোহানা, কণ্ট্রোল কলাম চেক করলো। টেক-অফ করার খানিক পর, বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর-পশ্চিমের কোর্স ধরলো সে, অটোমেটিক পাইলটের সুইচ অন করে কোলের ওপর একটা স্কেল ম্যাপের ভাঁজ খুললো।

'মেশিনটা চমৎকার,' এই প্রথম কথা বললো রানা। 'তোমার নিজের?'

'আমি ফ্রি ল্যান্সার হলেও,' উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো সোহানা, 'বর্তমানে কাজ করছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের হয়ে। ওরা এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।'

'কতো স্পীডে যাচ্ছি আমরা?'

'মিঃ রানা, আপনার ঠিক সামনেই একটা এয়ার-স্পীড ইণ্ডিকেটর রয়েছে।' ব্যাস, একথার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

পিছন থেকে রানার সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে জেনারেলই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'নিচে গ্রেট ডাইক।' চওড়া ফিতের মতো পাথুরে একটা আদিগন্ত বিস্তৃতি। 'ক্রোম, প্ল্যাটিনাম, সোনা—বহু কিছু পাবো বলে আশা করছি আমরা।' ডাইকের পর কৃষিভূমি, তারপর

হালকা খয়েরি রঙের পাহাড় আর ঘন সবুজ বনভূমি, যতোদূর দৃষ্টি যায়। 'পনগোলা হিলের এদিকে একটা এয়ারস্ট্রিপে নামবো আমরা। একেবারে নির্জন এলাকা, ছোটো দু'একটা গ্রাম আর একটা মিশন-স্টেশন ছাড়া কিছু নেই, ওখানে আমাদের জন্যে ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা থাকবে। ক্যাম্প ওখান থেকে দু'ঘণ্টার পথ।'

'আরো একটু নিচে নামতে পারি, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

মৃদু শব্দে হাসলো জেনারেল। রানার সিটের পিছনে টোকা দিয়ে বললো, 'বুনো প্রাণীদের সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করার দায়িত্ব নিয়েছেন উনি।'

অনেক নিচে নেমে এলো সেসনা। দমকা পাহাড়ী বাতাসের ধাক্কায় ঝাঁকি খেতে শুরু করলো প্লেন। নিচে গভীর জঙ্গল, কোথাও মানুষের বসতি বা কৃষিজমি চোখে পড়লো না। কখনো গাঢ় সবুজ বনভূমি, কখনো পাথুরে পাহাড়, এভাবেই চললো। একটা পাহাড়ী নালার ধারে এক পাল শিংওয়ালা হরিণকে দেখা গেল। বিশ মাইল দূরে জঙ্গলের ভেতর দেখা গেল বয়স্ক এক নিঃসঙ্গ হাতিকে। প্রায় গাছগুলোর মাথার কাছে নেমে এলো সেসনা, হাতিটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিলো। ভয় পেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠ ধরে ছুটলো ঐরাবত, সোহানা চাইছিলও তাই। 'হি ইজ ম্যাগনিফিসেন্ট!' চিৎকার করে বললো সে, আনন্দে-উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ জোড়া। 'এক একটা আইভরি একশো পাউণ্ডের কম না।' খোলা জানালা দিয়ে, এক হাতেই, ক্যামেরার শাটার টিপে অবিরাম ফটো তুলছে সে। প্লেন এতোই নিচে নেমে এলো, রানার মনে হলো উঁচু করা শুঁড় দিয়ে সেসনাকে যে-কোনো মুহূর্তে পেঁচিয়ে নিতে

পারে হাতিটা। ওটার চোখের কোণে জমে থাকা সাদা পিচুটি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল। সিটের একটা পাশ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রানা।

অবশেষে হাতিটাকে রেহাই দিয়ে সেসনার ডানা সিধে করে নিলো সোহানা, ওপর দিকে উঠতে শুরু করে আড়চোখে তাকালো রানার দিকে, একটা চোখ টিপলো। 'মেরে ফেললে ওই হাতি দশ হাজার ডলারে বিকোবে,' বললো সোহানা। 'কিন্তু বেঁচে থাকলে ওটার দাম দশগুণ বেশি—শুধু তাই নয়, আরো একশো হাতি রেখে যাবার ব্যবস্থা করবে ও।'

রানার সিটের পিছনে আবার মৃদু টোকা পড়লো। 'মিস সোহানার ধারণা, এ-দেশে লার্জ-স্কেল একটা পোচিং রিঙ আছে। উনি কিছু ছবিও দেখিয়েছেন আমাকে। আমারও বিশ্বাস...

'ওদেরকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে, জেনারেল,' বললো সোহানা।

'আপনি খুঁজে বের করুন, আমি ওদের ধ্বংস করবো। আপনাকে তো আমি আগেই কথা দিয়েছি।'

বেশ অনেকদিন হলো এ-দেশে আছে সোহানা, আন্দাজ করলো রানা। জেনারেল উমাঙ্গো সুদর্শন, ভদ্র, হাসিখুশি; বেশ সহজ হয়ে উঠেছে ওরা।

খেয়াল হলো, জেনারেল কি যেন জানতে চাইছেন। 'মিঃ রানা, র‍্যাঞ্চ আর ট্যুরিস্ট'স স্পট সম্পর্কে আপনার ফিলিংস একটু খুলে বলবেন?'

শিজারিরা এস্টেটকে নিয়ে ও কি প্ল্যান করেছে বলতে শুরু করলো রানা। কালো গণ্ডারের গল্প করলো ও। এলাকার বর্ণনা দিয়ে

জানালো, ওখানে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ আর মোষও আছে। ভিক্টোরিয়া ফলস থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, ট্যুরিস্টরা একবার ঢুঁ মেরে যাবার লোভ সামলাতে পারবে না। লক্ষ্য করলো, সোহানাও গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে। ও থামতে জেনারেল উমাঙ্গো বললেন, 'মিঃ রানা, ঠিক এই ধরনের প্ল্যানই দরকার এ-দেশে। শিজাম্বিয়া এস্টেট সম্পর্কে যে প্ল্যান আপনি শোনালেন, শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে সত্যিকার একজন প্রকৃতি প্রেমিকের চেহারা ভেসে উঠলো। ধন্যবাদ, মিঃ রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি শিওর, র‍্যাঞ্চের ব্যাপারেও আপনার প্ল্যান এই রকমই নিখুঁত আর গঠনমূলক...'

'মিস্টারটা বাদ দিলে হয় না, জেনারেল?'

'ধন্যবাদ, রানা—বন্ধুরা আমাকে শুধু রট বা উমাঙ্গো বলে। তুমিও যে-কোনো একটা বাদ দিতে পারো।'

আধ ঘণ্টা পর নাক বরাবর সামনে রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠলো গ্যালভানাইজড লোহার ছাদ। 'টুটি মিশন,' বললো সোহানা। ল্যাণ্ড করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো সে।

চার্চের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ক্ষুদে লোকজনের হাতনাড়া লক্ষ্য করলো ওরা। সরু, অসমান একটা এয়ারস্ট্রিপ, কিন্তু দক্ষতার সাথে সেসনাকে নামিয়ে আনলো সোহানা। বালি রঙের একটা ল্যাণ্ড রোভার ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়ির পাশে তিনজন থার্ড-ব্রিগেড ট্রুপার, জেনারেল উমাঙ্গোকে স্যালুট করলো তারা, তিন জোড়া বুট থেকে ধুলো উড়লো এক রাশ। সেসনাকে বাঁধার কাজে সোহানাকে সাহায্য করলো রানা, ট্রুপাররা প্লেন থেকে নামিয়ে ব্যাগগুলো তুললো ল্যাণ্ড-রোভারে।

চার্চের পাশেই মিশনের স্কুল, স্কুলের সামনে ল্যাণ্ড-রোভার আসতেই সোহানা জানতে চাইলো, 'কি মনে হয়, জেনারেল? লেডিজ রুম পাওয়া যাবে এখানে?'

স্টিক দিয়ে ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। ল্যাণ্ড-রোভার থামলো। আণ্ডা আণ্ডা চোখ নিয়ে বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা, সোহানা সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে স্কুল মিসট্রেস নিজে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো তাকে। টিচারের বয়স সোহানার চেয়ে বেশি নয়। সরু, লম্বা পা তার; সাধারণ একটা সুতী স্কার্ট পরে আছে। কাপড়চোপড়ে কড়া ভাঁজ, সাদা জুতোয় কোথাও একবিন্দু দাগ নেই। গায়ের চামড়া মখমলের মতো মসৃণ, চাঁদপানা মুখ, হাসিতে মুক্তো ঝরে, চোখে হরিণীর কোমল দৃষ্টি। চোখ ফেরাতে পারলো না রানা, মনে হলো, অপূর্ব!

সোহানাকে নিয়ে স্কুল-ভবনের ভেতরে চলে গেল মেয়েটা।

'পছন্দ হয়?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো জেনারেল। রানা কিছু বলতে গেল, কিন্তু সুযোগ পেলো না। 'ও মিরাণ্ডা। চারটে এ-লেভেল ডিগ্রী আর একটা হাইস্কুল টিচার'স ডিপ্লোমা আছে, সেই সাথে নার্সিংয়েও ট্রেনিং নিয়েছে। কুমারী, সুন্দরী, আধুনিকা, কিন্তু একটু সেকেলে। ওর বাবা এখনো ওঝা, শুধু কোমরে এক টুকরো চামড়া পরে থাকে, গোসল করে বছরে একবার। এই হলো আফ্রিকা, রানা,—মাই ওয়াণ্ডারফুল, এণ্ডলেসলি ফ্যাসিনেটিং, এভার-চেঞ্জিং, নেভার-চেঞ্জিং অ্যাফ্রিকা।'

স্কুলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা দুজন, এরই মধ্যে যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে ওরা। বারান্দার সামনে থেমে ছাত্র-ছাত্রীদের ফটো তুললো সোহানা, তাদের কারো কারো বয়স মিরাণ্ডার

চেয়ে কম নয়।

'দেখে মনে হয় ভালো জিনিসের কদর দিতে জানো তুমি,' মিরাণ্ডার দিকে চোখ রেখে বললো রানা। 'যৌতুকের টাকা নেই তোমার, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে অপেক্ষা করছো কেন, রট?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেনারেল রট উমাঙ্গো। 'ও ম্যাটাবেল, আর আমি ম্যাশোনা– সাপে নেউলে সম্পর্ক।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে। 'কোনো আশা নেই।'

ল্যাণ্ড-রোভারে ফিরে এসে মিরাণ্ডার উদ্দেশে হাত নাড়লো সোহানা, উত্তরে মিরাণ্ডাও। ছাত্র-ছাত্রীরা হেঁড়ে গলায় একটা কোরাস গাইতে শুরু করেছে। গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। লালচে ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল স্কুল। 'কালো তা সে যতোই কালো হোক, বাংলায় বললো সোহানা, '...রবীন্দ্রনাথ বোধহয় কল্পনায় এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন।'

'ওহ্‌হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমরা দু'জনই বাংলাদেশ থেকে এসেছো,' সকৌতুকে বললো জেনারেল। সোহানার অজান্তে রানার গায়ে মৃদু একটু ঠেলা দিলো সে, ফিসফিস করে বললো, 'বাতাস উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে। বলেছিলাম না, অনেক সময় অবহেলার পরপরই ভালো...'

হেসে উঠলো রানা।

মেটো রাস্তা, এখানে সেখানে গর্ত, ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। জঙ্গলের ফাঁক ফোকর দিয়ে উত্তর দিগন্তে নীল পাহাড় দেখা গেল—খাড়া, দুর্গম, বৈরী।

গন্তব্য আর খুব বেশি দূরে নয়, ওখানে পৌঁছে কি দেখবে বলে

আশা করতে পারে ওরা সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলো জেনারেল উমাঙ্গো।

এগুলো পুনর্বাসন কেন্দ্র, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নয়। কয়েদীদের এখানে লেখাপড়া শেখানো হয়, বাস্তব তুনিয়াকে মেনে নেয়ার সবক দেয়া হয়। দেশটা একটানা এগারো বছর একটা সিভিল ওঅরের ভেতর দিয়ে এসেছে, যুদ্ধটা তরুণ সম্প্রদায়কে নিষ্ঠুর কসাই বানিয়ে ছেড়েছে। যুদ্ধের পর ওদেরকে হয়তো গঠনমূলক কাজে ফিরিয়ে আনা যেতো, কিন্তু কিছু বিপথগামী নেতা ওদেরকেও নিজেদের পথে টেনে নেয়। এই বেঈমান নেতারা যুবক সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে পুঁজি করে মাঠে নামে। ওদের অসন্তুষ্ট হবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। বলা হয়েছিল দেশ স্বাধীন হলে চারদিকে প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যাবে, কেউ গরীব থাকবে না। দেশে যে সম্পদের অভাব, এটা কেউ বুঝতে চায় না। এই সব প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিল, বিপথগামী নেতারা যুবক সম্প্রদায়কে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। এরা প্রত্যেকে এক একজন দক্ষ গেরিলা, বহু মানুষ খুন করেছে, সুযোগ পেলে আরো বহু মানুষকে খুন করবে। সবশেষে জেনারেল বললো, 'ওদেরকে আমরা মেরে ফেলতে পারি না। আমাদেরই সন্তান ওরা। সেজন্যেই পুনর্বাসন কেন্দ্রে আটকে রেখে সৎ পথে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

রানা লক্ষ্য করলো, উপজাতীয় কোন্দল সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করলো না জেনারেল।

মেটো চৌরাস্তার মোড়ে থামানো হলো ল্যাণ্ড-রোভার, এখানে ওরা লাঞ্চ সারবে। সামনেই দেখা গেল একটা নদী, তুই পাড়ে মাথা নুইয়ে পড়া দশ ফিট লম্বা ঘাসের পাঁচিল। নদীর ওপর বাঁশের

একটা সাঁকো, নিচে ঠাণ্ডা সবুজ স্বচ্ছ পানি। লাঞ্চে বসে আরো কিছু কথা বললো জেনারেল। যে-কোনো কয়েদীর সাথে কথা বলতে পারবে ওরা। তবে, বিশেষ করে সোহানাকে সাবধান করে দেয়া হলো, কেউ যেন ভুলেও ক্যাম্পের বাইরে না বেরোয়—বাইরে সব সময় ঘুর ঘুর করছে চিতা আর হায়েনা।

আবার রওনা হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে টুটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে পৌঁছুলো ওরা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'নিরাপদ গ্রাম'-গুলোর একটা ছিলো এটা। গেরিলারা 'শান্তিপ্রিয়' এবং 'নিরপেক্ষ' গ্রামবাসীদের ওপর হামলা চালাতো, তাই স্মিথ সরকার গ্রামগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পাহাড়ী একটা ঢালের গা থেকে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় সব কেটে সাফ করা হয়েছে। বিশাল আকারের কালচে বোল্ডার ফেলে দুর্গম করে তোলা হয়েছে জায়গাটাকে। বোল্ডারের ওপরে তৈরি করা হয়েছে বালির বস্তা-ঘেরা ক্ষুদে একটা দুর্গ, দুই দেয়ালের মাঝখানে মেশিনগান বসাবার মুখ খোলা টানেল, ফায়ারিং প্ল্যাটফর্ম, কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ, আর ডাগ-আউট। ঢালের নিচে সার সার মাটির তৈরি ঘর, কোনো কোনোটার দেয়াল ছাদ ছোঁয়নি—ওই ঘর-গুলোয় কয়েদীরা থাকে। ঘরগুলো একটা মাঠকে ঘিরে তৈরি করা, মাঠের দু'ধারে একটা করে গোলপোস্ট। মাঠের এক প্রান্তে, দুর্গের কাছাকাছি, সাদা একটা দেয়াল দেখা গেল।

একজোড়া কাঁটাতারের বেড়া গোটা ক্যাম্পকে ঘিরে আছে। কাঁটাতারের জাল খুব ঘন করে বোনা, দশ ফিট করে উঁচু। বেড়ার গা ঘেঁষে বাঁশের মাচা আকৃতির অনেকগুলো ওয়াচ-টাওয়ার, প্রতিটির মাঝখানে বেশ অনেকটা করে দূরত্ব। একটাই গেট। ল্যাণ্ড-রোভার থামতেই তিনজন গার্ড স্যালুট করলো। গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে

প্যারেড গ্রাউণ্ডকে ঘিরে থাকা রাস্তা ধরে এগোলো গাড়ি।

প্রচণ্ড কড়া রোদ মাথায় করে প্রায় তিনশো যুবক মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'এ!' কয়েদীরা সবাই তারস্বরে উচ্চারণ করছে, 'এ!' ওদের কারো কারো বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। ঘরগুলোর কবাটহীন দরজার ভেতর আরো কয়েক শো লোক বসে রয়েছে, কালো ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে সরবে পড়া মুখস্থ করছে তারা। জেনারেল বললো, 'পরে সব ঘুরেফিরে দেখা যাবে। তার আগে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করা যাক।'

ঢালের গায়ে একটা ডাগ-আউট বরাদ্দ করা হলো রানাকে। মাটির মেঝে সদ্য পরিষ্কার করে পানি ছিটানো হয়েছে, যাতে ধুলো না ওড়ে। ঘাস দিয়ে বোনা একটা মাদুর ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। চটের একটা বস্তা কেটে খাটো পর্দা বানানো হয়েছে। মাদুরের ওপর একটা দিয়াশলাই, আর এক প্যাকেট মোমবাতি। এগুলো সম্ভবত কেবল মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদের জন্যেই বের করা হয়, আন্দাজ করলো রানা।

সামনে একটা ট্রেঞ্চ, ওপারে সোহানার ডাগ-আউট। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে রানা দেখলো, মাদুরের ওপর সোজা হয়ে বসে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করছে সোহানা।

ট্রেঞ্চ ধরে ওপরে, ঢালের মাথায় কমাণ্ড পোস্টে চলে গেল জেনারেল উমাঙ্গো। কয়েক মিনিট পর একটা ইলেকট্রিক জেনারেটর সচল হলো, রেডিওতে 'শোনা' ভাষায় কথা বলছে জেনারেল, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না রানার। আধ ঘণ্টা পর নেমে এসে বললো, 'চলো, কয়েদীদের দেখবে চলো।'

দশটা লাইনে কয়েক শো কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে, রাতের খাবার খেতে দেয়া হয়েছে তাদের। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির গামলা, তাতে সেদ্ধ করা প্রচুর সব্জি আর তরকারি। অপর হাতে বড় আকারের কয়েকটা করে রুটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাচ্ছে সবাই, কোনো দিকে কারো খেয়াল নেই। ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে এলো তিনজনের দলটা, কিন্তু কেউ ভুলেও মুখ তুলে তাকালো না। কেউ রুগ্ন বা অসুস্থ নয়, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ফুলে উঠেছে পেশী, কারো শরীরে মেদ জমেনি। আহত কয়েকজন কয়েদীকে দেখলো ওরা। কারণ জানতে চাইলে শোনা ভাষায় উত্তর এলো, অথচ কয়েদীরা সবাই ম্যাটাবেল। 'ওরা বলছে,' ইংরেজীতে বললো জেনারেল, 'নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আহত হয়েছে ওরা।'

সন্ধ্যে হয়ে আসতে প্যারেড গ্রাউণ্ড পেরিয়ে সাদা পাঁচিলটাকে পাশ কাটালো ওরা। জেনারেল বললো, 'কাল সকালে ঘুরে ফিরে সব দেখা যাবে। পরশু ভোরে রওনা হবো আমরা।'

মেসে শোনা অফিসারদের সাথে খেতে বসলো ওরা। সেই একই খাবার, শুধু রুটির রঙ সাদা, গামলার বদলে চীনা মাটির প্লেট আর চামচ দেয়া হলো। 'ছোটো বড় ভেদ নেই,' জেনারেল বললো, 'সবাই এখানে একই খাবার খায়। হপ্তায় একদিন মাংস।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার প্রায় পরপরই অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে গেল জেনারেল, ডাগ-আউটে রানা আর সোহানাকে একা রেখে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে সোহানা, ঠোঁটে একটা আঙুল তুলে নিষেধ করলো রানা। কাছেপিঠে কাউকে দেখা না গেলেও, বদ্ধ একটা জায়গায় গোপন কোনো কথা না বলাই ভালো। ইঙ্গিত পেয়ে রানার পিছু পিছু ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে

এলো সোহানা।

মেইন ট্রেঞ্চে, ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মে চলে এলো ওরা। বালির বস্তার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো রানা। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বস্তাগুলোর ওপর উঠে বসলো সোহানা, নিচের আধো অন্ধকার প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। পাহাড়ের মাথায় মস্ত থালার মতো চাঁদ উঠেছে। রানা উপলব্ধি করলো, শুধু সোহানার শারীরিক উপস্থিতিই তার মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি এনে দেয়।

'আমাকে নাহয় বিশ্ব-ব্যাংক একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছে,' জিজ্ঞেস করলো ও, 'কিন্তু তোমাকে?'

'আমাকে পাঠিয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট। একই কাজ নিয়ে এসেছি আমরা।'

'মাস্টার পোচারকে খুঁজে বের করা, আর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে কিনা খবর নেয়া…'

সোহানা এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে দেখে চুপ করে গেল রানা। 'উঁহু, কাজ শুধু এই দুটোই নয়,' বললো সোহানা। 'আরো আছে। বসের নির্দেশ, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে দেখলে তার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাদের।'

'কারণ?'

'কারণ, বসের ধারণা, এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে শুধু গোটা একটা উপজাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যু ঘটার কোনো আলামত এ কয়দিনে দেখতে পেয়েছো?'

'এখনো কিছু দেখছি না,' বললো সোহানা। 'তবে বাতাসে নানান গুজব। আমাদের জানতে হবে সেনাবাহিনীতে কি ঘটছে। তা

জানতে হলে জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে সম্পর্কটা নষ্ট করা চলবে না। খবর পাবার সে-ই একমাত্র সোর্স আমাদের। নিজে থেকে কোনো তথ্য দেবে বলে মনে হয় না, কৌশলে যদি কিছু আদায় করা যায়।'

'তুমি তো আমার আগে এসেছো,' বললো রানা, 'মাস্টার পোচার সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ?'

'অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি,' বললো সোহানা। 'তাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা করতে যাবো আমি। আশা করছি দিন কয়েকের মধ্যে দু'একটা সূত্র পেয়ে যাবো।'

'আমি তাহলে কোত্থেকে শুরু করবো ?'

'তোমার অ্যাকশন শুরু হবে মাস্টার পোচারের পরিচয় জানার পর, আর সামরিক অভ্যুত্থানের লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে উঠলে,' বললো সোহানা। 'যে-কদিন আমাকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়, তোমার কাজ হবে বিশ্রাম নেয়া, আর জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে যোগাযোগ রাখা।'

'সময় কাটাবার মতো একটা ঝামেলা অবশ্য এরই মধ্যে ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো সোহানা। সংক্ষেপে রুবেনসনের গল্পটা তাকে শোনালো রানা। সবশেষে বললো, 'ভদ্রলোক এমন-ভাবে ধরলেন ...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ও।

আবছা অন্ধকারে সোহানার ঠোঁটের হাসিটুকু দেখতে পেলো না রানা। সাউল র‍্যাঙ্কিং সম্পর্কে রানারও যে যথেষ্ট আগ্রহ আর দরদ আছে, এটুকু সে উপলব্ধি করতে পারলো। রেবেকার একটা স্মৃতি, রানা সেটা নষ্ট হতে দিতে চায় না। মনে মনে ঠিক করলো, দরকার

হলে রানাকে এই কাজে সাহায্য করবে ও। আগের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললো, 'বসের আরো একটা নির্দেশ আছে। তিনি বলেছেন, হীরেগুলো যেন এ-দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।'

'হীরে!'

'হ্যাঁ,' বললো সোহানা। 'জিম্বাবুইয়ে কোথায় নাকি প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের হীরে আছে। বস গোপন সূত্রে জানতে পেরে-ছেন, একটি সুপার পাওয়ার সামরিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করার বিনিময়ে এই হীরে হাত করতে চাইছে।

'কতো বললে?' রানার মনে হলো ভুল শুনেছে।

'প্রায় পাঁচ শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওগুলো সাধারণ কোনো হীরে নয়, রানা।'

'মাই গড!' একটা ঢোক গিললো রানা। তারপর বললো, 'অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি যেন!'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে, আঁচ করতে পারো?'

'বই-পত্র পড়ছি, লোকজনকে জিজ্ঞেস করছি,' বললো সোহানা। 'খোঁজ ঠিকই পাবো।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে। 'তোমার সাথে নতুন পরিচয় হয়েছে, বেশিক্ষণ একসাথে থাকলে জেনারেল সন্দেহ করবে। আমি চলি।' নিজের ডাগ-আউটের দিকে চলে গেল সে।

খানিক পর রানাও ফিরে এলো। নিজের ডাগ-আউটে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো একবার। সোহানার ডাগ-আউটে পর্দা ঝুলছে, ভেতরটা অন্ধকার।

মোমবাতি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালো রানা। কেন যেন ঘুম নেই চোখে। হোল্ড-অল টেনে নিয়ে ভেতর থেকে নোট-বুক আর

বল পয়েন্ট কলম বের করলো। কাগজের কোণায় পেনের শিষ ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো ও, তারপর শুরু করলো।

লিখেই চলেছে রানা। শুধু নতুন মোমবাতি জ্বালার জন্যে থামলো ও, খেয়াল নেই মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে কখন। নোটবুকের আর মাত্র কয়েকটা পাতা খালি, এই সময় নিঃশব্দ পায়ে পর্দার সামনে এসে দাঁড়ালো কেউ, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রানার। পা টিপে ডাগ-আউটের ভেতর ঢুকে পড়লো সোহানা। ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে কলম আর নোটবুক কেড়ে নিলো সে। 'রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে, সেদিকে খেয়াল নেই, না? শোও, শুয়ে পড়ো···'

'আহা, লাইনটা শেষ করতে দাও···' সোহানার হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রানা।

কিন্তু সোহানা দেবে না। ধস্তাধস্তি শুরু হতে, হঠাৎ পড়ে গিয়ে নিভে গেল মোমবাতি। তারপর...

তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

'ওই গানটা আমাকে একদিন শোনাবে?' অনেকক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে বললো সোহানা। 'ওই যে, লুবনা তোমাকে যে ক্যাসেটটা দিয়েছিল।'

'শোনাবো।' মৃদু হাসলো রানা। 'আমার মৃত্যু-সংবাদ যখন ঢাকায় পৌঁছলো—কেমন লেগেছিল তোমাদের? কেঁদেছিলে?'

'উঁহু। অনেকে কেঁদেছে, কিন্তু আমি না।' একটু চুপ করে থেকে বললো, 'সবাই যখন হাওয়া-বাতাস করে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো, ততক্ষণে রোম থেকে বুড়োর মেসেজ এসে গেছে। চোখ মেলেই দেখি দুই কান পর্যন্ত লম্বা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল ভাই আর জাহেদ শালা। আচ্ছা···তোমাকে কবর দেয়ার প্ল্যানটা কার?'

'বুড়োর। নইলে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঢাকায় ফিরতে পারছিল না। কর্ণেল গুগলিকে বুঝিয়েছে, রানা এখন 'সিটিং ডাক' যে-কোনো দিক থেকে গুলি আসতে পারে ম্যাফিয়া, সিআইএ বা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের। রানার মৃত্যু সংবাদ পেলেই কেবল থামবে ওরা, রানা সময় পাবে সুস্থ হয়ে ওঠার।'

'যাই বলো, প্ল্যানটা কিন্তু দারুণ ছিলো।'

'হ্যাঁ। বুড়োটা সত্যিই ভালোবাসে আমাদের।... কিন্তু এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে হতো না? ঘুম পাড়াতে এসে এখন বকিয়ে মারছো দেখছি!'

সকালে লাল টকটকে চোখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলো রানা। কিন্তু কানায় কানায় ভরে আছে মন। ব্রেকফাস্টের পর র‍্যাঞ্চ নিয়ে অনেক কথা বললো সোহানাকে। তেমন কোনো মন্তব্য করলো না সোহানা, কিন্তু মন দিয়ে শুনলো কথাগুলো। রানা যে সিরিয়াস, এটুকু সে বুঝেছে। কয়েদীদের দেখতে বেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রানাকে একা পেয়ে শুধু বললো, 'দেখো শেষপর্যন্ত কি হয়। বিপদ কোন দিক থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না।'

রানারও তাই মনে হচ্ছে। কোথায় কি যেন একটা পাকিয়ে উঠছে, কিন্তু সেটা যে কী, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবু, কিছু ঘটার আশংকায় তো আর সব কাজ ফেলে রাখা যায় না।

প্রায় সাত শো কয়েদী রয়েছে টুটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে। এগারো বছর আগে এদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিলো চোদ্দ কি পনেরো। স্কুল ছেড়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে। গোটা জাতিকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল,

শ্বেতাঙ্গরা বিদায় হলে দেশের লোক-সবাই ধনী হয়ে যাবে ; তারাই হবে খামার, খনি, আর সমস্ত ব্যবসার মালিক। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। স্বাধীনতার সুফল প্রধান একটা উপজাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, ম্যাটাবেল আর অন্যান্য উপজাতির লোকেদের অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপ হয়েছে। কাজেই তারা আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলে, সামনে যাকে পায় তাকেই খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাদেরই কিছু লোককে ধরে এনে রাখা হয়েছে এ-ধরনের ক্যাম্পগুলোয়।

ফেরার পথে জেনারেলকে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে এরা সবাই ম্যাটাবেল, তাই না ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'এক ক্যাম্পে দুই উপজাতির লোক রাখি না আমরা—রাখলে খুনোখুনি লেগেই থাকবে।'

'শোনা কয়েদী ? আছে ?'

'আছে বৈকি,' মৃদু হেসে রানাকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল। 'ওদেরকে রাখা হয়েছে ইস্টার্ণ হাইল্যাণ্ডের একটা ক্যাম্পে—সেখানেও এই একই পরিবেশ।'

দিনের বাকি সময়টা রাতের লেখাগুলো সংশোধন করে কাটালো রানা।

সূর্যাস্তের পরপরই জেনারেটর চালু হলো, রেডিওতে কথা বললো জেনারেল উমাঙ্গো। বিশ মিনিট পর রানার ডাগ-আডটে হাজির হলো সে। 'তোমার মেসেজ, রানা। নিউইয়র্ক থেকে, ভায়া ফ্রেঞ্চ এমব্যাসি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। মন্টিপিলারকে বলা ছিলো,

জাসটিন চ্যাপেলের মেসেজ পাওয়া মাত্র তার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেসেজটা একটা কাগজে লিখে এনেছে জেনারেল। সেটা নিয়ে পড়তে শুরু করলো রানা। 'মাসুদ রানার জন্যে। আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে আমার উৎসাহে সহকর্মীরা কেউ সাড়া দেয়নি। আপনি যে বইটা লিখবেন, সেটা লেখা শেষ না হলে অ্যাডভান্স দেয়া সম্ভব নয়। এখানে আমাদের লোন কমিটি বলছে উপযুক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া ফাণ্ড দেয়া যাবে না। দুঃখিত। শুভেচ্ছা নেবেন, জাসটিন চ্যাপেল।'

মেসেজটা আবার পড়তে শুরু করলো রানা, এবার ধীরে ধীরে।

'আমার নাক গলানো উচিত নয়,' বিড়বিড় করে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, 'তবু জিজ্ঞেস করি, এটা বোধহয় তোমার শিকারিরা এস্টেট সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার?'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। 'ওরা টাকা দিতে রাজি নয়।'

'চ্যাপেল?'

'একজন বন্ধু, ব্যাংকার—আমি বোধহয় ভদ্রলোকের ওপর খুব বেশি ভরসা করেছিলাম।'

আজ রাতেও ভালো ঘুমাতে পারলো না রানা। মাদুরটাকে লোহার মতো শক্ত মনে হলো, জঙ্গল থেকে ভেসে আসা হায়েনার হাসি শুনে মনে হলো তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

সকালে উঠেই রওনা হয়ে গেল ওরা। পথে জেনারেল আর সোহানা গল্পে মেতে উঠলেও, রানা বিশেষ কথা বললো না। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ওরাও কেউ ওকে বিরক্ত করলো না।

মিরাণ্ডার সাথে আরেকবার দেখা করার বায়না ধরলো সোহানা, মেয়েটিকে তার খুব ভালো লেগে গেছে, কাজেই টুটি মিশন সেন্টারে

থামাতে হলো ল্যাণ্ড-রোভার। এইবার তৈরি ছিলো মিরাণ্ডা, অতি-থিদের চা খাবার অনুরোধ করতে পারলো। গল্প-গুজবে মন নেই রানার, সবার কাছ থেকে দূরে বারান্দার একধারে একটা চেয়ারে একা বসে থাকলো সে। খানিক পর একটা ট্রে হাতে নিয়ে তার কাছে এলো মিরাণ্ডা। ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলতে যাবে রানা, মিরাণ্ডা সিনডেবেল ভাষায় নিচু গলায় বললো, 'চিতা যখন শিকার করে, অন্ধকারেই করে।'

চমকে উঠে মিরাণ্ডার মুখের দিকে তাকালো রানা। দেখলো, হরিণীর কোমল চোখ নয়, দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে।

'টুটি পুনর্বাসন ক্যাম্পে যা ঘটে আপনি তার কিছুই দেখেননি,' আবার বিড়বিড় করে বললো মিরাণ্ডা। 'উমাঙ্গোর পোষা চিতা আর হায়েনারা ম্যাটাবেল কয়েদীদের খেয়ে ফেলছে। আমার কাছ থেকে একটা অ্যাডভাইস নিন, মিঃ অ্যাডভাইজার, মেয়েটাকে নিয়ে এ-দেশ ছেড়ে পালান…'

অবাক হয়ে গেল রানা। শিজারিরার জঙ্গলে মেজর কুকি ওকে মিঃ অ্যাডভাইজার বলে সম্বোধন করেছিল, এই মেয়েটা তা জানলো কিভাবে? জেনারেল উমাঙ্গোর ওপর রেগে আছে ও, কারণটা কি? ওদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে বলছে কেন? ও কিছু বলার আগেই হঠাৎ করে উদয় হলো জেনারেল উমাঙ্গো। দ্রুত মুখ নিচু করে নিলো মিরাণ্ডা, চায়ের কাপটা চেয়ারের হাতলে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কাঁধ ঝাঁকালো জেনারেল।

মিশন সেন্টার থেকে এয়ারস্ট্রিপ কাছেই, পথে রানার কাঁধে হাত রাখলো জেনারেল। বললো, 'এখান থেকে তোমার শিজারিরা

এস্টেট মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। ফেরার পথে একটু ঘুরে জায়গাটা দেখে যেতে পারি আমরা।'

'কি লাভ।' মাথা নাড়লো রানা।

'কি লাভ মানে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

মেসেজ লেখা কাগজটা পকেট থেকে বের করে সোহানার হাতে ধরিয়ে দিলো রানা।

মেসেজটা পড়া শেষ করে মুখ তুললো সোহানা। 'আমি দুঃখিত, রানা,' শুকনো গলায় বললো সে।

'তবু জায়গাটা আমি একবার দেখতে চাই,' জেনারেল বললো। 'বলা যায় না, আমার পছন্দ হয়ে যেতে পারে।'

ঝট্ করে জেনারেলের দিকে ফিরলো রানা।

হেসে ফেললো জেনারেল। 'আরে না, তোমার শখের জিনিসে আমি হাত দেবো না। তবে, আমার যদি পছন্দ হয়, কেনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিনা দেখবো।'

সোহানাও একটু উৎসাহ দেখালো। 'চলোই না, দেখি জায়গাটা কেমন।' এরপর আর আপত্তি করলো না রানা।

সেসনায় উঠে সোহানা ম্যাপ বের করলো, শিজারিরা নদীর একটা অংশ তাকে দেখিয়ে রানা বললো, 'এখানে।'

বাতাসের গতি, ইত্যাদি চেক করে সোহানা বললো, 'কিছু না, পঁচিশ মিনিটের পথ।'

মিরাণ্ডা, একজন স্কুল মিসট্রেস—ভাবছে রানা—বিদ্রোহী গেরিলাদের সাথে নিশ্চয়ই তার যোগাযোগ আছে। চিতা যখন শিকার করে, অন্ধকারেই করে, এই কথাটার মানে কি? উমাঙ্গোর হায়েনা মানে? ম্যাটাবেল কয়েদীদের যারা পাহারা দিয়ে রেখেছে,

ম্যাশোনারা ?

প্রথমে জেনারেল টস মাজুলেট, তারপর মিরাণ্ডা, দু জনেই চাইছে জিম্বাবুই থেকে চলে যাক ও। কিন্তু কেন ?

'এটাই শিজারিরা নদী,' বললো সোহানা। বাঁক নিতে শুরু করে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো সেসনা। নদীর পাড় ধরে উড়ে গেল প্লেন, বনভূমি এদিকে খুব গভীর হলেও দু'একটা বুনো প্রাণীকে ছুটে পালাতে দেখলো ওরা। এক পাল শিংওয়ালা হরিণকে তাড়া করলো সোহানা। পাহাড়ের ঢালে একটা কালো গণ্ডার দেখা গেল, সাথে একটা বাচ্চা। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো সোহানা, 'দেখো, ওদিকে দেখো!' কিছু না, সবুজ ঘাস মোড়া একটা মাঠ দেখতে পেয়েছে সে। মাঠে এক পাল জেব্রা চরছে। 'প্লেন আমি ওখানে অনায়াসে ল্যাণ্ড করাতে পারি।' বলে কারো অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো সে।

মাঠের ওপর দিয়ে চারবার উড়ে গেল সোহানা, প্রতিবার আরো নিচে দিয়ে। জেব্রাগুলোর পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা। 'একেবারে সমতল, মাটিও শক্ত,' বললো সোহানা। পাঁচ বারের বার ল্যাণ্ড করলো সে, দেড়শো গজের মতো ছুটে দাঁড়িয়ে পড়লো সেসনা।

'বার্ড লেডি,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো জেনারেল।

মাঠ পেরিয়ে সবুজ পাঁচিলের দিকে এগোলো ওরা। একটা গেইম ট্রেইল ধরে জঙ্গলে ঢুকলো। ট্রেইলটা অনেক লম্বা, শেষ মাথায় নদীর ওপর একটা ঝুলে থাকা পাথর।

পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো ওরা। সাদা বালি

মোড়া নদীর পাড়, সরীসৃপের খুলির মতো চকচকে পানিতে ধোয়া পাথর। নদীর ওপর নুয়ে পড়া ডালে পাখির বাসা, স্বচ্ছ সবুজ নদীর পানিতে ঝাঁক বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙিন মাছ, পাড়ের প্রতিটি গাছের শিকড় পাথরের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে নেমে গেছে পানিতে, নদীর ওপারে আবার জঙ্গল।

'অপূর্ব!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলো সোহানা। ক্যামেরা নিয়ে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে সে।

'এখানেও তোমার একটা ক্যাম্প হতে পারে,' জেনারেল উমাঙ্গো বললো, আঙুল দিয়ে ওদের নিচে হাতির পায়ের দাগ দেখালো রানাকে। 'কনসরটিয়াম খুব কম দামই চেয়েছে। বছরে তুমি এখান থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারবে, রানা।'

'বাদ দাও,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

'পাগল নাকি!' বিস্মিত দেখালো জেনারেলকে। 'এই জায়গা কেউ হাতছাড়া করে!' এক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলো সে, তারপর আবার বললো, 'শোনো, রানা। ব্যাংক গ্যারান্টি দরকার তোমার, এই তো? যাও, সে ব্যবস্থা আমি করবো।' আড়ষ্ট একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'কিন্তু কমিশন হিসেবে কোম্পানীর খানিকটা শেয়ার কিন্তু আমাকে দিতে হবে।'

হতাশার মধ্যে আলোর একটু আভাস পেলো রানা। তাড়াতাড়ি বললো, 'ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারো, তাহলে তো সেটা তোমার পাওনাই হবে।'

ছবি তোলা শেষ করে সোহানা বললো, 'হারারে আড়াই ঘণ্টার পথ, চলো, রওনা হওয়া যাক।'

নিউ সারাম এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছে ওদের দু'জনের সাথে করমর্দন করলো জেনারেল উমাঙ্গো। সোহানাকে বললো, 'আশা করি আপনার ছবিগুলো ভালো উঠেছে।' তারপর রানার দিকে ফিরলো। 'তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবো তোমার সাথে।' একটা আর্মি জীপ অপেক্ষা করছিল, তাতে উঠে চলে গেল সে।

গভর্ণমেণ্ট হাউসের উল্টো দিকে একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করেছে সোহানা. ফোক্সওয়াগেন থামাতে বললো সে। রানার হাতে হাত রেখে চাপ দিলো একটু, তারপর নেমে পড়লো। 'প্লেন নিয়ে হাইল্যাণ্ডে যাচ্ছি আমি,' বললো সে, 'কাল খুব ভোরে। কবে ফিরবো জানি না। ফিরে এসে হিলটনে খবর নেবো আমি, কেমন?'

সোহানা ওকে অ্যাপার্টমেণ্টে যেতে বললো না দেখে একটু অবাক হলো রানা। জানতে চাইলো, 'তোমার ধারণা, কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে?'

'বিচিত্র কি।'

'হুম! সাবধানে থেকো,' বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

হোটেলে ঢোকার মুখে রানার সামনে দাঁড়ালো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। লোকটাকে হাত কচলাতে দেখে রানা আন্দাজ করলো, দুঃসংবাদ আছে। লোকটা ওকে নিজের অফিসে নিয়ে এসে সবিনয়ে বললো, 'মিঃ রানা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে লোক এসেছিল, ওরা আপনার কামরা সার্চ করেছে। আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু ওরা আমার '

'আমার কামরা সার্চ করেছে? কোন্ অধিকারে?'

'অধিকারের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই,' বললো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট

ম্যানেজার। 'ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। আমি, স্যার…'

তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় উঠে এসে নিজের জিনিস-পত্র চেক করলো রানা। ট্রাভেলার্স চেকগুলো গুণলো ও, ঠিকই আছে। প্লেনের রিটার্ণ টিকিটও নিয়ে যায়নি। না, কিছুই নেয়নি ওরা।

'এ-ধরনের সার্চ কার হুকুমে করা হয়, সাধারণত?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই এসেছিল, তারমানে খুবই ওপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়ে…'

টস মাজুলেট, মনে মনে বললো রানা, শালা সত্যি তুমি বদলে গেছো তাহলে।

পরদিন টুটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ওপর একটা রিপোর্ট লিখে ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে পৌঁছে দিলো রানা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনার জন্যে সরকারী অনুমতি চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটা আবেদন-পত্র জমা দিলো ও। তারপর কয়েকদিন হোটেল ছেড়ে বড় একটা বেরুলো না, বই লেখার কাজে ব্যস্ত রাখলো নিজেকে। শুধু সন্ধ্যের দিকে সোহানার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে একবার করে ঘুরে এলো, কিন্তু জানালা বন্ধ দেখে মন খারাপ করে ফিরতে হলো ওকে।

জেনারেল উমাঙ্গো তার কথা রাখেনি, তিন দিন পেরিয়ে গেল, অথচ কোনো যোগাযোগ করেনি সে। কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলো রানা। জেনারেল টস মাজুলেট তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে, নিজের প্রভাব খাটিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া রানার আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করাতে সফল হয়েছে সে। কৃষি মন্ত্রী জেনারেল

উমাঙ্গোর ভগ্নীপতি হোক আর যাই হোক, সুবিধে করতে পারেনি সে। জেনারেল মাজুলেট যেখানে জড়িত, সুবিধে করতে পারার কথাও নয়। মাজুলেট মন্ত্রীসভায় একমাত্র ম্যাটাবেল সদস্য হলেও, তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস বা স্পর্ধা কারো নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অবিশ্বাস্য বীরত্ব দেখিয়ে এই লোক খ্যাতির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, দেশের মানুষ তাকে পুজো করতে শুরু করে

এই ক'দিন বার কয়েক ফোন করেছে মন্টিপিলার, ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রানাকে। প্রতিবার এড়িয়ে গেছে রানা। চারদিনের দিন, হঠাৎ করে জেনারেল উমাঙ্গোর ফোন এলো। 'রানা, আজ বিকেলে আমার সাথে দেখা করতে পারো? তিনটের সময়? ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে আসবে।'

বাড়িটা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে একটা পাহাড়ের ওপর, নিচের শান্ত লেকে গোটা বাড়ির প্রতিবিম্ব স্থির হয়ে আছে। থার্ড ব্রিগেডের পুরোদস্তুর ব্যাটল-ড্রেস পরা একজন বডিগার্ড গেটে দাঁড় করিয়ে রানা আর ড্রাইভারকে তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো। পথ দেখিয়ে বাড়ির সামনের অংশে নিয়ে আসা হলো ওকে। ধাপ বেয়ে উঠছে ও, দেখলো সিঁড়ির মাথায় ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল উমাঙ্গো। তার মুখে সাফল্যের হাসি, রানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সামনের একটা কামরায় ঢুকলো সে। দামী সোফায় অপরিচিত কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখলো রানা।

'রানা, এসো, তোমার সাথে ভদ্রলোকদের পরিচয় করিয়ে দিই,' বললো জেনারেল। 'মিঃ নেবুবি, ল্যাণ্ড ব্যাংক অভ জিম্বাবুয়ের গভর্ণর। ইনি মিঃ হিকলি, গভর্ণরের অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর ইনি আমার অ্যাটর্ণি, মিঃ রামগোপাল। জেন্টেলমেন, ইন মিঃ মাসুদ রানা,

প্রখ্যাত সাংবাদিক।'

সবার সাথে করমর্দন করলো রানা। 'ড্রিঙ্ক, রানা?' জানতে চাইলো জেনারেল। 'আমরা সবাই স্কচ হুইস্কি খাচ্ছি।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা।

'তাহলে কফি, কেমন?' জেনারেলের ইঙ্গিতে একজন উর্দি পরা বেয়ারা কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সাথে সাথেই কফি নিয়ে এলো। রানার পাশের সোফায় বসলো জেনারেল। একটা চুরুট ধরালো সে, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'প্রথম খবর, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্বিতীয় খবর, বিশ্ব ব্যাংক তোমাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ধার দেয়ার জন্যে যতো বড় অংকের ব্যাংক গ্যারান্টি দাবি করুক, ল্যাণ্ড ব্যাংক অভ জিম্বাবুই তা দিতে রাজি হয়েছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'তোমার সাথে বিশ্ব ব্যাংকের সম্পর্ক গোপন কোনো ব্যাপার নয়, রানা,' আবার বললো জেনারেল। 'জাসটিন চ্যাপেলকে আমরা ভালো করে চিনি।' হাসলো সে। 'অবশ্যই, ব্যাংক গ্যারান্টি পাবার জন্যে কিছু শর্ত থাকবে, কিন্তু সেগুলো ফরমালিটিজ মাত্র।' অ্যাটর্নি রামগোপালের দিকে ফিরলো সে। 'গোপাল, কাগজ-পত্র সব তৈরি তো? মিঃ রানাকে একটা কপি দাও, তারপর সব আমাদের পড়ে শোনাও একবার।'

রামগোপাল তার বাই ফোকাল চশমা ভালো করে নাকে বসিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, 'এটা একটা ল্যাণ্ড পারচেজ অ্যাপ্রুভ্যাল। অথরিটি ফর মাসুদ রানা, এ বাংলাদেশী সাবজেক্ট...।'

একটা শেষ করে আরেকটা ডকুমেন্ট পড়ছে রামগোপাল, সবই

গৎ বাঁধা, সেদিকে তেমন খেয়াল নেই রানার। রুবেনসনের স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে দেখে ভারি খুশি সে। মনে মনে বললো, টস মাজুলেট, তুমি হেরে গেছো।

এতো উত্তেজনার মধ্যেও হঠাৎ একটা কথা কানে আসতে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। 'তারমানে? এনিমি অভ দি স্টেট অ্যাণ্ড দি পিপল অভ জিম্বাবুই, এ-সব কি?'

'আমাদের সমস্ত ডকুমেণ্টে থাকে এটা,' রামগোপাল আশ্বস্ত করলো ওকে। 'একটা গৎ আর কি। ল্যাণ্ড ব্যাংক একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান, খাতক যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে, কিংবা তাকে যদি রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়, ল্যাণ্ড ব্যাংক তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।'

'সেটা কি লিগ্যাল?' সন্দিহান দেখালো রানাকে। এ-ব্যাপারেও অ্যাটর্ণি ওকে আশ্বস্ত করলো। এবার রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক কি এই শর্তের ওপর লোন দিতে রাজি হবে?'

'ওদের সাথে আরো লোকের আরো অনেক চুক্তি হয়েছে, সবগুলোতে এই শর্ত ছিলো,' ব্যাংকের গভর্ণর বললেন। 'ওরাও জানে এটা একটা ফরমালিটি মাত্র।'

'আহা, রানা,' হাসতে হাসতে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, 'তুমি তো আর সরকার উৎখাতের জন্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছো না।'

জোর করে একটু হেসে রানা বললো, 'ঠিক আছে। বিশ্ব ব্যাংক যদি আপত্তি না তোলে, আমারও কিছু বলার নেই।'

পড়া শেষ হতে এক ঘণ্টার মতো লাগলো। একে একে সবগুলো কপিতে সই করলেন গভর্ণর নেবুবি, তাঁকে সই করতে দেখার সাক্ষী

হিসেবে জেনারেল উমাঙ্গো আর তার অ্যাটর্নিও সই করলো। এর-পর রানার, আর রানাকে যারা সই করতে দেখলো তাদের পালা। সবশেষে প্রত্যেকে আবার শপথনামায় সই করলো।

'শুভ কাজ সম্পন্ন হলো—সাইনড, সীলড, অ্যাণ্ড ডেলিভারড,' বললো রামগোপাল।

'তোমাকে বলেছি, রানা?' মিটি মিটি হাসি দেখা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর মুখে। 'গভর্ণর নেবুবি চ্যাপেলের সাথে কাল নিউইয়র্ক সময় দশটায় কথা বলেছেন। ব্যাংক গ্যারান্টি তাঁর হাতে পৌঁছুবার সাথে সাথে তোমার নামে টাকা বরাদ্দ করা হবে।'

আরেক দফা হুইস্কি খাওয়ার পর বিদায় নিলেন গভর্ণর নেবুবি। সহকারীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে যাবার পর জেনারেল উমাঙ্গো রানাকে বললো, 'এবার আমার ফি নিয়ে আলোচনা হবে। রাম-গোপাল কাগজ-পত্র সব তৈরি করে রেখেছে।'

কাগজগুলো পড়তে পড়তে রানার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'পঁচিশ পার্সেন্ট!' অবিশ্বাসের সাথে বললো ও। 'সাউল ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার!'

'নামটা নিশ্চই তুমি বদলাতে চাইবে, রানা?' রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি জেনারেল। হঠাৎ ভুরু কোঁচকালো সে। 'আরেকটা কথা, আমার নমিনি হিসেবে রামগোপাল শেয়ারগুলো হোল্ড করবে। আমি একজন সরকারী কর্মচারী, বোঝোই তো, আমার নামে প্রকাশ্যে সম্পত্তি থাকলে পরে নানান কথা উঠতে পারে।'

চুক্তিপত্রটা আবার পড়ার ভান করলো রানা, কিভাবে আপত্তি জানাবে ভাবছে। ওরা দু'জন নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে ওকে। পঁচিশ পার্সেন্ট মানে স্রেফ ডাকাতি, কিন্তু এ-ছাড়া রানার উপায়ই বা কি?

ধীরে ধীরে কলমের ক্যাপ খুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো রাম-গোপাল। 'জেনারেল উমাঙ্গো স্লিপিং পার্টনার হিসেবে থাকছেন,' শান্তস্বরে বললো সে। 'একজন জেনারেলকে পার্টনার হিসেবে পেলে আপনার এই ব্যবসা দিনে দিনে ফেঁপে উঠবে, মিঃ রানা।'

'কপি এই একটাই,' হাসতে হাসতে বললো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমার কাছে থাকবে।' মাথা ঝাঁকালো রানা।

তারমানে উমাঙ্গোর কাছেই শুধু প্রমাণ থাকবে। কিছু এসে যায় না। এই র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী মিঃ রুবেনসনের দরকার। তিনি জানিয়ে গেছেন, কাউকে অর্ধেক শেয়ার দিতে হলেও তাঁর আপত্তি নেই। রামগোপালের হাত থেকে কলমটা নিয়ে সই করে দিলো রানা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস চাপলো জেনারেল।

'ডিক্রু, কংগ্রাচুলেশন্স! এই মাত্র পঁচিশ হাজার ডলার কমিশন পেয়েছো তুমি!'

কালিচরণ ডিক্রু হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। 'তারমানে কনসরটিয়ামের অফার আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন।'

'অবশ্যই।' ডিক্রুর বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রানা। একটা ট্যাক্সি নিলো, হোটেলে ফিরবে। ফিরবে সোহানার হোটেলের সামনে দিয়ে।

জানালা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। ড্রাইভারের কাঁধে টোকার বদলে রীতিমতো থাবড়া মেরে বসলো রানা। ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সি থামিয়ে দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করলো ড্রাইভার, কিন্তু পেলো তারও বেশি।

'কে?' সোহানার গলা অস্পষ্ট শোনালো।

'আমি, রানা।'

'দরজা খোলা আছে।'

ভেতরে ঢুকে ঘরে কাউকে দেখলো না রানা। 'একটা সুখবর আছে।'

ডার্করুম থেকে জবাব দিলো সোহানা, 'পাঁচ মিনিট সবুর করো। কফি বানাতে ভুলে যাওনি তো?'

সাত মিনিট পর বেরুলো সোহানা। নরম, মোটা সুতো দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে বোনা একটা জার্সি আর শর্টস পরে আছে, মাথার চুল আলগা হয়ে রয়েছে কাঁধের ওপর। ঠোঁটের ওপর-নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রানার চোখে পলক পড়ছে না টের পেয়ে লালচে হয়ে উঠলো চেহারা। 'সুখবর কিনা জানি না, তবে তোমাকেও আমার একটা খবর দেয়ার আছে। আগে তোমারটা শোনা যাক।'

'মিঃ রুবেনসনের কপাল ভালো,' সোহানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললো রানা, 'সাউল র‍্যাঞ্চিং কিনতে পারবো।'

রানা শান্তভাবে কথা বললেও, ওর চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা টের পেলো সোহানা। 'সব খুলে বলো দেখি।'

'আর কোনো বাধা নেই,' বললো রানা। 'কেনার অনুমতি পেয়েছি, ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা হয়েছে...'

'আচ্ছা!' রানার খুশিতে খুশি হয়ে উঠলো সোহানা। মেয়েটার প্রতি রানার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা উপলব্ধি করে রানার প্রতি তার আকর্ষণ যেন বেড়ে গেল। 'সত্যি, দারুণ একটা খবর। এখন এই সম্পত্তি নিয়ে তুমি কি করতে চাও বলো দেখি।'

দক্ষিণের র‍্যাঞ্চ দুটো, আর শিজারিরা এস্টেটের টুরিস্ট'স স্পট কিভাবে তৈরি করা হবে, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো রানা। মাঝপথে

ওকে থামিয়ে দিয়ে সোহানা বললো, 'কিন্তু আমার ভাই একটা কথা আছে। যাই করো, আমাকে জিজ্ঞেস না করে করতে পারবে না।'

কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'সত্যি তুমি ইন্টারেস্টেড? আমি র্যাঞ্চ দুটোকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছি...' তাড়াহুড়ো করে কাপে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেললো।

'ভেরি গুড।'

'কিন্তু তোমার সময় হবে কি...'

'সময় করে নেবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়,' বললো রানা। 'আপাততঃ মাঝে মধ্যে এসে কাজগুলো তুমি তদারক করে গেলেই হবে। ট্যুরিস্ট'স স্পট তৈরি হয়ে যাবার পর অবশ্য তোমার দায়িত্ব অনেক বাড়বে। ট্যুরিস্টদের জন্যে তোমার তোলা ছবিগুলো বিরাট একটা আকর্ষণ হতে পারে...'

সোহানা বাধা দিয়ে বললো, 'দেখো না, এমন চমৎকার প্ল্যান করবো, সবাই তাজ্জব বনে যাবে।'

কফির কাপটা নামিয়ে রাখলো রানা। 'খবর আছে বললে না? শোনাও এবার।'

'মাস্টার পোচার কে তার একটা আভাস পেয়েছি।'

'মাই গড।' রানার শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'কয়েক শো হাতিকে যে লোক মাইন ফিল্ডে নিয়ে গিয়ে মারলো? এটা একটা খবর বটে। কোথায়? কিভাবে?'

ছোট্ট একটা গল্প শোনালো সোহানা। ইস্টার্ণ হাইল্যাণ্ডের বিশাল

বনভূমি জুড়ে যতো চিতা আছে, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ওগুলোর ওপর একটা ফটো ফিচার তৈরি করছে সে। চিতা-দের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে স্থানীয় লোকদের লাগিয়ে দিয়েছে, তারা নিয়মিত রিপোর্ট করে। এদের মধ্যে এক বুড়ো নির্জন পাহাড়ী ক্যাম্পে সোহানার সাথে দেখা করতে আসে। আশির ওপর বয়স, তার অষ্টাদশী ছোটো বউ সদ্য এক জোড়া পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে। বুড়ো নিজে এককালে পোচার ছিলো। শ্যাম্পেনের ভারি ভক্ত, একটা বোতলের জন্যে দু'চারটে বউ বিক্রি করে দিতে পারে। সোহানার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দু'ঢোক গিলেই বক বক করতে শুরু করে বুড়ো। এক লোক তাকে নাকি প্রস্তাব দিয়েছে, চিতার একটা ছালের জন্যে দুশো ডলার পেতে পারে সে। বুড়ো ভয় পেয়ে বলে, এ-কাজ করলে জেলে ভরা হবে তাকে। কিন্তু লোকটা তাকে আশ্বাস দেয়, ছাল কিনবে মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, প্রাক্তন মুক্তি-যোদ্ধা, বড়সড় একটা প্রাইভেট আর্মিও আছে তার। কাজেই বুড়োর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

দেরাজ খুলে একটা কার্ডবোর্ড ফোল্ডার বের করলো সোহানা, রানার কোলের ওপর ফেলে বললো, 'দেখো।'

ফোল্ডার খুলে দুটো কাগজ বের করলো রানা। প্রথম কাগজে জিম্বাবুই মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যের নাম লেখা রয়েছে। ছাব্বিশটা নাম, প্রতিটি নামের সাথে পোর্টফোলিও উল্লেখ করা আছে।

'তালিকা এখুনি আমরা ছোটো করে আনতে পারি,' বললো সোহানা। 'ক্যাবিনেটের সবাই সত্যিকার যুদ্ধে ছিলেন না। বেশির ভাগই লণ্ডনের রিজ হোটেলে মেয়ে-মদ নিয়ে ফুর্তি করেছেন। রানার চেয়ারের হাতলে বসলো সে। দ্বিতীয় কাগজটা নিয়ে চোখ

বুলালো। 'এতে রয়েছে ছ'জনের নাম। এই ছ'জন যুদ্ধে ছিলেন, প্রত্যেকে এক একজন ফিল্ড কমাণ্ডার।'

'আরো ছোটো করতে হবে তালিকা,' বিড়বিড় করে বললো রানা। দেখলো, তালিকার সবচেয়ে ওপরে রয়েছে জেনারেল উমাঙ্গোর নাম।

'করা হয়েছেও,' বললো সোহানা। 'প্রাইভেট আর্মি—তারমানে নিশ্চয়ই বিদ্রোহী গেরিলারা। ওরা সবাই ম্যাটাবেল। কাজেই তাদের লিডারও একজন ম্যাটাবেলই হবে।' দ্বিতীয় কাগজটা উল্টো করে রানার সামনে ধরলো সে। উল্টো পিঠে একটা মাত্র নাম লেখা রয়েছে। 'স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন ভদ্রলোক। একজন ম্যাটাবেল। ট্যুরইজম, আর ওয়াইল্ড লাইফ মিনিস্টার। কথায় বলে না, রক্ষকই ভক্ষক, এ যেন ঠিক তাই।'

বিড়বিড় করে নামটা পড়লো রানা। 'টস মাজুলেট।' এই অভি-যোগ সত্যি হোক চাইছে না ও। 'কিন্তু সোহানা, মাস্টার পোচার কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে। এতো টাকা মাজুলেট করছে কি? সবাই জানে, অত্যন্ত সাধারণভাবে চলাফেরা করে সে। নিজের বাড়ি নেই, দামী গাড়ি নেই, জমিজমা পর্যন্ত কেনেনি।'

'হয়তো সবচেয়ে দামী জিনিসটা দরকার তার—পাওয়ার। বুঝতে পারছো না, রানা? প্রাইভেট একটা আর্মি পোষা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগে।'

ধীরে ধীরে ঝাপসা একটা নকশা পরিষ্কার ফুটে উঠলো। জাসটিন চ্যাপেল আভাস দিয়ে ওকে বলেছেন, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ব্লকের সমর্থন নিয়ে এখানে কেউ কু করার চেষ্টা করতে পারে। যুদ্ধের সময় ম্যাটাবেল জেড-আই-পি-আর-এ শাখা কম্যুনিস্ট-ব্লকের সহায়তা

পেয়েছিল। তাদের ক্যানডিডেট একজন ম্যাটাবেলই হবে।

টস মাজুলেটই কি সেই ক্যানডিডেট? বিশ্বাস করতে মন চাইলো না। মাজুলেট এক সময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো বলে নয়, রানা তাকে ভালো করে চেনে বলে। এই লোকের চরিত্রে কোনো কালিমা ছিলো না। অসৎভাবে, বা ষড়যন্ত্র করে কিছু অর্জন করার প্রকৃতি নয় তার। আবার, এ-কথাও সত্যি, মানুষ বদলায়। সত্যিই কি মাজুলেট এতোটা বদলে গেছে? ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে সে? 'সে আমার বন্ধু,' বললো ও।

'ছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, চেয়ার ছেড়ে অস্থির ভাবে পায়চারী শুরু করলো। মনে পড়লো, ওপর মহলের কারো নির্দেশে ওর হোটেল কামরা সার্চ করা হয়েছে। মাজুলেট নিশ্চই খবর রাখে, বিশ্ব ব্যাং-কের একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে ও। কু এবং পোচিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে ও, এটাও সে আন্দাজ করে নেবে।'হতে পারে,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু হতে পারে সে-ই হয়তো এই পোচিঙের হোতা।'

'সে-ই, আমি জানি।'

'এখন কি করতে চাও তুমি?' পায়চারী থামিয়ে জানতে চাইলো রানা।

'আমার হাতে কিছু প্রমাণও আছে, সেগুলো আমি জেনারেল উমাঙ্গোর হাতে তুলে দিতে চাই।'

মনে মনে আঁতকে উঠলো রানা। 'মাজুলেট ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'লোকটা বর্বর, রানা। নির্দয় একটা পশু।'

'ওহ্, গড, আই হেট ইট।'

চেয়ারের হাতল থেকে উঠে রানার সামনে দাঁড়ালো সোহানা, ওর একটা হাত ধরলো। 'তুমিও চলো আমার সাথে। শুনি জেনারেল উমাঙ্গো কি বলেন।'

বিমর্ষ চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকলো রানা।

'আমি দুঃখিত, রানা,' বললো সোহানা। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমরা এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছি। দেরি করলে আমরা হয়তো অনেক নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে পারবো না। জেনারেল মাজুলেটের নির্দেশে ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা যদি ম্যাশোনা গ্রামগুলোয় হামলা চালায়, কতো লোক মারা যাবে ভেবে দেখেছো?'

রানা ভাবলো, বস কি এই আশংকার কথাই বলেছিলেন? ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের হাতে ম্যাশোনা উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? চোখ বুজে মাজুলেটের চেহারাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করলো ও, বিড়বিড় করে বললো, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, দেরি করা উচিত হবে না।'

পরদিন খুব সকালে ওদেরকে সময় দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। একজন ম্যাশোনা সৈনিক ওদেরকে পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলো, অফিসে বসতে দেয়া হলো ওদেরকে। খানিক পর প্রকাণ্ড ধড় নিয়ে ভেতরে ঢুকলো জেনারেল, কোমরে ছোট্ট একটা আণ্ডারওয়্যার ছাড়া সারা শরীর উদোম। হাঁটার সাথে তার শরীরের পেশীগুলো জ্যান্ত সাপের মতো কিলবিল করছে। 'তোমরা আবার কিছু মনে করো না,' হাসতে হাসতে বললো সে, 'বাড়িতে একা যখন থাকি, পুরোপুরি আফ্রিকান হয়ে যাই আমি।' চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। 'তোমাদের সাথে আড্ডা মারতে পারলে

মন্দ হতো না, কিন্তু ঠিক দশটায় পার্লামেন্ট মিটিং…'

'তাহলে দেরি না করে বলেই ফেলি,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে শুরু করলো সোহানা। 'আমার বিশ্বাস, মাস্টার পোচার কে জানতে পেরেছি আমি।'

ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিলো জেনারেল, থমকে গেল সে। ডেস্কের ওপর হাত দুটো রেখে সোহানার দিকে ঝুঁকলো। অস্বাভাবিক কঠোর হয়ে উঠেছে চেহারা।

'আপনি আমাকে বলেছেন, তার নামটা শুধু বলবো আমি, আপনি তাকে ধ্বংস করবেন,' সোহানা মনে করিয়ে দিলো।

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'হ্যাঁ, মনে আছে। বলুন। নামটা আমি শুনতে চাই।'

তার আগে কিভাবে সূত্র পেলো সেটা ব্যাখ্যা করলো সোহানা। গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর প্রতিটি শব্দ শুনলো জেনারেল। এখনো সে দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো কপালে। সবশেষে সোহানা তাকে শেষ তালিকাটা দিলো, যাতে শুধু একজনের নাম লেখা আছে।

'জেনারেল টস মাজুলেট,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো উমাঙ্গো। 'মাই গড!' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো সে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। এক সময় ডেস্ক থেকে স্টিকটা তুলে নিলো জেনারেল। ডান হাতের তালুতে ছোটো ছোটো বাড়ি মারছে, আর তাকিয়ে আছে সোহানার মাথার ওপর দিয়ে ম্যাপ ঢাকা দেয়ালের দিকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো সোহানা, 'জেনারেল?'

চোখ নামিয়ে সোহানার দিকে তাকালো উমাঙ্গো। 'আগুন থেকে

সবচেয়ে গরম কয়লাটা তুলতে বলছেন আপনি আমাকে। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই তো? জেনারেল মাজুলেট রানার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, সেটা আপনাকে প্রভাবিত করেনি তো?'

'ওটা কোনো ব্যাপারই নয়,' মৃদু কণ্ঠে বললো সোহানা।

রানার দিকে তাকালো জেনারেল। 'তুমি কি ভাবছো, রানা?'

খানিক ইতস্তত করে রানা বললো, 'সে আমার বন্ধু। বিপদে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করেছি।'

'সেটা অতীতের ঘটনা,' বললো জেনারেল। 'সে নিজেকে তোমার শত্রু বলে ঘোষণা করেছে।'

'তবু তাকে আমি পছন্দ করি, তাকে আমার ভালো লাগে।'

'অথচ—?'

'অথচ আমার বিশ্বাস সোহানা ঠিক সূত্র ধরেই এগোচ্ছে,' ম্লান গলায় বললো রানা।

চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল জেনারেল, ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো। 'গোটা দেশ বারুদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে,' রঙিন পতাকাগুলোর দিকে চোখ রেখে বললো সে। 'গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি বিদ্রোহ করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখানে। এখানে। এখানে। ওদের গেরিলারা জড়ো হয়েছে জঙ্গলে।' ম্যাপের কয়েক জায়গায় স্টিক দিয়ে টোকা দিলো সে। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন ম্যাটাবেল নেতাদের জেলে ভরেও কোনো লাভ হয়নি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করছিল ওরা। নকোমোকে জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, অপর দু'জন ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। মন্ত্রীসভায় ম্যাটাবেল সদস্য এখন এই একজনই, টস মাজুলেট।'

'তাতে কি··'

সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল উমাঙ্গো বললো, 'জেনারেল মাজুলেটকে শ্রদ্ধা করে না এমন লোক এ-দেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন কি ম্যাশোনাদের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। সন্দেহ নেই, ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা তাকেই তাদের একমাত্র নেতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। এই অবস্থায় আমরা যদি তার গায়ে হাত দিই···'

'লোকটা অপরাধী, জেনেও তাকে আপনারা ছেড়ে দেবেন?' তিক্ত সুরে জানতে চাইলো সোহানা।

'থামুন!' প্রায় ধমকে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসলো সে। 'আমি আসলে বলতে চাইছি, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে তার পরিণতি ভালো নাও হতে পারে। এখনই যদি জেনারেল মাজুলেটকে গ্রেফতার করা হয়, গোটা দেশকে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।'

'তাহলে?'

'আমি কোনো অ্যাকশন নেবো না, তা নয়। তবে, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু করতে রাজি নই।' এখনো দেয়াল জোড়া ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'প্রমাণ চাই, নিরপেক্ষ সাক্ষী চাই। কারণ, তা না হলে, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস বলবে সংখ্যা লঘু ম্যাটাবেলদের ওপর আমরা অত্যাচার চালাচ্ছি। এ-ধরনের অভিযোগ এরই মধ্যে তোলা হয়েছে। জেনারেল মাজুলেটই এখন বিদ্রোহীদের সমস্ত প্রেরণা আর শক্তির একমাত্র উৎস, তাকে আমরা হালকাভাবে নিতে পারি না।'

'আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি,' বললো সোহানা। 'আমি

আর রানা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। জেনারেল মাজু-লেটই যদি পোচার হয়, এতো টাকা কিসে খরচ করছে সে? আমাদের ধারণা, তার এই টাকা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমরা জানি, বিদ্রোহীদের সাথে তার একটা সম্পর্ক থাকা…'

কঠোর হয়ে উঠলো জেনারেলের চেহারা, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। 'সে যদি মাজুলেট হয়, ফেড়ে আমি তার রক্ত খাবো। কিন্তু তার আগে প্রমাণ যোগাড় করবো আমি, হাত ফস্কে যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে।'

'কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আপনাকে,' তীক্ষ্ণ সুরে জেনারেলকে সাবধান করে দিলো সোহানা। 'দেরি করলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।'

পাঁচ

নিউইয়র্কের সেরা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ পিনটা'স-এর অ্যালকোভ কেবিনে ঢুকলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথা ভর্তি এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল হলদেটে কপাল প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। পিছু ঢুকলো এক তরুণ, লম্বা সুদর্শন।

বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক আর হুইস্কির অর্ডার দিলেন প্রৌঢ়, তারপর যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, জেনারেল উমাঙ্গো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হলো।'

'সেকি! আমার রিপোর্টে সবই তো আছে, আপনি পড়েননি?'

'পড়েছি,' বললেন জাসটিন চ্যাপেল, 'তবু আপনার মুখ থেকে কিছু কিছু শুনতে চাই। আলাপের মধ্যে থেকে অনেক সময় এমন কিছু বেরিয়ে আসে, যা রিপোর্টে পাওয়া যায় না।'

'অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রলোক, চমৎকার ইংরেজী বলেন। ইউনিফর্ম পরলে ব্রিটিশ আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বলে মনে হয়। সাধারণ কাপড়ে মনে হয় কোনো টিভি সিরিজের তুখোড় নায়ক। শুধু আণ্ডারঅয়্যার পরা অবস্থায় বেরিয়ে আসে তার আসল চেহারা —একজন আফ্রিকান।'

'এই তো!' উৎসাহ দিয়ে বললেন জাসটিন চ্যাপেল। 'আপনার রিপোর্টে এই কথাগুলো নেই। বলে যান, বলে যান।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বললো রানা।

এরপর চ্যাপেল জানতে চাইলেন, 'ম্যাটাবেল, নডেবেল, আর সিনডেবেল, আমার কাছে খুব জটিল মনে হয়, একটু ব্যাখ্যা করবেন?'

'একজন ম্যাটাবেল নিজেকে নডেবেল বলে, কিন্তু আমরা তাকে ম্যাটাবেল বলি।'

'আচ্ছা, বুঝেছি। আর ম্যাটাবেলরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা সিনডেবেল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে চ্যাপেল বললেন, 'বিশ্ব ব্যাংকের ফিল্ড

এজেন্ট হিসেবে আপনি সত্যি ভালই কাজ দেখিয়েছেন। ওখানে আবার ফিরছেন কবে?'

'আমি শুধু একটা চেক নিতে এসেছি,' বললো রানা। 'ওটা পেলেই...'

বেয়ারা এসে ওদেরকে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করলো। মিটি মিটি হাসছেন চ্যাপেল। বেয়ারা চলে যেতে তিনি বললেন, 'লোনের জন্যে আপনি সরাসরি আবেদন করায় আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সে যাক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করা গেছে, সেজন্যে আমি খুশি। আমাদের হাউজ লইয়ার অপেক্ষা করছে, এখান থেকে সরাসরি সেখানেই যাবো আমরা। সই করে আপনি আপনার দেহ-মন-আত্মা সব বন্ধক রেখে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চেকটা নিয়ে যাবেন। এবার মাস্টার পোচার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'তালিকায় একজনই রয়েছে,' বললো রানা। 'বিকল্প আর কারো নাম এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। জেনারেল মাজুলেট সম্ভবত বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যেই এ-পথে পা বাড়িয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চ্যাপেল বললেন, 'জেনারেল উমাঙ্গো অ্যাকশন নিতে তেমন উৎসাহী নন, কারণটা কি?'

'অত্যন্ত যোগ্য লোক, আঁটঘাট না বেঁধে কোনো কাজে হাত দেয় না,' বললো রানা। 'প্রথমে নিখুঁত একটা পরিকল্পনা তৈরি করবে সে, তারপর জাল বিছাবে। অ্যাকশনে যখন নামবে, আমার বিশ্বাস, সবাইকে চমকে দেবে ও।'

'আমি চাই, মিঃ রানা, জেনারেল উমাঙ্গোকে সম্ভাব্য সব রকম-ভাবে সাহায্য করবেন আপনি।'

'আপনি জানেন মাজুলেট আমার বন্ধু।'

'ডিভাইডেড লয়ালটি ?'

'উঁহুঁ, সে অপরাধী হলে আমি তার পক্ষে থাকছি না।'

'গুড। ইতিমধ্যে আপনি যা খবর সংগ্রহ করেছেন, আমার বোর্ড তাতে ভারি খুশি।'

'দ্যাটস গুড,' খুশি মনে হাসলো রানা।

জুরিখ হয়ে জিম্বাবুইয়ে ফিরে এলো রানা। কালিচরণ ডিক্রুর কাছ থেকে সস্তায় তোবড়ানো, রঙ চটা একটা ল্যাণ্ড রোভার কিনলো ও, তাতে মাল-পত্তর ভরে রওনা হয়ে গেল কিং'স হেভেনের উদ্দেশে। তার আগে সুখবরটা দিয়ে মিঃ রুবেনসনকে একটা চিঠি লিখলো ও।

শেষ পাহাড়টা থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, চওড়া আকৃতির এক ম্যাটাবেল বৃদ্ধকে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে হাঁটতে দেখলো রানা। বুড়োর কোমরে নামকাওয়াস্তে ছোট্ট এক টুকরো পশুর চামড়া, কাঁধে তীর-ধনুক, হাতে একটা লাঠি। মুখে আর হাতে লাল, সবুজ, সাদা রঙের বিচিত্র সব নকশা। একটু ভালো করে নজর করতেই চিনতে পারলো ও, নিলির বাবা, কুয়াকোপা।

কুয়ার কাছে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করলো ও। বুড়ো কাছে আসতে তার হাতে এক প্যাকেট চুরুট আর এক বোতল মদ ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'রাজা মজিলিকাজির আত্মাকে বলবে, আমার জন্যে যেন দোয়া করে। কেমন আছো কুয়াকোপা, তোমাদের সব খবর ভালো তো ?'

'এহ হে, এহ্ হে!' আনন্দের আতিশয্যে নাচতে ইচ্ছে করলো বুড়োর। 'ভালো, সব ভালো।'

‘আচ্ছা,’ এটা সেটা নানা প্রসঙ্গে কথা বলার পর সাবধানে আসল কথাটা পাড়লো রানা, ‘বলো তো, কেউ যদি তোমার সব ছাগল কিনে নিতে চায়, তাকে কি বলবে তুমি?’

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো কুয়াকোপা। রানার মুখে কি যেন খুঁজলো সে। ‘বলবো, যাও বাছা, আগে কিং’স হেভেন কেনো, তারপর আমার ছাগল কিনতে এসো।’

‘বেশ, ধরো, কিং’স হেভেন কিনে তোমার কাছে ফিরে এলো সে, তখন তুমি কি করবে?’

গম্ভীর হয়ে গেল বুড়ো। ‘কথা যখন দিয়ে ফেলবো, তখন বিক্রি করতেই হবে।’

‘কতো দাম চাইবে তুমি?’

অনেকক্ষণ হিসেব করে একটা দাম বললো কুয়াকোপা। রানার বাজেটের চেয়ে কম দামই চাইলো বুড়ো। কিন্তু প্রস্তাবটা এখুনি গ্রহণ করলে কুয়াকোপা মনে করবে সে ঠকলো, আরো বেশি দাম চাইলেও হয়তো পেতো। তিন দিন ধরে দর কষাকষি করার পর প্রায় দু’হাজার ছাগল কিনে নিলো রানা। সেদিনই ট্রাকে তুলে বুলা-ওয়ায়ো কসাইখানায় পঠিয়ে দেয়া হলো। ছাগলগুলোর এই কেনা-বেচায় রানার পকেট থেকে প্রায় হাজার দশেক ডলার বেরিয়ে গেল। ‘এই যদি হয় ব্যবসার শুরু।’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে হাসলো রানা। নিলিকে পাঠালো তার বাপকে ডেকে আনার জন্যে।

শহর থেকে নিলির জন্যে খাটো স্কার্ট, আর ঢিলেঢালা ব্লাউজ নিয়ে এসেছে রানা। ওগুলো পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয় সে, কিন্তু পরতে বলায় প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। বাপের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে প্রথম দিনটা পালিয়ে পালিয়ে

বেড়ালো সে, পরদিন মেয়েকে ধরে নিয়ে এলো বুড়ো রানার কাছে। রানা বারবার অনুরোধ করার পর নিলি খুব নিচু গলায় জানালো, তার প্রেমিক শহরে চাকরি করে, ওর অনুমতি না পেলে পরপুরুষের দেয়া কাপড় সে পরতে পারে না। শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, ঠিক কথা। সেদিনই শহরে নিলির মনের মানুষকে খবর পাঠানো হলো। প্রেমিক প্রবর খবর পেয়েই ছুটে এলো। রানার সাথে বসে কফি খেলো সে, এক প্যাকেট চুরুট চেয়ে নিলো, তারপর শহরে ফেরার সময় নিলিকে ডেকে বলে গেল, কিং'স হেভেনের মালিক আমাদেরও মালিক, উনি আমাদের খারাপ চাইতে পারেন না। নিলিকে মালিকের সব কথা শুনতে হবে।

ঘরদোর দেখাশোনার দায়িত্ব নিলির হাতেই ছেড়ে দিয়েছে রানা। মেয়েটা খুব সরল। শুধু মেজাজ একটু কড়া। খেতে বসার জন্যে এক বারের জায়গায় দু'বার রানাকে ডাকতে হলে ভীষণ খেপে যায় নিলি, ঝড়ের বেগে ছুটে এসে কোমরে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায়, ভয়ই পেয়ে যায় রানা। তার সাথে বুঝেশুনে, নরম সুরে কথা বলতে হয় ওকে।

'বলো তো, কুয়াকোপা, গরু সম্পর্কে কি জানো তুমি?' বুড়োকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো রানা।

নিজের হাঁটুতে হাত রাখলো বুড়ো। 'আমি যখন এতোটুকু, তখ-নই পাহাড়ে গরুর পাল নিয়ে যেতাম। পালে বাঘ পড়লো, তখন আমি এতোটুকু,' নিজের কোমরে হাত রাখলো সে। তারপর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমার এই বয়সে পাঁচশো গরু ছাগল দেখা-শোনা করেছি, তার আগে বাঘ মেরেছি চারটে। মালিক, আপনি বরং জিজ্ঞেস করুন, গরু সম্পর্কে কি জানি না আমি। বাচ্চা

বিয়োতে পারি, রোগ সারাতে পারি…’

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, ‘কিং’স হেভেনে প্রচুর গরু আসছে। দেখাশোনার জন্যে আমার লোক দরকার। বিশজন পুরুষ আর বিশজন মেয়ে বাছাই করো তুমি।’

জবরদখলকারীদের কাউকে তাড়িয়ে না দিয়ে ওদেরকে গ্রাস-ল্যাণ্ডে নতুন ঘর বানিয়ে থাকতে দিলো রানা। প্রত্যেক পরিবারের কর্তাকে বাঁশ, তার, টিন ইত্যাদি কেনার জন্যে টাকা দিলো। ঠিক হলো, প্রত্যেক পরিবার থেকে তিনজন সমর্থ নারী বা পুরুষ কিং’স হেভেনে চাকরি করবে। মোট চল্লিশ জনকে একদিন জড়ো করা হলো বাড়ির সামনে। তাদেরকে চাকরির প্রকৃতি আর শর্ত বুঝিয়ে দিলো রানা। তার আগে কুয়াকোপা একটা বক্তৃতা মতো দিলো।

রানা বললো, ‘মাসিক বেতন ছাড়াও প্রত্যেকে তোমরা বছরশেষে এক জোড়া করে গরু পাবে। কিন্তু কেউ যদি কিছু চুরি করে, তার কপালে কিছুই জুটবে না, উল্টে তাকে এই এলাকা থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে।’

‘এহ্ হে। এহ্ হে!’ সবাই উল্লাসে ফেটে পড়লো।

সবচেয়ে আগে ধরা হলো বেড়া তৈরির কাজটা। মেরামতের বাইরে চলে গেছে ওটা। কয়েক মাইল পর্যন্ত কাঁটাতার গায়েব হয়ে গেছে। খবর নিতে গিয়ে রানা জানলো, জিম্বাবুই সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কাঁটাতার আমদানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নিরাশ হতে গিয়েও মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসায় ফোন করলো জেনারেল উমাঙ্গোকে। ‘রট, এখানে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।’

সব শুনে জেনারেল জানতে চাইলো, ‘কতোটা লাগবে তোমার?’

‘কম করেও বারো শো বেল।’

'আর কিছু ?'

'না···দাঁড়াও, সরি টু বদার ইউ, রট,—সোহানার কোনো খবর পাচ্ছি না। টেলিফোন ধরছে না, টেলিগ্রামেরও কোনো উত্তর আসছে না।'

'দশ মিনিট পর ফোন করো আমাকে,' বললো জেনারেল। দশ মিনিট পর রানা ফোন করলো। জেনারেল জানালো, 'তোমার বান্ধবী সেসনা নিয়ে কেনিয়ায় গেছে—মাসাই মারা-র কিচওয়া টিমবু-তে।'

'ফিরবে কবে জানো ?'

'না। তবে ফেরার সাথে সাথে তোমাকে আমি খবর দেবো।'

জেনারেল উমাঙ্গোর বাহু কতোটা লম্বা উপলব্ধি করতে পেরে প্রভাবিত হলো রানা, জিম্বাবুইয়ের বাইরেও হাত বাড়াতে পারে লোকটা। সন্দেহ নেই, সোহানার ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। নিশ্চই ওর ওপরও।

কিচওয়া টিমবু-তে কেন গেছে সোহানা, আন্দাজ করতে পারলো রানা। মারা প্রান্তরের মালিকের আমন্ত্রণ পেয়ে বছর কয়েক আগে ওখানে ও নিজেও একবার গিয়েছিল। ওখানে এখন ক্যাম্পের চারধারে গণ্ডারের বড় বড় কয়েকটা পাল বাচ্চা প্রসব করবে—দর্শনীয় একটা ব্যাপার। ক্যামেরা নিয়ে ওখানে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করছে না সোহানা।

শহর থেকে কিং'স হেভেনে ফেরার পথে পোস্ট অফিসে থামলো রানা, একটা টেলিগ্রাম পাঠালো সোহানাকে।

তিন দিন পর কিং'স হেভেনে ট্রাকের একটা কনভয় এসে থামলো, থার্ড ব্রিগেডের একটা প্ল্যাটুন বারো শো বেল কাঁটাতার নামালো

ছাদহীন ট্র্যাক্টর শেডে। 'ইনভয়েস নিয়ে এসেছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

সার্জেন্ট বললো, 'পেমেন্ট সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমাকে শুধু মালটা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে।'

খালি ট্রাকগুলো সগর্জনে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল, সে-দিকে তাকিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। একটা অপরাধ-বোধ জাগলো মনে। আশংকা করলো, ইনভয়েস হয়তো কোনো দিনই দাখিল করা হবে না। জানে, এটা আফ্রিকা মহাদেশ—আরো জানে, জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তর্কে নামলে তার পরিণতি ভাল নাও হতে পারে।

লেবারদের সাথে নিজেও কাজে নেমে পড়লো রানা। একটানা পাঁচ দিন কাজ করার পর কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করা গেল। পাঁচ দিন পরও যখন টেলিফোন এলো না, বিবেকের দংশন অনুভব করলো রানা। ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে বুলাওয়ায়োতে চলে এলো ও, সোজা জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িতে হাজির হলো।

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড,' সহাস্যে বললো জেনারেল, 'সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছো তুমি। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ইনভয়েস এখনো পাঠায়নি আমার কাছে। এতোই যখন অস্থির হয়ে উঠেছো, এক কাজ করো, একটা চেক লিখে দাও, ব্যাপারটা এখুনি আমি চুকিয়ে ফেলি। ভাল কথা, ওটা যেন বিয়ারার চেক হয়, কেমন?'

পরের কয়েক হপ্তা অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটলো রানার। সকাল সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে, ম্যাটাবেল শ্রমিকদের নিয়ে কিং'স

হেভেনকে বাসযোগ্য করে তোলার কাজে লেগে যায়। দুপুরে শ্রমিকদের সাথে বসে খায়, জাকারানডা গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটা ঘুম দেয়। রাতে, বাড়ির বারান্দায় টেবিল সামনে নিয়ে বসে—টেবিলে কাগজ, হাতে বলপয়েন্ট কলম। গ্যাস লাইটের হিস হিস আওয়াজে পোকামাকড়দের চেঁচামেচি চাপা পড়ে যায়।

এক সন্ধ্যায়, জাকারানডা গাছের নিচে ল্যাণ্ড রোভার পার্ক করলো রানা, বাড়ির দিকে হাঁটা ধরলো। জিভে পানি আসা গরুর মাংসের গন্ধে থমকে দাঁড়ালো ও। বারান্দায় উঠলো পা টিপে টিপে। কিচেনের দরজাটা আধ খোলা, উঁকি দেয়ার আগেই এক প্রৌঢ় বেরিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো।

'আমাকে খবর দেননি কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, চোখেমুখে রাগ। 'কিং'স হেভেনের রান্নাঘরে আমি ছাড়া আর কার ঢোকার অধিকার আছে?'

'টস্‌নে!' প্রৌঢ়কে বুকে জড়িয়ে ধরলো রানা। এই টস্‌নে রেবেকাদের পুরানো বাবুর্চি, রেবেকাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতো।

'মালিক, আপনার কাপড়চোপড় নোংরা, আপনার বিছানায় ছারপোকা,' চেহারায় রাজ্যের অসন্তোষ নিয়ে বললো টস্‌নে। 'ওই পুঁচকে ছুঁড়ি নিলি সারাদিন শুধু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আর গান গায়। ওকে আমি বিদায় করবো।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হাসলো রানা। 'হ্যাঁ, বিদায় করে দাও ওকে। ভারি পাজি মেয়ে, আমার কোনো কথাই শোনে না। ভাবছি, তোমার ছেলে এই মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে কিভাবে!'

'অ্যাঁ—ও, আচ্ছা, তারমানে, বুঝেছি!' মাথা চুলকাতে শুরু

করলো প্রৌঢ় টস্‌নে। 'তাহলে তো…মানে…'

'মানে ওকে বিদায় করে দেয়া উচিত হবে না,' বললো রানা।

'ঠিক,' তাড়াতাড়ি সায় দিলো প্রৌঢ়। 'আজকালকার ছেলেরা… বোঝেনই তো! তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েরা এই বয়সে একটু অমন করেই, এতে দোষের কিছু নেই।'

হাসি চেপে রান্নাঘরের দিকে তাকালো রানা। 'কিসের আওয়াজ? ওখানে আর কেউ আছে নাকি?'

'আলায়তুনে,' একগাল হাসলো টস্‌নে। 'আপনি ওকে এই এতোটুকু দেখেছেন,' নিজের হাঁটুর কাছে হাত রাখলো সে।

কয়েক পা এগিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলো রানা। অর্ধ উলঙ্গ এক যুবতী, লম্বা, একহারা গড়ন। ওদের উপস্থিতি টেরই পেলো না সে, পিছন ফিরে কাজ করছে। রানার সমস্ত কাপড়চোপড় আর বাড়ির প্রতিটি পর্দা, চাদর ইত্যাদি সব ধুয়ে ফেলা হয়েছে, টেবিলে ফেলে এক এক করে ইস্ত্রি করছে মেয়েটা। এতোক্ষণে লক্ষ্য করলো রানা, বারান্দা থেকে শুরু করে রান্নাঘর, বেডরুম, সিটিংরুম, সবগুলোর মেঝে মার্বেলের মতো চকচক করছে। দরজার কড়া, নব, ছিটকিনি পর্যন্ত ঝকঝক করছে।

'আমার বড় বউয়ের তুই ভাইকে খবর দিয়েছি,' বললো টস্‌নে। 'একজন কাঠ মিস্ত্রী, আরেকজন রাজ মিস্ত্রী। এক হপ্তার মধ্যে বাড়ির চেহারা বদলে ফেলবে ওরা। পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিনার রেডি হয়ে যাবে। যান, হাত-মুখ ধুয়ে নিন।'

পরের হপ্তায় গরুগুলোর থাকার জায়গা তৈরি হয়ে গেল। বাড়ি-টাও এখন বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যায় কুয়াকোপা আর টস্‌নেকে ডেকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো রানা, বললো দিন কয়েকের

জন্যে বাইরে যাচ্ছে ও।

পরবর্তী দুই হপ্তা প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে সেরা জাতের গরু দেখলো রানা। সাথে একজন ব্রোকারকে নিয়েছে, গরু সম্পর্কে এক্সপার্ট। দুই হপ্তায় প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেললো ওরা। ব্রোকার তৃপ্তির হাসি হেসে বললো, 'গোটা আফ্রিকায় এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে ভালো স্টক আর কারো নেই।'

কিং'স হেভেনে ফিরে এলো রানা। প্রথম চালানে চারটে যুবক ষাঁড় কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছুবে, দ্বিতীয় চালানে আসবে কিছু যুবতী গাভী। এক হপ্তার ভেতর ষাঁড়গুলোর একমাত্র কাজ হবে গাভীগুলোকে গর্ভবতী করা। প্রতিটি ষাঁড়ের জন্যে পনেরো হাজার ডলার করে দাম দিতে হয়েছে ওকে।

জেনারেল উমাঙ্গো জেদ ধরে বসলো, প্রথম চালানের আগমন উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করতেই হবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হবার জন্যে দু'জন মন্ত্রীকে রাজিও করিয়ে ফেললো সে। তবে, প্রধানমন্ত্রী মুগাবে বা পর্যটন মন্ত্রী টস মাজুলেটকে সেদিন পাওয়া যাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চাশ জন অতিথির জন্যে রাজকীয় খানাপিনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো টস্‌নে, সাথে মেয়ে আলায়তুনে আর ভাবী পুত্রবধূ নিলি। নিলি আর আলায়তুনে, দু'জনের মধ্যে ভারি ভাব। প্রায় রোজ রাতেই রানার কাছে এসে বায়না ধরে ওরা, দেশ বিদেশের গল্প শোনাও। রানা ইতস্তত করলে নিলি ভয় দেখিয়ে বলে, আবার কাল থেকেই সে আগের পোশাক পরতে শুরু করবে, তারমানে প্রায় উলঙ্গ থাকবে সে। আর আলায়তুনে হুমকি দেয়, যে-সব জিনিস খুব কম করে খেতে বলেছে রানা—শুকনো মরিচ, চর্বি,

তেল, পচা মাংস, কাঁচা মাছ, ইত্যাদি—বেশি বেশি করে খাবে সে। লেখাপড়া না জানলে কি হবে, ব্ল্যাকমেইলিং করতে কারো চেয়ে কম যায় না। অগত্যা প্রায় রোজই ওদের বায়না রক্ষা করতে হয় রানাকে।

মিনিস্টারদের দলটা মার্সিডিজের মিছিল নিয়ে এলো। প্রত্যেক মন্ত্রীর সাথে পাঁচ-সাতজন করে সশস্ত্র বডিগার্ড, তাদের প্রত্যেকের চোখে অ্যাভিয়েটর'স সানগ্লাস। সম্মানী অতিথিদের স্ত্রীরা প'রে এসেছেন পুরোদস্তুর সাফারি প্রিণ্ট, গাঢ় রঙ যতো আছে সবগুলো ব্যবহার করা হয়েছে প্রিণ্টে। নারী-পুরুষ সবাই পৌঁছেই ঢক ঢক করে মদ গিলতে শুরু করলো। বিশ মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে গেল খিলখিল হাসি, টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে গ্লাস ভাঙার আওয়াজ। শিক্ষামন্ত্রীর বড় বউ ব্লাউজের বোতাম খুলে কুমড়ো আকৃতির একটা স্তন বের করে কোমরে ঝুলে থাকা বাচ্চাকে দুধ খেতে দিলেন, ওদিকে সস্তা শ্যাম্পেনের গ্লাসে নিজেও ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন। 'রিফুয়েলিং ইন ফ্লাইট,' রানার এক প্রতিবেশী, বাবা হোসেইনি, হাসি চেপে ফিসফিস করে মন্তব্য করলো।

সবার শেষে পৌঁছলো জেনারেল উমাঙ্গো। ফুল আর্মি ড্রেস পরে এলো সে, সাথে এক তরুণ এইড। একে তার সাথে আগেও দেখেছে রানা, থার্ড ব্রিগেডের একজন ক্যাপটেন, কিন্তু কথাবার্তা হয়নি। এবার উমাঙ্গো ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ লম্বা, কিন্তু সাংঘাতিক রোগা, দেখে মনে হয় ধাক্কা দিলে ভেঙে পড়বে কাঠামোটা। তার চোখে স্টীল রিমের চশমা, রুগ্ন প্রফেসরের মতো লাগে। কিন্তু হ্যাণ্ডশেক করার সময় টের পেলো রানা, শুকনো হাড়েও যথেষ্ট শক্তি রাখে হোসে ভালডেজ। লোকটার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে থাকলেও, সুযোগ

মিললো না—ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে সগর্জনে নামতে শুরু করেছে ষাঁড়বাহী ট্রেইলর।

ফাঁক ফাঁক করে বাঁশ পুতে গোল করে খানিকটা জায়গা ঘেরা হয়েছে, ষাঁড়গুলোকে প্রথমে এখানেই নামানো হবে। লাল ধুলোর পাহাড় তুলে ঘেরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক নামানো হলো, কিন্তু টেইলগেট তোলার আগে জেনারেল উমাঙ্গো ডায়াসে উঠে উপস্থিত মেহমানদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করে দিলো। রানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো সে, বললো, রানাকে সামান্য সাহায্য করতে পেরে গর্ব বোধ করছে সে। সবশেষে সকৌতুকে ঘোষণা করলো, 'এখন আমরা চার মরদকে অভ্যর্থনা জানাবো, যারা বছর ঘুরতেই শ' শ', হাজার হাজার ছেলেমেয়ের বাপ হবে।' সে-ই প্রথম হাততালি দিলো, বাকি সবাই অনুকরণ করলো তাকে।

গেটটা তুললো রানা, নতুন মেহমানদের একজন ট্রেইলরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রোদের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকালো। প্রকাণ্ড একটা পশু, এক টনের ওপর হবে ওজন, লালচে-খয়েরি রঙের চামড়া চকচক করছে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ষোলো ঘণ্টা নির্জীব করে রাখা হয়েছিল, ওষুধের প্রভাব ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে, গোটা দুনিয়ার ওপর তার এখন ভারি রাগ। আওয়াজ লক্ষ্য করে অতিথিদের দিকে তাকালো সে, সামনের দিকে বাঁকানো শিং জোড়া নাড়লো, যেন এ সব তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এরপর তার দৃষ্টি আটকে গেল ভদ্রমহিলাদের রঙচঙে কাপড়ের ওপর। মুখ খুলে গগনবিদারী একটা হুংকার ছাড়লো সে, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাখালদেরকে সাথে নিয়ে লাফ দিলো নিচে, হিমবাহের মতো নেমে এলো মাটিতে।

রাখালরা হাতের রশি ছেড়ে দিলো, তা না হলে রশির অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টানে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের সাথে সংঘর্ষে ছাতু হয়ে যেতো তারা। বাঁশের সবগুলো খুঁটি চোখের পলকে বিস্ফোরিত হলো, বিস্ফোরিত হলো সম্মানিত অতিথিদের ভিড়টাও। উচ্চপদস্থ অফিসাররা জান বাঁচানোর দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে যার যার স্ত্রীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সবাই একটা করে জাকারানডা গাছ বেছে নিয়ে ছুটছে। মেয়েদের পিঠে ঝুলে থাকা থলের ভেতর বাচ্চারা তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলো, তাদের চিৎকার চাপা পড়ে গেল ছুটন্ত মায়েদের বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদে।

লাঞ্চের জন্যে একটা মস্ত তাঁবু খাটানো হয়েছিল, সেটাকে লক্ষ্য করে তেড়ে গেল ষাঁড় মহাশয়। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো সে, অপর দিক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল তাঁবু, ষাঁড়ের বিশাল ঘাড়ে শোভা পেতে দেখা গেল রাজ্যের দড়িদড়া।

তাঁবু থেকে বেরিয়েই ষাঁড়ের চোখ পড়লো এক মন্ত্রীর ছোটো বউয়ের ওপর। রঙচঙে সাফারি হাঁটুর ওপর তুলে খিঁচে দৌড় দিলেন ভদ্রমহিলা, ষাঁড়ও তাকে তাড়া করলো। প্রতি মুহূর্তে দ্রুত ছোটো হয়ে আসছে মাঝখানের ফাঁকটা। সামনের দিকে বাঁকানো শিং দিয়ে গুঁতো দিলো ষাঁড়, আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো ভদ্রমহিলার গলা চিরে। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, জোড়া শিং তাকে জখম করেনি। শুধু রঙিন ড্রেসটাকে শিঙে বাধিয়ে ওপর দিকে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে ষাঁড়, চোখের পলকে নগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা।

মন্ত্রী মহোদয়ের নিরাবরণ স্ত্রী কোনো রকমে তাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর দৌড় দিলেন পাহাড়ের দিকে। তার লম্বা পায়ে

ঝড়ের গতি, গোটা ছাতি জুড়ে থাকা স্তন জোড়া হরদম লাফাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, মিঃ রানা,' প্রতিবেশী বাবা হোসেইনি, কৃতজ্ঞ চিত্তে বললো, 'জানতাম না আপনার অনুষ্ঠান সূচীতে এতো মজাদার···' অনেকের মতো সে-ও একটু বেশি শ্যাম্পেন গিলেছে।

বহু-রঙা সিল্ক ড্রেসটা ষাঁড়ের মাথায় জড়িয়ে গেছে, তাতে সে আরো ক্ষেপে উঠলো। সশস্ত্র মাথা এদিক ওদিক ঘন ঘন নাড়লো, যেন বাতাসের সাথেই যুদ্ধ তার। ক্ষুদে একটা চোখে হিংস্র দৃষ্টি—ওই একটাই বেরিয়ে আছে, অপরটা কাপড়ে ঢাকা। সামনে শিক্ষা মন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে চোখটা যেন দপ করে জ্বলে উঠলো।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী, মনে হলো তাঁর পদভারে গোটা পাহাড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিক্ষামন্ত্রী কয়েক মন ভার বহন করছেন, সব তাঁর নিজেরই চর্বি আর মাংস। ওয়েস্টকোটের নিচে বিশাল ভূড়ি প্রতি মুহূর্তে আরো যেন ফুলে উঠছে। অনেক দিনের পুরনো ছাইয়ের মতো চেহারা, গলা থেকে চিঁ চিঁ মেয়েলি চিৎকার বেরিয়ে আসছে বিরতিহীন। 'মারো। শালার ব্যাটাকে গুলি করে মারো।'

কিন্তু তাঁর বডিগার্ডরা নির্দেশটা মানলো না। ওরা তাঁর পঞ্চাশ গজ আগে চলে গেছে, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব আরো বেড়েই চলেছে। ট্র্যান্সপোর্টারে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে রানা, শিং বাঁকিয়ে ষাঁড়টাকে শিক্ষামন্ত্রীর পিছু ধাওয়া করতে দেখে আঁতকে উঠলো ও। ষাঁড়ের পা থেকে ধুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে, আবার একটা গগনবিদারী ডাক ছাড়লো সে। এই আওয়াজ অকস্মাৎ ধাক্কা দিয়ে যেন শূন্যে তুলে দিলো তাঁকে। সেই সাথে প্রমাণ হয়ে গেল

পাহাড় বেয়ে ওঠার চেয়ে গাছ বেয়ে ওঠায় অনেক বেশি পারঙ্গম তিনি। চোখের পলকে একটা জাকারানডা গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে গিয়ে নিচের সারির ডালপালা আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকলেন। যমদূত তাঁর ঠিক নিচেই।

আবার হাঁক ছাড়লো ষাঁড়, ঘন ঘন পা ঘষছে মাটিতে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে শূন্যে ঝুলে থাকা কাপুরুষ প্রতিপক্ষের দিকে। 'বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয়। 'গুলি করে মারো ওটাকে!'

পিছন ফিরে তাকালো বডিগার্ডরা। চার্জ পেয়ে শত্রু ধাওয়া করছে না দেখে সাহস ফিরে পেলো। কাঁধ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নামিয়ে লক্ষ্য স্থির করলো ওরা।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলো রানা। 'খবরদার, কেউ গুলি করবে না!' ও জানে, ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে মারা হলে বীমা কোম্পানী টাকা দেবে না। তাছাড়া, পনেরো হাজার ডলারও বড় কথা নয়, উঁচু ঢাল থেকে গুলি করলে নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের কারো না কারো গায়ে লাগবে বুলেট।

দু'জন বডিগার্ড রাইফেল নামিয়ে নিলো, কিন্তু বাকি দু'জন রানার কথায় কান দিলো না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে শিউরে উঠলো রানা, যে কোনো মুহূর্তে গুলি করবে ওরা। ট্রেইলর থেকে নেমে ছুটলো ও। 'না। খবরদার!'

ষাঁড়ের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন, রানার চিৎকার শুনে সাইট থেকে চোখ তুলে তাকালো। এই সময় মট্ করে একটা আওয়াজ হলো। সরু তিনটে ডাল ধরে ঝুলে ছিলো শিক্ষামন্ত্রী, একটা ভেঙে গেছে। ষাঁড় লাফ দিলো, মন্ত্রীর পায়ের

তলায় ঘষা খেলো একটা শিঙের ডগা। দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুতে শুরু করলো তাঁর গলা থেকে। সুড়সুড়ি লাগায় হাসছেন, নাকি অন্য কিছু, ঠিক বোঝা গেল না।

বডিগার্ডদের পিছনে হঠাৎ একজন লোককে দেখা গেল। রাই-ফেলধারীদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সে, দু'দিকে দুই হাত লম্বা করে দিয়ে রাইফেল দুটোর মুখ অন্যদিকে সরিয়ে দিলো।

'কুয়াকোপা!' স্বস্তির পরশ অনুভব করলো রানা।

ষাঁড়ের দিকে ফিরলো কুয়াকোপা, এক পা এক পা করে এগুলো ওটার দিকে। 'সালামালেকুম, বাহাদুর ষাঁড়!' নরম সুরে বললো বুড়ো। আওয়াজ পেয়ে ঝট করে মাথা ফেরালো বাহাদুর। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে শিং বাঁকালো।

'তুমি কি সুন্দর!' ষাঁড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো কুয়াকোপা। 'তোমার মাথা যেন পাহাড়ের চূড়া, তোমার চোখ যেন একজোড়া চাঁদ।' ষাঁড় আবার শিং দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গি করলো, কিন্তু আগের মতো প্রচণ্ড বেগে নয়। বাচ্চাদের কান্না, আর মেয়েদের চিৎকার থেমে গেছে, সবচেয়ে ভীতু লোকটাও এখন আর ছুটছে না। সবার চোখ স্থির হয়ে আছে বৃদ্ধ কুয়াকোপা আর ষাঁড়ের দিকে।

'তোমার শিং যেন চোখা বর্শা, আর তোমার বিচি—আহা, তোমার বিচি! ঠিক যেন গ্র্যানিট পাথরের একজোড়া বোল্ডার! দশ হাজার গাভী ওগুলোর ওজন অনুভব করে ধন্য হবে।' এক পা পিছিয়ে গেল ষাঁড়। আবার গুঁতো মারার ভঙ্গি করলো সে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে।

সামনে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো কুয়াকোপা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। 'বাহাদুর ষাঁড়, তুমি আমার পরাণের বন্ধু···।' হাত দিয়ে ষাঁড়ের ভেজা, চকলেট রঙের নাক আলতোভাবে স্পর্শ করলো সে। নার্ভাস ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল ষাঁড়, তারপর সাবধানে এগিয়ে এসে বুড়োর হাত শুকলো। 'হাজার ষাঁড়ের বাপ তুমি, ছুকরি গাভীগুলোর তোমাকে ভারি পছন্দ,' কোমল সুরে বলে চলেছে বুড়ো। আলতোভাবে তর্জনীটা ব্রোঞ্জ রিঙের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিলো সে, অপর হাত রাখলো ষাঁড়ের মাথায়। ঝুঁকে নাকের সামনে মুখ নামালো, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়লো ভেতরে। কেঁপে উঠলো ষাঁড়; পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, ওটার কাঁধের পেশীতে ঢিল পড়লো। সিধে হলো কুয়াকোপা, নোজ-রিঙে এখনো ঢুকে আছে আঙুল, ধীর পায়ে হাঁটা ধরলো—লেজ দুলিয়ে তার সাথে সাথে এগোলো বাহাদুর। দর্শকদের মধ্যে থেকে দুর্বল গুঞ্জন উঠলো একটা—বিস্ময় আর স্বস্তি মেশানো। রানার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো কুয়াকোপা, 'মালিক, ম্যাশোনা বাঁদরগুলোকে আমাদের মাটি থেকে ভাগান তাড়াতাড়ি। আমার বাহাদুর ওদেরকে পছন্দ করে না।' মনে মনে আঁতকে উঠলো রানা, সম্মানী অতিথিরা কেউ সিনডেবেল ভাষা জানলে কেলেংকারীর আর শেষ থাকবে না।

শিক্ষামন্ত্রী এখনো ডাল দুটো ধরে ঝুলছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ছুটলো রানা। বডিগার্ডরা ইতিমধ্যে গাছের তলায় পৌঁচেছে। 'ডাল ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ে যান, স্যার,' মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছে তারা।

অবশেষে ভুরিভোজনের পর সবাই বিদায় নিলো। জেনারেল উমাঙ্গো গেল সবার শেষে। ফার্ম, বাড়ি, ইত্যাদি সব তাকে ঘুরিয়ে দেখালো

রানা। 'এই অল্প ক'দিনে এতোকিছু করে ফেলেছো!' তাজ্জব বনে গেল জেনারেল। ভারি খুশি আর তৃপ্ত দেখালো তাকে। 'না, সত্যি তুমি কাজের লোক হে, আমার পঁচিশ পার্সেন্ট মনে হচ্ছে-রাজা করে দেবে আমাকে। সামনে কিন্তু আরো বড় কাজ রয়েছে, তাই না? শিজারিরা এস্টেটে হাত দেবে কবে?'

'সবগুলো গরু আসুক,' বললো রানা। 'সোহানাকেও দরকার হবে।'

'তোমাকে বলিনি? তোমার বান্ধবী তো কাল সকালে হারারে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে।'

'কাল তাহলে শহরে গিয়ে টেলিফোন করবো ওকে।'

'এখনো ওরা তোমার টেলিফোন দেয়নি?' বিরক্ত হলো জেনারেল। 'ঠিক আছে, কাল সকালেই পেয়ে যাবে তুমি।'

পরদিন দুপুরের আগেই টেলিফোন লাইন্সম্যান এলো, তার এক ঘণ্টা পর পুব আকাশে উদয় হলো সেসনা। এয়ারস্ট্রিপটা অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি, পেট্রল ভেজা ছেঁড়া কম্বল জ্বেলে রানওয়ের কিনারাগুলো চিহ্নিত করলো রানা, হাত নেড়ে সোহানাকে বুঝিয়ে দিলো কোন্ দিকে বইছে বাতাস। ঠিক পার্ক করা ল্যাণ্ডরোভারের পাশে থামলো সেসনা। লাফ দিয়ে কেবিন থেকে নামলো সোহানা, মাথার হুড খুলে রানাকে যেন সদ্য ফোটা একটা গোলাপ উপহার দিলো সে। 'ওপর থেকে কী সুন্দর দেখালো র‍্যাঞ্চটাকে!'

'এসো, সব তোমাকে দেখাই।'

হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে ফেললো সোহানা, প্রথমে একটা পা তুলে দিয়ে ছোট এক লাফে উঠে পড়লো সামনের সিটে—যেন ব্যস্ত এক কিশোর।

শেষ বিকেলের রোদে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে বাড়ির সামনে নামলো ওরা। সোহানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বারান্দা থেকে নেমে এলো নিলি, আলায়তুনে আর টস্‌নে। নিলির দিকে তাকিয়ে সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না সোহানা। ক্ষীণ একটু মুচকি হেসে রানাকে বললো, 'স্বস্তি এইটুকু যে ওর সাথে আমাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে না।'

'বলো, সম্ভবত,' সংশোধন করে দিলো রানা।

'তবে রে,' বলে কিল তুললো সোহানা। অমনি খিল খিল করে হেসে উঠলো নিলি আর আলায়তুনে।

রানা বললো, 'টস্‌নে তোমার জন্যে একটা ঘর খালি করে রেখেছে।' আলায়তুনেকে দেখালো ও। 'বাপ-বেটি সেই দুপুর থেকে এটা সেটা অনেক কিছু রান্না করেছে তোমার জন্যে। নিলি তোমাকে গোসলখানায় নিয়ে যাবে, গরম পানি রাখা আছে ওখানে। জেনা-রেটর চালু করা গেছে, ঘরে আলো থাকবে রাতে।'

'ওদের কাছে আমি তোমার কে?' তির্যক চোখে তাকালো সোহানা।

'সেটা চুপি চুপি ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো,' মুচকি হেসে বললো রানা।

এগিয়ে গিয়ে নিলির একটা হাত ধরলো সোহানা। 'চলো ভাই, গোসলখানাটা দেখিয়ে দেবে।' চলে গেল ওরা।

পাগড়ির মতো করে তোয়ালেটা মাথায় জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সোহানা, রানার পাশের চেয়ারটায় ধপ্‌ করে বসে নিচু পাঁচিলে তুলে দিলো পা জোড়া। 'আহ্‌, কি আরাম!' গা থেকে সাবানের গন্ধ আসছে, চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে গোলাপি

আভা।

একটা ট্রে হাতে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো নিলি। ধূমায়িত কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিলো ওরা। নিলি চলে গেলে, ওরা দু'জন তাকিয়ে থাকলো অস্তমান সূর্যের দিকে।

পশ্চিম আকাশে রক্তলাল রঙ ঢেলে দেয়া হয়েছে যেন, গোধূলি লগ্নে চরাচরে নেমে এলো অটুট নিস্তব্ধতা। দূর থেকে ভেসে আসছে ম্যাটাবেল রাখালের সুরেলা গান। এমন একটা পরিবেশ, কারো মুখে কথা থাকে না।

সূর্য অস্ত যাবার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো ওরা। তারপর উঠে গিয়ে ঘর থেকে একবার ঘুরে এলো রানা। সোহানার হাতে পাণ্ডুলিপিটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'তিন ভাগ লেখা হয়ে গেছে, বাকিটা দু'এক হপ্তার মধ্যে শেষ করে ফেলব। তোমার তোলা একশো ফটো থাকলে তিনশো পৃষ্ঠার ঢাউস একটা বই হয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলো ও।

'ফটোগুলো তোমার জন্যে বাছাই করে রেখেছি আমি,' বললো সোহানা।

ডিনারের পর বারান্দায় আবার ওদেরকে কফি দিয়ে গেল নিলি। আলো নিভিয়ে দিলো রানা। অন্ধকারে বসে থেকে মাসাসা গাছের মাথায় চাঁদ উঠতে দেখলো ওরা, গাছগুলো পাহাড়ের চূড়ায় গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোহানার একটা হাত ধরলো রানা, মৃদু চাপ দিলো।

তারপর একসময় নিজের ঘরে যাবার জন্যে উঠলো সোহানা। কিন্তু তারপরও অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করলো সে, যেন যেতে ইচ্ছে করছে না।

ধীরে ধীরে হাত তুলে সোহানার পিঠ স্পর্শ করলো রানা, নিজের দিকে টানলো তাকে। মুখের ওপর রানার নিঃশ্বাস অনুভব করলো সোহানা। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে রানার ঠোঁটে আলতোভাবে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো সে, আর তারপরই নিজেকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, শান্ত পায়ে চলে গেল বারান্দা থেকে। শুনতে পেলো, পিছনে পায়ের শব্দ।

গরুর শেষ চালানটা পৌঁছুলো, সেই সাথে পাঁচ মাইল দূরে কুইন'স হেভেনও মেরামতের পর বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। তু'জন ম্যাটাবেলকে চাকরি দিলো রানা, একজন ওভারশিয়ার, অপরজন আর্কিটেক্ট। তু'জনেই তারা সপরিবারে কুইন'স হেভেনে উঠলো। ওভারশিয়ারকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এবার রানা মনোযোগ দিলো শিজারিরা এস্টেটের ওপর। ছোটো আকারের বেশ কয়েকটা বাংলো তৈরি করা হবে, আর্কিটেক্টের ডিজাইন ওদের তু'জনেরই পছন্দ হলো। এক হপ্তার জন্যে জঙ্গলে তাঁবু ফেললো ওরা, শিজারিরা এস্টেটের প্রায় প্রতি ইঞ্চি মাটিতে পা পড়লো ওদের। বাংলোগুলোয় রাতে থাকবে ট্যুরিস্টরা, প্রথম দিনেই জায়গা নির্বাচনের কাজ শেষ করলো ওরা। এরপর গেস্ট-লজের জন্যে জায়গা বাছা হলো, ট্যুরিস্টদের বড়সড় কোনো পার্টি এসে একসাথে থাকতে চাইলে এই লজগুলো ব্যবহার করবে তারা। প্রতিটি বাংলো আর গেস্ট-লজের সাথে আলাদা সার্ভিস কমপ্লেক্স থাকবে। জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশে ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে থার্ড ব্রিগেডের একটা স্কোয়াড এলো ওদের সাথে, স্কোয়াডের নেতৃত্বে রয়েছে ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ।

এই ক'দিন কাছ থেকে দেখে লোকটাকে আরো ভালো করে জানার সুযোগ পেলো রানা। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল ইকনমিক্সে একটা কোর্স শেষ করেছে ভালডেজ। ইংরেজী, সিনডেবেল, আর মাতৃভাষা শোনা বলতে পারে। ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে রোজ রাতেই সোহানা আর রানার সাথে গল্প করে সে। তার একটা খেদ হলো, জিম্বাবুইয়ের উপজাতীয় কোন্দল আজও মিটলো না। 'এই দেশের মানুষ পরস্পরকে কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে ছটফট করছে, অথচ এর একটা সমাধান করার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।' ব্যক্তিগত ভাবে ভালডেজের দৃষ্টিভঙ্গি উদার, শোনা ব্রিগেডের কোনো অফিসারের মধ্যে যা আশা করা যায় না। দুই প্রধান উপজাতির মধ্যে শান্তি চায় সে, এমনকি মধ্যস্থতা করার ব্যাপারেও ভীষণ আগ্রহী। তার কথা হলো, 'বেশি দিন এভাবে চলতে থাকলে, মিঃ রানা, দেশটা আমাদের টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিছু একটা এখুনি করা দরকার। ম্যাটাবেলদের কিছু কিছু দাবি ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু…'

রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু আপনি একজন শোনা, আপনি মধ্যস্থতা করতে চাইলে ম্যাটাবেলরা ভাববে আপনি নিজেদের পক্ষ নিয়েই কথা বলবেন...'

'প্রথমে আমি একজন দেশপ্রেমিক, মিঃ রানা,' শান্তভাবে বললো ভালডাজ। 'আমার ছেলে সারাক্ষণ রাইফেল হাতে ঘুরে বেড়াবে, এটা আমি চাইতে পারি না। আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতিকে মেরে না ফেললে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা হয় রাগের কথা, না হয় ঘৃণার কথা। এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা বিপজ্জনক।'

প্রতিটি আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু তা থেকে পরিস্থিতির একটা আভাস পেতে কষ্ট হয় না। সবাই বোঝে, এখানে কাজ করতে হলে সশস্ত্র একটা স্কোয়াড থাকা একান্ত দরকার—আপাত দৃষ্টিতে জায়গাটাকে দুর্গম আর নির্জন বলে মনে হলেও।

একদিন সশস্ত্র সৈনিকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে এলো ওরা, একটা উই-ঢিবি আবিষ্কার করে উত্তেজনায় ফেটে পড়লো সোহানা। চারপাশের গাছপালা বন-জঙ্গলের চেয়ে উঁচু ঢিবিটা, ওপরে উঠে দাঁড়ালে কাছেই ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। গোবর গাদা দেখে রানা বুঝলো, কালো গণ্ডারদের আরো একটা ঠিকানা পাওয়া গেল, মলত্যাগ করার জন্যে এখানেও আসে আরেকটা দল। দু'জনেই একমত হলো, ট্যুরিস্টদের জন্যে এটা একটা চমৎকার স্টেজ হতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক দানবের অপেক্ষায় চুপচাপ এখানে বসে থাকবে তারা।

হাঁটু ভাঁজ করে পাশাপাশি বসে রয়েছে ওরা, কথা বলছে ফিসফিস করে, মাথা দুটো কাছাকাছি। হঠাৎ ওদের নিচের ঘন, কালো ঝোপের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। 'নড়ো না,' অস্ফুটে বললো ও। 'এক চুল নড়ো না!'

ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করলো সোহানা, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার আওয়াজ পেলো রানা।

'কারা ওরা?' বিড়বিড় করে জানতে চাইলো সোহানা, কিন্তু উত্তর দিলো না রানা।

শুধু দু'জোড়া চোখ দেখা গেল। চিতা বাঘের মতো নিঃশব্দে ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এলো ওরা। 'তাহলে, মিঃ অ্যাডভাইজার,' ওদের মধ্যে একজন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আমাদের খুঁজে বের

করার জন্যে ম্যাশোনা খুনীগুলোকে সাথে করে এনেছো?'

'ব্যাপারটা তা নয়, মেজর কুকি,' নিচু গলায় বললো রানা। 'আমাদের নিরাপত্তার জন্যে সরকার ওদেরকে পাঠিয়েছে।'

'আমরা তোমার বন্ধু, প্রটেকশনের দরকার কি?'

'সরকার তা জানে না। কেউ জানে না তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তোমরা এখানে থাকো, সেটাও ওদের কল্পনার বাইরে।'

'বলছো, আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে আসোনি? তাহলে কেন এসেছো? তাড়াতাড়ি বলো।'

'শিজারিরা এস্টেট কিনে নিয়েছি আমি। আমার সাথে একজন ম্যাটাবেল আর্কিটেক্টও আছে। আমরা এখানে কয়েকটা বাংলো বানাবো, ট্যুরিস্টরা এসে থাকবে।'

গেরিলা দু'জন গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। তারপর মেজর কুকি জানতে চাইলো, 'তাহলে আমরা কোথায় যাবো?'

'তোমরা আমার বন্ধু,' মনে করিয়ে দিলো রানা। 'শিজারিরা এস্টেটেই থাকবে তোমরা। আমি তোমাদের টাকা আর খাবার দেবো, তোমরা আমার জানোয়ার, বাংলো সব দেখেশুনে রাখবে। আড়াল থেকে ট্যুরিস্টদের ওপর নজর রাখবে, কিন্তু ওদের কাউকে জিম্মি রাখার চিন্তা মাথায় আনবে না। বন্ধুদের সাথে এরকম একটা সমঝোতায় আসা যায় না?'

'বন্ধুত্বের দাম কতো ধরতে চাও তুমি?' দ্রুত জানতে চাইলো গেরিলা লিডার।

'প্রতি মাসে পাঁচশো ডলার।'

'এক হাজার,' দাবি করলো মেজর কুকি।

'ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া করে না,' রাজি হলো রানা। 'সাথে এখন ছয়শো ডলার আছে, নিয়ে যাও, বাকিটা আমি ডুমুর গাছের তলায় পুঁতে রেখে যাবো—যেখানে আমরা তাঁবু ফেলেছি।'

'ঠিক আছে,' বললো গেরিলা লিডার। 'প্রতি মাসে হয় এখানে, না হয় ওখানে দেখা করবো আমরা।' হাত তুলে দুটো পাহাড়ের চূড়া দেখালো সে, দুটো জায়গাই নদীর কাছ থেকে বেশ দূরে। 'সিগন্যাল হবে, সবুজ পাতার ছোটো আগুন, অথবা পাঁচ সেকেণ্ড পর পর তিনবার রাইফেলের আওয়াজ।'

'বেশ।'

'এবার, মিঃ অ্যাডভাইজার, তোমার পায়ের সামনে গর্তের ভেতর টাকা রাখো, তারপর বউকে নিয়ে কেটে পড়ো।'

মুচকি হেসে রানা বললো, 'ও আমার বউ নয়।'

'না হলেও, হবে,' মন্তব্য করলো মেজর কুকি। 'তোমার ওপর খুব বেশি আস্থা ওর—যেভাবে তোমার কাঁধ খামচে ধরেছে, দেখো, নিশ্চই মাংসের ভেতর নখ ঢুকে গেছে।'

ঝট করে রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলো সোহানা। ফেরার পথে অবশ্য প্রায় সারাক্ষণ ওর গা ঘেঁষে থাকলো সে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো। অনেকটা দূরে এসে ফিসফিস করে বললো, 'মাই গড, রানা! ওরা ম্যাটাবেল খুনী! ওরা আমাদের খুন করলো না কেন!'

'একটাই কারণ—টাকা।' হাসছে রানা। 'যাই বলো, প্রটেকশনের জন্যে খুবই কম খরচ পড়বে মিঃ রুবেনসনের। মাসে মাত্র এক হাজার ডলার, বিনিময়ে দক্ষ একদল গেরিলাকে বডিগার্ড হিসেবে পেয়ে

গেলেন ভদ্রলোক।'

'কিন্তু ওদের সাথে সম্পর্ক রাখা বিপজ্জনক নয়?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্যে যদি গ্রেফতার হও?'

'ঝুঁকি আছে বৈকি,' স্বীকার করলো রানা। 'কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি। তবে যতোদিন কেউ না জানছে বিপদের আশংকা নেই।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল সোহানার। 'মিঃ রুবেন-সনকে আসতে বলে চিঠি লিখেছো শুনলাম, কই, ভদ্রলোক আসছেন না যে?'

গম্ভীর হলো রানা। 'অস্ট্রেলিয়ার জিম্বাবুই এমব্যাসী জানিয়েছে, এতো তাড়াতাড়ি আবার তাঁকে ভিসা দেয়া সম্ভব নয়। অন্তত মাস তিন-চার অপেক্ষা করতে হবে।'

হেসে উঠলো সোহানা। 'মিঃ রুবেনসনের লাভই হলো। তিন মাস পর এসে উনি একেবারে তৈরি অবস্থায় পাবেন র‍্যাঞ্চটাকে। আর শিজারিরার ট্যুরিস্ট'স স্পট দেখে আহ্লাদে আটখানা হবেন।

ছয়

বাংলো তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। লেবারের অভাব রয়েছে জানতে পেরে রানাকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল উমাঙ্গো, তিন দিন পর আমি ট্রাকের একটা কনভয় দুশো কয়েদীকে নিয়ে হাজির হলো। এদের সবাইকে দুটি পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আনা হয়েছে।

তিক্ত কণ্ঠে সোহানা বললো, 'স্লেভ-লেবার!'

রানা বললো, 'কিন্তু এই সাহায্য এখন আমি ফিরিয়ে দিতেও পারি না।'

বাংলোগুলোর ফার্ণিচার আর অভ্যন্তরীণ সজ্জা সোহানার দায়িত্ব, রাত জেগে ক্যাটালগ ঘাঁটলো সে। রোজই টেলিফোনে অর্ডার দেয়া হচ্ছে, পরদিন ট্রাকে করে চলে আসছে মালামাল। মাঝখানে জিম্বাবুইয়ের বাইরেও যেতে হলো ওকে, ফেরার পথে কয়েকটা সমস্যার সমাধান করে এলো। বড়সড় এক হোটেল চেইনের পাঁচজন শেফকে ভাগিয়ে আনলো সে, পাঁচজনই সুইটজ্যারল্যাণ্ডে ট্রেনিং পেয়েছে। ছয়জন যুবতী সাফারি গাইডকেও মোটা বেতনের লোভ দেখিয়ে দলে টানা হলো।

আগামী মাসের শেষ দিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জেনারেল উমাঙ্গো প্রস্তাব দিলো প্রধান অতিথি হিসেবে সোফিয়া লোরেনকে নিমন্ত্রণ করা হোক। এ প্রস্তাবে ভেটো দিলো সোহানা। তার যুক্তি, আরো কম বয়েসী কেউ হতে হবে। 'প্রিন্স এণ্ড্রু আর প্রিন্সেস ডায়না হলে কেমন হয়?'

'ও কে,' বলে নিজের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলো উমাঙ্গো।

ওঁদের নিমন্ত্রণ করার জন্যে একে-তাকে ধরতে হবে, সেসনা নিয়ে তাই আবার বেরিয়ে পড়তে হলো সোহানাকে।

পাঁচদিন পর হারারে থেকে টেলিফোন করলো সে। 'শিজারিরা নদী পর্যন্ত রাস্তা কমপ্লিট?'

'কমপ্লিট,' বললো রানা। 'ওদিকের সব খবর কি?'

'ভালো। আমি আসছি। কোথায় থাকবে তুমি?'

'শিজারিরা,' বললো রানা। 'কাঠ মিস্ত্রী আর ইলেকট্রিশিয়ানরা কাজ শেষ করে এনেছে, ওদের সাথে আমাকে থাকতে হবে।'

নদীর ধারে, ঘাস মোড়া মাঠে ল্যাণ্ড করলো সেসনা। দেখেই রানা বুঝলো, কোনো কারণে ভয়ানক রেগে আছে সোহানা। 'কি ব্যাপার, সোহানা?'

'এক জোড়া গণ্ডার মারা হয়েছে,' হন হন করে এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো সোহানা। 'আকাশ থেকে ওগুলোর লাশ দেখতে পেয়েছি।'

রাগে দিশেহারা বোধ করলো রানা। 'কোথায়?'

খাদের ঝোপের ভেতর। ত্রিশ গজের মধ্যে দুটো লাশ পড়ে রয়েছে। ওগুলোর ওপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে গেছি, শিংগুলো নিয়ে গেছে। 'আমার ধারণা, ডালিম আর জ্যোছনার লাশ ওগুলো।'

প্লেন নিয়ে ঘুরে ঘুরে গণ্ডারগুলো গুণে রেখেছিল ওরা। আরো হয়তো বেশি আছে, কিন্তু ওদের চোখে সাতাশটা কালো গণ্ডার ধরা পড়েছিল। নয়টা যুবতী, সাতটা যুবক, চারটে বুড়ো-বুড়ি, সাতটা বাচ্চা। সাত জোড়া যুবক-যুবতীর নামকরণ করেছিল ওরা। ডালিমের খড়গ বিক্রি করে একজন পোচার কম করেও দশ হাজার ডলার আয় করবে।

রানার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইলো। জ্যোছনার পেটে বাচ্চা ছিলো। 'খাদ ধরে যেতে হলে অনেক সময় লেগে যাবে,' বললো ও। 'পৌছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

'একটা জায়গা দেখে এসেছি, সেসনা নামাতে পারবো,' বললো সোহানা। 'ওখান থেকে মৃতদেহ মাইল খানেক দূরে।'

এস্টেটের একবারে শেষ প্রান্তে গণ্ডার দুটো মেরেছে পোচাররা। উপত্যকার ঢাল প্রায় খাড়াভাবে নদীর দিকে নেমে গেছে, ঢালের কিনারায় ঘন ঝোপের ভেতর পাওয়া গেল লাশ দুটো। রানা আগে আগে এলো, হাতে কক্ করা রাইফেল। পোচাররা এখনো কাছে পিঠে থাকতে পারে।

লাশগুলোর আশপাশে সব গাছেই দু'চারটে করে শকুন বসে আছে। হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই যা দেখে ডালিম আর জ্যোছনাকে সনাক্ত করা যায়। ওদেরকে কাছে ঘেঁষতে দেখে পাঁচ ছয়টা হায়েনা মুখ ভেঙচে ছুটে পালালো। শকুনের পালক, হায়েনা আর চিতাবাঘের শুকনো মল ইত্যাদি দেখে রানা বুঝলো, অন্তত পাঁচদিন আগে খুন করা হয়েছে ওদেরকে।

'বাস্টার্ডস!' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'ধরতে পারলে ওদের আমি খুন করবো।'

পাহাড়ের মাথায় সেই বিকেল থেকে আগুন জ্বেলে বসে আছে রানা। মাঝে মধ্যে সবুজ কাঁচা পাতা ফেলছে সোহানা, আগুন থেকে হু হু করে ধোঁয়া উঠছে।

সন্ধ্যের দিকে ঝোপ ভেদ করে একটা মাথা বেরিয়ে এলো। 'এতো তাড়াতাড়ি ডাক পড়লো কেন?'

'এই তোমাদের পাহারা দেয়ার নমুনা?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমার দুটো গণ্ডারকে মেরে শিং চুরি করা হয়েছে। কোথায় ছিলে তোমরা?'

অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না মেজর কুকি। তারপর জানতে চাইলো, 'কোথায়?'

জায়গার বর্ণনা দিলো রানা।

'এখান থেকে, বা আমাদের ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বললো গেরিলা লিডার। 'আমরা জানতাম না। কিন্তু কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাকে আমরা ঠিকই চিনতে পারবো। অনুসরণ করা কোনো সমস্যাই নয়।'

'ওদেরকে শুধু চিনতে পারলেই হবে না,' বললো রানা। 'ওরা কার কাছে শিং বিক্রি করেছে তাও জানতে হবে।'

'ওই লোকের নাম নিয়ে আসবো,' কথা দিলো মেজর কুকি। 'এই পাহাড় থেকে সিগন্যাল দেবো আমরা।'

বারো দিন পর এক বিকেলে বায়নোকুলার চোখে নিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ ধোঁয়ার আভাস পেলো রানা। ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে একাই রওনা হয়ে গেল ও। ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের কি একটা কাজে হারারে-তে গেছে সোহানা।

'আমার টাকা এনেছো?' রানাকে দেখেই জানতে চাইলো মেজর

কুকি।

পকেট থেকে নিঃশব্দে এক হাজার ডলার বের করে মেজরের হাতে ধরিয়ে দিলো রানা।

'সিগারেট?'

এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো রানা। 'কি জানতে পারলে সব বলো আমাকে।'

পায়ের ছাপগুলো ছিলো দশ দিনের পুরানো, তার ওপর লোক তিনজন ফেরার পথে ওগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তবু অনুসরণ করতে অসুবিধে হয়নি, কারণ ম্যাটাবেল গেরিলারা পায়ের ছাপ ধরার ব্যাপারে এক্সপার্ট। উপত্যকার এক ধারে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা গ্রাম আছে, সেখানে থাকে ওরা, হাঁটলে তিন দিনের পথ। বাটোনকা উপজাতির লোক ওরা। সেখানে গিয়ে শিংগুলো ওদের কাছে পায় গেরিলারা। তিনজনকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে ফিরে আসে।

মেজর কুকি থামতে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি বললো ওরা?'

'বললো, মোটর কার নিয়ে এক লোক এসে তাদের কাছ থেকে হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং ইত্যাদি কিনে নিয়ে যায়। টুটি মিশনের দিক থেকে সাঙ্গানি নদীর তীরে আসে সে, প্রতি পূর্ণিমার রাতে। সে রাতে ওরা রাস্তার ধারে তার জন্যে অপেক্ষা করে।'

আগুনের দিকে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো রানা। তারপর বললো, 'ওদেরকে তুমি বলো...'

'তা সম্ভব নয়।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'ওরা বেঁচে নেই।'

হতাশায় রানার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'তিনজনই?'

'হ্যাঁ,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো মেজর কুকি।

'কিন্তু...'

রানাকে বাধা দিয়ে মেজর বললো, 'চিন্তার কিছু নেই, মিঃ অ্যাড-ভাইজার। তোমার শিং আমরা নিয়ে এসেছি।'

কাঁধে শিং ভর্তি ব্যাগ ঝুলিয়ে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে ফিরে এলো রানা। মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে। তিনজন মূর্খ গ্রামবাসীকে মেরে ফেলেছে গেরিলারা। অথচ আসল শত্রু ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল।

বিবেকের দংশন অনুভব করলো ও। কাজটা গেরিলাদের দেয়া উচিত হয়নি ওর।

জেনারেল উমাঙ্গোর ডেস্কে এক লাইনে সাজানো রয়েছে গণ্ডারের চারটে শিং। কার্পেটের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারী করছে সে। তার পরনে শুধু একটা সাদা সিল্ক শর্টস। দ্রুত হাঁটার সাথে ছন্দ রেখে পেশীগুলো জ্যান্ত সরীসৃপের মতো কিলবিল করছে সারা গায়ে।

একটা সোফায় পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা আর সোহানা। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ।

'আমার নিজের সূত্র থেকেও খবর এসেছে, রানা,' বললো জেনা-রেল। 'প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, মিস সোহানার ধারণাই ঠিক। সংঘবদ্ধ একটা পোচিং রিঙের অস্তিত্ব সত্যি আছে, গোটা দেশে জাল পেতে আছে তারা। অজ্ঞ গ্রামবাসীদের টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানছে, তারাই জন্তু-জানোয়ার মেরে শিং আর দাঁত জড়ো

করছে এক জায়গায়। কিছু সরকারী কর্মচারীও এই কাজে জড়িত—ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, রেঞ্জার, এরা। জড়ো করা দাঁত আর শিং সরকারী গাড়িতে করে লুকিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে শহরে। সোজা এয়ারপোর্টে ঢুকছে গাড়ি, প্লেনে তুলে দেশের সম্পদ পাচার করে দেয়া হচ্ছে বিদেশে।' হতাশ ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা নাড়লো জেনারেল। 'কোনো সন্দেহ নেই, সরকারী মহলের কোনো প্রভাবশালী লোক এই রিঙের হোতা।'

'সবার চোখের সামনে দিয়ে প্লেনে করে পাচার হয়ে যাচ্ছে?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইলো রানা।

সোহানার প্রশ্ন, 'এয়ার জিম্বাবুই কার পোর্টফোলিও?'

'জেনারেল টস মাজুলেটের। সবার চোখের সামনে দিয়ে, হ্যাঁ। সরকারী গাড়ি, সরকারী প্লেন, সরকারী নিরাপত্তা রক্ষীদের পাহারা—কার কি বলার আছে? ভুলে যেয়ো না, রানা, জেনারেল মাজুলেটকে কমবেশি সবাই ভয় করে।'

'ক'দিন পরপর এই ঘটনা ঘটে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ক্যাপটেন ভালডেজের দিকে তাকালো জেনারেল উমাঙ্গো। ভালডেজ বললো, 'রেগুলার কোনো প্যাটার্ণ নেই। বর্ষা মউশুমে জঙ্গলের অবস্থা খারাপ থাকে, শিকার পাওয়া কঠিন। কিন্তু শুকনো সময়ে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। তবে আমাদের কাছে খবর আছে, আগামী দু'হপ্তার মধ্যে একটা কনসাইনমেন্ট পাচার করা হবে।'

জেনারেলের ভুরু কুঁচকে ওঠায় হঠাৎ চুপ করে গেল ক্যাপটেন। বোঝা গেল, এই তথ্যটা ওদেরকে উমাঙ্গো নিজে দিতে চেয়েছিল। 'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন।' ডেস্কের পিছনে বসে একটা সিগার ধরালো

সে। 'আমরা আরো জেনেছি, অর্গানাইজেশনের চীফ প্রায় প্রতিটি অপারেশনে নিজে অংশগ্রহণ করে।' সোহানার দিকে তাকালো সে। 'মাইনফিল্ডে কয়েক শো হাতিকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়, আপনি ফটো তুলেছিলেন, মনে আছে? আমাদের সোর্স থেকে জানা গেছে, একজন মন্ত্রী, কে তা জানা যায়নি, সরকারী হেলিক-প্টার নিয়ে ওখানে গিয়েছিল। এ-ধরনের আরো ছটো ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে, এয়ারপোর্টে কনসাইনমেণ্ট পৌঁছুবার সময় কেবিনেটের একজন সদস্য নাকি উপস্থিত ছিলো।'

'হয়তো নিজের লোকদের ওপর তার বিশ্বাস নেই,' বললো সোহানা।

জেনারেল জানালো, রিঙের ভেতর নিজেদের একজন লোককে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী কনসাইনমেণ্ট সম্পর্কে আগেভাগে খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে। ভাগ্য বিরূপ না হলে হাতেনাতে ধরা যাবে তাকে। তা যদি সম্ভব না হয়, এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার সাথে সাথে আটক করা হবে কনসাইনমেণ্ট। যাদের অ্যারেস্ট করা হবে তাদের ছ'একজনকে রাজসাক্ষী বানালেই আসল অপরাধীর পরিচয় বেরিয়ে আসবে।

'পোচিং রিঙের হোতাকে গ্রেফতার করার সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী থাকলে ভালো হয়,' বললো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমি চাই, রানা, তোমরা ছ'জনেই আমার সাথে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। জানতে চাইলো, 'পোচিঙের শাস্তি কি?'

'আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি।'

'এ যথেষ্ট নয়।'

'জানি। পার্লামেন্টে নতুন একটা সংশোধনী বিল তোলা হয়েছে,' জেনারেল বললো। 'আমিই তুলেছি। আশা করছি বৃহস্পতিবারে পাশ হয়ে যাবে ওটা। তখন পোচিঙের জন্যে শাস্তি হবে বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

'বারো বছর—হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'এটা ঠিক আছে।'

ক'দিন পরই এক সকালে জেনারেল উমাঙ্গোর ডাক এলো। আশা করা হচ্ছে আজ রাতেই বোধ হয় পোচিং রিঙের হোতা মুভ করবে। জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িটাকে অপারেশন্যাল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে পৌঁছুতে হবে রানাকে। টেলিফোনে ক্যাপটেন ভালডেজ আরো জানালো, সোহানার সাথে কথা হয়েছে জেনারেলের, রানাকে নিয়ে আসার জন্যে এখুনি হারারে এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হচ্ছে সোহানা।

দু'ঘণ্টার মধ্যে কিং'স হেভেনে পৌঁছে গেল সোহানা, ওর জন্যে এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করছিল রানা। সরাসরি হারারে এয়ারপোর্টে পৌঁছুলো ওরা, ওখান থেকে গাড়ি করে জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িতে।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে চারদিকে অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়লো। সামনের লনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুপার ফ্রেলন হেলিকপ্টার, পাশেই পাইলট আর ইঞ্জিনিয়ার হাতে সিগারেট নিয়ে গল্প করছে। গাড়ি-পথ ধরে রানা আর সোহানাকে আসতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো দু'জন, তারপর গুরুত্বপূর্ণ কেউ

নয় ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিলো। বাড়ির এক পাশে ধূসর রঙের চারটে আর্মি ট্রাক রয়েছে, সেগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ফুল ব্যাটল-কিট সহ থার্ড ব্রিগেডের ট্রুপাররা। সবাই খুব অস্থির, যেন নির্দিষ্ট একটা নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

জেনারেল উমাঙ্গোর অফিসে একজোড়া ক্যাম্প টেবিল ফেলা হয়েছে, দেয়ালে সাঁটা বিশাল রিলিফ ম্যাপের দিকে মুখ করে। প্রথম টেবিলে তিনজন জুনিয়ার অফিসার বসে আছে। দ্বিতীয় টেবিলে একটা রেডিও অ্যাপারাটাস রয়েছে, ক্যাপটেন ভালডাজ অপা-রেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে মাইক্রোফোনে কথা বলছে শোনা ভাষায়। হঠাৎ চুপ করে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাপের পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্টকে একটা নির্দেশ দিলো সে। সাথে সাথে রঙিন একটা মার্কার সরিয়ে নতুন পজিশনে রাখলো সার্জেন্ট।

রানা আর সোহানাকে দেখে শুধু মৃদু একটু হাসলো জেনারেল উমাঙ্গো। টেলিফোনে কথা বলছে সে। খানিক পর রিসিভার নামিয়ে ওদের দিকে ফিরে দ্রুত ব্যাখ্যা করলো, 'তিনটে গুদাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমরা। একটা চিমানিমানি পাহাড়ের শাম্বা-তে, বেশিরভাগ চিতার ছাল আর আইভরি রাখা হয়। দ্বিতীয়টা দক্ষি-ণের সিরেজীর কাছে একটা ট্রেডিং পোস্টে—সবই আইভরি। তৃতীয়টা উত্তরে, সম্ভবত টুটি মিশনে। এটাই সবচেয়ে বড় আর দামী কনসাইনমেন্ট—আইভরি আর গণ্ডারের শিং। খবর আছে, তিনটে গুদাম থেকে আজই রওনা হবে ট্রাকগুলো।'

ক্যাপটেন ভালডাজ বাধা দিলো জেনারেলকে। তার হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে পড়লো জেনারেল, বললো, 'গুড। উত্তরের রাস্তায় দুটো প্ল্যাটুন পাঠাও, একেবারে কারোই পর্যন্ত।' আবার

রানার দিকে ফিরলো সে। 'অপারেশন কোড নেম, বাদা। এটা একটা শোনা শব্দ, মানে চিতা। অপারেশন চলার সময় আমরা যাকে সন্দেহ করছি তাকে বাদা বলে ডাকা হবে।' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এই মাত্র খবর পেলাম, হারারে থেকে রওনা হয়েছে বাদা। অফিশিয়াল ম্যাসিডিজে রয়েছে সে, সাথে ড্রাইভার আর দু'জন বডি-গার্ড। তিনজনই ম্যাটাবেল, অবশ্যই।'

'কোন্ দিকে যাচ্ছে?' দ্রুত জানতে চাইলো সোহানা।

'এই মুহূর্তে উত্তরেই যাচ্ছে, কিন্তু এখনো কিছু বলা যায় না।'

'তারমানে সবচেয়ে বড় চালানটার দিকে যাচ্ছে।' ফিসফিস করে বললো সোহানা, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তার রক্ত।

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বললো জেনারেল। 'এখন দেখা যাক, বাদা উত্তরে গেলে আমরা কি করবো। চিমানিমানি আর সিরেজী থেকে যে ট্রাকগুলো আসবে, ওগুলোকে আমরা বাধা না দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসতে দেবো। এয়ারপোর্টে ঢোকার সাথে সাথে থার্ড ব্রিগেডের ট্রুপাররা ওগুলোকে ঘিরে ফেলবে, গ্রেফতার করা হবে ড্রাইভারদের। সারাটা পথে আমাদের লোক থাকবে, ট্রাকগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে।'

রানা একটু গম্ভীর, কিন্তু জেনারেলের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও।

'বাদা, যদি পুব বা পশ্চিমে রওনা হয়, আমরাও তাহলে ওই সেক্টরে অপারেশন পরিচালনা করবো…'

'তাকে ধরার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইলো সোহানা।

'আসলে সুযোগের ওপর নির্ভর করবো আমরা,' বললো জেনা-রেল, 'আর সুযোগ পাবো কি পাবো না সেটা নির্ভর করছে বাদার

অ্যাকশনের ওপর। তার সাথে কনসাইনমেন্টের ফিজিক্যাল কানেক-শন হতে দিতে হবে, তবেই তাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব। ট্রাক আর মার্সিডিজ, দুটোর ওপরই নজর রাখবো আমরা। দুটো এক সাথে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বো।' হাত দুটো ওপরে তুলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করলো জেনারেল।

রেডিও সেট ঘড় ঘড় করে উঠলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর ক্যাপটেন ভালডেজ শান্ত গলায় বললো, 'আর কোনো সন্দেহ নেই, স্যার। কারোই রোড ধরে উত্তরে ছুটছে মার্সিডিজ।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন, কণ্ডিশন থ্রি, পর্যন্ত যেতে পারি আমরা,' নির্দেশ দিলো জেনারেল। হোলস্টারের মুখে বোতাম এঁটে দিলো সে। 'টুটি রোড থেকে সার্ভেইল্যান্স টিম কিছু বলছে না?'

মাইক্রোফোনে তিনবার ডাকলো ক্যাপটেন, সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'নেগেটিভ, জেনারেল।'

'এতো তাড়াতাড়ি আশাও করা যায় না।' লাল বেরেট একটু তেরছা ভঙ্গিতে মাথায় পরলো জেনারেল, রূপালি চিতার মাথা তার ডান চোখের ওপর চকচক করছে। 'তবে এখুনি আমরা আমা-দের ফরওয়ার্ড পজিশনে মুভ করতে পারি।' সবাইকে পথ দেখিয়ে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে।

তাকে দেখেই সিগারেট ফেলে, হ্যাচ দিয়ে হেলিকপ্টারে ঢুকে পড়লো ক্রুরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো জেনারেল, স্টার্টার-মটর জ্যান্ত হয়ে উঠলো, মাথার ওপর ঘুরতে শুরু করলো রোটর।

বেঞ্চে বসে ওয়েস্ট-বেল্ট বাঁধছে সবাই, রানা বললো, 'রট, এটা একটা ফুল স্কেল মিলিটারী অপারেশন, প্রায় ক্রুসেডের মতো।

তারচেয়ে সব দায়িত্ব পুলিশের হাতে ছেড়ে দিলে না কেন?'

'পুলিশ শুধু অযোগ্য নয়, ঘুষখোরও,' স্পষ্ট করে বললো জেনারেল। 'তাছাড়া, রানা, ওগুলো আমারও গণ্ডার ছিলো।'

আকাশে উঠে উত্তর দিকে উড়ে চললো হেলিকপ্টার। মেইন রোড থেকে অনেকটা দূরে থাকলো ওরা, মার্সিডিজ থেকে কেউ যাতে ওদেরকে দেখতে না পায়। এক ঘণ্টা পর কারোই-এর মিলিটারী দুর্গে নামলো হেলিকপ্টার। হাতঘড়ি দেখলো রানা। চারটে বাজে।

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'হ্যাঁ, এটা বোধহয় একটা নাইট অপারেশনই হতে যাচ্ছে।'

কারোই গ্রাম বলতে একটা রাস্তার দু'ধারে দু'চারটে দোকানপাট, একটা সার্ভিস-স্টেশন, একটা পোস্ট অফিস, আর ছোটো একটা পুলিশ স্টেশন। মিলিটারী বেস শহরের আরো খানিক সামনে —গোটা এলাকা কাঁটাতারের বেড়া, আর বিশ ফিট চওড়া বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ঢালু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

লোকাল কমাণ্ড্যাণ্ট, তরুণ এক সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট, জেনারেলের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরকে দেখে কি করবে ভেবে পেলো না। জেনারেল যতোবার কথা বলে, নাটকীয় ভঙ্গিতে ততোবার স্যালুট করতে শুরু করলো সে।

'এই ইডিয়েটকে সরাও,' ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। কমাণ্ড পোস্টের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলো সে। 'বাদার সর্বশেষ পজিশন বলো।'

রেডিও সেট থেকে মুখ তুলে ভালডাজ জানালো, 'বাদা তেইশ মিনিট আগে সিনাইয়া পেরিয়েছে।'

'গুড। ভেহিকেলের নিখুঁত বর্ণনা পেয়েছি আমরা ?'

'ডার্ক ব্লু মার্সিডিজ দুশো আট, বনেটে পতাকা, রেজিস্ট্রেশন পি. এল. ছয় শো চুয়াত্তর। মটর সাইকেল আউটরাইডার বা অন্য কোনো এসকর্ট ভেহিকেল নেই। চারজন আরোহী।'

'সব ইউনিটকে এই বর্ণনা পাঠিয়ে দাও,' নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'তারপর আরেকবার স্মরণ করিয়ে দাও, কোনো অবস্থা-তেই গুলি করা চলবে না। বাদাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় গ্রেফতার করবো।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'বাদা আহত হলে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি খেপে যাবে, সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' আবার ক্যাপটেনের দিকে তাকালো সে। 'এমনকি নিজের জান বাঁচাবার জন্যেও কেউ গুলি করতে পারবে না। এই নির্দেশ কেউ অমান্য করলে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। বাদাকে বা বাদার গাড়িকে লক্ষ্য করে কেউ একটা ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়তে পারবে না।'

এক এক করে প্রতিটি ইউনিটকে ডাকলো ক্যাপটেন, জেনারেলের নির্দেশ কয়েকবার করে রিপিট করলো। এরপর শুধু অপেক্ষার পালা, আর সস্তা এনামেলের মগে চুমুক দিয়ে তেতো চা খাওয়া।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। ঝাঁকি খেয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লো ক্যাপটেন। 'ট্রাকটাকে দেখা গেছে,' দ্রুত অনুবাদ করলো সে। 'সবুজ পাঁচ টনি ফোর্ড, ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। ক্যাবে একজন ড্রাইভার, একজন আরোহী। খুব ভারি, সাসপেনসনের ওপর চেপে বসে আছে। দশ মিনিট আগে সানিয়াটি নদী পেরিয়েছে ওটা, আসছে টুটি মিশনের দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সামনের রোড জাংশনে পৌঁছে যাবে, এখান থেকে বিশ মাইল উত্তরে।'

'তারমানে একই পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে ট্রাক আর মার্সিডিজ,'

নরম সুরে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, তার চোখে প্রত্যাশার চকচকে আলো, যেমন দেখা যায় শিকারীর চোখে।

খানিক পরপর রিপোর্ট আসছে। উত্তর দিকে, অর্থাৎ ওদের দিকে ছুটে আসছে মার্সিডিজ। একটা সেকেণ্ডারি রোড ধরে ধীর গতিতে উল্টোদিক থেকে আসছে ভারি ট্রাক।

জেনারেল উমাঙ্গো এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে, কমাণ্ড্যাণ্টের ডেস্কে পা তুলে দিয়েছে সে, চামড়া মোড়া স্টিক দিয়ে জাংগল বুটের রাবার সোলের কিনারায় একঘেয়ে ছন্দে বাড়ি মারছে—এক সময় রানার কাছে বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো ব্যাপারটা। ক্যাপটেনের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরালো ও, চলতি মাসে দ্বিতীয়বার। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে ছোটো অফিসের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করলো ও।

আরেকটা রিপোর্ট এলো। মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে ক্যাপটেন বললো, 'গ্রামে পৌঁছে গেছে মার্সিডিজ। গ্যাসোলিন নেয়ার জন্যে সার্ভিস স্টেশনে থেমেছে ওরা।'

ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে গাড়িতে বসে রয়েছে টস মাজুলেট, ভাবলো রানা। মনে মনে আরেকবার প্রার্থনা করলো ও, রিঙের লিডার যেন অন্য কেউ হয়, মার্সিডিজে যেন অন্য কেউ থাকে।

বন্ধুর প্রতি সৎ থাকতে চাইছে রানা, আবার একজন ক্রিমিন্যালকে আইনের হাতে তুলে দেয়ার তাগাদাও অনুভব করছে। এক সময় মনে হলো, এই দ্বন্দ্ব ওকে পাগল করে ছাড়বে। পায়চারী করতে করতে মাথার চুলে আঙুল চালালো, চোখ দুটো লালচে হয়ে

উঠেছে।

নিঃশব্দে ওকে লক্ষ্য করছে সোহানা।

ছোটো অফিসের ভেতর হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এলো রানার। ছোট্ট উঠনে বেরিয়ে এলো ও, উঠনটা চারদিক থেকে উঁচু বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা। সূর্য ডুবে গেছে, দিনের শেষ আলোও যাই যাই করছে।

পাশে এসে দাঁড়ালো সোহানা। 'এতো মন খারাপ করো না তো,' নিচু গলায় বললো সে। 'আমার একটা কথা শুনবে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা বললো, 'বলো।'

'তুমি যেয়ো না,' বললো সোহানা। 'এখানে থেকে যাও।'

মাথা নাড়লো রানা। 'না। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। দেখতে চাই সত্যি ওর স্খলন ঘটেছে কিনা।' হঠাৎ ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোহানার একটা কাঁধ খামচে ধরলো ও। 'জানো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! ওকে আমি ভালোবাসি, এই কথাটা আমি ভুলে থাকতে পারছি না!' রানার মতো সোহানার চোখও ছলছল করে উঠলো, কিন্তু তার এই চোখের পানি টস মাজুলেটের জন্যে নয়, রানার জন্যে ওর কষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে সোহানা।

'রানা

কথাটা শেষ করতে পারলো না সোহানা, দড়াম করে খুলে গেল কমাণ্ড পোস্টের দরজা, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমরা রওনা হচ্ছি, রানা!'

মাথা নিচু করে জেনারেলকে অনুসরণ করলো রানা, পাশে সোহানা, ওর হাত ধরে আছে। দুর্গের গেটের কাছে এসে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো ওরা।

সন্ধ্যে নামতেই ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো, শীত শীত করছে ওদের। ল্যাণ্ড-রোভারের বনেট থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে উইণ্ড-স্ক্রীন।

হোসে ভালডেজ গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে জেনারেল উমাঙ্গো। পিছনের সিটে রেডিও অপারেটরের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রানা আর সোহানা। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ভালডেজ, পার্কিং লাইট ছাড়া আর কোনো আলো জ্বলছে না। হুড খোলা দুটো আর্মি ট্রাকে থার্ড ব্রিগেড ট্রুপারদের কালো মাথা গিজ গিজ করছে, পিছু পিছু আসছে ট্রাক দুটো।

প্রায় আধ মাইল সামনে রয়েছে মার্সিডিজ। মাঝে মধ্যে গাড়ি-টার টেইল-লাইট দেখতে পেলো ওরা, ঘন জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ী রাস্তা ধরে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

ওডোমিটার চেক করলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'তেইশ মাইল এসেছি আমরা, সানিয়াটি আর টুটির দিকে বাঁকটা আর দু'মাইল সামনে।' স্টিক দিয়ে ক্যাপটেনের কাঁধে টোকা দিলো সে। 'থামো। জাংশান ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করো।'

শুধু ঠাণ্ডায় নয়, উত্তেজনাতেও রানার শরীর শির শির করছে। ইঞ্জিন চালু রেখেই জাংশান ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করলো ভালডেজ, ফরওয়ার্ড অবজারভেশন টিম গা ঢাকা দিয়ে আছে ওখানে।

'এই তো, যা ভেবেছি।' ভালডেজের গলা কেঁপে গেল। 'বাদা মেইন রোড থেকে বাঁক নিয়েছে, জেনারেল। টার্গেট ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়েছে, ক্রসরোড থেকে দু'মাইল দূরে। বোঝাই যাচ্ছে, আগে থেকে ঠিক করা ছিলো এখানে ওরা মিলিত হবে।'

'গাড়ি ছাড়ো।' নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ফলো দেম!'

আগের চেয়ে জোরে গাড়ি ছোটালো ভালডেজ।

'ওই বাঁক দেখা যায়!' চাপা গলায় বললো জেনারেল। আবছা অন্ধকারেও ধুলো ভরা মেটো পথটা দেখা গেল।

ল্যাণ্ড-রোভারের স্পীড কমিয়ে বাঁক নিলো ভালডেজ। একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে দাঁড়ালো একজন থার্ড ব্রিগেড সার্জেন্ট। লাফ দিয়ে ফুটবোর্ডে উঠলো সে, মুক্ত হাতটা দিয়ে কোনোরকমে স্যালুট করলো। 'এক মিনিট আগে এখান দিয়ে গেছে ওরা, জেনারেল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে, যেন কতো মাইল দৌড়ে এসেছে। 'ট্রাকটা খানিক সামনে। সেটার পিছনে রোডব্লক সেট করেছি আমরা; আপনারা এগিয়ে গেলে এখানেও আরেকটা রোডব্লক থাকবে। ওদের আমরা বোতলের ভেতর আটকে ফেলেছি, স্যার।'

'ক্যারি অন, সার্জেন্ট!' মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো, ক্যাপটেনের দিকে তাকালো। 'পথটা এখান থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে নদীর দিকে। আমরা গড়াতে শুরু করলেই ট্রাকগুলোর ইঞ্জিন অফ করে দিতে বলবে।'

প্রায় একসাথে বন্ধ হয়ে গেল তিনটে ইঞ্জিন, গাড়িগুলো ঢালু পথ বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা, কানে বিস্ফোরণের মতো বাজলো।

পথের বাঁক, মোড় আর মোচড়গুলো আবছা অন্ধকারে অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো ওদের সামনে। ঢাল এই একটাই নয়, একের পর এক অনেকগুলো। কিছুদূর পর পর খানিকটা করে সমতল পথ। ল্যাণ্ড-রোভারের ঠিক পিছনেই রয়েছে ট্রুপারদের ট্রাকগুলো, অন্ধকারে বিশাল আকৃতির কালো দানব মনে

হচ্ছে ওগুলোকে, কোনো আলো জ্বলছে না। প্রতিটি বাঁকে ঝাঁকি খেলো ল্যাণ্ড-রোভার, প্রতিবার রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরে প্রায় ঝুলে থাকলো সোহানা।

'ওই তো ওরা!' হঠাৎ কথা বলে ওঠায়, হিংস্র, কর্কশ শোনালো জেনারেল উম্নাঙ্গোর গলা।

ওদের নিচে, গাছগুলোর সামনে মার্সিডিজের হেডলাইট কখনো উজ্জ্বল দেখালো, কখনো নিষ্প্রভ। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। এক সেকেণ্ডের জন্যে হেডলাইট জোড়া সামনের বাঁকে হারিয়ে গেল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো আলো, আলোর লম্বা ছুটো টানেল মেটো পথের হলদেটে মেঝে উদ্ভাসিত করে তুললো। হঠাৎ করেই উল্টো দিক থেকে জ্বলে উঠলো চোখ ধাঁধানো আরো এক জোড়া হেডলাইট। এতো দূর থেকেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। এই দ্বিতীয় জোড়া হেডলাইট ঘন ঘন তিন বার নিভলো আর জ্বললো—বোঝাই যায়, এটা এক ধরনের সিগন্যাল। সাথে সাথে মন্থর হলো মার্সিডিজের গতি।

'ওদের পেয়েছি।' হিস হিস করে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। হাত বাড়িয়ে পার্কিং লাইট অফ করে দিলো সে।

ওদের নিচে, রাস্তা থেকে সরে গিয়ে, অন্ধকার ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো ট্রাকটা। ট্রাকের ওপর চৌকো একটা ফ্রেম, ফ্রেমের ওপর তেরপল। হেলেদুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথের ওপর চলে এলো, জোড়া আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মার্সিডিজ। দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা।

দু'জন লোক নামলো মার্সিডিজ থেকে। কয়েক পা হেঁটে ট্রাকের দিকে এগোলো তারা, একজনের হাতে একটা রাইফেল। ক্যাবের

পাশে দাঁড়ালো তারা। ক্যাবের খোলা জানালা দিয়ে ট্রাক ড্রাইভা-রের সাথে কথা বলছে।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো ল্যাণ্ড-রোভার, নিচের উপত্যকায় সমতল পথের ওপর উজ্জ্বল আলোর বন্যা। রানার একটা কনুই খামচে ধরেছে সোহানা।

নিচের রাস্তায় একজন লোক তেরপল ঢাকা ট্রাকের পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরালো সে, মুখ তুলে ওপরের রাস্তায় তাকালো। দ্রুতগতি ল্যাণ্ড-রোভারকে দেখে পাথর হয়ে গেল সে। এখন ওরা এতো কাছে চলে এসেছে, ট্রাক আর মার্সিডিজের ইঞ্জিনের আওয়াজ সত্ত্বেও নুড়ি পাথরের সাথে চাকার ঘষা শুনতে না পাবার কোনো কারণ নেই।

ল্যাণ্ড-রোভারের হেডলাইট জ্বাললো জেনারেল উমাঙ্গো, একই সাথে ইলেকট্রনিক বুলহর্ন তুললো মুখে। 'নড়বে না!' উচ্চকিত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠলো নিস্তব্ধ রাতে। 'কেউ পালাতে চেষ্টা করবে না!'

লোক দু'জন লাফ দিয়ে মার্সিডিজের দিকে ফিরতে চেষ্টা করলো। সগর্জনে স্টার্ট নিলো ল্যাণ্ড-রোভার, ঝাঁকি দিয়ে ছুটলো সামনে।

'ওখানেই দাঁড়াও তোমরা। অস্ত্র ফেলে দাও!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করতে লাগলো লোক দু'জন। প্রথম লোকটা হাতের রাইফেল ফেলে দিলো, তারপর দু'জনেই হাত তুললো মাথার ওপর, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিট পিট করছে।

একটু বেঁকে গিয়ে মার্সিডিজের সামনে থামলো ল্যাণ্ড-রোভার,

মার্সিডিজের পথ আটকে দিয়ে। লাফ দিয়ে নিচে নেমে খোলা জানালার দিকে ছুটলো ক্যাপটেন ভালডেজ, হাতের উজি সাবমেশিনগানটা তাক করলো গাড়ির ভেতরে। 'বেরোও!' হুংকার ছাড়লো সে। 'সবাই বেরিয়ে এসো!'

ধুলোর পাহাড় তুলে ওদের পিছনে এসে থামলো ট্রুপারদের ট্রাক দুটো। ঝুপ ঝুপ করে লাফ দিয়ে নামলো সশস্ত্র ট্রুপাররা, ছুটে গিয়ে নিরস্ত্র লোক দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো মাটিতে। চোখের পলকে মার্সিডিজকে ঘিরে ফেললো তারা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো দরজাগুলো। ভেতর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হলো ড্রাইভার সহ এক লোককে।

দীর্ঘদেহী পুরুষ, চওড়া কাঁধ—জেনারেল টস মাজুলেটকে চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। কালো গ্র্যানিট পাথরের মতো শক্ত চোয়ালে উজ্জ্বল আলো পড়ে চকচক করছে। একটা ঝাঁকি দিয়ে গা থেকে সৈনিকদের হাত সরিয়ে দিলো মাজুলেট, অগ্নিদৃষ্টি হানলো—ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে এলো সৈনিকরা। 'কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো জানো? এতো স্পর্ধা, আমার গায়ে হাত দাও!'

গাঢ় রঙের স্ল্যাকস আর সাদা শার্ট পরে আছে সে। কোঁকড়া চুল ভরা মাথাটাকে কামানের গোলার মতো লাগলো। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে, দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। নিজেদের অজান্তেই আরো এক পা করে পিছিয়ে এলো সৈনিকরা, কি করবে বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে হেডলাইটের পিছনের অন্ধকার থেকে সামনে, আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলো জেনারেল উমাঙ্গো। দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো মাজুলেট।

'আচ্ছা, তুমি!' গর্জে উঠলো সে। 'চীফ পোচার!'

'ট্রাক খোলো!' হুকুম দিলো উমাঙ্গো।

দুই জেনারেল পরস্পরের দিকে এমন প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে তাকিয়ে আছে, ওদের চারপাশের আর সব কিছু নিতান্ত তাৎপর্যহীন বলে মনে হলো। এ যেন দুই জন্মশত্রু মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—মহাদেশের সমস্ত ঘৃণা, হিংসা, আক্রোশ আর নির্দয়তার প্রতিনিধিত্ব করছে এই দু'জন।

ল্যাণ্ড-রোভার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এগোতে গেল রানা, কিন্তু হতভম্ব হয়ে মার্সিডিজের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। এ-ধরনের কিছু আশা করেনি ও। সাথে সাথে বুঝে নিলো, পরস্পরের প্রতি ওদের এই আক্রোশ আর ঘৃণা বহু দিনের পুরানো, এই মুহূর্তের কোনো ব্যাপার নয়। মনে হলো, যে-কোনো মুহূর্তে পরস্পরের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওরা।

আটক করা ট্রাকের পিছনে থেকে টুপাররা কাঠের বড় বড় বাক্স টেনে নামাতে শুরু করেছে। পথের ওপর পড়ে গিয়ে একটা বাক্স ভেঙে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা আইভরি, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় সাদা আগুনের মতো দেখালো ওগুলোকে। আরেকটা বাক্স থেকে মহামূল্যবান সোনালি চিতার ছাল বের করলো একজন সৈনিক।

'এই তো প্রমাণ!' উল্লাসে ফেটে পড়লো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ম্যাটাবেল কুকুরটাকে গ্রেফতার করো!'

'তোমার মতলব যাই হোক, এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে, উমাঙ্গো,' জেনারেল মাজুলেটের ভারি গলা শোনা গেল। এখনো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'শোনা বেশ্যার পেট থেকে

বেরিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছো, তোমার হাত ভেঙে দেয়া হবে।'

'বাঁধো ওকে! আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও!' প্রচণ্ড রাগে মাটিতে পা ঠুকলো জেনারেল উমাঙ্গো।

কিন্তু কে বাঁধবে! মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার দিকে এক পা এগোতেই সাহস পেলো না কেউ। মাজুলেটের শরীর থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে শক্তি, সাহস, আর ব্যক্তিত্বের আলো। জেনারেল উমাঙ্গোর হুকুম পেয়েও ইতস্তত করছে সৈনিকরা।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মাঝখানে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে পড়লো সোহানা। পথের ওপর নামানো হয়েছে চিতার ছাল আর হাতির দাঁত, সেদিকে এগোলো। এক সেকেণ্ডের জন্যে সৈনিক আর মাজুলেটের মাঝখানে চলে এলো সে। মাজুলেটের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেউটের ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে খপ্ করে সোহানাকে ধরে ফেললো সে, হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর এনে ফেললো।

পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা, এতো দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করাও সম্ভব হয়নি। সোহানার হাত বাঁকা করে মোচড়ালো মাজুলেট। ককিয়ে উঠলো সোহানা, তার পা দুটো মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়লো। তাকে ঢালের মতো করে নিজের সামনে ধরে আছে মাজুলেট, ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে একটা রাইফেল তুলে নিলো। তার পিছনটা আড়াল করে রেখেছে ল্যাণ্ড-রোভার, সামনে রয়েছে সোহানা।

গুলি করার জন্যে সাব-মেশিনগান তুললো একজন সৈনিক।

'না! খবরদার!'

রানা থামতেই জেনারেল উমাঙ্গো নির্দেশ দিলো, 'কেউ গুলি করলে তাকে আমি জ্যান্ত কবর দেবো! ম্যাটাবেল কুকুরটাকে

জ্যান্ত চাই আমি।'

সোহানার বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে এলো রাইফেলের ব্যারেল, পিস্তলের মতো করে এক হাতে সেটা ধরে আছে মাজুলেট। জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে লক্ষ্যস্থির করলো সে, এক পা এক পা করে ল্যাণ্ড রোভারের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ল্যাণ্ড-রোভারের ইঞ্জিন এখনো সচল।

'কোথায় পালাবে তুমি!' উমাঙ্গোর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'সামনে পিছনে দু'দিকেই রোডব্লক। আমার সাথে একশো লোক রয়েছে। এতোদিনে পেয়েছি তোমাকে।'

রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর আঙুল দিয়ে ঠেলে দিলো মাজুলেট, জেনারেল উমাঙ্গোর পেটের দিকে তাক করলো রাইফেল। মাজুলেটের বাঁ কাঁধের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, গুলি হবার এক পলক আগে ও দেখলো, রাইফেলের ব্যারেল চুল পরিমাণ সরে গেল। বুঝলো, ইচ্ছে করেই উমাঙ্গোর কোমর থেকে এক ইঞ্চি দূরে গুলি করলো মাজুলেট।

বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল, গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন কাভারের খোঁজে ছিটকে গেল চারদিকে।

এক হাতে ধরা মাজুলেটের রাইফেল ওপর দিকে মুখ তুললো, তেরপল ঢাকা ট্রাকে গিয়ে লাগলো গুলি, কয়েক ডজন ফুটো দেখা গেল তেরপলে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল জেনারেল উমাঙ্গো, গুলি না লাগলেও ভয় পেয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে ট্রাকের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। প্রচুর সময় পেলেও, মাজুলেট ওর দিকে দ্বিতীয়বার গুলি করলো না।

সৈনিকরা চারদিকে ছুটোছুটি করছে, গুলি করলে নিজেদের

লোককেই জখম করবে ওরা। ধাক্কা দিয়ে সোহানাকে ল্যাণ্ড-রোভারের প্যাসেঞ্জার সিটে ফেলে দিলো মাজুলেট, একই সাথে নিজে উঠে বসলো ড্রাইভিং সিটে। গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিলো গাড়ি।

'খবরদার, কেউ গুলি করবে না!' ট্রাকের পিছন থেকে নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ওকে আমি জ্যান্ত চাই!'

একজন ট্রুপার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভারের ফুটবোর্ডে, কনুইয়ের এক প্রচণ্ড গুঁতো দিয়ে তাকে ফেলে দিলো মাজুলেট। আরেকজন সৈনিক বোকার মতো ল্যাণ্ড-রোভারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছুটে এসে তার বুকে ধাক্কা দিলো ল্যাণ্ড-রোভার। থ্যাচ্ করে একটা আওয়াজ হলো। বার কয়েক ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো ল্যাণ্ড-রোভার, মট মট করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো।

অন্ধকার পাহাড়ের দিকে ছুটে চলে গেল ল্যাণ্ড-রোভার।

সাত

এক ঝটকায় মার্সিডিজের দরজা খুললো রানা। লাফিয়ে উঠে হুইল ধরলো। খোলা জানালা দিয়ে জেনারেল উম্যাঙ্গোর চিৎকার ভেসে এলো, 'রানা! ওয়েট!'

গ্রাহ্য না করে মার্সিডিজ সিধে করলো রানা, চাপ দিলো অ্যাকসিলারেটরে। তীর বেগে ছুটলো গাড়ি।

পাহাড়ী রাস্তা, প্রথম বাঁকটা যেন স্যাৎ করে উড়ে চলে এলো সামনে। পথের কিনারা উঁচু-নিচু, চাকাগুলো যেন হাতুড়িপেটা শুরু করলো মাটিকে, অসম্ভব ঝাঁকি খেলো গাড়ি। পিছনটা কাত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। পথের কিনারা থেকে নেমে গেল পিছনের একটা চাকা, বাকি তিনটে অবশ্য পরমুহূর্তে টেনে নিলো সেটাকে। বাঁক নেয়া শেষ করে সামনে ল্যাণ্ড-রোভারের লাল টেইল লাইট দেখতে পেলো ও, সাদা ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট।

পরবর্তী বাঁক গ্রাস করলো ওটাকে, ধুলোর ভেতর পথ হারালো রানা। ডান পা তুলে নিয়ে ঘন ঘন এদিক ওদিক হুইল ঘোরালো, মার্সিডিজের নাক বাঁকের হদিশ পাবার ব্যগ্র চেষ্টা করছে। আবার

পিছনের একটা চাকা কিনারা থেকে নেমে গিয়েও উঠে এলো, অল্পের জন্যে রক্ষা হলো, বাঁক নিয়ে সিধে হলো গাড়ি।

ধুলোর ভেতর মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল ল্যাণ্ড-রোভারকে। মার্সি-ডিজের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সোহানা। কিনারায় তার শরীর খানিকটা মোচড় খেয়ে রয়েছে, ছুটন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে নেমে পড়ার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু মাজুলেটের একটা লম্বা হাত এগিয়ে এসে তার কাঁধ খামচে ধরলো, হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এসে ঠেসে ধরলো সিটের সাথে।

স্কার্ফটা মাথা থেকে উড়ে গেল, ডানা ঝাপটানো পাখির মতো হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। ঘন কালো চুল খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মাথায় আর মুখে। পরমুহূর্তে আবার ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। প্রচণ্ড রাগে মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল রানার। মাজুলেটের ওপর ঘৃণায় রী রী করে উঠলো শরীর। পরবর্তী বাঁকটা নিখুঁতভাবে পেরিয়ে এলো ও। বাঁক নেয়া শেষ করে আবার বাড়িয়ে দিলো স্পীড।

আরেকটা বাঁক নেয়ার পর আরো কাছে চলে এলো ল্যাণ্ড-রোভার, মাঝখানে তিনশো গজ দূরত্ব। মাথা উঁচু করে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। আবার বাঁক এসে ছিনিয়ে নিলো তাকে। স্পীড কমিয়ে মোড় ঘুরলো রানা। সামনে রোডব্লক।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে তিন টনী একটা আর্মি ট্রাক। মাটির উঁচু পাড় আর ট্রাকের মাঝখানের ফাঁকটা সদ্য ফেলা কাঁটা-ঝোপ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে, কয়েক গজ চওড়া। ঝোপের ভেতর লোহার বারও দেখা গেল, প্রতিজোড়া বারের মাঝখানে লোহার মোটা চেইন। এই ব্যারিয়ার একটা বুলডোজারকেও ঠেকিয়ে দেবে।

ব্যারিয়ারের সামনে পাঁচজন সৈনিক, হাতের রাইফেল তুলে থামার নির্দেশ দিচ্ছে। এখনো ওরা গুলি করছে না দেখে রানা আশা করলো, জেনারেল উমাঙ্গো সম্ভবত রেডিওতে যোগাযোগ করেছে ওদের সাথে। তবু খোলা ল্যাণ্ড-রোভারে আধশোয়া অবস্থায় সোহানাকে পড়ে থাকতে দেখে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ শুরু করলো। গুলি হলে সোহানা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

অ্যাকসিলারেটরের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, দুটো গাড়ির মাঝখানে দূরত্ব এখন আরো কমে এসেছে। ব্যারিয়ারের একশো গজ এদিকে রাস্তা বরাবর ডানদিকের পাড়টা নিচু। হঠাৎ সেদিকে ফিরলো মাজুলেট, ভোঁতা নাক ল্যাণ্ড-রোভার উড়ে পেরিয়ে গেল জায়গাটা, চার চাকা দিয়ে মাটি খামচে চূড়া টপকালো, ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের হলুদ, উঁচু ঘাসের ভেতর। রানা বুঝলো, মাজুলেটকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। মার্সিডিজের ইঞ্জিন মাটির খুব কাছাকাছি ঝুলছে, পাড়ের মাথায় পেটটা বেধে যাবে। নিচু জায়গা-টাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো মার্সিডিজ। উড়ে সামনে চলে এলো রোডব্লক, সংঘর্ষের আগ মুহূর্তে সজোরে ব্রেক করলো রানা। ঘুরে গিয়ে রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো মার্সিডিজ, মুহূর্তের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল ধুলি-ঝড়ে। শরীরের এক ধাক্কায় দরজা খুললো রানা, হোঁচট খেতে খেতে রাস্তায় নামলো।

হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ের মাথায় উঠলো রানা। বিশ গজ সামনে ল্যাণ্ড-রোভার, লো গিয়ারে গর্জন করছে ইঞ্জিন, এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে। গাছগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা দখল করে রয়েছে ঘন হলুদ ঘাস, আঙুলের মতো মোটা ডাঁটা, মাথা সমান উঁচু। সেগুলোকে নত করে এগিয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার গতি

মন্থর হলেও ঘুর পথে রোডব্লককে পাশ কাটাচ্ছে মাজুলেট।

ছুটলো রানা। সোহানার জন্যে উদ্বেগ ওর পায়ে যেন ঝড়ের গতি এনে দিলো, উঁচু-নিচু মাটিতে মাত্র একবার হোঁচট খেলো ও।

ওকে পিছু নিতে দেখলো মাজুলেট, এক হাতে রাইফেল তুললো। রানার দিকে লক্ষ্য স্থির করছে সে, রাইফেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সোহানা। নিচু হলো রাইফেলের ব্যারেল। অপর হাতটা হুইল থেকে সরাতে পারছে না মাজুলেট, মুঠোর ভেতর জ্যান্ত কৈ মাছের মতো লাফাচ্ছে সেটা। ইতিমধ্যে রোডব্লক ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, প্রতি মুহূর্তে ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে চলে আসছে রানা।

মাজুলেট আর সোহানা ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু দশাসই কালো লোকটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করে নিলো। হাতটাকে দা-এর মতো ব্যবহার করলো সে, কানের নিচে একটা কোপ খেয়ে ড্যাশ বোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সোহানা। এবার দু'হাতে হুইল ধরলো মাজুলেট, ঘুরে গেল ল্যাণ্ড-রোভার, খানিকটা পিছিয়ে পড়লো রানা।

একটা ঢাল বেয়ে উঠলো গাড়ি। ঢালের মাথায় মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো, তারপরই ঝাঁপ দিলো ওপর থেকে—ঘুরন্ত চাকা আর মেটাল বডির কর্কশ আওয়াজ নিয়ে আছাড় খেলো রাস্তার ওপর।

ঢাল থেকে পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ল্যাণ্ড-রোভার, প্রাণপণে ছুটলো রানা। ঢালের মাথায় উঠে এলো ও। ওর দশ ফুট নিচে, কী আশ্চর্য, এখনো চার চাকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাণ্ড-রোভার। স্টিয়ারিং হুইলের সাথে বাড়ি খেয়ে কপাল ফেটে গেছে মাজুলেটের, গাড়িটাকে আয়ত্তে আনার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা

চালাচ্ছে।

লাফ দিলো রানা, পতনের ফলে দম আটকে এলো। ল্যাণ্ড-রোভার হঠাৎ গতি পেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। এই সময় সেটার টেইল-গেটের ওপর অর্ধেক শরীর দিয়ে পড়লো রানা। শক্ত লোহার সাথে ঠোকর খেয়ে পাঁজরগুলো যেন গুঁড়িয়ে গেল। কেউ যেন মুঠোর ভেতর নিয়ে চেপে ধরেছে ফুসফুস, হুস করে বেরিয়ে গেল বুকের সব বাতাস। চোখে ঝাপসা দেখলো রানা। রেডিও সেটটা ধরে ফেলে কোনো রকমে ঝুলে থাকলো।

ব্যথা আর আতংকে ফোঁপাচ্ছে সোহানা। আওয়াজটা প্রকৃতিস্থ করলো রানাকে, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। টেইল-গেটের পিছনে ঝুলে রয়েছে ও, পা দুটো শূন্যে। ওর পিছনে, রোডব্লক পেরিয়ে এসেছে আর্মি ট্রাক। হেডলাইটের আলো নিয়ে সগর্জনে ধাওয়া করে আসছে সেটা। ল্যাণ্ড-রোভারের সামনে, মেইন রোডে একটা তেমাথা—গতি ফিরে পেয়ে সেদিকে ছুটছে মাজুলেট।

বাঁকের জন্যে তৈরি ছিলো রানা, তবু অনুভব করলো বাহু দুটো শোল্ডার-সকেট থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। মাত্র দু'চাকায় ভর করে বাঁদিকে বাঁক নিলো মাজুলেট, উত্তর দিকে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। জিম্বাবুই সীমান্ত একশো মাইল সামনে। পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, পথের সবখানে ৎসেৎসি মাছির ঝাঁক, কোথাও কোনো লোক-বসতি নেই। সাথে জিম্মি থাকায় মাজুলেটের পক্ষে সীমান্তে পৌঁছানো সম্ভব, রানা যদি হাল ছেড়ে দেয়, কিংবা বাধা দিতে গিয়ে সোহানা আর নিজের মৃত্যু ডেকে আনে।

একটু একটু করে নিজেকে ল্যাণ্ড-রোভারে তুলে আনতে চাইছে রানা। সিটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সোহানা, প্রতিটি

ঝাঁকির সাথে তার মাথা এদিক-ওদিক দুলছে। তার পাশে দীর্ঘদেহী মাজুলেটের চওড়া কাঁধ, সাদা শার্ট হেডলাইটের আলোয় ঝলমল্ করছে।

শরীরটা আরো একটু তোলার জন্যে সিটের পিছনটা এক হাতে ধরলো রানা। সাথে সাথে ঘুরে গেল ল্যাণ্ড-রোভারের নাক, আচমকা ঝাঁকি খেয়ে আরেকটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো রানা। পলকের জন্যে মাজুলেটের রক্তচক্ষু দেখা গেল ভিউমিররে। রানাকে লক্ষ্য করছিল সে, দুর্বল মুহূর্তে গাড়ির নাক ঘুরিয়ে বেসামাল করতে চেয়েছিল ওকে।

ঘন ঘন দিক বদল করছে ল্যাণ্ড-রোভার, গাড়ির গায়ে একবার এদিক একবার ওদিক আছাড় খাচ্ছে রানার শরীর। শুধু বাঁ হাতে রেডিও সেটটা ধরে আছে ও, শরীরের সমস্ত ভার পড়ায় মনে হলো ছিঁড়ে যাবে হাতটা। স্টীলের কিনারায় আহত পাঁজর ঘষা খেলো, চোখে অন্ধকার দেখলো ও, কিন্তু রেডিও সেটটা ছাড়লো না কিছুতেই।

রানাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিতে চাইছে মাজুলেট। এঁকেবেঁকে ছুটছে ল্যাণ্ড-রোভার, ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে রাস্তার দু'দিকের পাড়ে।

গাড়ি একবার সিধে হতেই সুযোগটা নিলো রানা। পিছনের সিট ধরে ফেললো ও, সিটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা, তারপর মুক্ত হাতটাকে মাজুলেটের ঘাড়ের ওপর চাবুকের মতো ব্যবহার করলো। প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে গুঙিয়ে উঠলো মাজুলেট, হুইল থেকে হাত দুটো ছুটে গেল। পিছনে হাত উঠিয়ে রানার কব্জি আর কনুই ধরতে চেষ্টা করলো সে, আহত পশুর মতো ফোঁসফোঁস করছে। পোষ না মানা হুইল আপনা থেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। রাস্তা

থেকে ছিটকে সরে এলো ল্যাণ্ড-রোভার, হেলেদুলে ঢালের মাথায় উঠলো, তারপর ডিগবাজি খেতে শুরু করলো।

সিট থেকে হাতটা ছুটে গেল রানার, ছিটকে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। দড়াম করে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো শরীরটা, একটা কি দুটো গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা তুললো ও।

মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে ল্যাণ্ড-রোভার। হেডলাইট এখনো জ্বলছে, বিশ গজ দূরে আলোর একটা টানেলের মধ্যে শুয়ে আছে সোহানা। ছোট্ট একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। চোখ দুটো বন্ধ, মুখে প্রশান্তির ভাব, কিন্তু কপাল আর চুলের মাঝখানে মোটা লাল একটা দাগ জ্বল জ্বল করছে।

রক্ত দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার দিকে এগোলো ও, আবছা অন্ধকার থেকে উঠে দাঁড়ালো একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি।

টলছে মাজুলেট, হাত দুটো আহত ঘাড়ের ওপর। তাকে দেখে রাগে যেন অন্ধ হয়ে গেল রানা। দাঁড়ালো।

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখলো মাজুলেট, স্থির হয়ে গেল সে। তারপর সামনে এগোলো। সামনাসামনি হলো ওরা, পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। অনেক দিন আগে, যখন বন্ধুত্ব ছিলো, কুস্তি আর বক্সিং লড়েছে ওরা। মাজুলেটের গায়ে অসুরের শক্তি, সে-কথা ভুলে গেছে রানা। ওকে দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে নিলো মাজুলেট, ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু মাজুলেটকে ছাড়লো না রানা, তাকে নিয়ে ঘাসের ওপর পড়লো ও। রানার ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে যেতে চাইলো মাজুলেট। বাধা না দিয়ে নিজেও তার সাথে খানিকটা

গড়ালো রানা, উঠে পড়লো মাজুলেটের গায়ে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো মোটা গলাটা।

ছটফট করছে মাজুলেট, উরুর চাপ দিয়ে তাকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো রানা। মাজুলেটের গলায় ওর আঙুল ডেবে যাচ্ছে। লোমশ কালো দুটো হাত উঠে এসে রানার গলা চেপে ধরলো। কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে এসেছে মাজুলেটের। হাত দুটোয় জোর পাচ্ছে না। নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়লো একটু পরই।

তার গলায় চাপ আরো বাড়ালো রানা। দম আটকে গেছে মাজুলেটের। মারা যাচ্ছে সে।

হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সরে এলো রানা। কাঁপছে ও, হাঁপাচ্ছে। মাজুলেটকে খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার দিকে এগোলো রানা। সোহানার মাথাটা তুলে কোলের ওপর রাখলো। এক হাত দিয়ে রক্তের ধারাটা মুছলো, সোহানার চোখে পড়ার আগেই। ওদের ওপরে, রাস্তায়, ব্রেক করার আওয়াজ হলো। আর্মি ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলো সৈনিকরা। ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে তারা।

ঘুম থেকে যেন এক শিশু জাগছে, নড়ে উঠে বিড়বিড় করে কি যেন বললো সোহানা।

বেঁচে আছে, এখনো বেঁচে আছে। ফিসফিস করে বললো রানা, 'সোহানা, চোখ খোলো!' ঠোঁট নামিয়ে তার চোখে চুমো খেলো ও।

সোহানার দুটো পাঁজরে চিড় ধরেছে, মচকে গেছে ডান পায়ের গোড়ালি। কপালের ওপর খুলিটা ফাটেনি, শুধু খুলির চামড়া

ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু ঘাড়ে যেখানে মাজুলেট রদ্দা মেরেছিল, জায়গাটা ফুলে আছে, ব্যথাও খুব। জেনারেল উমাঙ্গোই সব ব্যবস্থা করে দিলো, হারারে-র একটা সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হলো সোহানা।

টস মাজুলেটের মুক্তির দাবিতে ম্যাটাবেল উপজাতির লোকেরা সারা দেশে মিছিল বের করলো। কিন্তু থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা ম্যাটাবেলদের প্রতিটি সমাবেশ ভেঙে দিলো, কোথাও কোনো ধর্মঘট সফল হতে পারেনি। কয়েক দিনে গ্রেফতার হলো প্রায় তু'হাজার ম্যাটাবেল।

শিজারিরা ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে রানা। সোহানাকে ফেলে হারারে থেকে নড়ার উপায় নেই ওর।

ম্যাশোনাল্যাণ্ড ডিভিশনের তু'নম্বর কোর্টে মামলা উঠলো। কোর্ট ভবন, আশপাশের সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এদের বেশির ভাগই ম্যাটাবেল। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে থার্ড ব্রিগেডকে তলব করা হয়েছে, হাতে কারবাইন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে তারা। জনতার মধ্যে কোনো রকম অশান্ত ভাব নেই, সবাই গম্ভীর এবং বিষণ্ন। শুধু আসামীকে যখন কোর্ট ভবনে নিয়ে আসা হলো, ভিড়ের মধ্যে থেকে চাপা একটা গুঞ্জন উঠলো। আর, কোর্টরুমের ভেতরে, দর্শকদের আসন থেকে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে জেনারেল মাজুলেটকে স্যালুট করলেন এক ভদ্রমহিলা, চিৎকার করে বললেন, 'নেতা দীর্ঘজীবী হোন। এ প্রহসন বন্ধ করো।' সশস্ত্র গার্ডরা ছুটে এলো, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সাথে সাথে কোর্টরুম থেকে বের করে দেয়া হলো ভদ্রমহিলাকে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো

জেনারেল টস মাজুলেট। শুধু তার শারীরিক উপস্থিতিই আর সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে। তার রাশভারি চেহারা, চওড়া কাঁধ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠলো, তাতে এমনকি মাননীয় বিচারককেও সাধারণ একজন লোক বলে মনে হলো।

বিচারকের ছ'পাশে কালো আলখাল্লা পরা ছ'জন জুরী বসে আছেন, ইচ্ছে করলে বিচারক তাঁদের পরামর্শ চাইতে পারবেন, কিন্তু বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত, জুরীদের মতামত তিনি গ্রাহ্য করতেও পারেন, নাও পারেন। ওঁরা তিনজনই শোনা।

বড় ধরনের অভিযোগের সংখ্যা আট। শিকার করা নিষিদ্ধ এমন বন্য প্রাণীর দাঁত এবং ছাল অবৈধভাবে রফতানী, একজন ভদ্রমহিলাকে জিম্মি রাখা, মারণাস্ত্র ছিনতাই, গুরুতর শারীরিক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, খুন করার চেষ্টা, গ্রেফতার এড়াবার জন্যে শক্তি প্রয়োগ, মোটর ভেহিকেল চুরি, সরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন। ছোটোখাটো আরো বারোটা অভিযোগও আছে।

'মাই গড,' সোহানাকে ফিসফিস করে বললো রানা, 'ওরা দেখছি ওকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে।'

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' একমত হলো সোহানা। 'আমিও চাই শয়তানটা উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

'দুঃখিত, ডার্লিং,' মৃদু হেসে বললো রানা, 'ওগুলোর একটাও ক্যাপিটাল চার্জ নয়।'

কিন্তু শুনানি চলাকালে কেন যেন বার বার মনে হলো রানার, গোটা ব্যাপারটা স্রেফ একটা প্রহসনের অংশ মাত্র। মাজুলেট যেন পৌরাণিক কাহিনীর একজন বীর, আর নীচ প্রকৃতির কিছু লোক

তাকে অপদস্থ করার জন্যে একজোট হয়েছে।

প্রথম সাক্ষী হিসেবে এলো জেনারেল ব্লট উমাঙ্গো। আসামী পক্ষের উকিল একজন শ্বেতাঙ্গ, ঝানু আইনবিদ, ক্রস এগজামিন করে উমাঙ্গোকে তার জবানবন্দি থেকে এক চুল সরাতে পারলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সাক্ষীর আশায় থাকলেন ভদ্রলোক।

দ্বিতীয় সাক্ষী তেরপল ঢাকা ট্রাকের ড্রাইভার। লোকটা প্রাক্তন ম্যাটাবেল গেরিলা, সম্প্রতি একটা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়েছে। সবার আগে এই ড্রাইভারই মাজুলেটকে ডোবালো।

ড্রাইভার জানালো, মাসকয়েক আগে জেনারেল টস মাজুলেটের নির্দেশে অবৈধ হাতি শিকারে অংশগ্রহণ করে সে। প্রায় তিন শো হাতিকে খেদিয়ে মাইনফিল্ডে নিয়ে যায় তারা। হাতিগুলো মারা যাবার পর সেখানে জেনারেল মাজুলেট স্বয়ং একটা সরকারী হেলি-কপ্টার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর সরকারী বাহি-নীর হাতে গ্রেফতার হয় সে, কিন্তু কিছুদিন আগে জেনারেল মাজু-লেট নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। না, পুনর্বাসন কেন্দ্রে ক্যাপ্টেন হোসে ভালডেজ বা থার্ড ব্রিগেডের আর কেউ তার সাথে দেখা করেনি। না, জেনারেল মাজুলেটের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে কেউ তাকে মুক্তি দেয়নি। পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বেরুবার পর তাকে নির্দেশ দেয়া হয় জেনারেল মাজুলেটের সাথে দেখা করার জন্যে। দেখা হলে জেনারেল মাজুলেট তাকে একটা দায়িত্ব দেয়। টুটি মিশন থেকে আইভরি আর চিতার ছালসহ একটা ট্রাক বিমান বন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

রানা লক্ষ্য করলো, জেরার সময় ড্রাইভার একবারও মাজুলেটের

দিকে তাকালো না।

তিনদিন পর সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ালো রানা। শপথ নেয়ার পর অপেক্ষা করছে ও, আসামী পক্ষের উকিল জেরা শুরু করেননি এখনো, এই সময় ডান হাত দিয়ে একটা সংকেত দিলো জেনারেল মাজুলেট।

গেরিলা হিসেবে ট্রেনিং নেয়ার সময় এই পদ্ধতির সংকেত রানাই শিখিয়েছিল মাজুলেটকে। যুদ্ধের সময় বহুবার এই সংকেত ব্যবহার করে বিপদ এড়িয়ে গেছে ওরা। এটা শুধু ওরা দু'জনেই জানে, ওদের এই নিঃশব্দ ভাষা তৃতীয় কেউ বুঝবে না।

ডান হাতটা মুঠো করলো মাজুলেট, চার আঙুলের ভেতর চাপা পড়ে গেল বুড়ো আঙুলটা। এর অর্থ হলো, 'সাবধান। সামনে চরম বিপদ।'

গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। এটা কি একটা হুমকি, না সৎ পরামর্শ? একদৃষ্টে মাজুলেটের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কিন্তু মাজুলেট অন্য দিকে ফিরে আছে, তার চেহারা নির্লিপ্ত। রানা তাকে একটা সংকেত দিয়ে জানতে চাইলো, 'আবার বলো! তোমার সংকেত আমি ধরতে পারিনি।' কিন্তু মাজুলেট ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

প্রশ্ন পর্ব শেষ হতে আসামী পক্ষের উকিল ক্রস এগজামিনের জন্যে উঠলেন, কিন্তু হাত নেড়ে তাঁকে নিষেধ করলো মাজুলেট। 'নো কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ,' বলে বসে পড়লেন শ্বেতাঙ্গ আইনবিদ। জেরার মুখে পড়তে হলো না রানাকে, উইটনেস বক্স থেকে নেমে এলো ও।

এরপর সোহানার পালা। গোড়ালি এখন আর ফুলে নেই, তবু

একটু একটু খোঁড়াচ্ছে সে। জেরার শুরুতেই জিজ্ঞেস করা হলো, জেনারেল মাজুলেট তাকে ধরার পর কি অনুভূতি হয়েছিল তার? সোহানা বললো, মৃত্যুভয় জেগেছিল মনে। এরপর হাসপাতালের রিপোর্ট চাওয়া হলো, এই রিপোর্টে লেখা আছে কোথায়, কি ধরনের আঘাত পেয়েছে সোহানা। এবারও মাজুলেটের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে শ্বেতাঙ্গ উকিল ক্রস এগজামিন থেকে রেহাই দিলো সাক্ষীকে।

পরদিন মাজুলেটের শোফার সাক্ষী দিলো। না, কোথায় যেতে হবে তা তাকে জেনারেল মাজুলেট বলেননি। ডান দিকে বাঁক নাও, বাঁ দিকে ঘোরো, এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার পর থেকে জেলখানায় আছে সে। তার মাথা ফুলে আছে কেন? কেউ কি মেরেছে? আসামী পক্ষের উকিলের এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বলে দাবি করলো পাবলিক প্রসিকিউটর। বিচারক বললেন, সাক্ষী ইচ্ছে করলে এই প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পারে। এরপর আসামী পক্ষের উকিল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তাঁর আর কোনো প্রশ্ন নেই। এবার সাক্ষীর সামনে দাঁড়ালো, পাবলিক প্রসিকিউটর। ট্রাকটা তাহলে হেডলাইট জ্বেলে সংকেত দেয় তোমাকে? হ্যাঁ। তারপর কি ঘটলো? জেনারেল মাজুলেট বললেন, ওই আমাদের ট্রাক—একপাশে গাড়ি থামাও।

পাবলিক প্রসিকিউটর বিজয়ীর হাসি হেসে বললো, 'নো ফারদার কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ।'

আবারো লক্ষ্য করলো রানা, সাক্ষী ভুলেও একবার মাজুলেটের দিকে তাকালো না।

এরপর টুটি মিশনের শিক্ষিকা মিরাণ্ডা নয়নির পালা। উইটনেস

বক্ষে দাঁড়িয়ে শপথ নিলো সে, তারপর মুখ তুলে কোমল দৃষ্টিতে মাজুলেটের দিকে তাকালো। মাজুলেট হাসলো না, কিন্তু রেলিঙ ধরে থাকা তার ডান হাতটা নিঃশব্দে নড়ে উঠলো। রানা বুঝলো, মেয়েটাকে গোপন সিগন্যাল দিচ্ছে মাজুলেট।

'সাহসে বুক বাঁধো,' সংকেত দিলো মাজুলেট। 'আমি তো এখনো বেঁচে আছি।' মেয়েটার চেহারায় আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো।

শুরু হলো জেরা। জেনারেল মাজুলেটের সাথে আপনার সম্পর্ক কি? পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি। জেনারেল কি প্রায়ই টুটি মিশনে আপনার সাথে দেখা করতে যেতেন? হ্যাঁ। ঘটনার রাতে কি জেনারেলের যাবার কথা ছিলো? ছিলো, আগের দিন ওর সাথে আমার টেলিফোনে কথা হয়। সে-রাতে আপনার সাথে জেনারেলের দেখা করার পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিলো কি? ছিলো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার বাবার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল ও।

এরপর পাবলিক প্রসিকিউটর ক্রস এগজামিন শুরু করলো। আপনি মন্ত্রী মহোদয় জেনারেল মাজুলেটকে কতোটুকু ভালোবাসেন, তাঁর উপকারের জন্যে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন? পারবো। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলতে হলে বলবেন কি? আসামীর উকিল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, পাবলিক প্রসিকিউটর তাড়াতাড়ি বললো, প্রশ্নটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। তারপর সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলো সে, যদি বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, টুটি মিশনে একটা গুদামের ব্যবস্থা করবেন আপনি, সেখানে হাতির দাঁত আর চিতার ছাল রাখা হবে, আপনি কি বলবেন? না, এ-ধরনের নির্দেশ ও দিতে পারে না···।

যদি বলা হয়, হাতির দাঁতগুলো আপনি দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাকে তুলতে বলেছেন? না। যদি বলা হয়, আপনি জানতেন ট্রাক ভরা হাতির দাঁত ইত্যাদি বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে? না, এ মিথ্যে। ও একজন সৎ মানুষ, ওর চরিত্রে কোনো কালিমা নেই…।

'নো ফারদার কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ,' বললো পাবলিক প্রসি-কিউটর, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার কালো তেল চকচকে চেহারা।

এরপর আসামীর পালা।

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে প্রশ্ন করা হলো জেনারেল মাজুলেটকে। না, তার কোনো জমিজমা বা বাড়ি নেই। না, তার নিজের গাড়ি নেই, সরকারী গাড়ি ব্যবহার করে সে। না, ফরেন ব্যাংক অ্যাকাউণ্টও নেই। কোরাই রোডে কেন গিয়েছিলেন সে-রাতে? মিস মিরাণ্ডা আর তার বাবার সাথে দেখা করার জন্যে। টুটি মিশনে আপনি যাবেন, আর কেউ তা জানতো? ওখানে আমার যাওয়াটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়, ডেস্ক ডায়রীতে লিখে রেখে-ছিলাম। কোথায় সেটা? নেই, আমার সেক্রেটারী বলছে, ডেস্ক থেকে ওটা গায়েব হয়ে গেছে। রওনা হবার আগে আপনি আপনার শোফারকে বলেছিলেন, কোথায় যেতে হবে? বলেছিলাম। কিন্তু আপনার শোফার তাহলে অস্বীকার করছে কেন? হয় ওর স্মরণশক্তি দুর্বল, না হয় কেউ তাকে মিথ্যে কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। রওনা হবার পর কি ঘটলো? কোরই রোডে, রাস্তার একধারে একটা ট্রাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তারপর? ট্রাকের হেড-লাইট তিনবার নিভলো, তিনবার জ্বললো। সেই সাথে রাস্তার ওপর উঠে এলো ট্রাক। আপনার শোফারকে কি বললেন আপনি?

বললাম, এক পাশে থামো, কিন্তু সাবধান—এটা একটা অ্যামবুশও হতে পারে। আপনি তাহলে ট্রাকটাকে ওখানে আশা করছিলেন না? না। আপনি কি বলেছিলেন, ওই আমাদের ট্রাক, একপাশে গাড়ি থামাও? না, বলিনি। এটা একটা অ্যামবুশও হতে পারে, এই কথা দিয়ে আপনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? বেশ কিছু-দিন থেকেই রাস্তা-ঘাটে সশস্ত্র ডাকাতরা গাড়ি থামাচ্ছিল—বিশেষ করে নির্জন রাস্তায় রাতের বেলা। এরপর কি ঘটলো? আমার গাড়ি থেকে বডিগার্ডরা ট্রাক ড্রাইভারের সাথে কথা বলার জন্যে নেমে গেল। ট্রাক ড্রাইভারকে আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, কিন্তু তাকে আগে কখনো দেখিনি আমি। এরপর কি ঘটলো? হঠাৎ করে আমাদের পিছনে আরো গাড়ি দেখলাম। বুল-হর্ণের আওয়াজ পেলাম, বডিগার্ডদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেণ্ডার করতে বলছে। থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা আমার মার্সিডিজ ঘিরে ফেললো, টেনে-হিঁচড়ে নামানো হলো আমাকে। তাদের কাউকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন? হ্যাঁ, তাদের মধ্যে জেনারেল রট উমাঙ্গো ছিলেন। তাঁকে দেখে নিশ্চই আপনি স্বস্তি বোধ করেন? ঠিক উল্টোটা, আমি বুঝতে পারি, কপালে খারাবি আছে। কেন, এরকম মনে হলো কেন? কারণ জেনারেল উমাঙ্গো এমন একটা কুখ্যাত ব্রিগেডের কমাণ্ডে আছে যে ব্রিগেডের কাজই হলো খ্যাতিমান ম্যাটাবেলদের ধ্বংস করা।

পাবলিক প্রসিকিউটার চিৎকার জুড়ে দিলো, 'আই অবজেক্ট, ইওর অনার! থার্ড ব্রিগেড রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর একটা ইউনিট, এবং জেনারেল রট উমাঙ্গো জনপ্রিয় ও সম্মানী একজন অফিসার...'

বিচারক রাগে কাঁপতে শুরু করলেন। 'প্রখ্যাত একজন মুক্তি-

যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ একজন অফিসারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এই কোর্ট বরদাস্ত করবে না। আসামী যদি এভাবে কথা বলেন, তাঁকে আমি ঘৃণা ছড়াবার অভিযোগে দোষী বলে রায় দেবো।'

আসামী পক্ষের উকিল আসামীকে আবার জেরা শুরু করলেন। আপনি উপলব্ধি করলেন, আপনার প্রাণ বিপন্ন? হ্যাঁ। ট্রাক থেকে আইভরি আর ফার নামানো হলো, আপনি দেখতে পেয়েছিলেন? হ্যাঁ। আপনার প্রতিক্রিয়া কি হলো? বুঝলাম, এটা আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। ওরা আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর আপত্তি জানালো।

বিচারক বললেন, 'এরপর আমি আর আসামীকে সাবধান করবো না।'

এরপর ক্রস এগজামিন। মিস সোহানাকে আপনি শুধু জিম্মিই রাখেননি, তাঁকে আপনি আঘাতও করেন—কেন? তিনি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে চেষ্টা করছিলেন, আমি চাইনি পড়ে গিয়ে তিনি আহত হোন। আপনি জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে রাইফেল তাক করেছিলেন? হ্যাঁ, রাইফেল তাক করে তাকে আমি হুমকি দিয়েছিলাম এবং তারপর আপনি তার তলপেট লক্ষ্য করে গুলি করেন? না, তাকে লক্ষ্য করে গুলি করিনি। তা করলে তাকে গুলিটা লাগতো।

পরদিন আরো দু'ঘণ্টা ধরে ক্রস এগজামিনেশন চললো। অধিবেশন মুলতবি করে দিয়ে বিচারক বললেন, 'রায় দেবো আগামীকাল।'

পরদিন। কোর্ট এলাকা লোকে লোকারণ্য। কোর্টরুমের ভেতর

পিন-পতন স্তব্ধতা। বিচারক তাঁর রায় পড়তে শুরু করলেন।

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না রানা। সারা শরীর শক্ত পাথর হয়ে গেল ওর। প্রতিটি অভিযোগ আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারণ করলেন বিচারক, সেই সাথে আসামীকে গিল্‌টি বলে রায় দিয়ে শাস্তির মেয়াদ ঘোষণা করলেন। সব মিলিয়ে চল্লিশ বছর জেল খাটতে হবে মাজুলেটকে। অর্থাৎ একটা শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে আরেকটা শাস্তির মেয়াদ শুরু হবে। জেলখানায় মাজুলেট যদি খুব ভালো আচরণও করে, ত্রিশ বছরের আগে বেরুতে পারবে না সে। রায় ঘোষণা শেষ হতে পিছনের আসন থেকে কান্নার রোল উঠলো। ম্যাটাবে্‌ল দর্শকরা বুক চাপড়ে কাঁদছে।

দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো দুঃসংবাদ, কোর্ট এলাকায় দাঙ্গা বেধে গেল। গুলি না চালিয়ে উপায় থাকলো না পুলিশের, ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়লো সতেরো জন ম্যাটাবেল।

রায় ঘোষণার সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলো মাজুলেট, তার ঠোঁটে বিদ্রূপ মেশানো এক চিলতে হাসি। রানার সাথে চোখাচোখি হলো তার। মাজুলেটের মুখ থেকে অদৃশ্য হলো হাসি। সংকেত দিলো সে, 'পালাও রানা, তোমার সামনে বিপদ রয়েছে।'

মিরাণ্ডা নয়নি বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো, শেষ একবার প্রিয়তমকে দেখতে চায়। মাজুলেট কোর্ট রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, মিরাণ্ডার উদ্দেশে শেষ সংকেতটা দিলো সে, 'গা ঢাকা দাও। লুকিয়ে পড়ো। ওরা তোমার ক্ষতি করবে।'

মিরাণ্ডার চেহারা দেখে রানা বুঝলো, মেসেজটা ধরতে পেরেছে সে।

শহরের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, ফলে কারফিউ জারি না

করে উপায় থাকলো না। কোর্ট ভবনে দু'ঘণ্টার মতো আটকে থাকলো ওরা, খবর পেয়ে জেনারেল উমাঙ্গো ওদের জন্য কারফিউ পাস আর থার্ড ব্রিগেডের একটা এসকর্ট পাঠিয়ে দিলো। রাজধানীতে সোহানা একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে, ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে সরাসরি সেখানে চলে এলো রানা। পথে ওরা কেউ কোনো কথা বলেনি।

'এখন?' জানতে চাইলো সোহানা।

'বুঝলাম না!' অকারণ ঝাঁঝের সাথে বললো রানা।

'অ্যাই!' চোখ পাকালো সোহানা। 'আমি তোমার বন্ধু—চিনতে পারছো না?'

'চল্লিশ বছর!' ফিসফিস করে বললো রানা। 'এ অবিশ্বাস্য! যদি জানতাম…'

'তখনও কিছু করার ছিল না তোমার, এখনও নেই।'

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঘুসি মারলো রানা। 'দ্য পুওর বাস্টার্ড—ফরটি ইয়ারস!'

চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকালো সোহানা, রানার একটা হাত ধরলো। 'আসছো আমার সাথে?' মাথা নাড়লো রানা।

'কিং'স হেভেনে ফিরতে হবে আমাকে। এই শালার মামলার জন্যে ওদিকের কোনো কাজই এগোয়নি।'

'মানে?' বিস্মিত হলো সোহানা। 'এখুনি তুমি রওনা হতে চাইছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'ক'টা দিন আমি একা থাকতে চাই, সোহানা।'

'নিজের ওপর যাতে টরচার চালাতে পারো। কিন্তু তাতো আমি হতে দেবো না। দাঁড়াও, ব্যাগে দু'একটা জিনিস ভরে এখুনি আমি ফিরে আসছি, ইঞ্জিন বন্ধ ক'রো না।' ঘাড় ফিরিয়ে আর্মি জীপটাকে একবার দেখে নিলো সোহানা। 'ওদের বলো, এখান থেকে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো, এসকর্ট লাগবে না।'

দীর্ঘ পথে খুব কম কথা বললো ওরা, কিং'স হেভেনে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এরই মধ্যে সোহানার ভক্ত হয়ে গেছে টসনে। মেয়ে আলায়তুনে আর ভাবী পুত্রবধূ নিলিকে ডেকে বললো, মালিক রাঙা বউ নিয়ে এসেছে। নিলি এসে বললো, বিবি সাহেবার জন্যে বাথরুমে গরম পানি দেয়া হয়েছে। বাথরুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটু থমকালো সোহানা। টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে রানা, সামনে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। মেহমানদের জন্যে এই শেষ একটা বোতল ছিলো, রানার হুকুম পেয়ে বের করেছে টসনে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সামনের একটা চেয়ারে বসলো সোহানা। একটা সিগারেট ধরালো রানা। ঢক ঢক করে আধ গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ফেললো।

'রানা,' মৃদু স্বরে বললো সোহানা, 'বেশি খেয়ো না।'

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, একটু পর চাঁদ উঠবে। গুলির শব্দ হলো, মনে হলো রাইফেল, কিন্তু বহুদূরে। সোহানার কথা যেন শুনতেই পায়নি ও।

উঠনে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে চিতা আর হায়েনার ডাক। দশ মিনিট চুপচাপ থাকলো সোহানা, ইতিমধ্যে বারতিনেক গ্লাসে চুমুক দিয়েছে রানা। আবার গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ও, আরো তিনবার গুলির আওয়াজ হয়েছে।

'না,' বললো সোহানা। 'আর নয়।'

গ্লাসটা ধরেও ছেড়ে দিলো রানা, ফিরিয়ে নিলো খালি হাত। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ও। পায়চারী শুরু করলো। 'কি থেকে কি হয়ে গেল!' বিড়বিড় করে বললো ও।

'পাপ করলে ভুগতে হয়, রানা।'

থমকে দাঁড়ালো রানা। 'তাই বলে চল্লিশ বছর!' আবার পায়-চারী শুরু করলো ও। তারপর সোহানার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, কণ্ঠস্বরে দ্বিধা আর সংশয়, 'সোহানা, আমরা কোনো ভুল করিনি তো? গোটা ব্যাপারটা সূক্ষ্ম কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো?'

'মামলা চলার সময় এরকম একটা সন্দেহ আমারও যে হয়নি তা নয়,' বললো সোহানা। 'কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটরের ক্রস এগজা-মিন আমার সমস্ত সন্দেহ দুর করে দিয়েছে। মাজুলেট যে অপরাধী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড পেয়েছে সে। চল্লিশ বছর···আমিও আশা করিনি।'

ডিনারের পর আবার ওরা বারান্দায় বসলো। 'আজ রাতে আমি ঘুমাতে পারবো না,' বললো রানা। 'তুমি বাধা না দিলে বোতলটা আমি শেষ করতে চাই।'

'না।' মাথা নাড়লো সোহানা। 'আমি তোমাকে ঘুম পাড়াবো।'

চেয়ার ছাড়লো রানা, টেবিল ঘুরে সোহানার সামনে থামলো। রানার একটা হাত ধরলো সোহানা, দাঁড়ালো। রানার কাঁধে মাথা রাখলো সে, বললো, 'চলো।' তার মুখটা তুলে ধরে আলতো করে চুমো খেলো রানা।

রানার কাঁধে মাথা রেখে এগোলো সোহানা, রানার বেডরুমে

ঢুকলো ওরা। বিছানায় চারটে বালিশ দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকালো রানা, লক্ষ্য করে লজ্জিত একটু হেসে সোহানা বললো, 'আমি না, এ নিশ্চয়ই নিলির কাণ্ড!'

নারীর সমস্ত আদর আর ভালোবাসা দিয়ে রানাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলো সোহানা। রানা হয়তো ঘুমিয়েও পড়তো, কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে মাঝেমধ্যেই গুলির আওয়াজ হলো, চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলো না রানা। মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে টসনের খোঁজ করলো ও।

গুলির শব্দ বহু দূর থেকে এলেও, টসনে আর আলায়তুনে জেগে ছিলো। আলায়তুর্নেকে সোহানার কাছে রেখে টসনেকে নিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো রানা। গ্র্যাস্ল্যাণ্ডে মেয়েকে নিয়ে কুয়াকোপা, আর তার লোকেরা কেমন আছে দেখে আসবে। ওরা নিশ্চই আতংকের মধ্যে আছে।

জেগেই ছিলো কুয়াকোপা। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। সবাইকে ডেকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিলো রানা, বললো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সাথে সাথে তাকে যেন খবর দেয়া হয়।

রাত তিনটের পর গুলির আওয়াজ থামলো। চারটের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো রানা। এতোক্ষণে ঢিল পড়লো সোহানার পেশীতে, বিছানার ওপর বসে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। দরজা খোলাই ছিলো, ভোরের আলো ফুটতে ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকলো টসনে। এক কাপ কফি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল সে।

সকাল দশটায় ঘুম ভাঙলো রানার। শাওয়ার সেরে ব্রেকফাস্ট করলো ও। কুয়াকোপা আর টসনে এলো কাজের ফিরিস্তি নিয়ে। উঠনে দাঁড়িয়ে থাকলো কুয়াকোপার দলবল। সবাই খুব অস্থির,

উদ্বিগ্ন। রানার মনে হলো, খারাপ কোনো খবর আছে, কিন্তু ওরা তাকে ব্যাপারটা গোপন করে যাচ্ছে। বার বার জিজ্ঞেস করেও লাভ হলো না কোনো। কেউ বলতে পারলো না, বা বললো না কাল রাতে কোথায় গুলি হয়েছে।

আজ কোনো কাজ হবে না বলে ওদেরকে বিদায় করে দিলো রানা। ঠিক করলো, ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে নিজেই দেখতে যাবে প্রতিবেশীদের সবাই নিরাপদে আছে কিনা। কিন্তু বাধা দিলো সোহানা। 'তোমাকে আমি একা ছাড়বো না,' বললো সে। 'সিরিয়াস কিছু ঘটে থাকলে টিভি আর রেডিওতে নিশ্চয়ই বলতো।'

সন্ধ্যের পর টিভি স্টেশন খুললো। অন্ধকার ঘরে বসে আছে ওরা। সাতটায় শুরু হলো খবর পড়া। প্রথমেই শোনা গেল জেনারেল টস মাজুলেটের নাম।

সেটের সামনে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলো ওরা। সোহানার চোখে আতংক, রানার চোখে অবিশ্বাস। খবর পড়া শেষ হতে সেট অফ করে দিলো রানা। টলতে টলতে চেয়ারে ফিরে এলো ও। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে থাকলো ওরা। রানার একটা হাত ধরলো সোহানা, সেটা থরথর করে কাঁপছে। 'ছোট্ট দুটো বাচ্চা—একেবারে শিশু। ওদের আতংকের কথা কল্পনা করতে পারো।'

'ওদের আমি চিনতাম। বোস বাবু মাটির মানুষ ছিলেন।' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার, বিড়বিড় করে বললো, 'কিন্তু ম্যাটাবেলরা ওদের মারবে কেন? বোস বাবুকে ওরা দেবতার মতো ভক্তি করতো...।'

'এখন বুঝলে তো, জানোয়ারটাকে জেলে ভরে ঠিক কাজই করেছে ওরা।'

মাথা নাড়লো রানা। 'কিছুই বুঝতে পারছি না, সোহানা। নিরীহ মানুষ মেরে কি লাভ ওদের? এ কাজ কেন করলো ওরা?'

'মাসুম বাচ্চা···আই হেট হিম।'

'ওরা তার নাম ব্যবহার করেছে, তারমানে এই নয় যে হুকুমটা মাজুলেট দিয়েছিল। সে হয়তো কিছু জানেই না।' কথাটায় যুক্তি নেই, জানে রানা।

বিড়বিড় করছে সোহানা। 'ছোটোটার বয়স মাত্র পাঁচ!' চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়লো।

'গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।' চেয়ার ছেড়ে আলমিরার সামনে দাঁড়ালো রানা। হুইস্কির বোতলটা বের করে ফিরে এলো সোহানার পাশে। অস্ফুটে কি যেন বলছে সোহানা, বোঝা গেল না। বোতলের ছিপি খুলে মুখটা তার ঠোঁটের কাছে ধরলো রানা। মাথা নেড়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সোহানা, ব্লাউজের হাতা দিয়ে চোখ মুছলো। বোতল থেকে দু'ঢোক হুইস্কি খেলো রানা। 'ম্যাশোনারা ছাড়বে না। ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে শোনা ট্রুপস লেলিয়ে দেয়া হবে। আগুন জ্বলে উঠবে গোটা দেশে।'

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো সোহানা। 'বর্বরটাকে গুলি করে মারা উচিত!'

আট

অমল বসুর বয়স প্রায় চল্লিশ হলেও, তাঁর চেহারা এবং আচরণে এখনো কিশোরসুলভ ভাব পুরো মাত্রায় বজায় রয়েছে। প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করেন তিনি, ফলে শরীরে মেদ জমেনি। কৌতুক-প্রিয় মানুষ, হাসিটি মুখে লেগেই আছে। চল্লিশ বছর আগে এই দেশেই জন্ম তাঁর, বৈধ নাগরিক হিসেবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন। তাঁর বাবা ব্যবসা উপলক্ষে কোলকাতা থেকে এ-দেশে এসেছিলেন, দেশটাকে ভালো লেগে যাওয়ায় আর ফিরে যাননি। বাবা-মা গত হবার পর অমল বসু ভারতীয় বংশোদ্ভুত একটা পরি-বারের একমাত্র মেয়ে মন্দাকিনীকে বিয়ে করেন। মন্দাকিনী লম্বা, কালো, একহারা। খুব কম কথা বলে সে, তার মনের ভাব বুঝতে হলে তাকাতে হবে চোখের দিকে। মায়াভরা চোখ, স্নেহ আর আদর-সোহাগের অফুরন্ত উৎস।

ছোটোখাটো একটা ফার্ম আছে ওদের। ফার্মে যারা কাজ করে তারা সবাই ম্যাটাবেল। কর্মচারী আর শ্রমিকদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন অমল বসু, বোস বাবু বলতে তারা অজ্ঞান। এই এলাকায় ওটা একটা জনপ্রিয় নাম।

এক ছেলে, এক মেয়ে, দুজনেই বুলাওয়ায়ো-র একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। মেয়েটি বড়, শোভা। গায়ের রঙ শ্যামলা, গাল দুটো ফোলা ফোলা। নয়নের বয়স পাঁচ, বোনের চেয়ে তিন বছরের ছোটো সে। নয়ন দেখতেও মায়ের মতো, স্বভাবটাও ধীরস্থির। একটু বরং গম্ভীরই বলা যায় তাকে। এতো কম বয়সের ছাত্রকে বোর্ডিং স্কুলে নেয়া হয় না, বড় বোন আছে বলে হেড মিসট্রেস ওর ব্যাপারটা বিবেচনা করেছেন।

প্রতি শুক্রবারে সস্ত্রীক শহরে আসেন বোস বাবু, আটাত্তর মাইল দুর থেকে এসে ছেলে-মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান, সাপ্তাহিক ছুটিটা এক সাথে হৈ-চৈ করে কাটান।

বেলা দুটোয় স্কুল থেকে ছেলেমেয়েকে টয়োটা ট্রাকে তুলে নিলেন বোস বাবু। মেলবোর্ণ হোটেলে লাঞ্চ খাওয়া হলো, বিকেলটা কাটলো শপিং সেণ্টারে কেনাকাটা করে। সামনের হপ্তার জন্যে দু বোতল হুইস্কি, পাইপ ট্যোবাকো, আর এক জোড়া রুমাল কিনলেন বোস বাবু। মন্দাকিনী নিজের জন্যে কিছু কিনলো না, শুধু মেয়েটার জন্যে এক জোড়া ফ্রক আর স্বামীর জন্যে একটা হ্যাট কিনলো। জানে, হ্যাটের প্রতি দুর্বলতা আছে বোস বাবুর, কেউ উপহার দিলে ভারি খুশি হন।

চারটের দিকে সবাই আলাদা হয়ে গেল। বোস বাবু গেলেন ম্যাটাবেল ফার্মার'স ইউনিয়নে, ইউনিয়নের কমিটিতে আছেন তিনি। মন্দাকিনী টিকেট কেটে ছেলে আর মেয়েকে তাঁবুর ভেতর বসিয়ে দিলো, ঘণ্টাখানেক সার্কাস দেখবে ওরা। তারপর নিজে ঢুকলো একটা বিউটি পারলারে, চুল বাঁধবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ইউনিয়নের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন

বোস বাবু। মনটা খুশি, সেক্রেটারী আর সদস্যদের সাথে দরকারী কিছু আলাপ সেরে নিয়েছেন। টয়োটা ট্রাকের কাছে এসে দেখেন তাঁর ম্যাটাবেল কর্মচারী এবান একজন শ্রমিকের সাথে মালপত্তর তুলছে। স্পেয়ার পার্টস, ক্যাটল মেডিসিন, রঙের কৌটা ইত্যাদি রাজ্যের জিনিস। ওদের কাজ শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েকে নিয়ে হাজির হলো মন্দাকিনী।

হ্যাটটা ভালো করে মাথায় বসিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বোস বাবু, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন ব্রায়ার পাইপটা। স্ত্রীকে কুর্ণিশ করলেন তিনি, বললেন, 'মাফ করবেন, মিস, মিসেস বোসকে আশপাশে কোথাও দেখেছেন নাকি?' এটা তাঁর একটা প্রিয় কৌতুক, মন্দাকিনীর চোখ দুটো হেসে উঠলো। মাথাটা একটু ঘোরালো সে, স্বামী যাতে তার নতুন বাঁধা চুলের বাহার দেখতে পায়।

বাবার হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে হাত বাড়ালো নয়ন, কিন্তু বড় বোন শোভাও হাত বাড়িয়েছে লক্ষ্য করে পিছিয়ে এলো সে, গম্ভীর সুরে বললো, 'লেডিজ ফার্স্ট।'

বাবার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো শোভা, তারপর ছোটো ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিলো। বাবার অনুকরণে শোভাকে কুর্ণিশ করলো নয়ন। 'ধন্যবাদ।'

নয়ন ছোটো বলে ট্রাকের ক্যাবে, মা-বাবার মাঝখানে বসলো। শোভা বসলো পিছনে, ম্যাটাবেল দু'জনের সাথে। সোয়েটারটা গা থেকে খুলে কোমরে বেঁধে রেখেছে শোভা, মা তাকে সতর্ক করে দিলো, 'এটা পরে নাও, মা, বাড়ি ফিরতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

প্রথম ষাট মাইল মেইন রোড ধরে ছুটলো গাড়ি, তারপর বাঁক

নিয়ে মেটো পথ। খানিক পর ট্রাক থামলো, লাফ দিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে গেট খুলে দিলো এবান। আবার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সকৌতুকে বোস বাবু বললেন, 'বুঝলে, মা-মণি, বাড়ি ফিরে আমরা দেখবো··· বলোতো, কি দেখবো?' প্রতি হপ্তায় ছেলে আর মেয়ের জন্যে কিছু প্রেজেন্টেশন কেনেন তিনি, কিন্তু বাড়িতে ফেরার আগে সেগুলো কাউকে দেখান না।

ট্রাকের পিছন থেকে শোভা বললো, 'বাঘ।'

'হোয়াট!' তাজ্জব বনে গেলেন বোস বাবু। পর মুহূর্তে হুংকার ছাড়লেন তিনি, 'এবান!'

'আমি কিছু বলিনি, বাবু,' হাসি চেপে জবাব দিলো এবান।

'এখানে বেশ বড় একটা খাঁচা দেখছি,' বললো শোভা, 'কাপড় দিয়ে ঢাকা। মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছি, ওতে বাঘের বাচ্চা···'

পাঁচ বছরের নয়ন কচি গলায় একটা আওয়াজ ছাড়লো, 'গুড়ুম!'

মন্দাকিনী ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেলো। 'তার-মানে?'

'বাঘকে আমি গুলি করে মেরে ফেলবো!'

আচমকা চারদিক অন্ধকার করে নেমে এলো আফ্রিকান রাত। বোস বাবু হেডলাইট জ্বেলে দিলেন। ফার্ম এলাকায় ঢুকে ট্রাকের গতি মন্থর করলেন তিনি। উজ্জ্বল আলোয় মোটাসোটা ষাঁড়গুলোর চকচকে চোখ দেখা গেল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ওগুলোর গন্ধ ভাসছে। 'সব শুকিয়ে যাচ্ছে,' বললেন বোস বাবু। 'বৃষ্টি দরকার।'

ছেলেকে বুকের আরো কাছে টেনে নেয় মন্দাকিনী, নয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে।

'পৌঁছে গেছি,' বললেন বোস বাবু। 'নকসি ল্যাম্প জ্বেলে অপেক্ষা

করছে।'

গত দশ বছর ধরে একটা ইলেকট্রিক জেনারেটর কেনার স্বপ্ন দেখছেন বোস বাবু, কিন্তু হাতে টাকা এলেই আরো জরুরী কোনো কাজে সেটা খরচ হয়ে যায়। কাজেই এখনো ওদেরকে গ্যাস আর প্যারাফিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে ল্যাম্পের আলো, বার বার হারিয়ে গিয়ে ওদের সাথে যেন লুকোচুরি খেলছে।

পিছনের বারান্দার পাশে ট্রাক থামালেন বোস বাবু, হেডলাইট আর ইঞ্জিন বন্ধ করলেন। ছেলেকে বুকে নিয়ে নামলো মন্দাকিনী। ঘুমের মধ্যে মুখের ভেতর বুড়ো আঙুল পুরে চুষছে নয়ন। তার জুতো জোড়া রয়ে গেছে ট্রাকে, খালি পা দুটো দুলছে।

ট্রাকের পিছন দিকে এসে শোভাকে কোলে করে নামালেন বোস বাবু। 'এবান, তোমরা এবার যেতে পারো। মালপত্তর সব কাল সকালে নামাবো আমরা। গুডনাইট।'

শোভার হাত ধরে স্ত্রীর পিছু পিছু বারান্দার দিকে এগোলেন বোস বাবু, কিন্তু বারান্দায় ওঠার আগেই চোখ ধাঁধানো টর্চের আলো এসে পড়লো ওদের ওপর, চারজনের দলটা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'কে ওখানে?' চোখের সামনে একটা হাত তুলে জানতে চাইলেন বোস বাবু, ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছেন। শোভার কব্জিটা আরো জোরে চেপে ধরলেন তিনি।

চোখে আলো একটু সয়ে এলো, টর্চের পিছনটা দেখতে পেলেন তিনি। হঠাৎ করেই স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে তাঁর মনে ভয় ঢুকলো। অসুস্থ বোধ করলেন। বারান্দায় তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি, ব্লু ডেনিম জিনস আর জ্যাকেট

পরে আছে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ-কে ফরটিসেভেন রাইফেল। রাইফেলগুলো ছোট্ট দলটার দিকে তাক করা। চট করে পিছনটা একবার দেখে নিলেন বোস বাবু। পিছনে আরো লোক রয়েছে, ক'জন ঠিক বুঝতে পারলেন না। অন্ধকার থেকে পাঁচ-সাতজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, এবান আর তার সহকারীকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে নিয়ে আসছে।

'ওরা কারা, বাবা?' জিজ্ঞেস করলো শোভা, ভয়ে গলার আওয়াজ ভালো করে ফুটলো না। সন্দেহ নেই, জানে সে। টেলিভিশনে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি দেখেছে।

'কেউ ভয় পেয়ো না,' কথাটা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন বোস বাবু, মন্দাকিনী স্বামীর গায়ের সাথে আরো একটু সেঁটে এলো। মায়ের কোলে নয়ন এখনো ঘুমাচ্ছে, আঙুল মুখের ভেতর।

বোস বাবুর শিরদাঁড়ার ওপর একটা রাইফেলের মাজল ঠেকলো, শিউরে উঠলেন তিনি। তাঁর হাত দুটো ধরে পিছনে নিয়ে যাওয়া হলো, বেঁধে ফেলা হলো কব্জি দুটো এক করে। গ্যালভানাইজড তার ব্যবহার করলো ওরা। চামড়া কেটে মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে গেল তার। এরপর ওরা মায়ের কোল থেকে নয়নকে টেনে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিলো। চোখে এখনো ঘুম রয়েছে বাচ্চাটার, পা টলছে, টর্চের আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার বন্ধ করে ফেলছে চোখের পাতা, আঙুলটা এখনো মুখের ভেতর। পিছমোড়া করে মন্দাকিনীর হাত দুটোও বাঁধলো ওরা। তারটা মাংসের ভেতর ডেবে যেতে একবার শুধু ফুঁপিয়ে উঠলো সে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো। এরপর হাতে তার নিয়ে দু'জন

লোক বাচ্চাদের দিকে এগোলো।

'কচি বাচ্চা ওরা,' সিনডেবেল ভাষায় বললো বোস বাবু, 'প্লিজ, ওদেরকে বেঁধো না। আমার বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি করো না।'

'চোপ শালা, বানচোত!' একই ভাষায় গর্জে উঠলো ওদের এক-জন, নয়নের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে।

'বাবা, লাগছে!' কেঁদে উঠলো নয়ন। 'পাজি, বিল্লি, হুতোম প্যাঁচা। বাবা, ওকে বকে দাও!'

'সাহস ধরো, নয়ন,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বোস বাবু, বোকা লাগলো নিজেকে। অসহায়ত্বের জন্যে নিজেকেই তিনি ঘৃণা করছেন। 'এখন তুমি আর ছোটো নও।'

অপর লোকটা শোভার পিছনে দাঁড়ালো।

'আমি কাঁদবো না,' কথা দিলো শোভা, কান্না চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে: 'তুমি চেয়ে থাকো, বাবা, দেখো আমার কতো সাহস।'

'এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,' বললেন বোস বাবু, লোকটা শোভাকে বেঁধে ফেললো।

'হাঁটো!' হাতের টর্চ নেড়ে বললো তৃতীয় লোকটা। বোঝা যায়, সে-ই লিডার। বাচ্চাদের পিঠে রাইফেলের ব্যারেল ঠেকিয়ে ধাক্কা দিলো সে।

হোঁচট খেয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল নয়ন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা, চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারলো না। ধাপের ওপর অস-হায়ভাবে মোচড় খেতে লাগলো সে।

'ইউ বাস্টার্ড,' বিড়বিড় করে বললেন বোস বাবু। 'ইউ ফিলথি বাস্টার্ড!'

ওদের একজন নয়নের মাথার চুল খামচে ধরে তাকে দাঁড় করালো। টলতে টলতে বোন শোভার দিকে এগোলো সে, শোভা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

'ছেলেমানুষি করে না, নয়ন,' তাকে বললো শোভা। 'এতো এক ধরনের খেলা, তুমি জানো না?' যদিও আতংকে কেঁপে গেল তার গলা, চোখ দুটো বিশাল, কানায় কানায় পানি।

ছেলেমেয়েদের পাশে মা-বাবাকেও দাঁড় করালো ওরা। পালা করে চারজনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলা হলো। উঠনে কি ঘটছে ওদেরকে দেখতে দিতে চায় না।

'কেন?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলেন বোস বাবু। 'কি করেছি আমরা? আমাদের যা আছে সব নিয়ে যাও···।'

ঠাস করে একটা চড় খেলেন বোস বাবু। কোনো উত্তর নেই। শুধু এক দুই সেকেণ্ড পর পর টর্চের উজ্জ্বল আলো পড়ছে মুখে। শব্দ বলতে নয়নের গলায় ভেতর চাপা কান্না। অন্ধকার উঠনে নারী-পুরুষ-শিশু, অনেক মানুষের ফিসফিসানি।

'দেখার জন্যে আমাদের সব লোকদের নিয়ে এসেছে ওরা,' নরম গলায় এই প্রথম কথা বললো মন্দাকিনী। 'ওগো, ওদের বলো, সবার আগে আমাকে যেন গুলি করে।' ছেলেমেয়েরা কেউ তার কথা শুনতে পেলো না।

কি বলবেন ভেবে পেলেন না বোস বাবু। স্ত্রীর ভয়টা যে মিথ্যে নয়, এটুকু তিনিও বুঝতে পেরেছেন, ওদেরকে মারতেই এসেছে লোকগুলো। 'তোমাকে ভালোবাসি, কথাটা আরো অনেকবার বলিনি কেন?' বোকার মতো আক্ষেপ করলেন তিনি।

'সে তো আমি জানিই,' ফিসফিস করে বললো মন্দাকিনী। 'তুমি

ভালো না বাসলে আমি এতো সুখী হলাম কি করে।'

টর্চের আলো ঘুরে গেল উঠনের দিকে। উঠনে ষাট সত্তর জন ম্যাটাবেল ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এই ফার্মেরই কর্মচারী বা শ্রমিক, বোস বাবু বলতে অজ্ঞান।

ভিড়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে লিডার সিনডেবেল ভাষায় শুরু করলো, 'এখানে যাদের বাঁধা হয়েছে, এরা ম্যাশোনা খুনীদের দালাল, এতোদিন গরীব ম্যাটাবেলদের রক্ত পান করেছে।'

উঠনে পিন-পতন স্তব্ধতা।

'আমাদের নেতা টস মাজুলেটকে এরাই ম্যাশোনা কুকুরদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

'মা, শোভা!' কাতর কণ্ঠে ডাকলেন বোস বাবু। 'বাবা, নয়ন।'

'তোমার পায়ে পড়ি।' চাপা গলায় ফুঁপিয়ে উঠলো মন্দাকিনী। কিন্তু সে কি বলতে চায় বোঝা গেল না।

'তোমরাই বলো, এদের নিয়ে কি করবো আমরা?' কর্কশ সুরে জানতে চাইলো লিডার।

'খুন করো!' লিডারের বাঁ পাশ থেকে তারই একজন লোক চিৎকার করে বললো, কিন্তু উঠনের লোকজন কেউ মুখ খুললো না। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে উঠনে নামলো লিডার। ম্যাটাবেলদের মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলো সে, 'বলো, এদের নিয়ে কি করবো? বলো? বলো!'

সবাই চুপ।

রাইফেলের বাঁট দিয়ে সামনে যাকে পেলো তাকেই গুঁতো মারলো লিডার। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো আহত ম্যাটাবেলরা।

'বলো ! কি করবো ? এদের নিয়ে কি করবো ?' বার বার সেই একই প্রশ্ন।

'এবার উত্তর না পেলে গুলি।' দাঁতে দাঁত চাপলো লিডার। 'বলো, এই বেঈমানদের নিয়ে আমরা কি করবো ?'

'খুন করো।' অবশেষে জবাব মিললো। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রথমে একজন বললো কথাটা।

'আবার বলো, কি করবো ?'

'খুন করো।' এবার একাধিক ম্যাটাবেল চিৎকার করলো।

'কি করবো ?'

'খুন করো।' ভিড়ের মধ্যে থেকে বহু লোকের গলা পাওয়া গেল। 'খুন করো। খুন করো।'

'ও আমার নয়ন রে।' ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রৌঢ় এক মেয়েলোক বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলো। তাকে চিনতে পারলো মন্দাকিনী, নয়নের আয়া। কিন্তু তার কান্না ম্যাটাবেলদের উন্মত্ত চিৎকারে চাপা পড়ে গেল। 'খুন করো। খুন করো। খুন করো।'

দু'জন লোক টর্চের আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো, দু'জনেই ডেনিম পরে আছে। বোস বাবুকে ধরে ঘোরালো তারা, দেয়ালের দিকে মুখ করে, তারপর কাঁধে চাপ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করলো।

হাতের টর্চ নিজের একজন লোকের হাতে ধরিয়ে দিলো লিডার, জিনের বেল্ট থেকে বের করলো পিস্তলটা। স্লাইড টেনে ভেতরে এক রাউণ্ড গুলি ভরলো সে। বোস বাবুর ঘাড়ের পিছনে মাজল ঠেকিয়ে একটা মাত্র গুলি করলো, সামনের দিকে ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়লেন বোস বাবু। খুলির ভেতর থেকে হলুদ মগজ

ছুটে গিয়ে সাদা দেয়ালে মাথামাখি হয়ে গেল, তারপর তরল ঘির মতো গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

'ম্-মা!' সাহসিনীর ভূমিকায় শোভার করুণ অভিনয়ে ইতি ঘটলো, দ্বিতীয় বুলেটটা মায়ের কপাল ফুটো করে বেরিয়ে আসতে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, মুখ থুবড়ে পড়লো বারান্দার মেঝেতে। নরম ছল ছল শব্দে বমি শুরু করলো সে।

এক পা এগিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো লিডার। শোভার কপাল মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে, চুলের ছোট্ট দুটো বেণী দুই কানের পিছনে ঝুলে আছে, উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে ঘাড়ের পিছনটা। লিডার তার ডান হাত সবটা লম্বা করে দিলো, শোভার মাথা আর ঘাড়ের মাঝখানের নরম জায়গাটায় পিস্তলের মাজল ঠেকালো। ঝাঁকি খেলো হাতটা, টর্চের আলোয় নীলচে ধোঁয়া দেখা গেল।

নয়নই শুধু ধস্তাধস্তি করলো ওদের সাথে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তাকে একটা বাড়ি মারলো লিডার। তবু বোনের রক্তের ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো অবোধ শিশু। তার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একটা পা রাখলো লিডার। নয়নের কপাল ফুটো করে বেরিয়ে এলো বুলেট, ঠিক ডান কানের সামনে দিয়ে। মেঝেতে ছোট্ট একটা গর্ত করলো বুলেটটা, তাজা রক্তে দ্রুত ভরে উঠলো সেটা।

ঝুঁকে গর্তের ভেতর আঙুল ডোবালো লিডার। সাদা দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখলো সে—টস মাজুলেট দীর্ঘজীবী হোন।

বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে, চিতার মতো, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল লিডার। লাইন ধরে সঙ্গীরা অনুসরণ করলো তাকে।

বুধবারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মুগাবে। 'আমি

কথা দিচ্ছি, তথাকথিত বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হবে।'

টেলিভিশনের পর্দায় স্থির হয়ে আছে দু'জনের চোখ। রানার হাতে কফির কাপ, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি, চুমুক দিতে ভুলে গেছে। বিড়বিড় করে সোহানা বললো, 'প্রাইম মিনিস্টারকে কেমন বুড়ো দেখাচ্ছে।'

'এই ক'দিনে কয়েক হাজার লোক মারা গেছে, তাই না?'

'আর্মি আর পুলিশ ফোর্সকে আমি অর্ডার দিয়েছি, বিদ্রোহীদের প্রতিটি আস্তানা খুঁজে বের করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে ওরা। শুধু বিদ্রোহীদের নয়, তাদের যারা সাহায্য করছে তারও কেউ রেহাই পাবে না। দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, আর্মি এবং পুলিশের সাথে আপনারা সহযোগিতা করুন...।'

হপ্তা ঘুরে আবার শুক্রবার এসে পড়লো। কিং'স হেভেনের জন্যে শুক্রবার মানে বাজার করার দিন, সেই সাথে বুলাওয়ায়ো-তে বেড়ানোরও একটা সুযোগ। সেদিন বেশ সকাল সকাল সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা, ওদের পিছু পিছু চললো নতুন পাঁচটনী ট্রাকটা। ট্রাকের ওপর গিজ গিজ করছে ম্যাটাবেলদের মাথা, ওরা সবাই রানার গ্রাসল্যাণ্ডের লোক, র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করে। বিনা পয়সায় শহরে বেড়াবার সুযোগটা হাতছাড়া করে না কেউ। যে যার সেরা কাপড় পরে চলেছে, পিকনিক পার্টির মতো হাসি-আনন্দে মাতোয়ারা সবাই।

থাবাস ইনডুনাস ক্রস রোডের খানিক আগে রোডব্লকের সামনে পড়লো রানা। যানবাহনের লম্বা একটা লাইন দেখা গেল, বেশির ভাগ গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরছে।

'দেখে আসি কি ব্যাপার,' সোহানাকে বলে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে

নামলো রানা। দ্রুত পা চালিয়ে লাইনের শেষ মাথায় চলে এলো ও।

এ রোডব্লক সাধারণ বা সাময়িক কোনো ব্যাপার নয়। হাইওয়ের দু'দিকে বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা শেলটারে পজিশন নিয়ে রয়েছে সৈনিকরা, ঘেরের ভেতর হেভী মেশিনগান, বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচি-লের মাথার কাছে উঁকি দিচ্ছে কালো রঙের ব্যারেল। পাঁচিলের মাঝামাঝি জায়গায় ফুটো দেখা গেল, লাইট মেশিনগানের ব্যারেল বেরিয়ে আছে। ব্যারেলের পিছনে লালচে বেরেট পরা সৈনিকদের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে কংক্রিট ভরা ড্রাম ফেলে, তার সাথে রয়েছে কাঁটা বসানো লোহার পাত। ব্যারিকেডের দু'ধারে টহল দিচ্ছে রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ পরা থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা। ডোরাকাটা ক্যামোফ্লেজ ব্যাটল-জ্যাকেটে বাঘের মতো লাগছে ওদেরকে।

'কি ব্যাপার, সার্জেন্ট?' ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রাস্তা বন্ধ,' বিনয়ের সাথে বললো সার্জেন্ট। 'শুধু মিলিটারী-পারমিট হোল্ডাররা আসা-যাওয়া করতে পারবে।'

'কিন্তু আমাদের যে শহরে যেতে হবে।'

'আজ নয়।' মাথা নাড়লো লোকটা। 'দেশী-বিদেশী কারো জন্যেই আজ নিরাপদ নয় বুলাওয়ায়ো।'

যেন সার্জেন্টের কথায় সায় দিয়েই শহরের দিক থেকে গুলি-বর্ষণের আওয়াজ ভেসে এলো। ঘাড়ের পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেল রানার। গুলির এই আওয়াজ চেনে ও। অটোমেটিক রাইফেল।

'বাড়ি ফিরে যান, সাহেব,' নরম সুরে বললো সার্জেন্ট। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও বিশেষ নিরাপদ বলে মনে করি না।'

হঠাৎ করেই ট্রাক ভরা লোকজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করলো রানা। ওদেরকে কিং'স হেভেনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ছুটে ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে চলে এলো ও। ক্যাবে উঠে গাড়ির মুখ ঘোরালো।

'কি হলো, রানা?'

'যা ভয় করেছিলাম,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'ব্যাপারটা বোধহয় শুরু হয়েছে।' অ্যাকসিলারেটরের ওপর পা চেপে ধরলো ও।

খানিক দূর যেতেই ট্রাকটাকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ম্যাটাবেল মেয়েরা গান ধরেছে, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে পুরুষরা, বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে ওদের রঙচঙে কাপড়। হাত দেখিয়ে ট্রাকটাকে থামালো রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানিং বোর্ডে। বুড়ো কুয়াকোপা, রানার দেয়া কালো স্যুট পরে ড্রাইভারের পাশে সম্মানের আসনে বসে আছে। 'ট্রাক ঘোরাও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'কিং'স হেভেনে ফিরে চলো সবাই। শহরে ভীষণ গণ্ডগোল। যতো দিন না সব ঠাণ্ডা হয় কিং'স হেভেন থেকে কেউ বেরুতে পারবে না।'

'গণ্ডগোল? কারা গণ্ডগোল করছে? নিশ্চই ম্যাশোনা সোলজাররা?'

'তা জানি না,' বললো রানা। 'তবে রোডব্লকে ওদেরকেই দেখলাম।'

'গু-খেকো বেজন্মার দল!' থো করে থুথু ফেললো কুয়াকোপা।

'আমার অনুরোধ, গুজবে কান দেবেন না,' টেলিভিশনে বক্তৃতা দিচ্ছেন আইনমন্ত্রী। 'সেনাবাহিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করছে, এটা দুষ্কৃতকারীদের জঘন্য মিথ্যে প্রচারণা মাত্র। এ-কথা সত্যি যে বিদ্রোহী ম্যাটাবেল আর সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় মাঝখানে পড়ে গিয়ে দু'একজন লোক হতাহত হয়েছে। তাই বলে হাজার হাজার! হাহ্ হা হাহ্ হা! হাজার হাজারই যদি মারা যায়, লাশগুলো কোথায় দেখতে পারি?...'

সেট অফ করে দিলো রানা। 'হারারে থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না,' সোহানাকে বললো ও। রিস্টওয়াচ দেখলো। 'প্রায় আটটা—বি. বি. সি. কি বলে শোনা যাক।'

বি. বি. সি. খবর দিলো, ম্যাটাবেলিল্যাণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে বের করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে পিল পিল করে ম্যাটাবেল উপজাতির লোকরা ঢুকে পড়ছে। একজন রিফিউজির উদ্ধৃতি দেয়া হলো, 'ম্যাটাবেল পেলেই খুন করছে থার্ড ব্রিগেডের সৈন্যরা। যাকে পাচ্ছে তাকেই।'

ভয়েস অভ আমেরিকা ধরলো রানা। জাপু পার্টির নেতা নকোমো প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানায় পালিয়ে এসেছেন। 'ওরা আমার ড্রাইভারকে গুলি করে মেরেছে,' ভোয়া-র আঞ্চলিক রিপোর্টারকে জানিয়েছেন তিনি। 'মুগাবে আমাকে খুন করতে চায়।' সম্প্রতি জাপু পার্টির প্রভাবশালী অন্যান্য নেতাদের জেলে ভরার ফলে মিঃ নকোমোই ছিলেন ম্যাটাবেলদের একমাত্র নেতা এবং মুখপাত্র। ইতিমধ্যে মুগাবে সরকার পুরোদস্তুর নিউজ ব্ল্যাকআউট আরোপ করেছেন, দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তরফ থেকে পর্য

বেক্ষক পাঠাবার প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেছে হারারে।

'এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি কিছুই করার নেই, রানা?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'সময়ই তা বলে দেবে,' চিন্তিত দেখালো রানাকে। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, তার আর বেশি দেরিও নেই।'

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর গ্রাসল্যাণ্ডে যাবার জন্যে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো ওরা, নিলির কাছে যাবে। সোহানার জন্যে কেনা উপহারটা নিলির কাছে গচ্ছিত রেখেছে রানা, শেষ মুহূর্তে সোহানাকে চমকে দেবে বলে। সোহানার আজ জন্মদিন।

উপহার দেখে কচি খুকীর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সোহানা। 'ইস, কি সুন্দর। নরম তুলতুলে।' ছোট্ট ছানাটাকে তুলে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমো খেলো সোহানা, প্রতিদান হিসেবে সে-ও সোহানার নাক চেটে দিলো।

'বয়স হলে ও একটা বাঘা কুকুর হবে।'

তার গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা আর কুচকুচে কালো, চামড়ার খোলসটা এতো বড় যে আরো একটা ছানা অনায়াসে ঢুকে যাবে ভেতরে। 'দেখো দেখো, কি রকম থাবা দেখো! ছ'মাসেই একটা দানব হয়ে উঠবে। কি নাম রাখা যায় বলো তো?' রানা কিছু বলার আগেই হেসে উঠলো সে। 'কি যেন বললে? বাঘা? ওয়া-ণ্ডারফুল!'

আজ সবার ছুটি, আগেই জানিয়ে দিয়েছে রানা। ল্যাণ্ড-রোভারে বাঘা আর পিকনিক বাস্কেট নিয়ে কুইন'স হেভেনে চলে এলো ওরা। বনের ভেতর, লেকের ধারে চাদর বিছানো হলো। মাথার

ওপর কাঠ-ঠোকরা পাখিদের চঞ্চল ছুটোছুটি, ঝোপের ভেতর পাখা ঝাপটাচ্ছে বনমোরগ, লেকের পানিতে বুনো হাঁস। বাস্কেটে সাদা ওয়াইনের একটা বোতল ভরে দিয়েছে টসনে। অনেকক্ষণ ধরে ফড়িংগুলোকে ব্যর্থ তাড়া করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো বাঘা, চাদরের ওপর সোহানার পাশে নেতিয়ে পড়লো। লাঞ্চ শেষ করলো ওরা, তারপর ছোট্ট একটা ঘুম দিলো। বিকেলের নিস্তেজ রোদে পাশা-পাশি শুয়ে গল্প করলো। এক সময় দু'জনেই আবিষ্কার করলো, সব কথা ফুরিয়ে গেছে। দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকলো মাথায়। চোখ বুজে ছিলো রানা, তার নাকে ঘাসের একটা ডগা ঢুকিয়ে দিলো সোহানা। তার হাতটা খপ করে ধরে ফেললো রানা, তারপর বিকট শব্দে একটা হাঁচি দিলো। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল বনমোরগ আর কাঠ-ঠোকরার ঝাঁক।

শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। এবং যা হয়, পুরুষের বাহুবন্ধনে আটকা পড়লো নারী।

'এই আস্তে,' ফিসফিস করে বললো সোহানা, 'বাঘার ঘুম ভাঙিয়ো না!'

ঘুম ভাঙলো গুলির শব্দে।

পুরোপুরি সজাগ হবার আগেই, ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা রিফ্লেক্স বিছানা থেকে নামিয়ে দিলো রানাকে। আওয়াজ-গুলো অটোমেটিক রাইফেলের, সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ, খুব কাছ থেকে আসছে। সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ মানে দক্ষ, ট্রেনিং পাওয়া রাইফেলধারী ওরা। পাহাড় থেকে নেমে এসে ওরা সম্ভবত এরই মধ্যে ফার্মের গ্রামে, অর্থাৎ গ্রাসল্যাণ্ডে অথবা ওঅর্কশপে পৌঁছে গেছে। দূরত্বটা

আন্দাজ করে শিউরে উঠলো রানা। র‍্যাঞ্চের লোকজনদের কথা ভেবে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ওর।

তারপরই সোহানার কথা ভাবলো। জানালার কাছ থেকে হামা-গুড়ি দিয়ে ফিরে এলো বিছানায়। সোহানাকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু ঝাঁকি দিলো।

সোহানা নগ্ন, ঘুমের ভেতর তলিয়ে আছে। দ্বিতীয়বার ঝাঁকি খেয়ে একবার চোখ মেললো সে। বিড়বিড় করে বললো, 'ন্‌না!' তারপর পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলো।

'বিপদ,' ফিসফিস করে বললো রানা।

মুহূর্তে সজাগ হলো সোহানা। ঝট্ করে উঠে বসার চেষ্টা করলো, হাতটা বালিশের তলায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু রানা তাকে বুকের সাথে ধরে রাখলো। 'বিছানায় বসো না,' সতর্ক করে দিলো ও। 'বাইরে থেকে দেখা যাবে।' বালিশের তলা থেকে খালি হাতটা ফিরিয়ে আনলো সোহানা, মনে পড়ে গেছে ওখানে কোনো অস্ত্র নেই। পায়ের কাছ থেকে তুলে গাউনটা সোহানার বুকে রাখলো রানা। 'তাড়াতাড়ি পরে নাও এটা।'

সোহানা কাপড় পরছে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কাঠ কাটার কুঠার আর কিচেন নাইফ ছাড়া বাড়িতে কোনো অস্ত্র নেই। নেই বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ফল-ব্যাক পজি-শন।

রাইফেলের আরো একটা বিস্ফোরণ হলো। কেউ চিৎকার করলো —মেয়েলি কণ্ঠস্বর—কিন্তু অস্পষ্ট আওয়াজটা হঠাৎ করেই আবার থেমে গেল। গুলি করার পর বেয়নেট চার্জ করছে ওরা?

'কি ঘটছে? কারা ওরা?' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে জানতে চাইলো

সোহানা। চেহারায় সতর্কতা, কিন্তু ভয়ের কোনো ভাব নেই। 'বিদ্রোহী ম্যাটাবেল নাকি?'

'জানি না,' গম্ভীর গলায় বললো রানা। জানার জন্যে অপেক্ষা করা নেহাতই বোকামি হবে, উপলব্ধি করলো ও। এই মুহূর্তে প্রাণ নিয়ে পালানো উচিত ওদের। কিন্তু কুয়াকোপা, টসনে, নিলি, আলায়তুনে, ওদের সবার প্রতি ওর একটা দায়িত্ব আছে। ওদেরকে বিপদের মুখে ফেলে লেজ তুলে পালানোর কথা ভাবতেও পারছে না।

তবে বাঁচতে হলে পালাতে হবে, আগে হোক বা পরে। সবচেয়ে ভালো বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়া। কিন্তু তা করতে হলে একটা ডাইভারশন দরকার।

'অপেক্ষা করো,' নির্দেশ দিলো ও। 'জুতো পরে তৈরি থাকবে, বললেই যেন ছুটতে পারো। আমি চলে গেলে কাউকে যদি আসতে দেখো, একাই পালাবে—জঙ্গলে।' জানে, বিপদসংকুল জঙ্গলেও, অস্ত্র ছাড়াই, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে সোহানা।

'গ্রাসল্যাণ্ডে যাচ্ছো,' রানার পথ আগলে ধরলো সোহানা। 'খালি হাতে তোমাকে আমি যেতে দেবো না।'

'কে বললো তোমাকে ওদের সামনে পড়বো আমি?' ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ল্যাণ্ড-রোভারের চাবিটা আছে কিনা দেখে নিলো ও। খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো প্যাসেজে। টেলিফোন নিয়ে দশ সেকেণ্ড অপব্যয় করলো—আগেই আন্দাজ করেছিল,তার কেটে দিয়েছে ওরা। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে কিচেনের দিকে ছুটলো।

প্রতিপক্ষের দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার একটাই উপায় দেখলো রানা

—আলো। রিমোট-কন্ট্রোল সুইচ অন করে ডিজেল জেনারেটর চালু করলো, উঠনের ওদিকে ইঞ্জিনরুম থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এলো। বাড়ির সামনের সব ক'টা বালব্ জ্বেলে দিলো ও, এক এক করে নিভিয়ে দিলো পিছনের, আর দু'পাশের প্রতিটি বালব্। পালাবার সময় অন্ধকারে মিশে যেতে পারবে ওরা।

কিচেন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো রানা। লাউঞ্জের পিছনের দরজায় থেমে, লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে বাগান আর বারান্দার দিকে দ্রুত চোখ বুলালো। প্রতিটি বালব্ জ্বলছে। আলোর বন্যায় লনের ঘাস আশ্চর্য সবুজ দেখালো, ঘাসের ওপর জাকারানডা গাছগুলো যেন ছাতার মতো ঝুঁকে আছে। গোলাগুলি থেমে গেছে, কিন্তু গ্রাসল্যাণ্ড থেকে ভেসে আসছে আহত নারী-পুরুষের অস্পষ্ট কাতরানি। করুণ বিলাপের সুরও কানে বাজলো। গা শির শির করে উঠলো ওর। না জানি কি সর্বনাশ হয়ে গেছে!

দরজার কাছ থেকে সরে আসবে রানা, এই সময় আলোর কিনারায় কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও। চোখ কুঁচকে জিনিসটা চিনতে চেষ্টা করলো ও। কারা শত্রু জানতে পারলে সামান্য একটু সুবিধে হবে, যদিও অমূল্য সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির দিকে ছুটে আসছে একজন লোক। উলঙ্গ—না, কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়ানো রয়েছে। ঠিক ছুটছে না, মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। বারান্দার আলোয় চকচকে দেখালো তাকে, যেন এই মাত্র প্রচুর তেল মেখেছে। হঠাৎ রানা বুঝতে পারলো, তেল নয়, ওটা রক্ত। নিজের রক্তে সারা শরীর রাঙা হয়ে আছে লোকটার। কুকুর ছানা নদী থেকে উঠে এলে তার গা থেকে যেমন পানি ঝরে, এই লোকের গা থেকে সে রকম রক্ত

ঝরছে।

তারপর আতংকের আরো একটা বিষম ধাক্কা খেলো রানা। হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারলো ও। কুয়াকোপা। কিছু না ভেবেই ছুটলো রানা। লাথি মেরে লাউঞ্জের ফ্রেঞ্চ ডোর খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, লাফ দিয়ে নিচু পাঁচিল টপকে নেমে পড়লো উঠনে। কুয়াকোপা পড়ে যাচ্ছে, এই সময় তাকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলো। তারপর বুকে তুলে নিয়ে উঠে এলো বারান্দায়। বুড়ো মানুষটা এতো হালকা, আশ্চর্য হয়ে গেল ও।

নিচু পাঁচিলের কাছে মেঝেতে নামালো তাকে। বাঁ কাঁধে গুলি খেয়েছে সে। অনেকটা জায়গা জুড়ে চুর চুর হয়ে গেছে হাড়, ডান হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে আছে বুড়ো বাঁ হাতের কনুই। 'ওরা আসছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কুয়াকোপা। 'মালিক, আপনারা পালিয়ে যান।'

'কি হয়েছে বলো আমাকে,' শার্ট ছিঁড়ে জখমটা বাঁধতে বাঁধতে দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা। মুখ তুলে আলোর কিনারার দিকে তাকালো। 'নিলি কোথায়?'

'প্রার্থনা করুন, আমার মেয়েটা যেন না বাঁচে।' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করলো কুয়াকোপা। 'ওরা লাইন দিয়ে রেপ··· পুরুষরা বোধ হয় একজনও বেঁচে নেই·· পালান···আলায়তুনের পেটে বেয়নেট·· পালান, মালিক, পালান···!' রানা বাধা দেয়ার আগেই নিচু পাঁচিল টপকে উঠনে নামলো কুয়াকোপা, আলোর পিছনে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও আমাকে সাবধান করতে এসেছিল,' বিড়বিড় করে বললো রানা। চোখের কোণে লালচে আলো দেখে

ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো ও। অন্ধকার আকাশে ধোঁয়ার গায়ে আগুনের আভা পড়েছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, গ্রাসল্যাণ্ডের বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা ।

এখন আর ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই, উপলব্ধি করলো রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো ও। এরই মধ্যে বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে।

জানালার নিচে হাঁটু ভাঁজ করে বসে রয়েছে সোহানা, জানালা গলে হলদেটে চৌকো আলো পড়েছে বেডরুমের মেঝেতে। ইতিমধ্যে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে চুল বেঁধে নিয়েছে সোহানা, পরে নিয়েছে একটা টি-শার্ট আর শর্টস। নরম চামড়ার জুতো পরে ফিতে বাঁধছিল, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' সোহানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলো রানা। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'বাঘা,' বললো সোহানা। 'আমার কুকুরছানা!'

'ফর গডস সেক!'

'ওকে ফেলে যাই কিভাবে!' জেদ ফুটে উঠলো সোহানার চেহারায়, এই জেদের সাথে রানার পরিচয় আজকের নয়।

'গোলমাল করলে তোমাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাবো,' রাগের সাথে হুমকি দিলো রানা, সিধে হয়ে দাঁড়ানোর সময় ঝুঁকি নিয়ে জানালার কার্ণিশের ওপর চোখ তুলে আরেকবার বাইরে তাকালো।

লন আর বাগানে আলোর বন্যা। গ্রাসল্যাণ্ডের দিক থেকে মানুষের কালো মূর্তি এগিয়ে আসছে। সশস্ত্র মানুষ, হাঁটার ধরন আর ভাবভঙ্গিতে কঠোর শৃংখলা। যা দেখছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাসই

করতে পারলো না রানা, তারপর স্বস্তি বোধ করলো ও, ঢিল পড়লো পেশীতে।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!' বিড়বিড় করে বললো ও। হঠাৎ উদ্বেগ আর উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে একটু দুর্বল লাগছে, শীত শীত একটা ভাব অনুভব করলো। সোহানাকে দু'হাতে ধরে নিজের কাছে টানলো ও। 'আর কোনো ভয় নেই,' বললো তাকে। 'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কেন···কি ঘটলো?'

'সরকারী বাহিনী পৌঁছে গেছে,' বললো রানা। লালচে বেরেট আর রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ চিনতে পেরেছে ও। আলোর কিনারা পেরিয়ে পিল পিল করে লনে ঢুকে পড়ছে ওরা। 'ওরা থার্ড ব্রিগে-ডের লোকজন, বিপদ কেটে গেছে।'

উদ্ধারকারীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা। কোথায় ছিলো কে জানে, বেরিয়ে এসে সোহানার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুদে বাঘা। ঝুঁকে সেটাকে বুকে তুলে নিলো সোহানা। একটা হাত রাখলো রানা সোহানার কাঁধে।

'ঠিক সময় এসে পড়েছেন আপনারা, সার্জেন্ট,' বললো রানা। ট্রুপারদের পিছনে নিয়ে বারান্দার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে নন-কমিশনড অফিসার। 'ধন্যবাদ।'

'আপনারা ভেতরে যান, প্লিজ,' হাতের রাইফেলটা নাড়লো সার্জেন্ট, ভঙ্গিটা সরাসরি হুমকি দেয়ার মতো যদি না-ও হয়, আদে-শের ভাবটুকু গোপন থাকলো না। লোকটা দীর্ঘদেহী, হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, নির্লিপ্ত চেহারা। রানার দিকে মাত্র একবার ঠাণ্ডা চোখে তাকালো সে। ট্রুপারদের দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাত-ইশারায়

নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

স্বস্তিবোধটুকু কর্পূরের মতো উবে যেতে শুরু করলো। রানা উপলব্ধি করলো, কোথায় কি যেন একটা গোলমাল আছে। ট্রুপার-দের দলটা হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে গিয়ে গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলছে। প্রতি জোড়া সৈনিকের পিছনে আর পাশে আরো একজন করে সৈনিক, তার কাজ সামনের দু'জনকে কাভার দেয়া। রাস্তায় খণ্ড যুদ্ধের সময় এই কৌশল অবলম্বন করা হয়, আশপাশ থেকে চোরাগুপ্তা আক্রমণের আশংকা থাকলে। যে যেখান দিয়ে পারলো, বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা। দড়াম করে দরজা খোলা হলো। চার-দিকে শোনা গেল জানালার শার্সি ভাঙার আওয়াজ। বাড়ির ভেতর তল্লাশী শুরু হয়েছে। উল্টে পাল্টে ফেলে দিচ্ছে সব, ভেঙে চুরমার করছে।

'এসব কি, সার্জেন্ট?' লোকটার সামনে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ালো রানা। রাগে লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা।

এবার সরাসরি হুমকি দিয়ে রাইফেল তুললো সার্জেন্ট। তাকে সামনে নিয়ে পিছিয়ে এলো রানা, সোহানাকে এক হাতে ধরে আছে। ডাইনিং রুমে ঢুকে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘরের মাঝ-খানে ওরাও দাঁড়ালো, ডাইনিং টেবিলের পাশে। কাঁধ আর বাহু দিয়ে সোহানাকে আড়াল করে রেখেছে রানা, ওদের দিকে তাক করা রাইফেলের দিকে চোখ।

সামনের দরজা দিয়ে দু'জন ট্রুপার ঢুকলো। শোনা ভাষায় সার্জেন্টকে রিপোর্ট দিলো তারা, একটা শব্দও বুঝলো না রানা। মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট, ওদেরকে একটা নির্দেশ দিলো। পিছিয়ে গিয়ে দরজার দু'পাশে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ট্রুপার দু'জন,

হাতের রাইফেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো জোড়া মূর্তির দিকে তাক করা।

'আলোর সুইচ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট। রানার কাছ থেকে জেনে নিয়ে সুইচ অন করলো সে। আলোকিত হয়ে উঠলো ঘর।

'আমি এসবের ব্যাখ্যা চাই,' গম্ভীর গলায় বললো রানা। 'কার হুকুমে আমার বাড়িতে ঢুকলেন আপনারা?'

জবাব না দিয়ে গট গট করে হেঁটে দরজার কাছে গেল সার্জেন্ট। লন থেকে একজন ট্রুপারকে ডেকে নিলো সে, পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে ছুটে এলো লোকটা। রেডিওর হ্যাণ্ড-সেটে নিচু গলায় কথা বললো সার্জেন্ট। তারপর আবার ফিরে এলো ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর দুটো দল, কেউ নড়াচড়া করছে না। পরিষ্কার বোঝা গেল, কারো আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে সার্জেন্ট। রানার মনে হলো এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, আসলে পাঁচ মিনিট পর মাথাটা একটু কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করলো সার্জেন্ট। জেনা-রেটরের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠলো আওয়াজটা। একটা ইঞ্জিনের শব্দ। এক সেকেণ্ড শোনার পর রানা বুঝলো, একটা ল্যাণ্ড-রোভার।

গাড়ি-পথ ধরে ছুটে এলো সেটা, হেড লাইটের আলোয় মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হলো জানালা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো। বন্ধ হলো ইঞ্জিন। দরজা খোলার, তারপর বন্ধ হবার আওয়াজ শুনলো ওরা। বারান্দায় একাধিক লোকের বুটের শব্দ।

ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলো জেনারেল উমাঙ্গো।

বেরেটটা এমনভাবে পরেছে, প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে একটা চোখ। গলায় ম্যাচ করা একটা সিল্ক স্কার্ফ। কোমরে জড়ানো হোলস্টারে পিস্তল, হাতে চামড়া মোড়া স্টিক। তাকে দেখে রানাকে ছেড়ে দিলো সোহানা, একটু সরে দাঁড়ালো।

মিটি মিটি হাসছে জেনারেল উমাঙ্গো।

নয়

জেনারেল উমাঙ্গোর পিছু পিছু ঢুকলো ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ। তার স্টীল-রিম চশমার পিছনে চোখ জোড়ায় রহস্যময় দৃষ্টি। হাতে লেদার ম্যাপ কেস, কাঁধ থেকে স্লিঙে ঝুলছে একটা মেশিন পিস্তল।

'রট!' রানা স্বস্তি পেতে চাইলেও সতর্ক একটা ভাব সেটাকে দমিয়ে রেখেছে। গোটা ব্যাপারটা বড় বেশি পরিকল্পিত, বড় বেশি নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে ভয়ংকর কিছু যেন না থেকেই পারে না। 'তোমার লোকেরা এসব কি শুরু করেছে? আমার লোকদের গুলি করা হয়েছে, আমার গ্রাসল্যাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে! আমি এ-সবের ব্যাখ্যা চাই।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো, মিটি মিটি হাসিটা এখনো লেগে আছে তার মুখে। 'কথাটা সত্যি, শত্রুপক্ষে প্রচুর

হতাহত হয়েছে।'

'শত্রু ?' হতভম্ব হয়ে গেল রানা।

'বিদ্রোহী।' আবার মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। 'ম্যাটাবেল বিদ্রোহী।'

'বিদ্রোহী ?' তার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'কুয়াকোপাকে তুমি বিদ্রোহী বলো ? নিলি, আলায়তুনে, টসনে—এদের তুমি··· তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! লেখাপড়া জানে না, নিরীহ মানুষ ওরা, পলিটিক্সের প-ও বোঝে না···'

'বাইরে থেকে দেখে অনেক সময় অনেক কিছুই বোঝা যায় না।' লম্বা টেবিলের মাথায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে একটা পা তুলে দিলো জেনারেল উমাঙ্গো, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকলো। তার সামনে লেদার ম্যাপ কেসটা রেখে পিছিয়ে গেল ক্যাপটেন ভালডেজ, গার্ড দেয়ার ভঙ্গিতে জেনারেলের কাঁধের পিছনে পজিশন নিলো সে। মেশিন পিস্তলটা শক্ত মুঠোয় ধরা।

'রট!' থরথর করে কাঁপছে রানা। 'আমার দিকে তাকাও!'

কিন্তু জেনারেল উমাঙ্গো তাকালো না। মাথা নিচু করে ম্যাপ দেখছে সে। নরম সুরে বললো সে, 'বলো, শুনছি।'

'আমি জানতে চাই কারা আমার গ্রামে আগুন জ্বাললো! জানতে চাই আমার লোকদের খুন করা হলো কেন! এসবের জন্যে কারা দায়ী ? তুমি তাদের ধাওয়া করছো না কেন ?'

'গোলাগুলি থেমে গেছে,' বললো উমাঙ্গো। 'বেঈমানদের ঘাটি ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা।'

'বেঈমান ?'

'হ্যাঁ, তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছিলে।' মুখ তুলে তাকালো জেনা-

রেল। 'অস্বীকার করতে পারো, ধ্বংসাত্মক কাজে বিদ্রোহীদের সাহায্য করোনি তুমি? বিদ্রোহীরা তোমার এই বাড়ি আর গ্রাম-টাকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করছিল। তুমিই ওদের অস্ত্র আর রসদ দিয়ে পালছিলে। আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'এসব কি বলছো তুমি!' রানা এবার সত্যি নার্ভাস বোধ করলো। 'রট, তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও?'

'সিরিয়াস?' রানার মুখের ওপর হাসলো উমাঙ্গো। সিধে হলো সে, মেঝেতে ত্ব'পা রেখে দাঁড়ালো। এগিয়ে ওদের সামনে চলে এলো সে। 'আরে, আরে, এ যে দেখছি একটা কুকুরছানা!' এখনো হাসছে সে। 'ভারি সুন্দর তো!'

সোহানা বাধা দেবে কি দেবে না ঠিক করার আগেই তার হাত থেকে বাঘাকে নিয়ে নিলো উমাঙ্গো, ফিরে এলো টেবিলের কাছে। ছোট্ট কুকুরছানার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে সে। এখনো ওটা আধো-ঘুমের মধ্যে রয়েছে, মুখ ঘষছে উমাঙ্গোর গায়ে, সম্ভবত মায়ের ত্বধ পেতে চাইছে।

'সিরিয়াস?' শব্দটা আবার উচ্চারণ করলো জেনারেল। 'ঠিক কতোটা সিরিয়াস, সেটা আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।' বাঘাকে হাত থেকে ছেড়ে দিলো সে, ডিগবাজি খেতে শুরু করে পাকা মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়লো বাচ্চাটা, পড়েই কেঁউ করে উঠলো। কচি বুকের ওপর একটা পা তুলে দিলো উমাঙ্গো, 'লুক!' বলেই শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিলো পায়ের ওপর। ছোট্ট বুকটা চ্যাপ্টা হবার আগে একবার মাত্র চিৎকার করে উঠলো ক্ষুদে বাঘা। 'এই রকম সিরিয়াস আমি।' এখন আর হাসছে না উমাঙ্গো। 'তোমাদের জীবনের দাম এই কুত্তার বাচ্চার চেয়ে বেশি নয় আমার কাছে।'

মৃদু গোঙানির শব্দ করে চোখ ফিরিয়ে নিলো সোহানা, মুখ লুকালো রানার বুকে। লাথি দিয়ে সাদা-কালো লাশটাকে ফায়ার-প্লেসের দিকে ছুঁড়ে দিলো উমাঙ্গো, তারপর বসলো একটা চেয়ারে।

'নাটকের পিছনে যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি,' বললো সে, লেদার ম্যাপ কেস থেকে আরো কিছু কাগজ বের করে নিজের সামনে টেবিলে রাখলো। 'তুমি কুখ্যাত সি. আই. এ.-র একজন এজেন্ট হিসেবে জিম্বাবুইয়ে আসো…'

'হ্যাটস আ ব্লাডি লাই,' চিৎকার করে বললো রানা, কিন্তু বিস্ফোরণটা জেনারেলকে স্পর্শ করলো না।

'তোমার লোকাল কণ্ট্যাক্ট জঁ। মন্টিপিলার, ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে, এবং তোমার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল জাসটিন চ্যাপেল নামে বিশ্ব ব্যাংকের জনৈক অফিসার, তিনিই তোমাকে আর মিস সোহানাকে রিক্রুট করেন…।'

'মিথ্যে কথা!'

'তোমার মাসিক বেতন চল্লিশ হাজার মার্কিন ডলার,' বলে চলেছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'তোমার মিশন ছিলো ম্যাটাবেলি ল্যাণ্ডে বিদ্রোহীদের জড়ো করে তাদের ট্রেনিং দেয়া, এবং সবশেষে সরকারকে উৎখাত করা। ট্রেনিঙের সমস্ত খরচ যোগাচ্ছিল সি. আই. এ., ইতিমধ্যে তারা তোমার হাতে পঞ্চাশ লাখ ডলার পৌঁছেও দিয়েছে…।'

'রট।' প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু সোহানা বাধা দিলো। ফিসফিস করে বললো সে, 'লাভ কি! শুধু শুনে যাও।'

'ইন্টারোগেশনের বাকি সময় তুমি আমাকে স্যার, নয়তো জেনা-

রেল উমাঙ্গো বলে সম্বোধন করবে, বোঝা গেছে?' দরজার দিকে ফিরলো উমাঙ্গো, বাইরে হঠাৎ কি সব তৎপরতা শুরু হয়েছে। শব্দ শুনে মনে হলো, হালকা ট্রাকের একটা কনভয় এসে পৌছুলো, ট্রুপাররা ঝপাঝপ নামছে, শোনা ভাষায় হুকুমের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঁচের দরজা দিয়ে রানা দেখলো, দশ বারো জন ট্রুপার কাঠের বাক্স নিয়ে বারান্দায় উঠলো।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ক্যাপ্টেন ভালডেজের দিকে তাকালো উমাঙ্গো, অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ক্যাপ্টেন।

'রাইট!' জেনারেল উমাঙ্গো রানার দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো। 'আবার আমরা শুরু করতে পারি। তুমি তোমার পরিচিত ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ শুরু করো—ওদের ভাষা আর চরিত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকায়…'

রাগ নয়, বিস্ময় নয়, স্রেফ শান্ত হয়ে গেছে রানা। ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে ও, কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে। বাধা দিয়ে বললো, 'পরিচিত ম্যাটাবেল বিদ্রোহী?'

'ইয়েস। অস্বীকার করতো পারো, ওদের সাথে তুমি যোগাযোগ করোনি?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'আমার তো মনে পড়ে না।'

ক্যাপ্টেনকে ইঙ্গিত দিলো উমাঙ্গো, ক্যাপ্টেন একটা হাঁক ছাড়লো।

মাঝখানে একজন লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলো দু'জন ট্রুপার। লোকটার খালি পা, পরনে শুধু খাকি শর্টস, নাকে-মুখে বেশ কয়েকটা জায়গা আলুর আকৃতি নিয়ে ফুলে রয়েছে। সারা শরীরে বেয়-

নেটের কমবেশি গভীর টানা আঁচড়।

'এই বিদেশী লোকটাকে চেনো তুমি?' ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো উমাঙ্গো। লোকটা ক্লান্ত, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো। চোখ দুটো ঝাপসা, যেন ধুলো ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে।

'ওকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি...,' শুরু করলো রানা, কিন্তু হঠাৎ চিনতে পেরে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললো। লোকটা ক্যাপ্টেন কিনকিনি, তিন গেরিলার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসী, আর বদরাগী।

'ইয়েস?' কথা বলার জন্যে আহ্বান জানালো উমাঙ্গো, আবার হাসছে সে। 'কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি?'

'বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বললো রানা।

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো। 'সময় মতো সবই হবে, কিন্তু যেটা শুরু করেছি সেটা আগে শেষ করি এসো।' ঝট্ করে আবার ক্যাপ্টেন কিনকিনির দিকে ফিরলো সে। 'এই বিদেশী লোককে চেনো তুমি?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো কিনকিনি। 'উনি আমাদের টাকা দিয়েছেন।'

'ওকে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। 'যত্ন নিতে ভুলো না, আর কিছু খেতে দিয়ো। এবার, রানা, এখনো কি তুমি অস্বীকার করবে যে অন্তর্ঘাতকদের সাথে তোমার যোগাযোগ ছিলো না?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে অভিযোগের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো সে, 'বিদ্রোহীদের জন্যে তোমার এই এস্টেটে তুমি একটা অস্ত্রের গুদাম তৈরি করো। তুমি চেয়েছিলে বিদ্রোহীদের সাহায্যে

একটা ক্যু ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করবে, তারপর প্রো-আমেরিকান একজন ডিকটেটরকে গদীতে বসাবে…'

'আমার এই এস্টেটে তাহলে অস্ত্রও পাওয়া গেছে?'

রানার ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো, 'ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো উমাঙ্গো। পিছু পিছু রানা আর সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো সার্জেন্টও। কাঠের বাক্সগুলো বারান্দার ওপরই এক ধারে রাখা হয়েছে।

'খোলো,' নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। ক্লিপ খুলে ডালা তুললো একজন ট্রুপার।

বাক্সের ভেতর প্যাক করা অস্ত্রগুলো দেখেই চিনতে পারলো রানা। এগুলো আমেরিকান আর্মালিট ফাইভ পয়েন্ট ফিফটি-সিক্স এম-এম এ-আর এইটিন অটোমেটিক রাইফেল। প্রতিটি বাক্সে ছয়টা করে, আনকোরা নতুন, গায়ে এখনো ফ্যাক্টরী গ্রিজ লেগে রয়েছে।

'এগুলোর সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

'তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছো,' কঠোর সুরে বললো উমাঙ্গো। ক্যাপ্টেন ভালডেজের দিকে ফিরলো সে। 'অপর লোকটাকে আনো।'

পার্ক করা একটা ট্রাকের ক্যাব থেকে নামিয়ে, ধাক্কা দিতে দিতে বারান্দায় নিয়ে আসা হলো এক লোককে। লোকটা রানার ওভারশিয়ার। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, নাকে-মুখে রক্ত। নিরীহ গোবেচারা মানুষ, আতংকে থরথর করে কাঁপছে।

'এই র‍্যাঞ্চের ট্রাক্টর শেডে অস্ত্রগুলো রাখোনি তুমি?' প্রশ্ন করলো উমাঙ্গো, কিন্তু ওভারশিয়ার বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা

গেল না।

'জোরে।'

'হ্যাঁ, ওগুলো আমি ওখানে রেখেছিলাম, স্যার।'

'কার হুকুমে?'

কাতর চোখে রানার দিকে তাকালো ওভারশিয়ার, সেই সাথে হৃৎপিণ্ডে একটা শীতল স্পর্শ পেলো রানা, ঠাণ্ডা ভাবটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। বেআইনী অস্ত্র রাখার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

'কার হুকুমে?' নরম সুরে আবার জিজ্ঞেস করলো উমাঙ্গো।

'মিঃ রানার হুকুমে, স্যার।'

'ওকে নিয়ে যাও।'

গার্ডরা তাকে ট্রাকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে এখনো রানার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে ওভারশিয়ার। হঠাৎ চিৎকার করে বললো সে, 'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। আমার বালবাচ্চা আছে…'

গার্ডদের একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার পেটে গুঁতো মারলো, পেট ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো ওভারশিয়ার। পড়েই যেতো, কিন্তু তাকে ধরে ফেলে ক্যাবে তুলে দেয়া হলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। সগর্জনে পাহাড়ের দিকে চলে গেল সেটা।

সবাইকে সাথে নিয়ে ডাইনিং রুমে ফিরে এলো জেনারেল উমাঙ্গো, টেবিলের মাথায় নিজের চেয়ারে বসলো। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলো নাড়াচাড়া করার সময় রানা বা সোহানার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে থাকার ভান করলো সে। রাইফেল নেড়ে ওদের

দু'জনকে পিছু হটতে বাধ্য করলো সার্জেন্ট, দেয়ালে পিঠ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা, দু'পাশে একজন করে ট্রুপার।

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা।

রানার পাশে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। হাত কাঁপবে এই ভয়ে নাভির কাছে পেটের ওপর একটা দিয়ে অপরটাকে চেপে ধরে আছে। তার চোখে আগুন, ধিকি ধিকি জ্বলছে। ফায়ার-প্লেসের দিক থেকে জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে আছে সে, ওখানে পরিত্যক্ত খেলনার মতো পড়ে রয়েছে বাঘার চেপ্টে যাওয়া দেহটা।

অবশেষে কাগজগুলো ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো জেনারেল উমাঙ্গো, হাতের স্টিক দিয়ে ছোটো ছোটো টোকা মারলো টেবিলের কিনারায়। 'কেস খুব খারাপ,' গম্ভীর মুখে বললো সে। 'তোমার আর সোহানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ তোলা হয়েছে, বেশিরভাগই ক্যাপিটাল অফেন্স—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দু'জনের কপালেই ফায়ারিং স্কোয়াড ঝুলছে।'

'খবরদার, সোহানাকে জড়াবে না।' নিজের অজান্তেই সোহানার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা।

'এ-দেশে এখনো আমরা ফাঁসির ব্যবস্থা রেখেছি। নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি, গলায় রশি বেঁধে জল্লাদ যখন কোনো মেয়েকে ঝুলিয়ে দেয়, কাপড়চোপড় সব একেবারে ভিজিয়ে ফেলে সে। মেয়েদের নিচের অংশ তেমন টাইট না আর কি।'

প্রচণ্ড ঘৃণায় অসুস্থ বোধ করলো রানা, ইচ্ছে হলো শয়তানটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর মনের ভাব টের পেলো সোহানা, একটা হাত চেপে ধরলো খপ করে। 'না।'

'তোমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, ব্যাপারটা অতোদুর গড়াতে

না-ও দেয়া যায়। অবশ্য কোন্‌টা বেছে নেবে, সেটা সম্পূর্ণ তোমাদের ওপরই নির্ভর করছে।

থেমে থেমে একাই কথা বলছে উমাঙ্গো।

'অভিযোগ গুরুতর, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও সত্যি,' চেহারায় তাচ্ছিল্যের একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো সে, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগণ্য ঘুঁটি তোমরা। তোমাদের মেরে জেনারেল রট উমাঙ্গো ওর হাত গন্ধ করতে পারে না। হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

ঝট্‌ করে মুখ তুললো সোহানা। কিন্তু রানা অটল।

'দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না। কিন্তু না, আমি ঠাট্টা করছি না। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আই লাভ বোথ অভ ইউ। শুধু ভালোবাসি না, রানার তো রীতিমতো ভক্ত আমি। ও একটা প্রতিভা। মাত্র অল্প ক'দিনেই কি রকম জাঁকিয়ে বসেছিল এখানে!' উমাঙ্গোর চেহারায় প্রশংসার ভাব। 'সুযোগ পেলে কিছু-দিনের মধ্যে ভেল্কি দেখিয়ে দিতো। এরকম একটা দুর্লভ প্রতিভার অকালমৃত্যু হোক তা আমি চাই না।'

জেনারেল উমাঙ্গো আশার আলো দেখাতে চাইলেও, তাকে বিশ্বাস করতে পারলো না রানা। ওর মনে হলো, বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, উমাঙ্গোও তেমনি খেলছে ওদের নিয়ে।

'আমার প্রস্তাবটা এই রকম। সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে কাগজে সই করবে তোমরা। বিনিময়ে তোমাদের আমি সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

টেবিলের ওপর ঠক-ঠক-ঠক একঘেয়ে আওয়াজটা রানার মাথায় যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। গুলির আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙার পর

থেকে একের পর এক ঘটনাগুলো এতো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু চিন্তা করা অসম্ভব বলে মনে হলো। 'অভিযোগ? কিসের অভিযোগ? আমরা কোনো অপরাধ করিনি···'

'হয়তো করোনি, হয়তো করেছো,' হাসি মুখে বললো উমাঙ্গো, 'কিন্তু বহাল তবিয়তে জিম্বাবুই থেকে বেরুতে হলে স্বীকার করতে হবে সব সত্যি। সইটা নেবো শুধু একটা কারণে, তোমরা যাতে এ-দেশে আর ফিরে আসতে না পারো।'

'সই করলাম, তারপর তুমি আমাদের হাজতে পাঠিয়ে দিলে—কি মজা, তাই না?'

'আমার সম্পর্কে তোমার এরকম নীচ ধারণা হলো কি করে বুঝলাম না,' অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালো উমাঙ্গো।

এই বিপদের মধ্যেও না হেসে পারলো না রানা। চারদিকের মেঝেতে চোখ বুলালো ও, টেবিল-চেয়ারের নিচেও তাকালো, তারপর বললো, 'কই, এখানে আর তো কোনো কীট দেখছি না।'

অপমানে উমাঙ্গোর চেহারা লালচে হয়ে উঠলো। কঠিন সুরে জানতে চাইলো সে, 'ইয়েস অর নো?'

লোকটাকে খেপিয়ে দিতে পেরে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করলো রানা। 'কিন্তু তোমার এই উদারতার কারণটা কি? তুমি নিজেও কি নিজেকে এতোটা মহৎ হৃদয় ভাবতে পারো যে আমরা দুষ্কৃতকারী জানার পরও শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে?'

অপমানটা ভুলে গিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসলো উমাঙ্গো। 'আগেই বলেছি, তুমি একটা প্রতিভা। ঠিক ধরতে পেরেছো, মুক্তির বিনিময়ে কিছু একটা নেবো তোমার কাছ থেকে।' অনেকগুলো কাগজ থেকে একটা বেছে নিলো সে। 'এই যে, এটা পড়, তাহলেই বুঝতে

পারবে।'

'কি ওটা?'

'তোমার স্বীকারোক্তি, অবশ্যই।'

'তারমানে আগেই তুমি টাইপ করিয়ে রেখেছো?' এতো কিছুর পরও অবাক না হয়ে পারলো না রানা।

কেউ জবাব দিলো না, ক্যাপ্টেন ভালডেজ ডকুমেন্ট-টা নিয়ে এলো ওর কাছে। 'প্লিজ, পড়ে দেখুন, মিঃ রানা।'

টাইপ করা ফুলসক্যাপের তিনটে শিট। সাম্রাজ্যবাদী প্রভু, অশুভ শক্তি, দালাল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নিন্দাসূচক শব্দই বেশি, প্রতিটি বাক্যে একটা করে অপরাধের স্বীকারোক্তি। পড়তে পড়তে গোটা ব্যাপার-টা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো রানার। তারপর হঠাৎ একটা পরিচিত বাক্য দেখে এক নিমেষে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাক্যটা এই রকম, 'আই ফুললি অ্যাডমিট দ্যাট বাই মাই অ্যাকশন আই হ্যাভ প্রুফড মাইসেলফ টু বি অ্যান এনিমি অভ দা স্টেট অ্যাণ্ড দা পিপল অভ জিম্বাবুই।'

এর আগে আরো একটা ডকুমেন্টে সই করেছে রানা, তাতে এই বাক্যের শেষ অংশ প্রায় হুবহু এইভাবেই ছিলো। 'কিং'স হেভেন!' বিড়বিড় করে বললো ও, মুখ তুলে উমাঙ্গোর দিকে তাকালো। 'এর জন্যেই তাহলে এতো কিছু! কিং'স হেভেন চাইছো তুমি!'

ঘরের ভেতর কোনো শব্দ নেই, শুধু টেবিলের কিনারায় স্টিকের বাড়ি পড়ার একঘেয়ে ঠক-ঠক-ঠক আওয়াজ ছাড়া। উমাঙ্গোর ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি লেগে রয়েছে।

'তারমানে প্রথম থেকেই তোমার মনে এই ছিলো। আমার লোনের জন্যে ব্যাংক গ্যারান্টি—ক্লজ-টা তুমি ইচ্ছে করেই ঢুকিয়ে

দিয়েছিলে ডকুমেন্টে। কিং'স হেভেন যাতে কেড়ে নিতে কোনো অসুবিধে না হয়।' রাগে দিশেহারা বোধ করলো রানা; হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে সেটা তুলে নিলো ক্যাপ্টেন ভালডেজ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। রাগে কাঁপছে রানা, সামনে বসে থাকা কালো দানবটার দিকে এক পা এগোলো ও, হাত দুটো নিজের অজান্তেই সামনে বাড়লো, কিন্তু দীর্ঘদেহী শোনা সার্জেন্ট ওর বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে বাধা দিলো ওকে।

'ইউ ব্লাডি সোয়াইন,' হিস হিস করে বললো রানা। 'আমি এক-জন ব্যারিস্টারের সাথে কথা বলতে চাই। আই ওয়াণ্ট দ্য প্রটেকশন অভ ল।'

'বন্ধুবর,' সহাস্যে জবাব দিলো জেনারেল, 'ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে আমিই আইন। নিরাপত্তার প্রস্তাব আমার তরফ থেকেই দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'আমি রাজি নই। ওতে আমি সই করবো না। তার আগে আমার লাশ দেখবে তুমি।'

'সে ব্যবস্থাও করা যায়,' নরম সুরে বললো উমাঙ্গো, তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকে বলছি, বাস্ত-বতার কাছে মাথা নত করো, রানা। কাগজটায় সই করো, তাহলেই কুৎসিত ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যেতে পারবো আমরা।'

অশ্রাব্য গালিগালাজগুলো জিভের ডগায় ভিড় করে এলো, অনেক কষ্টে সেগুলো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকলো রানা, ওদের সামনে নিজেকে ছোটো করার কোনো মানে হয় না। 'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ও। 'আমি সই করবো না।'

'এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, মেনে নাও।'

'অসম্ভব!'

ঝট্ করে লম্বা সার্জেন্টের দিকে ফিরলো উমাঙ্গো। 'মেয়েলোক-টাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম,' বললো সে। 'প্রথমে তুমি, তার-পর তোমার লোকেরা। পালা করে ওর ওপর চড়াও হবে, প্রত্যেকে। এখানে, এই ঘরে, এই টেবিলের ওপর।'

'তুমি মানুষ নও!' সোহানাকে ধরার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু ট্রুপাররা ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, টেনে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরলো। তাদের একজন সামনে দাঁড়িয়ে ওর গলায় বেয়নেটের ডগা ছোঁয়ালো।

অপর একজন ট্রুপার সোহানার হাত মুচড়ে ধরলো, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তুলে ফেললো তার একটা কনুই। তাকে ঠেলে সার্জেন্টের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সোহানা, কিন্তু ট্রুপারটা তাকে শূন্যে তুলে ফেললো, শুধু জুতোর ডগা দুটো মেঝে ছুঁয়ে থাকলো। ব্যথায় নীল হয়ে উঠলো তার চেহারা।

সার্জেন্টের চেহারায় কোনো ভাব নেই। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকা-লোও না, অশ্লীল কোনো ভঙ্গিও করলো না। সোহানার টি-শার্টের সামনেটা দু'হাতে ধরলো সে, এক টানে গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেললো। তার ফর্সা স্তন জোড়া লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'ইচ্ছে করলে মেঝের ওপর বসতে পারো, রানা,' সকৌতুকে বললো উমাঙ্গো। 'দেড়শো লোক রয়েছে আমার, একজন একজন করে কাজ সারতে প্রচুর সময় নেবে।'

সোহানার শর্টসের ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো সার্জেন্ট, টান দিয়ে নামিয়ে দিলো। সোহানার হাঁটুর কাছে আটকে গেল শর্টস, ঝুঁকে সেটাকে পায়ের পাতা দিয়ে গলিয়ে বের করে আনলো সার্জেন্ট। সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু বেয়নেটের চোখা ডগা গলার চামড়া ভেদ করলো। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়লো বুকের ওপর শার্টে। মুক্ত হাতটা দিয়ে নাভির নিচটা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সোহানা।

'প্রিয়তমাকে কেউ ধর্ষণ করছে, এই দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো উমাঙ্গো। পরমুহূর্তে সকৌতুকে কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'ঠিক আছে, তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, আমারও কোনো আপত্তি নেই। দেখি, কতোবার তুমি ব্যাপারটা ঘটতে দিতে পারো।'

সার্জেন্ট আর ট্রুপার, দু'জন মিলে সোহানাকে দুদিক দিয়ে চেপে ধরলো। ডাইনিং টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। পকেট থেকে কর্ড বের করে সোহানার পায়ের গোড়ালি দুটো বাঁধলো সার্জেন্ট, কিন্তু পায়ের জুতো জোড়া খুললো না। দক্ষ হাতে সোহানার হাঁটু দুটো তার বুকের ওপর তুললো ওরা, তারপর গায়ের জোরে চাপ দিয়ে নামিয়ে ঢুকিয়ে দিলো বগলের তলায়। এই জঘন্য কাজ আগেও নিশ্চই বহুবার করেছে ওরা।

সম্পূর্ণ অসহায় সোহানা, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়ে আছে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ঘরের প্রতিটি লোক তাকিয়ে আছে তার গোপন অঙ্গের দিকে। এর চেয়ে বড় অবমাননা আর কি হতে পারে নারীর। সার্জেন্ট তার কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করলো।

'রানা!' চিৎকার করলো সোহানা। নিজের অজান্তে ঝাঁকি

খেলো রানা, কেউ যেন চাবুক মেরেছে পিঠে।

'করবো,' বিড়বিড় করে বললো রানা। থরথর করে কাঁপছে ও। 'সই করবো। ওকে ছেড়ে দাও।'

শোনা ভাষায় একটা নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো, সাথে সাথে সোহানাকে ছেড়ে দিলো ওরা। পিছিয়ে এলো ট্রুপার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সোহানাকে সাহায্য করলো সার্জেন্ট। মাথা নিচু করে, বিনয়ের সাথে শর্টসটা তার হাতে ধরিয়ে দিলো সে। শর্টসের ফাঁকে একটা পা গলালো সোহানা, ফোঁপাচ্ছে আর কাঁপছে।

শর্টস পরে রানার দিকে ছুটলো সে, ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। কথা বলতে পারলো না, ঘন ঘন শিউরে উঠলো, হাঁ করা মুখে ঢুকে গেল চোখের পানি। তাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো রানা, ফিসফিস করে বললো, 'শান্ত হও, লক্ষ্মী, শান্ত হও।'

'তাড়াতাড়ি সই করলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে তোমরা।'

টেবিলের দিকে এগোলো রানা, বাঁ হাতের ভাঁজে এখনো আটকে রেখেছে সোহানাকে। ক্যাপ্টেন ভালডেজ রানার হাতে একটা কলম ধরিয়ে দিলো, স্বীকারোক্তির প্রথম দুটো পাতায় ইনিশিয়াল দিলো রানা, শেষটায় পুরো নাম সই করলো। ক্যাপ্টেন আর জেনারেল, ওরাও সাক্ষী হিসেবে সই করলো।

উমাঙ্গো বললো, 'শেষ একটা ফরমালিটি। আমি চাই তোমাদের দু'জনকে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পরীক্ষা করুক, তোমাদের ওপর কোনো রকম টরচার চালানো হয়নি সেটা প্রমাণ হওয়া দরকার।'

'ড্যাম ইউ।'

'আরে ভাই, রাগ করো কেন—যেখানের যা নিয়ম।'

ডাক্তার নিশ্চয়ই বাইরের ট্রাকগুলোর একটায় অপেক্ষা করছিল। খর্বকায় একজন শোনা, ভারি চটপটে।

'মিস সোহানাকে আপনি ওর বেডরুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, ডক্টর। আপনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করবেন, ওকে জোর করে পেনিট্রেট করা হয়েছে কিনা।' সোহানাকে নিয়ে বেডরুমের দিকে চলে গেল ডাক্তার, রানার দিকে ফিরলো উমাঙ্গো। 'ইতিমধ্যে তোমার অফিসের সেফ খুলে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সব বের করে নাও, পথে দরকার লাগবে।'

বারান্দার শেষ মাথায় রানাকে এসকর্ট করে নিয়ে এলো ট্রুপাররা। অফিসে ঢুকে সেফের কমবিনেশন লক খুললো রানা। পাসপোর্ট, ওয়ালেটে ভরা ক্রেডিট কার্ড, আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্যাজ, আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্যাভেলার্স চেকের তিনটে ফোল্ডার, এবং পাণ্ডুলিপিটা নিলো ও। সব একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরে এলো ডাইনিং রুমে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো সোহানা আর ডাক্তার। কাপড় বদলে কাশ্মিরী জার্সি, শার্ট, আর জিনস পরেছে সোহানা। এখন আর কাঁপছে না, কিন্তু থেকে থেকে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠছে। তার এক হাতে ক্যামেরা ব্যাগ, অপর হাতে ফটোগ্রাফ ভরা আর্ট ফোল্ডার।

'এবার তোমার পালা,' রানাকে বললো উমাঙ্গো।

ডাক্তারের কাজ শেষ হতে বাইরে বেরিয়ে এলো রানা। একটা ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনের সিটে ইতিমধ্যে উঠে বসেছে সোহানা, পাশে ক্যাপ্টেন ভালডেজ। গাড়ির পিছনে আরো দু'জন ট্রুপার রয়েছে। ড্রাইভারের পাশের সিটটা খালি রাখা হয়েছে রানার জন্যে।

বারান্দায় অপেক্ষা করছে উমাঙ্গো। 'গুডবাই, রানা।' চোখে নগ্ন ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'জানি,' আবার বললো জেনারেল, 'আমার ওপর রেগে আছো তুমি। সেজন্যে তোমাকে আমি দোষও দিতে পারি না। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলে, মাটির পৃথিবীতে কি সুন্দর গড়ে তুলেছিলে একটা স্বর্গ—সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হলে রাগ তো হবেই। আমার ধারণা এই শোক খুব তাড়াতাড়ি তুমি কাটিয়ে উঠবে।'

'আবার দেখা হবে,' শান্ত গলায়, কিন্তু জোর দিয়ে বললো রানা। গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। পিছনে শোনা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর ভারি গলার অট্টহাসি। রানা যেন তার সাথে সাংঘাতিক একটা রসিকতা করেছে।

গ্রাসল্যাণ্ডে এখনো আগুন জ্বলছে দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো রানার। এক এক করে ওদের ক'জনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠলো—কুয়াকোপা, টসনে, নিলি, আলায়তুনে। ক'জন মারা গেছে, ক'জন বেঁচে আছে কিছুই জানা হলো না। 'আবার আমি ফিরে আসবো,' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো ও।

পাহাড় চূড়ায় উঠলো, তারপর নামতে শুরু করলো গাড়ি। পিছনে রয়ে গেল র‍্যাঞ্চ। পশ্চিম দিকে বাঁক নিলো ড্রাইভার, উঠে এলো মেইন রোডে। এখনো কেউ একটা কথাও বলেনি।

হাঁটুর ওপর রাখা ম্যাপ কেস থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করলো ক্যাপ্টেন ভালডেজ। সিটের ওপর দিয়ে বোতলটা বাড়িয়ে ধরলো সে, কিন্তু হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা। ক্যাপ্টেন তবু বোতলটা ওর মুখের সামনে ধরে রাখলো। অগত্যা সেটা নিলো রানা, ছিপি খুলে দু'ঢোক নির্জলা হুইস্কি খেলো।

সাথে সাথে শরীর চাঙা হয়ে উঠলো রানার। আরো এক চুমুক খেলো ও। তারপর বোতলটা বাড়িয়ে ধরলো সোহানার দিকে। সোহানা মাথা নাড়লো।

'এক ঢোক খাও,' অনুরোধ করলো রানা। এখনো সোহানাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে, নড়াচড়ায় আড়ষ্ট ভাব। কাঁপুনিটা আগেই থেমেছে, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ শিউরে ওঠা বন্ধ হয়নি। আরো একবার অনুরোধ করায় বোতলটা নিয়ে এক ঢোক খেলো সে-ও।

বোতলটা ক্যাপ্টেন ভালডেজকে ফিরিয়ে দিলো সোহানা। 'ধন্যবাদ।' যে ভদ্রমহিলাকে এইমাত্র চরম অপমান এবং অপদস্থ করা হয়েছে তার কাছ থেকে এই সবিনয় ভদ্রতা প্রকাশ পাওয়ায় ওরা সবাই অপ্রতিভ বোধ করলো।

বুলাওয়ায়োর খানিক আগে প্রথম রোডব্লকের সামনে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভার। রিস্টওয়াচ দেখলো রানা, রাত তিনটে। ব্যারিয়ারের সামনে আর কোনো গাড়ি নেই, ব্যারিকেডের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাণ্ড-রোভারের দু'পাশে দাঁড়ালো দু'জন ট্রুপার। জানালার কাঁচ নামিয়ে তাদের একজনের সাথে কথা বললো ক্যাপ্টেন ভালডেজ, নিজের পাস-টা দেখালো তাকে। টর্চের আলোয় পাস-টা পরীক্ষা করলো ট্রুপার, তারপর ফিরিয়ে দিয়ে স্যালুট ঠুকলো। তার ইঙ্গিতে ব্যারিয়ার তোলা হলো, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রোডব্লক পেরিয়ে এলো ড্রাইভার।

বুলাওয়ায়ো যেন মৃত শহর, অল্প দু'একটা জানালায় আলো দেখা গেল। রাস্তার ওপর এখানে-সেখানে লাশ পড়ে আছে, আকাশের এদিক সেদিক কালো ধোঁয়া আর লালচে শিখা। একটা ট্রাফিক সিগন্যাল লাল সংকেত দিলো, রাস্তায় আর কোনো যানবাহন বা

পথিক না থাকলেও বাধ্য ড্রাইভার ল্যাণ্ড-রোভার থামালো। ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ, প্রথমটা কাছাকাছি কোথাও, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা অনেকটা দূরে।

রিয়্যার ভিউ মিররে চোখ রেখে ক্যাপটেন ভালডেজকে লক্ষ্য করছিল রানা। গুলির শব্দে লোকটাকে শিউরে উঠতে দেখলো ও। ট্রাফিক সিগন্যাল বদলালো, ল্যাণ্ড রোভার ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। দক্ষিণের রাস্তা ধরে শহরতলীর দিকে এগোলো ওরা। শহরের কিনারায় পৌঁছুবার আগে আরো দু'বার রোডব্লকে থামতে হলো ওদের। তারপর খোলা রাস্তা।

অন্ধকার চিরে ছুটে চললো গাড়ি। ড্যাশবোর্ডের আলোয় শুধু মুখগুলো আলোকিত হয়ে থাকায় ভূতের মতো দেখালো ওদের। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া মাঝে মধ্যে ঘড় ঘড় করে উঠলো রেডিও, বারকয়েক যান্ত্রিক শোনা কণ্ঠস্বর ঢুকলো কানে। জেনারেল উমাঙ্গোর গলা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার, সে সম্ভবত অন্য কোনো ইউনিটকে ডাকছে, অন্তত ক্যাপটেন ভালডেজ সাড়া দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না।

সোহানার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, মাঝে মধ্যে ঢুলছে সে। অপমানিত বোধ করলেও শক্তি ক্ষয় হয়, মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ডাইনিং রুমের টেবিলে সোহানা দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে, এই দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল রানা, এই সময় হঠাৎ ক্যাপটেন ভালডেজ কথা বলে ওঠায় বাস্তবে ফিরে এলো ও।

পুব আকাশে দিনের প্রথম আলো। ম্লান কমলা রঙের আকাশের গায়ে গাছের সবুজাভ মাথা দেখলো রানা। ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, মন্থর হলো গতি, হঠাৎ করে ঘুরে মেইন টারমাক রোড থেকে

একটা মেটো পথে নেমে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভার। পরমুহূর্তে ধুলোর পাহাড় উঠলো পিছনে।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'কোথায় আমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ও। 'রাস্তা ছেড়ে এলাম কেন?'

ড্রাইভারের সাথে কথা বললো হোসে ভালডেজ, মেটো পথের কিনারায় ল্যাণ্ড-রোভার থামালো ড্রাইভার। 'আপনারা দয়া করে নামবেন কি?'

নামতে শুরু করলো রানা, ওকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়ালো ভালডেজ, কিন্তু রানা কিছু বুঝতে পারার আগেই ওর হাতে এক-জোড়া হাতকড়া পরিয়ে দিলো সে। গোটা ব্যাপারটা এতো দ্রুত, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল যে কয়েক সেকেণ্ড বিস্ময়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, হাতকড়া পরা হাত দুটো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে রেখে সেদিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো। চিৎকার করে উঠতে চাইলো, কিন্তু গলা দিয়ে তেমন আওয়াজ বেরুলো না, 'এর মানে কি?'

ইতিমধ্যে একই দক্ষতার সাথে সোহানার হাতেও হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে ভালডেজ। রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ড্রাইভার আর ট্রুপার দু'জনের সাথে কথা বলছে সে। শোনা ভাষায় দ্রুত কথা বলছে ওরা, কি বলছে বুঝতে পারলো না রানা। কিন্তু দুটো শব্দের অর্থ বুঝতে পেরে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। একটা 'খুন', অপরটা 'গায়েব'।

ক্যাপটেনের নির্দেশ শুনে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো একজন ট্রুপার, তর্ক জুড়ে দিলো। খোলা দরজা দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভা-রের ভেতর হাত ঢোকালো ক্যাপটেন, মাইক্রোফোনের রিসিভার

তুলে মুখের সামনে ধরলো। কল সাইনটা তিনবার রিপিট করলো সে। অল্প কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে যোগাযোগ হলো। ভি. এইচ. এফ-এর কান ঝালাপালা করা যান্ত্রিক কোলাহল সত্ত্বেও উমাঙ্গোর গলা চিনতে পারলো রানা। মাত্র দু'একটা কথা হলো, মাইক্রোফোন রেখে দিলো ক্যাপটেন। ট্রুপারের চেহারায় আর কোনো সংশয় নেই। বোঝা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশই পালন করছে ভালডেজ।

মেটো পথ ধরে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। জঙ্গলের বাইরে দিনের আলো প্রতি মুহূর্তে প্রখর হচ্ছে, কিন্তু এখানে গভীর ছায়া আরো গভীর হতে থাকলো। পথের ওপর দু'একটা হরিণ দেখা গেল, হেডলাইটের আলো দেখে ত্রস্তে পালালো ঝোপের আড়ালে।

বাঁচার উপায় ভাবছে রানা।

'মিথ্যে আশ্বাস দিয়ো না,' ফিসফিস করে বললো সোহানা। 'ওরা আমাদের গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না?' সম্পূর্ণ শান্ত সে, নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সম্ভাব্য সব দিক ভেবে দেখেছে রানা, মুক্তির কোনো উপায় এখনো খুঁজে পায়নি। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়জোর ক্যাপটেন আর ড্রাইভারকে কাবু করতে পারবে ও, তারপরও ট্রুপার দু'জন থেকে যাবে। হিসেবে এক চুল ভুল হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে, শুধু একা নয়, সোহানাকে নিয়ে। হাতে হাতকড়া না থাকলে অবশ্য আলাদা কথা ছিলো, সোহানার সাহায্য ছাড়াই কিছু একটা চেষ্টা করতে পারতো ও।

মিথ্যে বলে লাভ নেই, বিপদের জন্যে সোহানারও তৈরি থাকা দরকার। 'হ্যাঁ। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিলো, উমাঙ্গো

আমাদের চলে যেতে দেবে না।'

'বুঝলেও তোমার কিছু করার ছিলো না।'

এবার বাংলায় নয়, ইংরেজীতে বললো রানা, 'দূরে কোথাও পুঁতে ফেলা হবে আমাদের লাশ, তারপর নিখোঁজ বলে ঘোষণা করা হবে, আর দায়ী করা হবে বিদ্রোহী ম্যাটাবেলদের।' ক্যাপটেন ভালডেজ শুনলো, বুঝলো, কিন্তু হাঁড়ি মুখ করে চুপচাপ বসে থাকলো সে, স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করলো না।

পথটা সামনে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের পথটা কোনো রকমে চেনা যায়, ইঙ্গিতে সেটাই ড্রাইভারকে দেখালো ভালডেজ। গতি আরো কমিয়ে আনলো ড্রাইভার, লো গিয়ার দিলো। উঁচু-নিচু পথ ধরে আরো বিশ মিনিট এগোলো ওরা। ইতি-মধ্যে দিনের আলো পুরোপুরি ফুটেছে, আকেইশা গাছের মগডাল ছুঁয়েছে কচি রোদ।

আরেকটা নির্দেশ দিলো ক্যাপটেন, পথ ছেড়ে মাঠে নেমে এলো ল্যাণ্ড রোভার, মাঠ থেকে ঢুকে পড়লো কোমর সমান উঁচু ঘাসের রাজ্যে। একটা পাথুরে ঢালকে ঘিরে এগোলো গাড়ি। বোঝা গেল, নগণ্য পথটা থেকেও যতোদূর সম্ভব সরে আসতে চাইছে ওরা জঙ্গলের আরো খানিক ভেতরে ঢুকে থামলো ড্রাইভার।

'কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না,' বিড়বিড় করে বললো সোহানা। বাংলায় কথা বলছে সে। 'কিছু করার আগে আমাকে বলবে।'

রানার মুখে কথা যোগালো না।

'আপনারা কেউ নড়বেন না!' হুকুম করলো ভালডেজ।

'কাপুরুষ!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলো সোহানা। 'এই কাজ করতে তোমার লজ্জা করছে না?'

ধীরে ধীরে সোহানার দিকে ফিরলো ক্যাপটেন ভালডেজ। স্টীল রিম চশমার ভেতর তার চোখে হয়তো বিষাদ আর সহানুভূতি আছে, কিন্তু মুখের চেহারা নির্দয় খুনীর মতো কঠোর। প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। ট্রুপারদের দিকে তাকিয়ে শোনা ভাষায় অর্ডার দিলো।

হাতের অস্ত্র ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে রাখলো ট্রুপাররা, রুফ-র‍্যাক থেকে তিনটে ভাঁজ করা ট্রেঞ্চিং-টুল নামালো ড্রাইভার।

জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের ইগনিশন থেকে চাবিটা বের করে নিলো ভালডেজ। নিজের লোকদের নিয়ে খানিক দূর হেঁটে গেল সে, বুটের ডগা দিয়ে মাটির ওপর লম্বা দাগ টানলো —প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, পাশাপাশি। গা থেকে ব্যাটল জ্যাকেট খুলে কবর খুঁড়তে লেগে গেল ওরা। একপাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছে ক্যাপটেন। একটা সিগারেট ধরালো সে, স্থির ঠাণ্ডা বাতাসে খাড়া উঠে গেল নীলচে ধোঁয়া।

দশ

'রাইফেল নিতে যাচ্ছি আমি,' ফিসফিস করে বললো রানা।

রাইফেলগুলো ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে। দুটো সিটের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে ওকে, তারপর র‍্যাকে খাড়া করে রাখা রাইফেলের নাগাল পেতে হবে। তারপরও পাঁচটা কাজ বাকি থাকবে—র‍্যাকের ক্লিপ খোলা, রাইফেল লোড করা, রেট-অভ-ফায়ার সিলেকটর বদলানো, এবং সবশেষে পিছনের জানালা দিয়ে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করা। এ সবই ওকে সারতে হবে হাতে হাত-কড়া পরা অবস্থায়।'

'পারবে না,' অস্ফুটে বললো সোহানা।

'হয়তো,' গম্ভীরমুখে একমত হলো রানা। 'কিন্তু আর কিছু ভাবতে পারো তুমি? শোনো, আমি রেডি বললেই ডাইভ দিয়ে গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়বে।'

ধীরে ধীরে সিটের ওপর ঘুরে বসলো রানা। পিছনের জানালা দিয়ে ছোট্ট দলটার দিকে তাকালো। শক্ত মাটি, পাথর মেশানো —কবর খুঁড়তে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা।

'শোনো,' হঠাৎ খুব জরুরী ভঙ্গিতে বললো রানা, 'তোমাকে

আমি ভালোবাসি। এতো ভালো জীবনে বোধহয় কাউকে বাসিনি।'

'এখন এসব কথা বলো না,' সোহানার গলা বন্ধ হয়ে এলো। 'আমি কেঁদে ফেলবো।'

'আমি চাই তুমি ভয় পাবে না।'

'গুড লাক!' সিটের ওপর মাথা নিচু করে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে সোহানা নিজের সিটের ওপর শরীরটা উঁচু করলো রানা, তার পিঠ জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো সোহানা। সামনের সিটের পিঠ টপকে পিছনের সিটে নেমে পড়লো রানা। মাথা তুলে পিছনের জানালা দিয়ে চট করে বাইরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সোহানা।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো সোহানা। 'ক্যাপটেন এদিকে আসছে ...না, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন বলছে ওদের।'

একটা গড়ান দিয়ে পিছনের সিট থেকে নেমে পড়লো রানা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করলো ও, নাগালের মধ্যে চলে এলো র‍্যাক। ইস্পাত দিয়ে দুটো হাত এক করে বাঁধা, রাইফেলটাকে কিছুর সাথে বাড়ি না খাইয়ে নামিয়ে আনতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ও।

সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে কয়েক সেকেণ্ড আর কোনো দিকে খেয়াল থাকলো না ওদের।

'যেখান থেকে নিয়েছেন সেখানেই রেখে দিন,' নিচু একটা গলা শোনা গেল।

পাথর হয়ে গেল রানা। হাতে রাইফেল নিয়ে পিছনের সিটে বসে আছে ও, কক্ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। ধরা পড়ে গিয়েও জানালার দিকে মুখ তুললো না ও। শেষ সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে

গেল।

'যা বলছি শুনুন,' আবার নিচু গলায় ইংরেজীতে বললো ভালডেজ। 'রাইফেল রেখে নিজের সিটে ফিরে যান।'

আয় শালা, রাইফেল কেড়ে নিতে চেষ্টা কর।— মনে মনে বললো রানা। ক্যাপটেনকে নাগালের মধ্যে পেতে চাইছে ও। মরার আগে অন্তত একটাকে নিয়ে মরবে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মিঃ রানা। আপনাকে বুঝতে হবে, আমরা সবাই ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি। একটু আশা আছে আপনি শুধু যদি চুপচাপ থাকেন।' পকেট থেকে ইগনিশন কী বের করলো সে, পিস্তল হোলস্টারের ফ্ল্যাপ আলগা করলো। বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'ওদের আমি নিরস্ত্র করেছি, তিনজনই কাজে ব্যস্ত··· ল্যাণ্ড-রোভারে আমি যখন ঢুকবো, বাধা দেবেন না আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন—বুঝতে পারছেন?'

ভুরু কুঁচকে উঠলেও, মাথা ঝাঁকালো রানা।

রাইফেল রেখে রানাকে নিজের সিটে ফিরে আসার সময় দিলো ক্যাপটেন, তারপর ড্রাইভারের দরজা খুলে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো। একটা হাত হুইলে রেখে পিছন ফিরে জানালা দিয়ে লোক তিনজনের দিকে তাকালো একবার। দুটো কবরে কোমর সমান নেমে আছে ওরা। ব্যস্ত, আরো গভীর করছে গর্ত।

ইগনিশনের চাবি ঢোকালো ভালডেজ। ঘোরালো।

গর্জে উঠলো স্টার্টার মটর, একসাথে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালো ট্রুপাররা। স্টার্টার মটর বার কয়েক ঘর ঘর আওয়াজ করে থেমে গেল, ইঞ্জিন চালু হলো না। ট্রুপারদের একজন হুংকার ছাড়লো, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো কবর থেকে। সারা শরীর ঘামে

ভিজে আছে, তার সাথে ধুলো-কাদা মিশে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে ছুটে আসছে সে।

ঘন ঘন অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো ভালডেজ, ইগনিশন-চাবি ঘুরিয়ে আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই একই অবস্থা—স্টার্টার গর্জে ওঠে, কিন্তু ইঞ্জিন চালু হয় না। স্টীল রিমের ভেতর ভালডেজের চোখ জোড়া আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

ছুটন্ত ট্রুপার প্রায় পৌঁছে গেছে। বাকি দু'জন, ততোটা সতর্ক নয়, তবে অনুসরণ করছে তাকে।

'দরজা বন্ধ করুন!' চিৎকার করলো রানা। এক টানে নিজের দিকের দরজা বন্ধ করলো ক্যাপটেন, ঝাপটা দিয়ে লক পজিশনে নামিয়ে আনলো হাতলটা। সেই সাথে দরজার ওপর কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো ট্রুপার। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাইরের হাতল ঘোরাতে চেষ্টা করলো সে, তারপর ছুটলো পিছনের দরজার দিকে। সোহানা সেটা লক করার আগেই ঝাঁকি দিয়ে টেনে খুলে ফেললো, ভেতরে মাথা আর কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়ে দু'হাতে ধরলো সোহানাকে। খোলা দরজা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সিটের ওপর ঘুরে বসলো রানা, হাতকড়া পরা হাত দুটো মাথার ওপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনলো ট্রুপারের কামানো চাঁদিতে। ইস্পাতের ধারালো কিনারা খুলির হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল, মুখ থুবড়ে খোলা দরজার ওপর পড়ে নিথর হয়ে গেল লোকটা, বাইরে অর্ধেক-টা ঝুলছে। তার মাথায় আবার মারলো রানা, ক্ষতের গভীরে সাদা হাড় দেখতে পেলো ও, উজ্জ্বল দ্রুতগতি রক্ত ঢেকে ফেললো হাড়-টাকে। বাকি দু'জন ট্রুপারও প্রায় পৌঁছে গেল, মাথার ওপর কোদাল তুলে তেড়ে আসছে। এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠলো ইঞ্জিন,

হাত ঝাপটা দিয়ে গিয়ার দিলো ভালডেজ।

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। সিট থেকে ছিটকে অর্ধেক শরীর দিয়ে সোহানার ওপর পড়লো রানা, আর রক্তাক্ত ট্রুপারকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কাঁটাঝোপ।

বার বার কাত হলো গাড়ি, মনে হলো উল্টে যাবে। মাটি এদিকে উঁচু-নিচু, ফুটবলের মতো ড্রপ খেতে খেতে এগুলো ল্যাণ্ড-রোভার। হুংকার ছাড়তে ছাড়তে এখনো পিছু ধাওয়া করছে দু'জন ট্রুপার। পিছনের খোলা দরজা প্রতি মুহূর্তে দড়াম দড়াম বাড়ি খেলো। হুইল সোজা করে নিয়ে গিয়ার বদল করলো ক্যাপটেন। গতি পেয়ে জোরে ছুটলো গাড়ি, পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো ট্রুপাররা। ওদের একজন মরিয়া হয়ে হাতের কোদালটা ছুঁড়ে দিলো ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে! পিছনের জানালা চুরমার হয়ে গেল, ক্যাবের পিছনে ছড়িয়ে পড়লো টুকরো কাঁচ।

উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথে ছুটছে গাড়ি। ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, এতোক্ষণে দ্রুত হলো গতি, এখন কেউ আর দৌড়ে এসে ধরতে পারবে না ওদের। হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রুপাররা। খানিক পর গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল তারা, আরো একটু পর তাদের অশ্রাব্য গালিগালাজও আর শোনা গেল না।

মেটো পথের ওপর ফিরে এলো ল্যাণ্ড-রোভার। স্পীড আরো একটু বাড়িয়ে দিলো ক্যাপটেন। 'আপনার হাত দুটো দিন, মিঃ রানা,' বললো সে। রানা হাত বাড়াতে হাতকড়ার তালা খুলে দিলো। 'নিন!' রানার মুঠোয় চাবি গুঁজে দিলো সে।

মুক্ত কব্জি দুটো পালা করে ডলতে শুরু করলো সোহানা।

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো··· ।'

পথের ওপর চোখ রেখে হেসে উঠলো ভালডেজ। 'ভেবে দেখুন, আপনার বন্ধু এই বান্দাকেই আরেকটু হলে গুলি করে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন।' রানার দিকে একবার তাকালো সে। 'মিঃ রানা, হাতে একটা রাইফেল রাখুন। আরেকটা আমাকে দিন।'

বেঁটে, কদাকার রাইফেল দুটো সিটের ওপর দিয়ে হস্তান্তর করলো সোহানা। রেগুলার আর্মির মধ্যে শুধু থার্ড ব্রিগেডই এ-কে ফরটিসেভেন ব্যবহার করে, ওরা উত্তর কোরিয়ান ইন্সট্রাক্টরদের কাছে ট্রেনিং পেয়েছে।

দ্রুত হাতে বাঁকা "ব্যানানা" ম্যাগাজিন চেক করলো রানা, তারপর রিলোড করলো চেম্বার। অস্ত্রটা প্রায় নতুন, নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়েছে। হাতে এটা থাকায় গোটা ব্যক্তিত্বই যেন বদলে গেল। কয়েক মুহূর্ত আগেও ঘটনাপ্রবাহের অসহায় শিকার ছিলো রানা, কিছুর ওপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। দ্বিধা আর অনিশ্চয়তায় ভুগছিল, ফুঁসছিল নিষ্ফল আক্রোশে। কিন্তু এখন সে সশস্ত্র। এখন সে পাল্টা আঘাত হানতে পারে। রক্ষা করতে পারে নিজেকে, রক্ষা করতে পারে আপনজনকে।

সিটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সোহানার কাঁধ ধরলো রানা। কাঁধ থেকে ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো সোহানা।

'এখন আমরা অন্তত লড়তে পারবো।' রানার এই নতুন সুরে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, সোহানাকেও তা স্পর্শ করলো। দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলো রানা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হুইস্কির বোতলটা বের করলো ও, সোহানার হাতে ধরিয়ে

দিলো। তারপর সোহানার কাছ থেকে নিয়ে ভালডেজকে দিলো।

'এবার শুরু করুন, ক্যাপটেন,' বললো ও 'আসলে কি ঘটছে বলুন তো?'

বোতল থেকে এক ঢোক হুইস্কি গিলে, বোতল কতোটা খালি হয়েছে দেখলো ভালডেজ। 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, মিঃ রানা। আমার ওপর জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশ ছিলো, আপনাদের খুন করে লাশ গায়েব করে ফেলতে হবে। তারপর আপনাদের নিখোঁজ হওয়ার জন্যে দায়ী করা হবে ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের।'

'সেই নির্দেশ আপনি পালন করেননি। কেন?'

উত্তর দেয়ার আগে বোতলটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলো ভালডেজ, কাঁধের ওপর দিয়ে সোহানার দিকে একবার তাকিয়ে নিলো। 'আমার সাথে ওরা যারা ছিলো, সবাই ইংরেজী জানতো। আমি যে আপনাদের দলে, কথাটা বলতে পারিনি। আপনাদের খুন করার সমস্ত প্রস্তুতি বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে আমাকে, আমি চাইনি ওরা কিছু সন্দেহ করুক।'

'ক্যাপটেন ভালডেজ, আই লাভ ইউ ফর হোয়াট ইউ আর ডুয়িং,' বললো সোহানা, 'কিন্তু বলবেন কি, এ কাজ আপনি কেন করছেন?'

'কেউ জানে না, শুধু আপনাদেরকেই প্রথম বলছি, আমার মা ছিলো একজন ম্যাটাবেল,' যেন কেউ শুনতে পাবে এই ভয়ে ফিস-ফিস করে কথা বলছে ক্যাপটেন। 'আমি খুব ছোটো থাকতে মা মারা যায়, কিন্তু তার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। বাবার কাছে একজন শোনা হিসেবে বড় হলাম বটে, কিন্তু আমি কখনো ভুলতে পারিনি আমার শরীরে ম্যাটাবেল রক্ত রয়েছে।' ওদের

দিকে তাকালো না ভালডেজ, পথের ওপর চোখ রেখে কথা বলে গেল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হলো ম্যাটাবেল উপজাতির ওপর ম্যাশোনাদের নির্মম অত্যাচার। সেনাবাহিনীতে আছে বলে এই কোন্দল আর নোংরা রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়ায়নি ভালডেজ, ম্যাটাবেলদের জন্যে মনে মনে শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাশোনারা ম্যাটাবেল নেতাদের এক এক করে জেলে ভরতে শুরু করে, বিনা দোষে নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে ধরে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠায়, ম্যাটাবেলদের গ্রামগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ-সব দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি ভালডেজ, বোকার মতো নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ফেলেছে। জেনারেল উমাঙ্গো তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে বুঝতে পারে ভালডেজ আর তার কোনো কাজে আসবে না। উমাঙ্গো যে তাকেও বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবে না, ছোটোখাটো লক্ষণ দেখে সেটা টের পেয়ে যায় ভালডেজ। তার ধারণা, এটাই তাকে দেয়া শেষ কাজ। 'আপনাদের লাশ পুঁতে ফিরে গেলেই উমাঙ্গো আমার ব্যবস্থা করতো, অন্তত আমার তাই ধারণা। হয় আপনাদের মতো আমাকেও পুঁতে ফেলা হতো, না হয় উমাঙ্গো তার পোষা চিতা আর হায়েনাদের সামনে ফেলে দিতো আমাকে।'

'উমাঙ্গোর পোষা চিতা?' ভুরু কুঁচকে তাকালো রানা। এই কথাগুলো টুটি মিশন স্কুলের হেড মিসট্রেস মিরাণ্ডা নয়নিও ব্যবহার করেছিল। 'এর মানে কি?'

'চিতা মানে চিতা, হায়েনা মানে হায়েনা,' ব্যাখ্যা করলো ভাল-ডেজ। 'প্রতিটি পুনর্বাসন কেন্দ্রের আশপাশে চিতা আর হায়েনা পোষে জেনারেল উমাঙ্গো, কেউ অবাধ্য হলে বা অত্যাচারে মারা গেলে তাকে ওগুলোর খাদ্য হিসেবে জঙ্গলে ফেলে আসা হয়।

জানোয়ারগুলো হাড়ের একটা কণা বা ছালের একটা লোম পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখে না, সব খেয়ে ফেলে।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলো সোহানা। 'টুটিতে আমরা চিতা আর হায়েনার ডাক শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। উমাঙ্গো আমাদের সাবধান করে বলেওছিলো, ভুলেও যেন ক্যাম্পের বাইরে না যাই। এভাবে কতোজনকে মারা হয়েছে?'

'হিসেব নেই···হাজার হাজার।'

'কী ভয়ংকর!'

'ম্যাটাবেলদের ওপর জেনারেল উমাঙ্গোর ঘৃণা সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। তার বেলায় এটা একটা ম্যাডনেস। একটাই কথা তার, ওদেরকে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। গোটা ম্যাটাবেল উপজাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছে সে। প্রথমে নেতাদের খতম করছে, দেশদ্রোহের মিথ্যে অভিযোগ তুলে···জেনারেল টস মাজুলেটের কথাই ধরুন··· ।'

'সেকি—না!' সোহানা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো। 'এ আমি সইতে পারবো না—জেনারেল মাজুলেট নির্দোষ?'

রানা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল, শুধু চোয়াল দুটো একবার উঁচু হয়ে উঠলো ওর, কপালের পাশে তির তির করে কেঁপে উঠলো একটা শিরা।

'জেনারেল মাজুলেটকে ফাঁসাবার জন্যে চিন্তার অতীত সতর্ক ছিলো উমাঙ্গো। অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে একটু একটু করে এগিয়েছে। সে জানতো, রাজনৈতিক অভিযোগ তুলে জেনারেল মাজুলেটকে ফাঁসানো যাবে না, তাহলে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি বিদ্রোহ করবে। আপনারা তাকে নিখুঁত একটা সুযোগ নিয়ে এসে

দেন—এ নন-পলিটিকাল ক্রাইম।'

'আজ বুঝলাম, কি বোকামি করেছি আমি,' বললো সোহানা। 'কিন্তু জেনারেল মাজুলেট যদি না হন, মাস্টার পোচার তাহলে কে?'

'জেনারেল উমাঙ্গো স্বয়ং।'

'আপনি ঠিক জানেন?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো রানা।

'বিমানে হাতির দাঁত তোলার কাজটা আমিই তো তদারক করতাম।'

'কিন্তু সে-রাতে কোরাই রোডে?'

'ওটার আয়োজন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। উমাঙ্গো জানতো, আগে বা পরে টুটি মিশনে জেনারেল মাজুলেট যাবেনই। জেনারেল মাজুলেটের সেক্রেটারীই আমাদেরকে তারিখ আর সময় জানিয়ে দেয়। তেরপল ঢাকা ট্রাকে আমরাই হাতির দাঁত আর চিতার ছাল ভরে দিই, ড্রাইভার ছিলো একজন ম্যাটাবেল। তাকে আমরা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে মুক্তির লোভ দেখিয়ে এই কাজে রাজি করাই। তবে জেনারেল মাজুলেট যে ওরকম ভয়ংকর হয়ে উঠবেন সেটা আমরা কেউ আশা করিনি। ব্যাপারটা আমাদের জন্যে বোনাস হয়ে দেখা দেয়।'

এই পথে যতো জোরে সম্ভব ল্যাণ্ড-রোভার চালাচ্ছে ভালডেজ। নিজেদের সিটে কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা আর সোহানা, মৃত্যুর কিনারা থেকে ফিরে আসার আনন্দ দ্রুত চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ক্লান্তি আর নির্মম দুঃখবোধে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বতসোয়ানা সীমান্তে।'

দক্ষিণ আর পশ্চিমে বতসোয়ানা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, প্রতিবেশী

দেশগুলোর রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা ওখানে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ বোধ করে।

'ম্যাটাবেলদের ওপর কি ঘটছে, যাবার পথে দেখার সুযোগ পাবো আমরা। দক্ষিণ-পশ্চিম ম্যাটাবেলিল্যাণ্ড সম্পূর্ণ সীল করে দিয়েছে উমাঙ্গো—সাংবাদিক, যাজক, রেডক্রস কারো ঢোকার অনুমতি নেই।'

পথের ওপর উই-পোকা গর্ত করে রেখেছে, গাড়ির গতি কমাতে বাধ্য হলো ভালডেজ। গর্তের ভেতর চাকা ডেবে গেল দু'বার, দু'বারই গাড়ি ঠেলে গর্ত থেকে চাকা তুলতে হলো।

স্পীড আবার বাড়িয়ে দিয়ে ভালডেজ বললো, 'উমাঙ্গো যে পাস দিয়েছে, সেটা দেখিয়ে খানিক দূর যেতে পারবো আমরা, কিন্তু সীমান্ত পর্যন্ত যেতে পারবো না।'

'তাহলে?' জানতে চাইলো সোহানা।

সীমান্ত পেরোবার পয়েন্টে না পৌঁছুনো পর্যন্ত সাইড আর ব্যাক রোড ব্যবহার করতে হবে। আমার দলবদলের ব্যাপারটা একটু পরেই জেনে ফেলবে উমাঙ্গো। আমাদের পিছনে গোটা থার্ড ব্রিগেড লেলিয়ে দেবে সে। সেটা ঘটতে শুরু করার আগে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাই আমি।'

পথের মোড়ে এসে পৌঁছুলো ওরা, ল্যাণ্ড-রোভার থামালো ভালডেজ। কিন্তু ইঞ্জিন চালু থাকলো। লেদার ম্যাপ কেস থেকে একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ বের করলো সে। খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর বললো, 'রেললাইনের ঠিক দক্ষিণে রয়েছি আমরা। এই রাস্তাটা এম পাণ্ডেনি মিশন স্টেশনের দিকে চলে গেছে। আমাদের খোঁজ শুরু হবার আগে ওখানে যদি পৌঁছুতে পারি, তাহলে মাদাবা আর

মাতসুমির মাঝখান দিয়ে বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করা যাবে। বত-সোয়ানা পুলিশ বেড়া বরাবর সারাক্ষণ পেট্রল দেয়।

'ওদিকেই চলুন,' বললো রানা। প্রথমে নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার ওদের, আর সব কথা পরে ভাবা যাবে। ম্যাপ ভাঁজ করে রেখে দিলো ভালডেজ, আবার ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার।

কয়েক মিনিট পর সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'আরো কিছু প্রশ্ন আছে আমার।'

'বলুন।'

'বোস পরিবারকে খুন করা হলো কেন? শুধু বোস পরিবার নয়, শ্বেতাঙ্গ আর ভারত থেকে আসা বহু পরিবারকে মেরে ফেলা হয়েছে। এসবের জন্যে, আপনি বলতে চাইছেন, জেনারেল মাজুলেট দায়ী নয়?'

'মোটেও না। আগে কিছু খুন-খারাবি অবশ্য ম্যাটাবেলরাই করেছে, কিন্তু জেনারেল মাজুলেট মরিয়া হয়ে ওদের কন্ট্রোলে আনার চেষ্টা করছিলেন। আমার বিশ্বাস টুটি মিশনে সেজন্যেই সেদিন যাচ্ছিলেন তিনি, চরমপন্থী ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে।'

'কিন্তু রক্ত দিয়ে দেয়ালে ওই লেখাগুলো—জেনারেল মাজুলেট দীর্ঘজীবী হোন?'

এবার কথা বলতে পারলো না ভালডেজ, তার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠলো, যেন ভয়ংকর একটা দ্বন্দ্বে ভেতরটা তার ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

সোহানা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকালো, কিন্তু ভালডে-জকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

খানিক পর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো ক্যাপটেন। 'আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, সত্যি কথাই বলবো আমি। শুধু অনুরোধ করবো, আমার পজিশনটা আপনাদের বুঝতে হবে।'

চুপ করে থাকলো ওরা।

'আমি...আমিই বোস পরিবারকে খুন করার সমস্ত আয়োজন করি। পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়ে ওদের খুন করার জন্যে লোক বাছাই করতে হয় আমাকে। মুক্তির লোভ দেখিয়ে ওদেরকে কাজগুলো করতে রাজি করাই। কোথায় যেতে হবে, কাকে মারতে হবে, দেয়ালে কি লিখতে হবে—সব আমিই তাদের বলে দিই। আমার কাছ থেকেই অস্ত্র আর থার্ড ব্রিগেডের গাড়ি পায় ওরা।' জঘন্য অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করছে ক্যাপটেন, গলা একটুও কাঁপছে না, শুধু চোখ থেকে নেমে আসছে পানির দুটো ধারা। 'উমাঙ্গোর নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমার ছিলো না। আমি একটা কাপুরুষ ছিলাম, জেনে শুনে...'

'ওদের তাহলে উমাঙ্গোর নির্দেশে খুন করা হয়?'

'হ্যাঁ। ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের দিয়ে খুন করিয়ে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে সে—এটা তার সূক্ষ্ম একটা কৌশল ছিলো। ম্যাটাবেলরা নিরীহ মানুষকে পাইকারীভাবে মেরে ফেলছে এই অজুহাত দেখিয়ে থার্ড ব্রিগেডকে ওদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে সে। আগেই বলেছি, ম্যাটাবেলদের জাত শত্রু উমাঙ্গো, গোটা উপজাতিকে ধ্বংস না করে শান্ত হবে না সে। এবার নিশ্চই আপনারা বুঝতে পারছেন, কেন আমি পালাচ্ছি?'

'মাজুলেট এখন কোথায় জানেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তাকেও কি উমাঙ্গো, মেরে ফেলতে চায়?'

'কোথায় জানি না। তবে জেনারেল মাজুলেটকে উমাঙ্গো মারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাকে জ্যান্ত দরকার ওর। তাকে নিয়ে ওর একটা প্ল্যান আছে...'

'কি প্ল্যান?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলো রানা।

'তা জানি না। তবে...একজন বিদেশী লোকের সাথে তাকে আমি আলোচনা করতে দেখেছি। কোনো কমিউনিস্ট দেশের প্রতিনিধি হবে লোকটা।'

'রাশিয়ান?'

মাথা নাড়লো ভালডেজ। 'কি জানি। জার্মান হতে পারে, অনেকগুলো ভাষায় কথা বলে—রুশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংলিশ।'

'লোকটাকে আপনি নিজের চোখে দেখেছেন, ক্যাপটেন?'

'দেখেছি। বেশ কয়েকবারই দেখেছি।'

ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। উমাঙ্গোর যদি ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য থাকে, লোকটা যে-দেশেরই হোক, ইন্টেলিজেন্সের কোনো অফিসার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'বিদেশী লোকটার কথা আপাততঃ থাক। মাজুলেটকে কোথায় রাখা হয়েছে আপনি জানেন না। এবার, সাউল র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী সম্পর্কে বলুন। উমাঙ্গো আমার সম্পত্তি কেড়ে নিলো—নিজের জন্যে, না সরকারের জন্যে?'

'অবশ্যই নিজের জন্যে, স্যার।'

'কিভাবে? মানে, সম্পত্তিটা নিজের নামে করতে গেলে আইন তাকে বাধা দেবে না?'

'সব দিক গুছিয়ে নিয়েই কাজে হাত দিয়েছে উমাঙ্গো। স্বীকারোক্তি দিয়ে আপনি এ-দেশের শত্রু হয়েছেন। আপনার সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ল্যাণ্ড-ব্যাংক আপনার লোনের জন্যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা বলবে সম্পত্তির মালিক দেশের শত্রু হওয়ায় তাদের আর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকলো না। অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক আপনাকে যে টাকা ধার দিয়েছিল সেটা তারা ফিরে পাচ্ছে না। সরকার বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিক্রি করার জন্যে টেণ্ডার ডাকবে, শুধু উমাঙ্গোর টেণ্ডারই গ্রহণ করা হবে। শত্রু-সম্পত্তি মন্ত্রণালয়ে উমাঙ্গোর ভগ্নীপতি সবচেয়ে বড় পদ দখল করে বসে আছে। অর্থাৎ নামমাত্র টাকায় ওটা কিনে নেবে উমাঙ্গো।'

সারাদিন চলার মধ্যে থাকতে হবে, কাজেই মুখে কিছু দেয়ার তাগাদা অনুভব করলো ওরা। পথ থেকে সরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকলো ল্যাণ্ড রোভার। ছুরি দিয়ে ঝোপ কেটে নিয়ে এলো সোহানা আর ভালডেজ, গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সেগুলো ঘন করে বিছিয়ে দিলো রানা, বিশেষ করে আকাশ থেকে যাতে ল্যাণ্ড রোভারকে দেখা না যায়। প্যাসেঞ্জার সিটের নিচের লকার থেকে ইমার্জেন্সী রেশন বের করলো ভালডেজ। ফ্লোরবোর্ডের নিচের ট্যাংক থেকে বেরুলো খাবার পানি।

একটা মেটাল ক্যানটিনে বালি ভরলো সোহানা, রিজার্ভ ট্যাংক থেকে গ্যাসোলিন নিয়ে সেই বালি ভিজিয়ে আগুন ধরালো। 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,' মন্তব্য করলো রানা। আগুনের শিখা লক লক করে উঠলো, কিন্তু কোনো ধোঁয়া থাকলো না। চায়ের জন্যে পানি গরম করতে দিলো সোহানা।

খেতে বসে বিশেষ কথা হলো না। একবার উঠে গিয়ে ভলিউম বাড়িয়ে রেডিওর কথাবার্তা শুনলো ভালডেজ, ফিরে এসে মাথা নাড়লো সে। 'আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সীমান্ত এখান থেকে কতোদূর?' গরুর ঠাণ্ডা মাংস মুখে পুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'চল্লিশ মাইল—কিছু বেশিও হতে পারে।'

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। লাফ দিয়ে ছুটে গেল ভাল-ড্রেজ। এবার সাথে সাথে ফিরে না এসে মনোযোগ দিয়ে শুনলো—বেশ অনেকক্ষণ ধরে। যখন ফিরে এলো, গম্ভীর দেখালো তাকে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমাদের অল্প ক'মাইল সামনে থার্ড ব্রিগেডের একটা ইউনিট রয়েছে,' বললো ক্যাপটেন। 'এমপাণ্ডেনি মিশন স্টেশনে ছিলো ওরা, এইমাত্র রওনা হয়েছে। বিদ্রোহীদের আস্তানা ধ্বংস করে ফিরে যাচ্ছে ঘাটিতে। সম্ভবত এই পথ দিয়েই যাবে ওরা।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো সে, 'আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।'

'রাস্তা থেকে আমাদের দেখা যায় কিনা চেক করছি আমি,' বলে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো রানা। 'সোহানা, আগুন নেভাও। ক্যাপটেন, কাভার দিন আমাকে।'

রাইফেল তুলে নিয়ে পথের দিকে ছুটলো ও। পথের ওপর দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো, ডালপালা দিয়ে ঢাকা ল্যাণ্ড-রোভা-রের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় কিনা। তারপর নিজের পায়ের, আর ল্যাণ্ড-রোভারের চাকার দাগ ঢাকার জন্যে পাতাবহুল ডাল ফেললো পথের ওপর। রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় ঘাসের ওপর দিয়ে এসেছে গাড়ি, উবু হয়ে বসে নুয়ে পড়া ঘাসগুলোকে যথাসম্ভব খাড়া করার চেষ্টা করলো। কাজটা নিখুঁত হলো না, তবে ছুটন্ত একটা গাড়ি থেকে এতো ছোটোখাটো ব্যাপার কারো

চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। সিধে হয়ে দাঁড়ালো রানা, সেই সাথে বাতাসের সাথে ভেসে এলো মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ, চিনতে পারলো ও।

ছুটে ল্যাণ্ড-রোভারে এসে উঠলো রানা, সামনের সিটে ভাল-ডেজের পাশে বসলো।

'আপনার রাইফেল র‍্যাকে রেখে দিন,' বললো ক্যাপটেন। রানা ইতস্তত করছে লক্ষ্য করে আবার মুখ খুললো সে, 'প্লিজ, যা বলছি শুনুন, মিঃ রানা। ওরা যদি আমাদের দেখতে পায়, ফাইট করার কোনো মানেই থাকবে না। আমি ওদের ভুল বুঝিয়ে বোকা বানা-বার চেষ্টা করবো। কিন্তু আপনার হাতে অস্ত্র থাকলে কিছুই আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোহানার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিলো রানা। নিজেকে ওর নগ্ন আর অসহায় লাগলো। কোলের ওপর হাত দুটো শক্ত মুঠো করে রাখলো ও। র‍্যাকে রাইফেল রেখে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো সোহানা, মৃদু চাপ দিলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। বোঝা গেল, একটা কনভয় আসছে। এরপর হঠাৎ করে অনেক মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়লো ওদের ওপর।

গানের আওয়াজ বাড়তে লাগলো। অদ্ভুত ছন্দময় আফ্রিকান ভাষার গান, সুরের প্রতিটি বিরতিতে একটা করে হুংকারের মতো দুর্বোধ্য আর্তনাদ আছে—ঘাড়ের পিছনে রানার চুল খাড়া হয়ে গেল।

'থার্ড ব্রিগেড,' নিচু গলায় বললো ভালডেজ। 'রেজিমেন্টের নিজস্ব সঙ্গীত।' তারপর সৈনিকদের সাথে গলা মিলিয়ে নিজেই গাইতে শুরু করে দিলো সে।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে ধুলোর পাহাড় দেখলো রানা। গানের আওয়াজ একেবারে কাছে চলে এলো। উইণ্ডশীল্ডে রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠলো। ডালপালার একটা ফাঁকে চোখ রেখে কনভয়-টাকে দেখতে পেলো ও। বাদামী রঙের তিনটে ট্রাক, প্রতিটি ট্রাকের পিছনে গিজ গিজ করছে সৈনিকদের বুশ হ্যাট পরা মাথা। প্রত্যেকে ব্যাটল-ক্যামোফ্লেজ পরে আছে, হাতে রাইফেল নিয়ে সদা-প্রস্তুত। শেষ ট্রাকের ক্যাবে একজন অফিসার রয়েছে, শুধু এই একজনের পরনেই লালচে বেরেট আর রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ দেখা গেল। লোকটা সরাসরি রানার চোখে তাকালো, মনে হলো একদম কাছ থেকে, ডালপালার ফাঁকগুলো হঠাৎ যেন বড় বেশি ফাঁক ফাঁক ঠেকলো ছিটকে নিজের সিটে পিছিয়ে এলো রানা।

কোনো বিপদ ঘটলো না, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল আর্মি কনভয়। ইঞ্জিন আর গানের শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকটাকে হালকা করলো ভালডেজ। 'আরো দল আসবে,' সাবধান করে দিয়ে বললো সে। ইগনিশন কী-তে আঙুল রেখে অপেক্ষা করলো, ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে চালু করলো ল্যাণ্ড-রোভার।

পথের ওপর উঠে এসে কনভয়ের উল্টো দিকে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। বিশ মিনিট পর হঠাৎ মাথা নিচু করে উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো ক্যাপটেন। 'ধোঁয়া,' বললো সে। 'ঠিক সামনেই এমপাণ্ডেনি। ক্যামেরা রেডি রাখবেন, মিস সোহানা। আমার ধারণা, থার্ড ব্রিগেড আপনার ছবির জন্যে প্রচুর খোরাক রেখে গেছে।'

মিশন গ্রামটাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে ভুট্টাক্ষেত। পেকে

হলুদ হয়ে আছে ফসল, শুধু কাটার অপেক্ষা। মেয়েরা কাজ করছিল ক্ষেতে, তাদের একজন মেটো পথের ওপর পড়ে আছে। ছুটছিল, পিছন থেকে পিঠে গুলি করা হয়েছে, দুই স্তনের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পিঠে ঝোলার ভেতর ছিলো বাচ্চাটা, মা হয়তো ছুটছিল বলেই গুলির সময় ঝোলাটা একপাশে সরে যায়, তাই বাচ্চাটাকে গুলি লাগেনি—বেয়নেট চার্জ করে মারা হয়েছে তাকে। ওরা পাশ কাটাবার সময় নীল মাছির ঝাঁক ভন ভন করে লাশ ছেড়ে উঠে পড়লো, তারপর আবার ঝাঁক বেঁধে বসলো।

কারো মুখে কথা নেই। ক্যামেরা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে নিকন-টা বের করলো সোহানা, তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে।

দ্বিতীয় মেয়েটা রাস্তা থেকে খানিক দূরে পড়ে আছে—ঠিক লাশ বলা যাবে না, রক্তরাঙা কাপড়ের একটা পোঁটলা। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা কুড়েঘর। প্রতিটি জ্বলছে পরিষ্কার নীল আকাশের একটা অংশ ঢাকা পড়ে গেছে কালো ধোঁয়ায়। বেশির ভাগ লাশই জ্বলন্ত কুঁড়েঘরে ফেলে দিয়ে গেছে ওরা। রক্তের অনেকগুলো ক্ষুদে পুকুর দেখা গেল, প্রতিটি পুকুর থেকে ধুলোর ওপর দিয়ে মোটা একটা দাগ চলে গেছে কুড়েঘরগুলোর দিকে। গুলি খেয়ে গ্রামের লোকেরা যেখানে পড়েছে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের। বাতাসে মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ, মাথার মগজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায়। গন্ধটা ওদের টাকরায় জমে যাওয়া চর্বির মতো লেপ্টে থাকলো। রানার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো, নাকে আর মুখে হাতচাপা দিলো ও।

'এরা বিদ্রোহী?' অস্ফুটে বললো সোহানা। তার ঠোঁট বরফের মতো সাদা। কাঁপা হাতে ছবি তুলছে সে।

মুরগীগুলোও রেহাই পায়নি, মৃদু বাতাসে তাদের পালক উড়ছে।

'থামুন।'

মাথা নাড়লো ক্যাপটেন। 'থামলে বিপদ হতে পারে।'

'থামুন।' আবার চিৎকার করলো সোহানা।

দরজা খোলা রেখেই ছুটলো সোহানা, কুড়েঘরগুলোর মাঝখানে চলে এলো। দ্রুত নিজের কাজ সারলো সে, একের পর এক ফিল্মের রোল বদলালো। লেন্সের ভেতর চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত, সাদা ঠোঁট কাঁপছে।

'আমরা আর দেরি করতে পারি না,' অস্থির হয়ে উঠলো ভালডেজ।

'আরেকটু।' বলে সামনে এগোলো সোহানা—ঝুঁকে, হাঁটু গেড়ে বসে, কখনো পিছু হটে এসে বা সামনে ছুটে গিয়ে ক্যামেরার শাটার টিপছে ঘন ঘন। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো কয়েকটা ঘর দেখে সেদিকে এগোলো সে, আড়ালে হারিয়ে গেল। মাংস পোড়ার উৎকট দুর্গন্ধ আর আগুনের আঁচ অসহ্য মনে হলো রানার।

সোহানা চিৎকার করতেই ল্যাণ্ড-রোভার থেকে লাফ দিয়ে ছুটলো ওরা, ছোটার মধ্যেই দ্রুত হাতে রাইফেল কক করে নিলো। দু'জনের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে এগোলো ওরা, পরস্পরকে যাতে কাভার দিতে পারে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে পিছন দিকে বেরিয়ে এলো রানা।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, এখন আর ক্যামেরা ব্যবহার করার শক্তি নেই। কালো, নগ্ন একটা মেয়ে পড়ে আছে তার পায়ের সামনে। মেয়েটার ওপরের অংশ স্বাস্থ্যবতী যুবতীর বলে চেনা যায়, কিন্তু নাভির নিচে চামড়াহীন বীভৎস একটা দৃশ্য।

তাকে ওরা আগুনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জীবন বড় প্রিয়, আগুন থেকে নিজের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। শরীরের নিচের অংশে কোনো কোনো জায়গা গভীর-ভাবে পোড়েনি, সেখানে সাদা চর্বি আর লাল মাংস বেরিয়ে আছে। অন্যান্য জায়গায় সাদা হাড় দেখা গেল। তলপেটের নিচে চামড়া বলতে কিছু নেই, শুধুই দগদগে ঘা। দু'পাশের হিপ-বোন পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। পুড়ে গিয়ে ফেটে গেছে পেট, বাধা না থাকায় ফুলে উঠেছে ভেতরের নাড়িভুড়ি, একটু নড়াচড়া করলেই যেন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। আশ্চর্য, এখনো বেঁচে আছে সে। আঙুলগুলো ধুলোর ওপর নড়াচড়া করছে। কোনো শব্দ নেই, কিন্তু ঘন ঘন খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে মুখ। চোখ জোড়া সবটুকু খোলা, সজাগ এবং কাতর।

সোহানার কাঁধ ধরে তাকে নিজের দিকে ফেরালো রানা। ডুকরে কেঁদে উঠে রানার বাহুতে মুখ ঘষলো সোহানা, তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠলো।

'আপনারা ল্যাণ্ড-রোভারে ফিরে যান,' ভালডেজ বললো। 'ওর জন্যে আমাদের কারো কিছু করার নেই।'

সোহানাকে জড়িয়ে নিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে গেল সোহানা, কিন্তু রানা বাধা দিলো।

জ্বলন্ত ঘরটার কোণে পৌঁছে পিছন দিকে তাকালো রানা। বোবা মেয়েটার আরো কাছে সরে গেছে ভালডেজ, কোমরে রাইফেল নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অভাগীর দিকে। তার চেহারায় মেয়ে-টার সমস্ত কষ্ট আর আবেদনের ছায়া পড়েছে।

ঘরটাকে ঘুরে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো ওরা। ওদের পিছনে গুলির আওয়াজ হলো একটা, আগুনের শব্দে ভোঁতা শোনালো। হোঁচট খেলো সোহানা, তারপর তাল সামলে নিলো। ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে পৌঁছে ক্যাবের গায়ে হেলান দিলো সে, গলাটা লম্বা করে দিয়ে ধুলোর ওপর হড়হড় করে বমি করলো। সোজা হয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছলো, লক্ষ্যই করেনি রানা একটা রুমাল বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে।

ক্যাব থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করলো রানা। আর এক ইঞ্চির মতো অবশিষ্ট আছে। বোতলটা রানার হাত থেকে নিয়ে পানির মতো ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললো সোহানা। খালি বোতলটা ফিরিয়ে নিলো রানা, তারপর হঠাৎ করে নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলন্ত ঘরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলো সেটা।

ঘরের কোণে দেখা গেল ভালডেজকে, মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে। নিঃশব্দে ক্যাবে উঠলো সে, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসলো। সোহানাকে নিয়ে পিছনের সিটে উঠলো রানা। গ্রামের বাকি অংশের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালালো ভালডেজ। ঘন ঘন ডান বাঁয়ে তাকাচ্ছে সবাই। একটু পরপরই নতুন নতুন বীভৎস দৃশ্য।

লাল ইট দিয়ে তৈরি মসজিদটা পেরিয়ে এলো ওরা। পিছনে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলো, এক মুহূর্ত আগে দেখা গম্বুজটা নেই, সেখানে লালচে আগুনের শিখা নাচছে।

ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করলো রেডিওটা।

থার্ড ব্রিগেডের রোডব্লক আর অ্যামবুশগুলো থেকে ভি. এইচ. এফ.-এর মাধ্যমে রিপোর্ট যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে—নিজেদের পজিশন জানাচ্ছে ওরা, রুটিন রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, নতুন কোনো নির্দেশ থাকলে জানতে চাইছে। মেসেজগুলো গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে ভালডেজ, সামনে খুলে রাখা ম্যাপে আঙুল রেখে চিহ্নিত করছে ওদের পজিশন।

রোডব্লক এড়াবার জন্যে পথ থেকে দু'বার সরে এলো ওরা। গভীর আকেইশা (ACACIA) জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মন্থরবেগে এগোলো গাড়ি। ছোটো ছোটো আরো দুটো গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে হলো ওদেরকে। একেবারে ক্ষুদে বসতি, দু'তিন ঘর ম্যাটাবেল পরিবারের বসবাস। যা করার করে চলে গেছে থার্ড ব্রিগেড, বাকি কাজ সারছে কাক আর শকুনরা—আগুনে পোড়া, ভাজা দেহ থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে কালো মাংস।

পথ ধরে এগোবার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকলো ল্যাণ্ডরোভার। প্রতিটি বাঁকের মুখে গাড়ি থামালো ভালডেজ, গাড়ির মাথায় উঠে সামনে যতোদূর দেখা যায় চোখ বুলালো রানা, তারপর চারদিকে তাকালো। যেদিকেই তাকালো, নীল আকাশের গায়ে শুধু কালচে ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

পশ্চিম দিকে যতোই এগোলো ওরা, দ্রুত বদলে যেতে লাগলো এলাকার চেহারা—কালাহারি মরুভূমির কিনারা কাছে চলে আসছে। গাছপালা কমে যেতে যেতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত একঘেয়ে প্রান্তর আত্মপ্রকাশ করছে, মাথার ওপর নির্দয় সূর্য। তবু ওরা দিক বদল না করে পশ্চিমেই এগোলো।

দুপুরের পর ঢলে পড়তে শুরু করলো সূর্য, এরমধ্যে ত্রিশ মাইল

এগিয়েছে ওরা। সীমান্ত এখনো অন্তত বিশ মাইল দূরে, ম্যাপ দেখে বুঝলো রানা। তিনজনই ওরা প্রচণ্ড গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে। ইস্পাতের গাড়ির ভেতরটা গনগনে তন্দুরকেও যেন হার মানায়।

মাঝ বিকেলের দিকে আবার কয়েক মিনিটের জন্যে থামলো ওরা। সবার জন্যে চা বানালো রানা। ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে বোল্ডার আর ক্ষুদে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা। এদিকে রেডিওর ওপর ঝুঁকে পড়লো ভালডেজ।

রেডিও রিটিউন্ করে রানাকে বললো সে, 'সামনে আর কোনো গ্রাম নেই। কিন্তু এরচেয়ে সামনে আমি কখনো যাইনি। কিসের মুখে পড়বো জানি না।'

'যুদ্ধের সময় মাজুলেটের সাথে এদিকে এসেছি আমি,' বললো রানা। 'সে অনেক দিন আগের কথা। তাছাড়া, একবার একটা মানুষ খেকো সিংহের পিছু নিয়ে সীমান্ত বরাবর প্রায় এক শো মাইল যেতে হয়েছিল।'

'দুর্গম?' রেডিওর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো ভালডেজ।

'সারফেস ওয়াটার নেই,' বললো রানা। 'কোথাও শুধু বালি, কোথাও শুধু পাথর। ছোটো বড় অসংখ্য গর্ত আছে, লবণ তৈরির জন্যে খোঁড়া...' হঠাৎ জরুরী ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওকে চুপ করতে বললো ভালডেজ।

রেডিওতে আরেকটা কণ্ঠস্বর ধরতে পেরেছে সে। এর আগের কণ্ঠস্বরগুলোর সাথে এটার কোনো মিল নেই। এটা গম্ভীর, প্রায়োরিটি দাবি করছে, জরুরী একটা নির্দেশ দেবে বলে সব কটা ইউনিটকে একদম চুপচাপ থাকতে বলছে। তার গলায় কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট।

ভালডেজের পেশীতে টান পড়লো।

'কি ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা। কিন্তু আবার হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে বললো ভালডেজ। মেসেজটা শোনা ভাষায় প্রচার হচ্ছে, কিছুই বুঝছে না রানা।

দু'মিনিট পর মুখ তুললো ভালডেজ, মুখের চেহারা সাদা হয়ে গেছে।

'বলুন!' তাগাদা দিলো রানা।

কেশে গলা পরিষ্কার করলো ক্যাপটেন। 'আপনাদের জন্যে যারা কবর খুঁড়ছিল,' থেমে থেমে বললো সে, 'একটা পেট্রল তাদের উদ্ধার করেছে।'

'বেশ। তারপর?'

'ওই মেসেজে সমস্ত ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়া হলো। জেনারেল উমাঙ্গোর হুকুম, সব ইউনিটের প্রথম কাজ হবে আমাদের খুঁজে বের করা। এরই মধ্যে দুটো স্পটার প্লেন রওনা হয়ে গেছে।'

'আমরা এদিকে এসেছি ওরা জানলো কিভাবে?'

'যে-কোনো মুহূর্তে প্লেন দুটো আমাদের মাথার ওপর চলে আসতে পারে,' বললো ভালডেজ। 'কিভাবে জানলো জানি না, তবে তার জানার মধ্যে কোনো খুঁত নেই। আমাদের পুব দিকে কয়েকটা পিউনিটিভ ইউনিট রয়েছে, হাতের কাজ ফেলে এদিকে আসতে বলা হয়েছে ওদের।'

'তারমানে আমরা বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করবো এটা সে আন্দাজ করে নিয়েছে।'

'শুধু তাই নয়, ঠিক কোন জায়গা দিয়ে পেরোবো, তাও বুঝতে পেরেছে সে,' বললো ভালডেজ। 'পামট্রি-র দক্ষিণ আর রেললাইনের

দিকে যাবো আমরা, সে-ও পামট্রি বর্ডার-পোস্টের দুটো ইউনিটকে আমাদের বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে আসার নির্দেশ দিয়েছে।'

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে লেন্স পরিষ্কার করলো ভালডেজ।

'আরকি?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

'জেনারেল উমাঙ্গো তার সমস্ত ইউনিটকে লেপার্ড কোড দিয়েছে,' বলে আবার থামলো ক্যাপটেন, তারপর প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো, 'লেপার্ড কোড হলো 'কিল অন সাইট' অর্ডার। দেখামাত্র গুলি করার হুকুম। আমাদের জন্যে দুঃসংবাদই বলতে হবে।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

ক্যাডেট অফিসার আজম

বাংলার আলো, পোঃ বক্স নং ৬৪১, চট্টগ্রাম।

অগ্নিপুরুষ পড়ে আরও একবার অমৃতের সাধ লভেছি। খারাপ লেগেছে লুবনার মৃত্যু। আর এই খারাপ লাগাটাই বোধহয় রানার হাজারো কৃতিত্বে আমাদের ভাল লাগার মাঝে আনন্দাশ্রু। আসলে যে যাই বলুক—এ ধরনের প্যাথেটিক পাঠ্যদৃশ্যের অবতারণা রানা সিরিজের প্রতি আমাকে আরো আগ্রহী করে তোলে—তা না হলে অন্ততঃ আমার কাছে রানা সত্যি সত্যিই অতিমানব হয়ে যেতো।

সবশেষে রানা ভক্তদের প্রতি বন্ধুত্বের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

এম. আসাদুজ্জামান

গ্রাম ও পোঃ হঠাৎগঞ্জ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আব্বা গত ১৫ই মে সেবা প্রকাশনীর কয়েকটা বই সাতক্ষীরা থেকে ক্রয় করে এনেছিলেন। তার সাথে মাসুদ রানা সিরিজের বের হওয়া নতুন বই 'অগ্নিপুরুষ'-ও এনেছিলেন। আজ পর্যন্ত মাসুদ রানা সিরিজের যে বইটি আমার জীবনে প্রথম রেকর্ড ভেঙেছে সে রুদ্ধ বইটি হল অগ্নিপুরুষ। এই বইখানা পড়ে আমি ভাবাবেগে এমনই হয়েছিলাম যে কখন চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। মাসুদ রানাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই।

আনোয়ার-উস-সালেহ খোকন

ফুলতলা যন সম্প্রসারণ কেন্দ্র, জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা।

আলোচনা বিভাগের চিঠি পড়ে ভয় হয়, আপনাকে কেউ আবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় না করায়। পাঠকদেরকে যেমন নেশাগ্রস্ত করে তুলছে সেবার বই। অনেকেই, বিশেষ করে তরুণরা তো মনে হচ্ছে মুখস্থ করে ফেলছে সব। তবে আদালতে যদি লড়তেই হয় ভয় নেই ; আমরা আছি আপনার সাথে। চাই কি মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, সবকিছুই পাবেন।

সুলতানুল আরেফিন শিপু (রানা)

ডাকবাংলা, স্টেশন বাজার, নাটোর।

আমিই রানা, দুঃসাহসিক সেই অগ্নিপুরুষটি, যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরে, বিপদজনক অদৃশ্য শত্রু পাগল বৈজ্ঞানিক ও সতর্ক শয়তানদের সাথে যে হামলার মোকাবিলা করে। বন্ধু বন্দী গগলকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম রত্নদ্বীপে, ওকে লাল পাহাড়ের এক দুর্গম দুর্গে আটকে রেখেছিল শয়তানের দূত, ক্ষ্যাপা নর্তক আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই-উ-সেন। স্পর্ধা কত! অকস্মাৎ সীমান্তে ওরা হাইজ্যাক করে গগলকে, তারপর জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে ঘোষণা করে ওর মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র। উ-সেনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা নয়, প্রতিশোধ নেওয়া।

যাইহোক, পিশাচ দ্বীপে গিয়ে ধরা পড়লাম শত্রু পক্ষের জালে, দেখলাম চারিদিকে শত্রু। আমাকে নিয়ে গেল দুর্গম দুর্গে, আমার পাশের কামরায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল প্রবেশ নিষেধ, নীল আতংক।

পরদিন, তিন শত্রু এলো আমাকে মৃত্যুর ঠিকানায় পৌছে দিতে। পালাবার চেষ্টা করতেই একজন গর্ব ভরে বললো, আমি ব্লাক স্পাই-ডার, পালাবে কোথায়? অপরজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুংকার ছাড়ল রানা।

সাবধান, আরেকজন তো পিস্তল হাতে নিয়ে একটা অট্টহাসি উপহার দিয়ে বলেই বসলো, বিদায় রানা।

কাজী দা, আমার এতো তাড়াতাড়ি মরবার সাধ নেই। এই চ্যালেঞ্জের মুখ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি খুব শীঘ্রই জানান। আমাকে বাঁ-চা-ন।

* 'মরণ কামড়' দিয়ে পড়ে থাকুন, আমি আসছি যত শীঘ্রি সম্ভব।

মোঃ আবুল কাশেম (লিপু)

গ্রাম ঃ চুটলিয়া, পোঃ ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ।

কাজীদা, যে দিন থেকে মাসুদ রানা পড়ছি, সেই দিন থেকে ভাবছি, আমরা আপনাকে হারাতে চাই না। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কাঠ মিস্ত্রী দিয়ে একটা কাঠের আলমারী তৈরি করে নিয়েছি। না… না কাজীদা, চিন্তা করবেন না। এই আলমারীতে আপনাকে রাখবো না। রাখবো আপনার দেওয়া সুন্দর সুন্দর বইগুলি। যাতে আপনি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে না যান।

* ধন্যবাদ।

মঈন উদ্দিন আহমেদ মুকুল

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, উপজেলা কৃষি অফিস, নেত্রকোনা সদর।

বহুদিন পর আপনাদের 'আলোচনা বিভাগ'-এ লিখছি। তাই বলে ভাববেন না আপনাদের প্রকাশিত কোনো বইয়ের এবং কোনো লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার জন্যে এ চিঠি। ওসব আমি মোটেই পারি না এবং আমার ধাতেও সয় না। আমি যা লিখবো, খোলাখুলি এবং স্পষ্টাস্পষ্টিই লিখবো। পারলে ছাপাবেন। তা না হলে তো ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আছেই।

আপনাদের বইকে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক হালকা বলে মনে করেন। কিন্তু আমি কিছু কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে এ মন্তব্য মানতে রাজি নই। যেমন, আত্মোন্নয়ন সিরিজের বইগুলো এবং কিছু অনুবাদ। উদাহরণ স্বরূপ, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'হারানো পৃথিবী', 'বিষ বলয়', 'বাস্কারভিলের হাউণ্ড', এইচ. জি· ওয়েলস-এর 'অদৃশ্য মানব,' স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড-এর 'শী' ও 'রিটার্ন অভ শী', 'সলোমনের গুপ্তধন' এবং এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর 'অল কোয়া-য়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। বিশ্ব সাহিত্যের সেরা সম্পদ এই বইগুলো বাঙালী পাঠক সমাজ পড়তে পেরে আপনাদের চির শুভা-কাঙ্ক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য আজব সিরিজ, অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ এবং সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা বইগুলোও চমৎকার উপহার।

তবু যদি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতেন, মনে হয় সেবা প্রকাশনীর বিচিত্র বিষয়ক প্রজাপতির মনো-গ্রাম সার্থক এবং যথার্থ হতো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর মেজর রফিক-উল-ইসলামের সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'এ টেল অব মিলিয়নস' অনুবাদ করে ছাড়লে আমা-দের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি একটা মহৎ কর্তব্য পালন করা হতো। এছাড়া এন্থনী মাসকারেনহাসের বিতর্কিত 'বাংলাদেশ ঃ এ লীগেসী অব ব্লাড. বাংলা রূপান্তর করলে অনেক অজানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম। এ ছাড়াও 'জীবনী' সিরিজ করে চার্লি চ্যাপলিনের 'মাই অটোবায়োগ্রাফী' জোয়ান কলিন্স-এর 'পাস্ট ইম্পারফেক্ট' লিভ উলম্যানের 'চেঞ্জিং' এবং প্রিসিলা প্রেসলির 'এলভিস এণ্ড মি' বাংলা বই হিশেবে বাজারে ছাড়লে হলিউডের ঝলমলে চিত্রজগত সম্পর্কে, সর্বোপরি চিত্রতারকাদের সম্পর্কে বিশদ অবগত হতে পারতাম।

আশা করি প্রস্তাবগুলি নিয়ে কিছুটা হলেও নাড়াচাড়া করবেন। 'রহস্য পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় একজন করে রোমাঞ্চ রহস্য ঔপন্যাসিকের জীবনী প্রকাশ করে দিলে ক্ষতিটা কি? শুরুতে তো ছিল হঠাৎ উঠে গেল কেন?

* আপনি যে-সব সংযোজনের কথা বলেছেন এগুলো নিয়ে আমরাও বেশ কিছুদিন যাবত ভাবছি। ভাল কিছু আমরা তো ছাপাতে চাই-ই, আসল অসুবিধে পাওয়া দুষ্কর।

ডাঃ খলিলুর রহমান

শংকরপুর ফেরিঘাট বাজার, পোঃ বাগআঁচড়া, যশোহর।

সুদীর্ঘ পাকিস্তান আমল থেকেই আমি রানার ভক্ত। ও আমার কল্পনার হিরো। ওর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের প্রচেষ্টা আমার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ভয় হয় যেদিন আপনি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবেন সেদিন আর কেউ রানাকে আমাদের সাথে পরিচয় করাতে পারবে কিনা। এইমাত্র অগ্নিপুরুষ-১ শেষ করে, রানার অন্তরের হাহাকার ও লুবনার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা পড়তে গিয়ে কখন যে দু'চোখের পাতা ভিজে গেছে বলতে পারবো না। কেন জানি প্রায় ১৫/২০ মিনিট যাবত চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। প্রাণোচ্ছল, সদা চঞ্চল কিশোরী মেয়েটাকে না মারলে কি হতো না? অগ্নিপুরুষ-১ ব্যতিক্রমধর্মী মনে হচ্ছে। যাই হোক, কাজীদা, অনুরোধ রইলো, সব রকম ধানাই-পানাই ও ভণিতা বাদ দিয়ে মাঝখানে অন্য কোনো বই প্রকাশের দুরাশা ও দুঃসাহস ত্যাগ করে শীঘ্র আমাদের হাতে অগ্নিপুরুষ-২ তুলে দিন।

* কেমন লাগলো?

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার সিরিজের ষষ্ঠ রহস্যোপন্যাস

রত্নদানো

রচনা : রকিব হাসান

মূল্য : চোদ্দ টাকা

প্রকাশের তারিখ : ৭ আগস্ট, ১৯৮৬

বিষয় : তিন গোয়েন্দা—কিশোর, রবিন ও মুসার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। ওদের চোখের সামনে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে চুরি হয়ে গেল সম্রাটের সোনার বেল্ট। তারপর…

রানা-১৩৭

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অন্ধকারে চিতা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের একটা কাজ নিয়ে আফ্রিকার
জিম্বাবুইয়ে পৌঁছলো রানা। ইচ্ছে,
রেবেকার র‍্যাঞ্চে কদিন বিশ্রাম নেবে।
কিন্তু ন্যাশোনা ও ম্যাটাবেল—চিরশত্রু দুই উপজাতির
সশস্ত্র কোন্দলে জড়িয়ে পড়লো সে।
বন্ধু পরিণত হলো শত্রুতে—
অচেনা একজন বাড়িয়ে দিল বন্ধুত্বের হাত।
সব ধোঁয়াটে।
কেন কি ঘটছে কিছুই বোঝা যায় না।
যখন স্পষ্ট জানা গেল, তখন আর সময় নেই—
মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

বিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

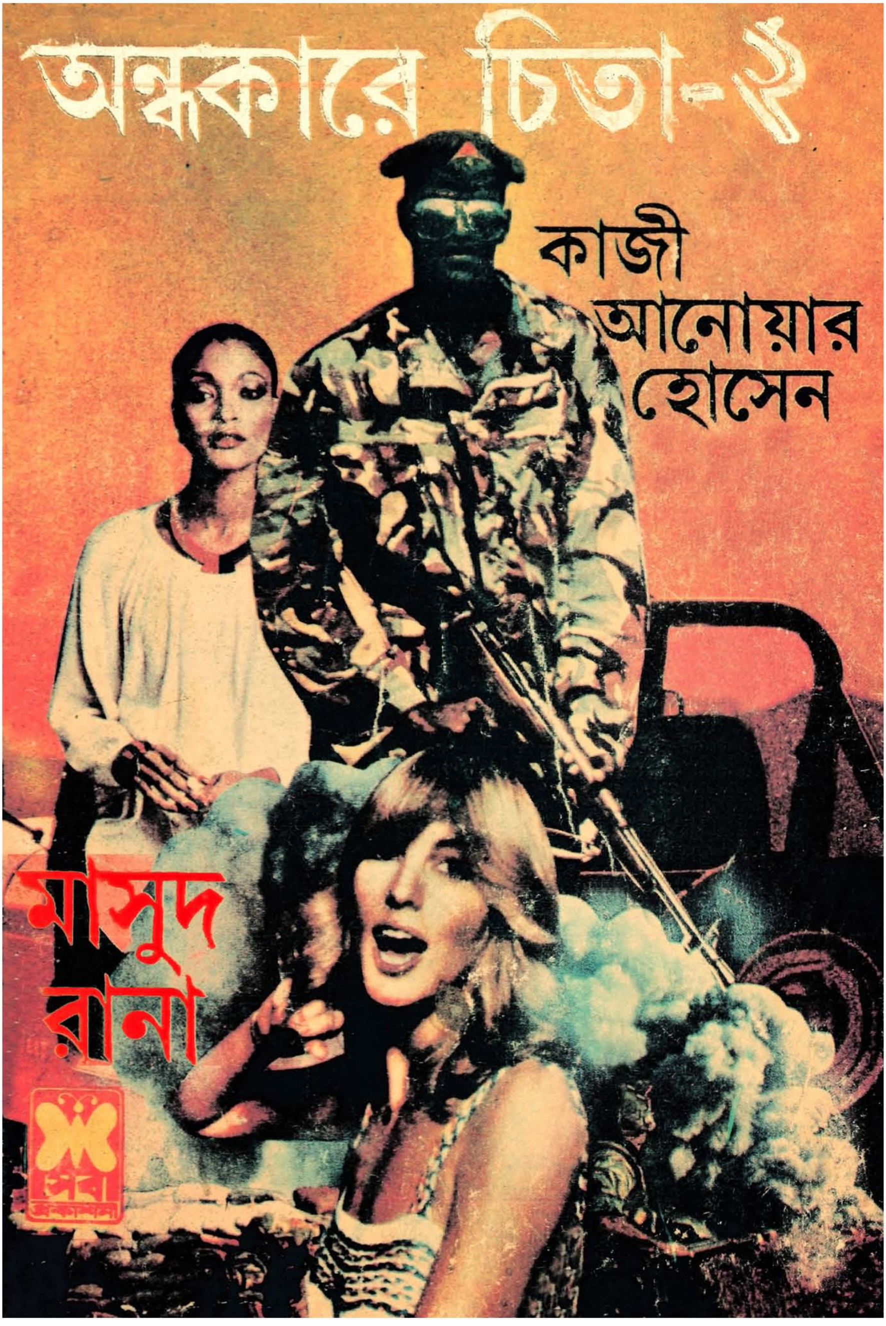

অন্ধকারে চিতা-২
কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২
রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১,
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১, ২
বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১, ২
মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১, ২
চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১, ২

অন্ধকারে চিতা-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা—১৩৮

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৈয়দ ইকবাল

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দুরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

ANDHAKAREY CHITA
By Qazi Anwar Husain
Rana-138

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

জেনারেল রট উমাঙ্গোর নির্দেশে থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা সোহানা চৌধুরীকে রেপ করতে যাচ্ছিলো, তাই বাধ্য হয়ে একটা কাগজে সই করে নিজেকে জিম্বাবুইয়ের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছে মাসুদ রানা। জেনারেল উমাঙ্গোর প্রতিশ্রুতি ছিলো, রানা আর সোহানাকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে প্রতিবেশী একটা দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

জানা গেছে আসলে বন্ধু বেশে শত্রু ছিলো জেনারেল উমাঙ্গো। সে-ই মাস্টার পোচার, টস মাজুলেট নয়। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে চল্লিশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে মাজুলেটকে।

জঙ্গলের ভেতর নির্জন একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছিল ওদেরকে। বুঝতে বাকি থাকলো না, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিতে হবে।

সৈনিকরা ওদের জন্যে কবর খুঁড়ছিল, তাদের কাজ তদারক করছিল ক্যাপটেন ভালডেজ।

হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় ল্যাণ্ড-রোভারে ছিলো রানা, পাশে সোহানা। আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে ও, র‍্যাক থেকে একটা রাইফেল নামিয়ে ফেলে। কিন্তু রাইফেলটা লোড করার আগেই

ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে ফিরে আসে ক্যাপটেন। সেই মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারতো। হয়তো রাইফেলের বাটের আঘাতে জ্ঞান হারাতো ক্যাপটেন, তার পকেট থেকে হাতকড়ার চাবি বের করে নিতো সোহানা। কিংবা হয়তো ভালডেজকে অজ্ঞান করার পর হাতকড়া খোলার সময় পেতো না ওরা, দুই হাত এক করা অবস্থায় রাইফেল চালাতে হতো রানাকে। কিন্তু এ-সব কিছুই ঘটেনি। প্রাণের দায়ে দল বদল করেছে ক্যাপটেন, তার সহায়তায় ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে পালিয়ে এসেছে ওরা।

ল্যাণ্ড-রোভারে একটা রেডিও রয়েছে, সেটার মাধ্যমে থার্ড ব্রিগেডের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারছে ওরা। পথে কয়েকটা গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে, প্রতিটি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিরীহ ম্যাটাবেল গ্রামবাসীদের মেরে সাফ করে দিয়েছে শোনা অর্থাৎ থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা।

প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানা। সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ওরা। পথে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে চলে গেছে একটা আর্মি কনভয়, জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থেকে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে ওরা। এক সময় জঙ্গল আর পথ ছেড়ে মরু প্রান্তরে বেরিয়ে এসেছে ল্যাণ্ড-রোভার, সামনে আর কোনো গ্রাম নেই।

রেডিওতে শোনা গেল জেনারেল উমাঙ্গো ওদেরকে ধরার জন্যে থার্ড ব্রিগেডের সমস্ত ইউনিটকে 'লেপার্ড' কোড পাঠিয়েছে। লেপার্ড কোড মানে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ। এরই মধ্যে দুটো স্পটার প্লেনকে পাঠানো হয়েছে এদিকে। পিউনিটিভ ইউনিটগুলোকেও হাতের কাজ ফেলে এদিকে আসতে বলা হয়েছে। প্লামট্রি বর্ডার-পোস্ট থেকে রওনা হয়ে গেছে দুটো প্ল্যাটুন, ওদেরকে সীমান্তে

পৌঁছুতে বাধা দেবে তারা।

সবচেয়ে আগে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। নিজেরা না বাঁচলে বন্ধু মাজুলেটকে উদ্ধার করার প্রশ্নই ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে না প্রতিশোধ নেয়ার।

থার্ড ব্রিগেডকে লেপার্ড কোড দেয়া হয়েছে শুনে হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লো ক্যাপটেন ভালডেজ। কিন্তু রানা ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলো। সোহানাও দমবার পাত্রী নয়।

এখন দেখা যাক। রক্তপিপাসু থার্ড ব্রিগেডের বিরুদ্ধে বি. সি. আই.-এর দু'জন দুর্ধর্ষ এজেন্ট কতটুকু কি করতে পারে।

ছোঁ দিয়ে ম্যাপটা তুলে নিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের বনেটে মেললো রানা। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালো সোহানা।

'এখানে রয়েছি আমরা।' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো রানা, দ্রুত মাথা ঝাঁকালো ক্যাপটেন ভালডেজ। একটা রেখা ধরে এগিয়ে গেল রানার আঙুল। 'এখান থেকে সীমান্তের দিকে এই একটাই পথ চলে গেছে,' আপনমনে বিড়বিড় করছে ও। 'এই পথ ধরেই গ্রামটি পেট্রল আমাদের বাধা দিতে আসবে, আর পিউনিটিভ গ্রুপটা আসবে পিছন থেকে।'

আবার মাথা ঝাঁকালো ক্যাপটেন। 'এবার ওরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে না। জানে, এই পথের আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে থাকবো আমরা।'

হঠাৎ আবার রেডিওটা জ্যান্ত হয়ে উঠতেই পড়িমরি করে ছুটলো ভালডেজ। মেসেজটা শুনতে শুনতে তার কালো চেহারা

ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। রানাকে রিপোর্ট করলো সে। ওদের পিছনে পিউনিটিভ ইউনিট ল্যাণ্ড-রোভারের চাকার দাগ আবিষ্কার করে ফেলেছে। খুব একটা পিছনে নেই তারা, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। ওদের সামনে যে পেট্রল রয়েছে, তাদের সাথেও যোগাযোগ করেছে পিউনিটিভ ইউনিট। দুটো দলের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা। সবশেষে ভালডেজ বললো, 'আমার কোনো পরামর্শ নেই, মিঃ রানা। বাঁচার কোনো উপায় দেখছি না আমি। দু'চার মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।' রানার দিকে আবেদন ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলো সে।

'ঠিক আছে।' শান্তভাবে দলের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলো রানা। 'মরুভূমির ওপর দিয়ে সীমান্তের দিকে যাবো আমরা।'

'কিন্তু আপনি বললেন এলাকাটা দুর্গম… '

'ড্রাইভ করুন,' ধমকে উঠলো রানা। 'রুফর‍্যাক থেকে গাইড করবো আমি। সোহানা, ফ্রন্ট সিটে বসো।'

রুফর‍্যাকে বসলো রানা, একটা কাঁধে এ-কে ফরটিসেভেন রাইফেলটা ঝুলছে। ক্যাপটেনের ম্যাপ-কেস থেকে পাওয়া হ্যাণ্ড-বেয়ারিং কমপাস থেকে একটা সাইট নিলো ও। ম্যাগনেটিক ডিফ্লেকশনের মোটামুটি একটা হিসেব কষে নিয়ে নির্দেশ দিলো ক্যাপটেনকে, 'ডান দিকে, ডান দিকে ঘুরুন—হ্যাঁ, হয়েছে। হোল্ড ছাট কোর্স।' কয়েক মাইল সামনের ছোটো একটা সল্ট-প্যান-এর সাদা দ্যুতিকে টার্গেট হিসেবে ধরে একটা সরল রেখা বরাবর কোর্স স্থির করলো রানা। গাড়ির নিচে কোথাও বালি, কোথাও পাথর—বালির বিস্তৃতিগুলো তেমন নরম বা আলগা নয়, চাকা ডেবে যাবে বলে মনে হলো না। নিচু কাঁটাঝোপগুলোর মাথা মুড়িয়ে দিয়ে বেশ দ্রুত

গতিতে ছুটলো ল্যাণ্ড রোভার। সামনে শুধু উঁচু ঝোপ বা ধরাশায়ী গাছ পড়লে দিক বদল করলো ক্যাপটেন। প্রতিবার নির্দেশ দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারকে আগের কোর্সে ফিরিয়ে আনলো রানা।

ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিতে এগোচ্ছে ওরা, দিগন্তরেখা পর্যন্ত যতোদূর দেখা যায় খাঁ খাঁ করছে মরু প্রান্তর। ধাওয়ারত ট্রাক-গুলোয় শুধু সৈনিকরা নয়, মেশিনগান ইত্যাদি আছে, কাজেই তাদের সাথে ওরা পারবে না। সীমান্ত খুব বেশি হলে আর এক ঘণ্টার পথ, এদিকে সন্ধ্যে হতেও আর বেশি দেরি নেই। সোহানার হাতের গরম চা খেয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে রানার, যে-কোনো বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি সে।

হঠাৎ রক্তে একটা আলোড়ন অনুভব করলো রানা। কাছাকাছি বিপদ থাকলে মন তার আভাস পায়, সংকেত পেয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় শরীরে। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা, দেখ-তেও পেলো সাথে সাথে—মরীচিকার মতো, দুপুরবেলার স্থির মরুর তপ্ত বুকে ধুলোর নাচন। কিন্তু এ ধুলোর মেঘ নির্দিষ্ট একটা গতিতে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেখানে দেখবে বলে আশা করেছিল রানা সেখান থেকে—ওদের পূব দিকে, এগিয়ে আসছে ওদের ফেলে আসা পথ ধরে।

'একটা পেট্রল দেখতে পাচ্ছি,' খোলা জানালার দিকে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বললো রানা। 'মাইল পাঁচেক পিছনে।'

আবার পিছনে তাকালো রানা, ফোর-হুইল ড্রাইভ যেভাবে ধুলো ওড়াচ্ছে, দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলো সে। লম্বা একটা ফিতের মতো ওদেরকে অনুসরণ করছে ধুলো, কয়েক মিনিট ধরে ভেসে থাকছে বাতাসে। শোনা সৈনিকরা নিশ্চই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফিতে-

টাকে। পিছন ফিরে ধুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু আসলে ওর সামনের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিলো। অ্যাণ্ট বিয়ার-এর গর্তটা ধূসর মরু ঘাসে ঢাকা পড়ে আছে, ড্রাইভারের দেখতে পাবার কথা নয়। পঁচিশ মাইল গতিতে ছুটছে ল্যাণ্ড-রোভার, গর্তে পড়ে আচমকা স্থির হয়ে গেল।

ছাদ থেকে ছিটকে পড়লো রানা, বনেটের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে হাঁটু, কনুই আর মুখের একটা পাশ দিয়ে পড়লো। ধুলোর ওপর পড়ে থাকলো ও, ব্যথায় কাতর, বিস্ময়ের ধাক্কায় নিশ্চল। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা গড়ান দিয়ে বসলো ও, থো করে বালি মেশানো রক্ত ফেললো মুখ থেকে। জিভ বুলিয়ে দাঁতগুলো পরীক্ষা করলো, একটাও আলগা হয়নি। দুটো কনুইয়ে চামড়া বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, আর হাঁটুর কাছে জিন ছিঁড়ে রক্ত গড়াচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালো ও।

ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের বাঁ দিকটা গর্তের ভেতর ডেবে গেছে, চেসিস পর্যন্ত। অসতর্ক থাকার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করলো রানা, গাড়ির পাশে এসে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো। উইণ্ডস্ক্রীনে তারকা চিহ্নের আকৃতি নিয়ে চিড় ধরেছে, ওটার সাথে ঠুকে গেছে সোহানার মাথা। সামনের দিকে ঝুঁকে সিটের ওপর নিথর পড়ে আছে সোহানা।

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠে সোহানার মাথাটা আস্তে করে তুললো রানা। সোহানার ডান চোখের ওপরটা গোল আলুর মতো ফুলে উঠেছে। রানার স্পর্শ পেয়ে ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে উঠলো তার।

'আর কোথাও লেগেছে?'

সিটের ওপর হাত রেখে সিধে হলো সোহানা। 'তোমার হাতে রক্ত,' জড়ানো গলায় বললো সে, যেন নেশা করেছে।

'চামড়া ছড়ে গেছে,' সোহানাকে আশ্বস্ত করলো রানা, ড্রাইভিং সিটে বসা ক্যাপটেনের দিকে তাকালো।

স্টিয়ারিং হুইলের সাথে বাড়ি খেয়েছে ক্যাপটেনের মুখ, ফলে ওপরের ঠোঁট কেটে দু'টুকরো হয়ে গেছে, মাড়ি থেকে ভেঙে গেছে একটা দাঁত। মুখের ভেতরটা রক্তে ভরে আছে, একটা রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে রেখেছে সে।

'রিভার্স গিয়্যার দিয়ে পিছিয়ে আসুন,' ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে সোহানাকে নামতে সাহায্য করলো রানা, গাড়ি হালকা করা দরকার। কয়েক পা এগিয়ে পড়ে গেল সোহানা, মাটিতে বসে পড়লো। ধাক্কা খেয়ে এখনো ঝিমঝিম করছে তার মাথা।

ইঞ্জিন গর্জে উঠলো, কিন্তু পিছু হটার কোনো লক্ষণ নেই ল্যাণ্ড-রোভারের। পিছনে, ধুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রমাদ গুণলো রানা। শত্রুরা খুব বেশি দূরে নেই আর, দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন, আবার বারকয়েক চেষ্টা করার পর স্টার্ট নিলো। পেডালের ওপর জোরে চাপ দিলো ভালডেজ, প্রচণ্ড ঝাঁকির সাথে ক্লাচ দিলো—চারটে চাকাই ঘুরতে শুরু করলো বন বন করে।

'কি করছেন, একটা হাফশ্যাফট ভেঙে গেল!' তিরস্কার করলো রানা।

আবার চেষ্টা করলো ভালডেজ, এবার ধীরেসুস্থে। কিন্তু এবারও শুধু চাকাগুলো ঘুরলো, আর ধুলোর পাহাড় খাড়া হলো পিছন

দিকে। অস্থির ভাবে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করলো গাড়ি, কিন্তু গর্ত থেকে বেরুতে পারলো না।

'স্টপ ইট!' ক্যাপটেনের কাঁধে একটা থাবড়া বসিয়ে দিলো রানা, নির্দেশটা যাতে তাড়াতাড়ি পালন করে। বালি মেশানো নরম মাটিতে আরো সেঁধিয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার, নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। মাটির ওপর পেট দিয়ে শুয়ে চেসিসের তলায় উঁকি দিলো রানা। সামনের বাঁ হুইলটা গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে, শূন্যে ঘুরছে সেটা। গাড়ির ভার চেপেছে ফ্রন্ট সাসপেনশনের ব্লেডের ওপর।

'ট্রেঞ্চিং টুল,' হাঁক ছাড়লো রানা।

'ফেলে এসেছি,' মনে করিয়ে দিলো ক্যাপটেন।

গর্তের কিনারায় হাত দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো রানা। 'খোঁড়ার জন্যে কিছু একটা যোগাড় করুন!' পাগলের মতো মাটি সরাচ্ছে ও।

পিছনের লকার হাতড়ে একটা জ্যাক হ্যাণ্ডেল নিয়ে এলো ভালডেজ। সেটা দিয়েই গর্তের কিনারায় হামলা চালালো রানা। হাঁপাচ্ছে ও, ফোঁসফোঁস আওয়াজ বেরিয়ে আসছে নাক দিয়ে, গালের চামড়া ওঠা জায়গাটুকু ভিজে গেল ঘামে।

ঘড় ঘড় করে উঠলো রেডিও।

'পথের যেখান থেকে সরে এসেছি, ওরা সেটা দেখতে পেয়েছে,' মেসেজটা ভাষান্তর করলো ভালডেজ।

'সর্বনাশ!' দ্রুত হাত চলছে রানার, হাঁসফাঁস করছে। দু'মাইলের মধ্যে চলে এসেছে শত্রুরা।

কথা বলার সময় হিস হিস আওয়াজ করছে ভালডেজ, ঠোঁটের ফুটো থেকে বাতাস বেরিয়ে আসছে। 'আমি কোনো সাহায্য করতে

পারি ?'

কথা বলা মানেই সময় নষ্ট। চেসিসের নিচে কাজ করার জন্যে একজনের বেশি জায়গা নেই। মাটি সরে যাওয়ায় আরো কয়েক ইঞ্চি ডেবে গেল ল্যাণ্ড-রোভার, তারপর মুক্ত টায়ারটা গর্তের ভেতর মাটির স্পর্শ পেলো। এবার গর্তের তীক্ষ্ণ কিনারার দিকে নজর দিলো রানা, মাটি সরিয়ে একটা ঢাল মতো তৈরি করার চেষ্টা করলো, চাকাটাকে যাতে ঠেকিয়ে রাখতে না পারে।

'সোহানা, ড্রাইভিং সিটে বসো,' জ্যাক হ্যাণ্ডেল দিয়ে মাটিতে খোঁচা মারার ফাঁকে কথা বলছে রানা, শব্দগুলো যেন শরীরের ঝাঁকি খেয়ে ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। 'আমি আর ক্যাপটেন সামনেটা উঁচু করার চেষ্টা করবো।' হামাগুড়ি দিয়ে চেসি-সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ও, তারপর এক সেকেণ্ড অপব্যয় করলো পিছন দিকে তাকিয়ে। গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ছুটে আসা ধুলোর মেঘ। 'ক্যাপটেন, জলদি!'

রেডিয়েটরের সামনে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ওরা, তারপর সামনের ফেণ্ডারটা ভালো করে ধরার জন্যে হাঁটু ভাঁজ করলো। ধুলোয় আবছা উইণ্ডস্ক্রীনের পিছনে বসেছে সোহানা, কপালের ফোলাটা নীলচে হয়ে উঠেছে। ঝাপসা কাঁচের ভেতর দিয়ে রানার দিকে তাকালো সে, চোখে-মুখে মরিয়া একটা ভাব।

'হিট ইট!' হুংকার ছাড়লো রানা, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে সোজা করলো হাঁটু, দু'জন একসাথে সিধে হলো। গর্ত থেকে খানিকটা ওপরে উঠলো গাড়ির বাঁ দিকটা, সোহানার উদ্দেশে দ্রুত মাথা ঝাঁকালো রানা। ক্লাচ দিলো সোহানা, গর্জে উঠলো ইঞ্জিন, চাকা ঘুরলো, ঝাঁকি দিয়ে পিছু হটার ভঙ্গি করলো ল্যাণ্ড-রোভার,

কিন্তু গর্তের কিনারায় বাধা পেয়ে আটকে গেল।

'বিশ্রাম!' হুশ করে দম ছেড়ে বললো রানা, বনেটের ওপর নেতিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলো।

ধুলোর মেঘ এতো কাছে চলে এসেছে, রানার ভয় হলো বোধহয় এই মুহূর্তেই ওটার নিচে থেকে ট্রাকটা বেরিয়ে আসবে।

'ঠিক আছে, ওটাকে এবার বারবার উঁচু-নিচু করবো,' ভালডেজ-কে বললো রানা। 'ওয়ান! টু! থ্রি!'

ইঞ্জিন চালু করলো সোহানা, সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে ফেণ্ডারের ওপর নিয়মিত ছন্দে শরীরের ভার চাপালো ওরা। 'ওয়ান! টু! থ্রি!' চাপ দেয়ার সময় প্রতিবার দম বন্ধ করছে রানা, ওপর-নিচে ঘন ঘন দুলতে শুরু করলো ল্যাণ্ড-রোভার।

'ইঞ্জিন চালু রাখো!'

ওদের চারদিকে উথলে উঠলো ধুলো, রেডিও থেকে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, যেন শিকারী একটা হাউণ্ড শত্রুর গন্ধ পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। ধুলোর পাহাড় দেখে চেঁচাচ্ছে ওরা।

'চালু, চালু!' সোহানার উদ্দেশে আবার চিৎকার করলো রানা। শরীরে এতো শক্তি লুকিয়ে ছিলো, আগে কখনো টের পায়নি ও। দু'সারি দাঁত পরস্পরকে পিষে যেন গুঁড়ো করতে চাইলো, ওর গলার ভেতর ঘূর্ণি তুললো নিঃশ্বাস, ফুলে উঠে টকটকে লাল হয়ে গেল গাল, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ আলোর কণায় ভরে গেল সামনেটা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়িটাকে উঁচু করছে রানা, পরমুহূর্তে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে—বারবার, ঘন ঘন, কোনো বিরতি ছাড়া। ঘাড় আর পিঠের শিরাগুলো ছিঁড়ে

যাবে বলে মনে হলো। শিরদাঁড়া মট করে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু রানার জেদ চেপে গেছে, থামছে না ও। তারপর হঠাৎ করেই গর্তের কিনারা দিয়ে গড়িয়ে উঠে এলো চাকাটা, ল্যাণ্ড-রোভার পিছু হটলো।

অবলম্বন না থাকায় মাটিতে হাঁটু দিয়ে পড়লো রানা, মনে হলো উঠে দাঁড়াবার শক্তি আর কখনো ফিরে আসবে না।

'রানা! জলদি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাগাদা দিলো সোহানা। 'ওঠো!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো রানা, থপ থপ করে এলোমেলো পা ফেলে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো। চলমান গাড়ির বনেটে উঠলো ও, সাথে সাথে স্পীড বাড়িয়ে দিলো সোহানা।

বনেটের কিনারা আঁকড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত নিথর পড়ে থাকলো রানা, হাত পায়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে শক্তি। তারপর ক্রল করে রুফর‍্যাকে উঠলো ও, ল্যাণ্ড-রোভারের পিছন দিকে তাকালো।

ওদের পিছনে একটা মাত্র ট্রাক, বালি রঙের পাঁচ-টনী একটা টয়োটা। তাপ-মরীচিকার ঝিকিমিকির ভেতর ট্রাকটাকে বিশাল দানবের মতো দেখালো, মনে হলো মাটি থেকে যেন আলাদা হয়ে ওদের দিকে ভেসে আসছে। চোখ পিট পিট করে পাতা থেকে ঘাম সরালো রানা। কাছে, কিন্তু কতোটা কাছে ওটা? একে সমতল মাটি, তার ওপর উথলে ওঠা তাপের কাঁপন, আন্দাজ করা কঠিন।

দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এলো, সাথে সাথে টয়োটার ক্যাবের ওপর কালো সুপারস্ট্রাকচারটা চোখে পড়লো রানার। রিঙ মাউন্টের ওপর ওখানে একটা হেভী মেশিনগান রয়েছে, পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একজন গানারের কালো মাথা।

'সেরেছে!' ফিসফিস করে বললো রানা, এই প্রথম লক্ষ্য করলো

ল্যাণ্ড-রোভারের গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এলোপাথাড়ি লাফাচ্ছে গাড়ি, আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে। ল্যাণ্ড রোভারের সামনের বাঁ প্রান্ত থেকে কর্কশ, তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসছে, ওখানে ধাতুর সাথে ধাতুর অবিরাম তীব্র সংঘর্ষ চলছে। সেই সাথে ঢিমে হয়ে আসছে গতি।

ড্রাইভারের খোলা জানালার দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা। 'স্পীড আপ!'

'সামনের দিকটা ভেঙে পড়ছে,' জানালা দিয়ে মাথা বের করে রিপোর্ট করলো সোহানা। 'স্পীড বাড়ালে সব খসে পড়বে!'

পিছন দিকে তাকালো রানা। এগিয়ে আসছে ট্রাক, খুব দ্রুত না হলেও, পিছু ছাড়ছে না। পরিষ্কার দেখলো রানা, ক্যাবের ছাদে দাঁড়ানো গানার তার ভারি অস্ত্রটা একটু ঘোরালো। 'ঝুঁকি নাও, সোহানা, ঝুঁকি নাও! স্পীড বাড়াও! পিছনে হেভী মেশিনগান, রেঞ্জের ভেতর চলে আসছে ওরা!'

স্পীড বাড়লো, সেই সাথে বাড়লো লম্ফঝম্ফ, আর কর্কশ যান্ত্রিক কাতরানি। গাড়ির সাথে সাথে রানার দু'সারি দাঁতও পরস্পরের গায়ে বাড়ি খেয়ে আওয়াজ করতে লাগলো। আবার পিছন দিকে তাকালো রানা। মাঝখানের দূরত্ব একটু বেড়েছে। পরমুহূর্তে টয়োটাকে প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠতে দেখলো রানা—ক্যাবের মাথায় বসানো হেভী মেশিনগানের রিকয়েলের ফল ওটা।

এখনো বিস্ফোরণের কোনো আওয়াজ নেই, লক্ষ্য করলো রানা। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে কৌতূহলের সাথে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো মনে গেঁথে নিচ্ছে ও। আচমকা ওদের বাঁ দিকে বিস্ফোরিত হলো ধুলো, ধুলোর কয়েকটা স্তম্ভ খাড়া উঠে গেল আকাশের দিকে। বিস্ফোরণের

আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে।

'বাঁ দিকে ঘোরো।' নির্দেশ দিলো রানা। এটাই নিয়ম, গুলি যে দিকে পড়েছে সেদিকে ঘোরো। ত্রুটি সংশোধনের জন্যে মেশিন-গানের ব্যারেল উল্টো দিকে ঘোরাতে হবে গানারকে, ধুলোর পাঁচিল লক্ষ্যস্থির করতে বাধা দেবে তাকে।

পরের বিস্ফোরণটা ডান দিকে, অনেকটা দূরে ঘটলো।

'ডান দিকে ঘোরো।'

জানালা দিয়ে আবার মাথা বের করলো সোহানা। 'পাল্টা গুলি করো।' মরতে হয় লড়ে মরবে, চোখে-মুখে এই রকম একটা প্রতিজ্ঞার ভাব।

'নির্দেশ আমি দিচ্ছি,' সোহানাকে বললো রানা। 'তুমি গাড়ি চালাও!'

পরের বিস্ফোরণটা আবার অনেক দূরে ঘটলো, প্রায় একশো ফিট তফাতে।

'বাঁ দিকে ঘোরো।'

ল্যাণ্ড রোভার বারবার দিক বদল করায় লক্ষ্যস্থিরে ভুল হতে লাগলো গানারের, আর মাঝখানে ধুলোর পাঁচিল থাকায় রেঞ্জ আন্দাজ করতেও অসুবিধে হলো তার।

কিন্তু এঁকেবেঁকে এগোনোর ফলে মূল্য দিতে হলো ওদেরকে। ট্রাক আর ল্যাণ্ড-রোভারের মাঝখানের দূরত্ব কমে গেছে। দ্রুত কমে আসছে আরো।

সামনে, কাছাকাছি চলে এসেছে সল্ট-প্যান। কয়েক শো একর নগ্ন নির্জন খাঁ খাঁ মাঠ রোদের ভেতর রূপালি পারদের মতো ঝিল-মিল করছে। তীব্র আলোর ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো

রানা, একটা পথ দেখতে পেলো, ওটা দিয়ে ক্ষুদে একটা জেব্রার পাল মসৃণ প্রান্তর পেরিয়ে গেছে। লবণের আবরণ ভেদ করে ভেতরের হলুদ রঙা কাদায় ডেবে গেছে ওগুলোর খুর। এই পথ একটা মারাত্মক ফাঁদ, হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যে-কোনো গাড়ি ওই কাদায় আটকে যাবে।

'বাঁ দিকে,' নির্দেশ দিলো রানা। 'আরো, আরো। প্যান এর ডান দিকের কিনারা ঘেঁষে যাও। ওকে, হোল্ড দ্যাট কোর্স।'

সল্ট প্যানের সরু একটা শাখা ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে। রানা আশা করলো, ওটার ওপর দিয়ে ধাওয়া করে আসবে শত্রুরা। ল্যাণ্ড-রোভারকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওরা আসলে টয়োটার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছে। ঘাড় ফেরালো রানা, ধুলোর ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'শালারা!'

ট্রাক কমাণ্ডার বোকা নয়। শিং আকৃতির সল্ট-প্যানের ওপর দিয়ে আসছে না সে, ওদের সাথে সাথে ঘুরে পেরিয়ে আসছে জায়গাটা। ল্যাণ্ড-রোভারের চারপাশে মেশিনগানের গুলি পড়লো। ক্যাবের গায়ে লাগলো কয়েকটা, ফুটোগুলোর কিনারায় চকচকে লোহা দেখা গেল।

'সোহানা?' খবর নিলো রানা।

'লাগেনি,' সাথে সাথে জবাব দিলো সোহানা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'রানা, এ আমি আর চালাতে পারছি না! নিজে থেকেই থেমে যাচ্ছে। কোথায় আটকাচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

গাড়ির আহত সামনের অংশ থেকে গরম-লাল ধাতব গন্ধ পেলো রানা। 'ক্যাপটেন, একটা রাইফেল দাও!'

এখনো শত্রুরা রেঞ্জের অনেক বাইরে, তবু গুলি করার পর অসহায়

ভাব একটু যেন কমলো। বুলেটগুলো কোথায় গিয়ে পড়লো টেরও পেলো না ও। সল্ট-প্যানের শাখাটাকে ঘিরে সগর্জনে ছুটলো ল্যাণ্ড রোভার, নাকে ঢুকলো ধুলো আর গরম ধাতব গন্ধ। রাইফেল লোড করার সময় সামনের দিকে তাকালো রানা।

সীমান্ত আর কতোদূর? দশ মাইল? কিন্তু থার্ড ব্রিগেডের পিউনিটিভ ইউনিট, লেপার্ড কোড পাবার পর, আন্তর্জাতিক সীমান্তে থামবে কি? দক্ষিণ আফ্রিকা আর ইসরায়েল আগেই দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, গেরিলাদের ধাওয়া করে নিউট্রাল টেরিটোরিতে ঢুকে পড়তে বাধেনি তাদের। আপন মনে মাথা নাড়লো রানা, খুন না করা পর্যন্ত পিছু ছাড়বে না ওরা।

ভারসাম্য হারানো সাসপেনশনের ওপর ঘন ঘন, নির্দিষ্ট একটা ছন্দে, একদিকে কাত হয়ে পড়ছে ল্যাণ্ড-রোভার। হতাশায় মুষড়ে পড়লো রানা, এই গাড়ি নিয়ে শত্রুদের ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি খেপিয়ে তুললো ওকে। সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটা শেষ করলো ও। তৃতীয় বিস্ফোরণের পরপরই ঝাঁকি খেয়ে দিক বদল করলো টয়োটা, নিজের ধুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে পড়লো।

উল্লাসে ফেটে পড়লো রানা 'শালাদের থামিয়ে দিয়েছি!'

'শাবাস রানা!' খুশির চোটে অ্যাকসিলারেটারের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো সোহানা।

এই প্রথম হাসি দেখা গেল ক্যাপটেনের মুখে, দুই কান পর্যন্ত বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়লো। 'ওয়েল ডান, মিঃ রানা, ওয়েল ডান!'

ট্র্যাকের ওপর লক্ষ্যস্থির রেখে রাইফেলটা খালি করলো রানা।

মৌমাছির লাসকে ঘিরে পিঁপড়ের দল যেমন ছুটোছুটি করে, ট্রাকের ক্যাব ঘিরে তেমনি ছুটোছুটি শুরু করে দিলো শোনা সৈনিক-রা। এদিকে ভেঙে পড়ার হুমকি দিতে দিতে, বিচিত্র কর্কশ শব্দে নিস্তব্ধ প্রান্তর কাঁপিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে দুরে সরে যাচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার।

'আরে, আরে—না।' প্রায় গুঙিয়ে উঠলো রানা।

অচল ট্রাক হঠাৎ আবার সচল হয়ে উঠলো, ফিরলো ওদের দিকে, তারপর পিছনে ধুলোর পাঁচিল তুলে আবার ছুটে আসতে শুরু করলো।

'আবার আসছে।'

রাইফেলের গুলিতে সম্ভবত ড্রাইভার আহত হয়েছিল। ক্ষতি যতোটুকুই হয়ে থাকুক, সেটা স্থায়ী কিছু নয়। মাত্র দু'মিনিট অচল ছিলো ট্রাক, এখন আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। বিপদ কাটেনি সেটা আঁতে ঘা দিয়ে বোঝাবার জন্যেই যেন আবার গর্জে উঠলো হেভী মেশিন গান। এক ঝাঁক গুলি এসে লাগলো ল্যাণ্ড-রোভারে।

ক্যাবের ভেতর ফুঁপিয়ে উঠলো কেউ। তীক্ষ্ণ গলা, মেয়েলি বলে মনে হলো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানার, কে আহত হয়েছে জিজ্ঞেস করার সাহস নেই। রুফর‍্যাক ধরে ঝুলে আছে ও, উদভ্রান্ত দেখালো ওকে।

'ক্যাপটেনকে গুলি লেগেছে,' সোহানার গলা।

'সিরিয়াস?'

'সিরিয়াস। রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

'গাড়ি থামিয়ো না।'

মরিয়া হয়ে সামনে তাকালো রানা, সামনে খাঁ খাঁ নিঃস্ব প্রান্তরের বিশাল বিস্তৃতি। এমন কি ন্যাড়া একটা গাছও চোখে পড়লো না। সমতল প্রান্তরের যতোদূর দেখা যায় কোথাও আকৃতি পেতে পারে এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সাদা সল্ট-প্যানের প্রতিফলন ম্লান করে তুলেছে আকাশের রঙ, ফলে দিগন্তরেখার কাছে আকাশ আর মাটিকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না। চোখ নামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রানা, 'স্টপ।'

নির্দেশের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তিতে ক্যাবের ছাদে পা ঠুকলো ও। সাথে সাথে সাড়া দিলো সোহানা, লক করলো ব্রেক। মুমূর্ষু ল্যাণ্ড-রোভার আড়াআড়িভাবে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রানার ব্যস্ততার কারণ আর কিছুই নয়, নিরীহদর্শন হলুদ লোমের একটা বল, আকারে ফুটবলের চেয়ে একটু ছোটোই হবে। প্রথম লাফটা দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের একেবারে সামনে পড়লো, পিছনের পা দুটো ক্যাঙ্গারুর মতো লম্বা, শরীরের বাকি অংশের তুলনায় বড় বেশি বেমানান। আরেক লাফে ভোজবাজির মতো মাটির ভেতর গায়েব হয়ে গেল।

'স্প্রীং হেয়ার!' ঘোষণা করলো রানা। 'বিশাল একটা কলোনি, ঠিক আমাদের নাক বরাবর!'

'ক্যাঙ্গারু র‍্যাটস!' জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে সোহানা, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

ভাগ্যটা ভালো ওদের। স্প্রীং হেয়ার নেহাতই নিশাচর প্রাণী, এই একটাই কি কারণে কে জানে মাটির ভেতর গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওদেরকে সতর্ক হবার সুযোগ করে দিলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

খুঁটিয়ে দেখলো রানা, কলোনির বিস্তৃতি ধরা পড়ে গেল ওর চোখে। দশ থেকে পনেরো হাজার গর্ত রয়েছে, প্রতিটি গর্তের মাথায় আলগা ঝুরঝুরে মাটির টোপর। গর্তের ভেতর গর্ত, তার ভেতর গর্ত, একটার সাথে আরেকটার সংযোগ আছে—গোটা কলোনি অন্তত চার ফুট পর্যন্ত গভীর।

এই মাটি একজন ঘোড়সওয়ারের ভারও সইতে পারবে না, ল্যাণ্ড রোভারের তো প্রশ্নই ওঠে না। অলস ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো ট্রাকের গর্জন। মেশিনগান ফায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, এতো কাছ থেকে যে নিজের অজান্তেই ঝট্ করে মাথা নিচু করে নিলো রানা।

'বাঁ দিকে ঘোরো!' গলা ফাটালো রানা। 'প্যানের দিকে ফিরে চলো।'

ছুটে আসা ট্রাকের সামনে দিয়ে আড়াআড়িভাবে এগোলো ল্যাণ্ড-রোভার। মেশিনগানের বিরতিহীন বিস্ফোরণ তাড়া করলো ওদেরকে। ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো ক্যাপটেনের কাতরানি। কানে তুলো দিলো রানা।

'ভেতর দিয়ে যাবার কোনো পথ দেখছি না।' রিপোর্ট করলো সোহানা, চারদিকে শুধু স্প্রীং হেয়ারের গর্ত দেখছে ও।

'থেমো না,' জবাব দিলো রানা। ট্রাকের মুখ ঘুরে গেছে, তেরছা একটা পথ ধরে ওদের সামনে এসে বাধা দিতে চায়—দ্রুত কাছে চলে আসছে টয়োটা।

'ওই যে!' পরম স্বস্তি বোধ করলো রানা। যেমন আন্দাজ করে-ছিল, সল্ট-প্যানের কিনারা পর্যন্ত না পৌঁছে, একটু আগেই স্প্রীং হেয়ার কলোনির বিস্তৃতি থেমে গেছে, উদ্দেশ্য মাটিতে চোয়ানো

প্যানের লোনা পানি এড়িয়ে যাওয়া। প্যানের কিনারা আর কলোনির মাঝখানে সরু একটা ব্রিজ, পথ নির্দেশ দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারকে তাতে তুলে আনলো রানা। সাড়ে তিন শো গজ পেরিয়ে ব্রিজ থেকে নেমে এলো ওরা, সামনে শক্ত মাটি। ল্যাণ্ড-রোভারের সবটুকু গতি আদায় করছে সোহানা, ধাওয়ারত শত্রুদের কাছ থেকে সরাসরি দূরে সরে যাচ্ছে।

'না! না!' ক্যাবের ছাদে পা ঠুকলো রানা। 'ডান দিকে ঘোরো, পুরোপুরি ডান দিকে!' কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলো সোহানা। 'যা বলছি করো, ড্যাম ইউ!' হঠাৎ করেই রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো সোহানা, বন বন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরালো সে, ধেয়ে আসা ট্রাকের সামনে দিয়ে উল্টো দিকে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার।

আবার সাথে সাথে ঘুরে গিয়ে সরাসরি ল্যাণ্ড-রোভারের পিছু নিলো টয়োটা। প্যান, আর শক্ত মাটির ব্রিজের দিক থেকে ঘুরে যাচ্ছে সেটার মুখ। এতো কাছে, খোলা পিছন দিকটায় সৈনিকদের মাথা দেখতে পেলো রানা। রোদে চকচক করছে লালচে বেরেট, আর রুপালি ক্যাপ-ব্যাজ। একটা এ-কে ফরটিসেভেন গর্জে উঠলো, সেই সাথে শোনা গেল সৈনিকদের রক্ত হিম করা উল্লাস ধ্বনি।

মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলি ল্যাণ্ড-রোভারের দশ ফিট সামনে ধুলোর কয়েকটা স্তম্ভ তুললো, খাড়া স্তম্ভগুলোকে ভেদ করে বেরিয়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার।

দ্রুত লোড করে একের পর এক এলোপাথাড়ি গুলি করছে রানা, ট্রাকের সামনে মাটির দিকে ড্রাইভার যাতে মন দিতে না পারে।

'হাইকোর্টের মাজারে পাঁচ সিকে সিন্নি দেবো,' বিড়বিড় করে মানত করলো সোহানা। ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে টয়োটার দিকে

তাকালো সে।

প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে রানাও, সে-ও বিড়বিড় করছে, 'প্লিজ, প্লিজ, লেট ইট হ্যাপেন!' আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছে রাইফেল, দ্রুত হাতে ম্যাগাজিন বদল করলো। ভাগ্যদেবী ওদের প্রার্থনায় সাড়া দিল। ফাঁপা মাটির ভেতর সবেগে সেঁধিয়ে গেল টয়োটা।

এ যেন একটা হাতির ছুটে এসে খাদের ভেতর পড়ে যাওয়া। মাটি ফাঁক হয়ে গিয়ে গিলে ফেললো ট্রাককে, ভেতরে নেমে যাবার সময় এক দিকে কাত হয়ে পড়লো সেটা, পিছনের লোকগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। রাশি রাশি ধুলো এক পাশে সরে যাবার পর দেখা গেল, টয়োটা এক দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে, অর্ধেকটাই মাটির নিচে গাঁথা। সেটাকে ঘিরে কেঁচোর মতো মাটিতে বুক দিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে কিছু মনুষ্য আকৃতি। দু'একজন অনবরত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। বাকিরা যেখানে ছিটকে পড়েছে সেখানেই শুয়ে থেকে মোচড় খেতে লাগলো।

'কেমন মজা!' রানার উৎফুল্ল গলা শোনা গেল। 'বুলডোজার ছাড়া ওখান থেকে আর উঠতে হচ্ছে না!'

'রানা, ক্যাপটেনের অবস্থা…'

'গাড়ি থামাও!' রানার চিৎকারে সোহানার গলা চাপা পড়ে গেল।

গাড়ি থামালো না সোহানা, স্পীড কমালো। লাফ দিয়ে ছাদ থেকে নামলো রানা, গাড়ির সাথে ছুটতে ছুটতে আরেক লাফে উঠে পড়লো ব্যাক সিটে। স্পীড আবার বাড়িয়ে দিলো সোহানা।

সিটের অর্ধেক বাইরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ভালডেজ,

দরজার গায়ে ঠেকে আছে মাথাটা। চশমা জোড়া হারিয়ে ফেলেছে সে। গলার ভেতর ঘর ঘর আওয়াজ করছে কফ আর নিঃশ্বাস। ব্যাটল-জ্যাকেটের পিছনটা রক্তে ভিজে জবজব করছে। সাবধানে ধরে তাকে সিটের ওপর তুলে আনলো রানা, জ্যাকেটের চেইন খুললো।

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। বুলেটটা নিশ্চই গাড়ির গা ফুটো করে ঢুকেছে, আকৃতি বদলে ভোঁতা হয়ে গেছে চেহারা। ক্যাপটেনের পিঠে কফি কাপ আকারের একটা গর্ত করে ভেতরে ঢুকেছে সেটা। কিন্তু বেরোয়নি।

ড্যাশবোর্ডের সাথে একটা ফার্স্ট-এইড বক্স আটকানো রয়েছে। ছটো ফিল্ড ড্রেসিং বের করে ক্ষতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলো রানা।

'কি রকম বুঝছো?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলো সোহানা। চট করে একবার রানার দিকে তাকালো সে।

'ঠিক হয়ে যাবে,' ভালডেজকে শোনাবার জন্যে কথাটা ইংরেজিতে বললো রানা, কিন্তু সোহানার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লো সে।

ধরে নিতে হয় ক্যাপটেন ভালডেজ মারা গেছে। আর বড় জোর ছ' এক ঘণ্টার ব্যাপার। এই রকম একটা ক্ষত নিয়ে কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

গরম ধাতব গন্ধে দম আটকে এলো।

'শ্বাস টানতে পারছি না,' ভালডেজের গলা অস্পষ্ট শোনালো, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে সে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে রানার মুখের দিকে তাকালো ভালডেজ। মুঠো করা হাত দিয়ে ভালডেজের মাথার ওপর জানালার কাঁচ ভেঙে ফেললো রানা। 'আমার চশমা,' বিড়বিড় করে বললো ভাল-

ডেজ, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

সিটগুলোর মাঝখানে হাতড়ে চশমাটা তুললো রানা, ভালডেজের নাকের ডগায় বসিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ, মিঃ রানা।' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানা দেখলো, ভালডেজ হাসছে। 'ভান করে লাভ নেই,' আবার বললো সে। 'বোঝাই যাচ্ছে, আমাকে রেখে যেতে হবে।'

বেদনা, ক্ষোভ, আর নিষ্ফল রাগের মাত্রা উপলব্ধি করে রানা নিজেই অবাক হয়ে গেল। ভালডেজের কাঁধ দুটো শক্ত হাতে ধরলো ও, গায়ের জোর সংক্রমিত হলে একটু যদি আরাম পায় বেচারা।

'ট্রাক?' জিজ্ঞেস করলো ভালডেজ।

'আমরা ওটাকে অচল করে দিয়েছি।'

'যাক, মরেও শান্তি পাবো।' ভালডেজের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

তার কথা শেষ হতেই ওদের নাকে রাবার আর তেল পোড়ার গন্ধ ঢুকলো।

'গাড়িতে আগুন ধরে গেছে!' আঁতকে উঠলো সোহানা।

ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের দিকটা জ্বলছে। নষ্ট বেয়ারিং লাল হয়ে উঠে গ্রিজ আর সামনের টায়ারের রাবারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রায় চোখের পলকে শিখাগুলো গ্রাস করে ফেললো সামনের চাকা। ইঞ্জিন বৃথা গর্জন করছে বটে, কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। স্লিপিং ক্লাচেও আগুন লাগলো, চেসিসের ভেতর থেকে কুল কুল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

'সুইচ অফ!' নির্দেশ দিয়েই এক ঝটকায় দরজা খুলে নেমে

পড়লো রানা, দরজার এক ধারে ঝুলে থাকা ফায়ার-এক্সটিংগুইশার হাতে চলে এসেছে।

জ্বলন্ত সামনের অংশে সাদা পাউডার স্প্রে করলো রানা। প্রায় সাথে সাথে অদৃশ্য হলো শিখাগুলো। বনেট তুলতে গিয়ে আঙুলের চামড়া পুড়িয়ে ফেললো ও। ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টেও স্প্রে করলো আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে।

পিছিয়ে এসে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'এ আর চলবে না।'

ইঞ্জিনের গর্জন আর গোলাগুলির বিস্ফোরণ থেমে যাওয়ায় কানের পাশে ঝাঁঝাঁ করছে নিস্তব্ধতা। ক্যাবের পিছনে এসে দূরে তাকালো রানা। তাপ-মরীচিকার ভেতর অচল ট্রাকটাকে দেখা গেল ।। খাঁ খাঁ মরু প্রান্তরের নির্জনতা নিরেট বস্তুর ভার নিয়ে চেপে বসলো ওর মনে, যেন স্তিমিত করে তুললো ওর নড়াচড়া আর চিন্তাশক্তি।

নৈরাশ্য, ক্ষোভ, আর রাগে মুখের ভেতরটা কাগজের মতো শুকনো লাগলো। 'পানি।' সিটের নিচে রিজার্ভ ট্যাংকের কাছে চলে এলো রানা, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যাপ খুললো, পরীক্ষা করলো পানির লেভেল। 'অন্তত পঁচিশ লিটার!'

র‍্যাকের সাথে, এ-কে ফরটিসেভেনের পাশে, অ্যালুমিনিয়ামের একটা ক্যানটিন ঝুলছে, কবর খুঁড়তে যাবার সময় সৈনিকদের এক-জন রেখে গেছে। ট্যাংকে ডুবিয়ে সেটা ভরে নিলো রানা, তারপর ভালডেজের মুখের সামনে ধরলো।

কৃতজ্ঞ চোখে রানার দিকে তাকালো ভালডেজ, তাড়াহুড়ো করে ঢোক গিলতে গিয়ে বিষম খেলো। তারপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো। ক্যানটিনটা সোহানাকে দিলো রানা, সবশেষে

বাকি পানিটুকু নিজে খেলো। আগের চেয়ে একটু যেন শান্ত হলো ভালডেজ, তার ড্রেসিং আবার পরীক্ষা করলো রানা। রক্তক্ষরণ আপাততঃ বন্ধ আছে।

মরুভূমিতে অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম শর্ত, রানা জানে, বাহনের কাছে থাকা। কিন্তু সে-নিয়ম এখানে খাটে না। ল্যাণ্ড-রোভার চুম্বকের মতো টেনে আনবে শত্রু-সেনাদের। তাছাড়া, ভালডেজের কাছ থেকে জানা গেছে, স্পটার প্লেন আসছে। এই খোলা প্রান্তরে চল্লিশ মাইল দূর থেকে ল্যাণ্ড-রোভারকে দেখতে পাবে পাইলট। তারপর আছে দ্বিতীয় পেট্রল, প্লামট্রি বর্ডার-পোস্ট থেকে আসছে যারা। এখানে পৌঁছুতে বড়জোর দু'ঘণ্টা লাগবে তাদের।

এখানে থাকা চলে না। হাঁটার মধ্যে থাকতে হবে ওদের। ভাল-ডেজের দিকে তাকালো রানা, দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরের মনোভাব উপলব্ধি করলো ওরা।

'হ্যাঁ, রওনা হয়ে যান,' ফিসফিস করে বললো ভালডেজ।

তাকিয়ে থাকতে পারলো না, মুখে কোনো কথাও যোগালো না, একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার গাড়ির ছাদে উঠলো রানা, পিছন দিকে তাকালো।

নরম মাটিতে ওদের চাকার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সূর্য নিচে নেমে যাওয়ায় ছায়ায় ভরে গেছে ওগুলো। দৃষ্টি দিয়ে ঝাপসা দিগন্তরেখা পর্যন্ত দাগটাকে অনুসরণ করলো রানা, তারপরই চমকে উঠলো।

দৃষ্টিসীমার একেবারে কিনারায় কি যেন নড়ে উঠলো। দীর্ঘ অনেকগুলো সেকেণ্ড ধরে আশা করলো রানা, বোধহয় কিছু না, স্রেফ আলোর ছলনা। কিন্তু তারপরই মাটির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে

কেঁচোর মতো কিলবিল করে উঠলো, মাটি থেকে উঠে এলো তাপ-মরীচিকায় একটা ঝলক, আরেকবার চেহারা বদল করলো, আবার নামলো মাটিতে, এবং সবশেষে লাইন বন্দী সশস্ত্র এক দল মানুষের আকৃতি পেলো।

ওদের চাকার দাগ ধরে এগিয়ে আসছে একটা কালো সরলরেখা। পিছু ছাড়েনি থার্ড ব্রিগেড। ঘোড়ার মতো তুলকি চালে সমান গতিতে ছুটে আসছে। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই সৈনিকদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে রানার, জানে, পুরো একটা দিন এবং সারা রাত এভাবে দৌড়াতে পারবে ওরা।

লাফ দিয়ে নামলো ও, গাড়ি থেকে ভালডেজের বায়নোকিউলার-টা বের করলো।

'এদিকে একটা পেট্রল আসছে,' ওদেরকে বললো ও।

'ক'জন?' দম আটকে জানতে চাইলো ভালডেজ।

ছাদে দাঁড়িয়ে বায়নোকিউলার অ্যাডজাস্ট করলো রানা। 'আট-জন, বাকি সবাই ট্রাক উল্টে আহত হয়েছে।'

ফিরে সূর্যের দিকে তাকালো ও, তাপ হারাতে হারাতে লালচে হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে ডুব দিচ্ছে ঝিকিমিকি দিগন্তে। অস্ত যেতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না, আন্দাজ করলো ও।

'আমাকে একটা ভালো জায়গায় বসিয়ে দিন,' বিড়বিড় করে রানাকে বললো ভালডেজ। 'হাতে রাইফেল থাকলে ওদের আমি কিছুক্ষণ অন্তত ঠেকিয়ে রাখতে পারবো।' রানা ইতস্তত করছে লক্ষ্য করে আবার বললো সে, 'এখন সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, মিঃ রানা।'

'সোহানা, ক্যানটিনে পানি ভরো,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা।

'ইমার্জেন্সী রেশন থেকে চকোলেট আর হাই-প্রোটিন স্ল্যাব বের করো। ম্যাপ, কম্পাস, আর এই বায়নোকিউলারটা নাও।'

ভালো একটা কাভারের খোঁজে অচল ল্যাণ্ড-রোভারের চারদিকে তাকালো রানা। সমতল প্রান্তর, এমন কোনো আড়াল নেই যেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে শত্রুদের ওপর গুলি চালানো যায়। তারস্থানে একমাত্র আড়াল দিতে পারে ল্যাণ্ড-রোভারটাই। গ্যাসোলিন ট্যাংক থেকে ড্রেন প্লাগ খুলে ফেললো ও, বালি বহুল মাটিতে অবশিষ্ট ফুয়েল সবটুকু গড়াতে দিলো, শত্রুরা যাতে গাড়িতে আগুন ধরাতে না পারে—পারলে গাড়ির সাথে ভালডেজও পুড়ে মারা যাবে।

রানার সাথে আলাপ করে নিয়ে পিছনের চাকা দুটোর চারপাশে একটা পর্দা তৈরি করলো সোহানা, স্পেয়ার চাকা আর টুল-বক্সটা ভালডেজের দু'পাশে থাকবে।

দু'জন ধরাধরি করে ভালডেজকে নামালো ওরা। পিছনের চাকা জোড়ার পিছনে উপুড় করে শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, ভিজে লাল হয়ে গেছে সাদা ব্যাণ্ডেজ। ভালডেজের চেহারা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, ওপরের ঠোঁটে ক্ষতটাকে ঘিরে উজ্জ্বল বুদবুদের মতো ঘাম জমেছে। সোহানা তার হাতে একটা এ-কে ফরটিসেভেন ধরিয়ে দিলো, সামনে রাখলো একটা সিট কুশন, এইমিং রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে ওটা। ভালডেজের ডান হাতের কাছে স্পেয়ার ম্যাগাজিনের বাক্সটা রাখলো রানা, পাঁচশো রাউণ্ড।

'সন্ধ্যে পর্যন্ত টিকবো আমি,' ভাঙা, কর্কশ গলায় বললো ভালডেজ। 'তবে একটা গ্রেনেড রেখে যান।'

গ্রেনেড কেন চাইছে সবাই বুঝলো। ভালডেজ জীবিত অবস্থায় ধরা পড়তে চায় না। একেবারে শেষ মুহূর্তে গ্রেনেডটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে পিন খুলে নেবে।

বাকি পাঁচটা গ্রেনেড একটা রাকস্যাকে ভরলো রানা। গ্রেনেড-গুলোর ওপর রাখলো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ব্যাগটা, তাতে ওর কাগজ-পত্র আর পাণ্ডুলিপি রয়েছে। টুলবক্স থেকে হালকা গজ ওয়্যারের একটা রোল, আর এক জোড়া সাইড কাটার নিলো; অ্যামুনিশন বক্স থেকে নিলো এ-কে ফরটিসেভেনের জন্যে ছয়টা স্পেয়ার ম্যাগা-জিন। ফার্স্ট এইড বক্সের জিনিসগুলো ভাগ করলো ও, দুটো ফিল্ড ড্রেসিং, এক প্যাকেট পেইন-কিলার, সিরিঞ্জ ভর্তি মরফিন রাখলো ভালডেজের জন্যে। বাকি সব ভরে নিলো নিজের রাকস্যাকে।

দ্রুত একবার ল্যাণ্ড-রোভারের ভেতরটা দেখে নিলো রানা। এমন কিছু থেকে যাচ্ছে যা পরে দরকার লাগবে? ক্যামোফ্লেজ ডিজাইন করা প্লাস্টিক গ্রাউণ্ডশিটের একটা রোল মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে ব্যাগে ভরলো ও। এর বেশি বোঝা বাড়ানো সম্ভব নয়।

সোহানার দিকে তাকালো রানা। তার এক কাঁধে ঝুলছে ক্যান-টিন, আরেক কাঁধে দ্বিতীয় রাকস্যাক। ফটোর পোর্টফোলিওটা রাকস্যাকে ভরে নিয়েছে সে। কঠিন দেখালো তাকে, যেন আবেগের রাশ টেনে ধরার জন্যে নিজের সাথে যুদ্ধ করছে, ছল ছল করছে চোখ দুটো। মনে হলো কপালের ফোলাটা আরো যেন বড় হয়ে উঠেছে।

'রাইট?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওকে।'

ভালডেজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা। ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো সোহানা।

ভালডেজের কাঁধ ধরলো রানা। 'গুডবাই, ক্যাপটেন,' বললো ও।

'গুডবাই, মিঃ রানা।'

ভালডেজের কাঁধ ছেড়ে তার একটা হাত ধরলো রানা, তার চোখে তাকালো। ক্যাপটেনের চোখে ভয় নেই। আফ্রিকানদের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে আগেও পরিচয় ঘটেছে রানার, মৃত্যুকে তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে পারে। 'ধন্যবাদ, ভালডেজ। আপনার কথা কখনো ভুলবো না।'

মৃদু হাসি দেখা গেল ভালডেজের ঠোঁটে। 'আমার সান্ত্বনা এইটুকু যে আপনাদের আমি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি। এখন শুধু এইটুকু আশা, জেনারেল উমাঙ্গোকে আপনারা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেবেন না।'

রানার চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো। 'তা দেবো না, আপনাকে আমি কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ, মিঃ রানা। গো ইন পীস।'

উঠে দাঁড়ালো রানা। ঘুরে এগিয়ে এলো সোহানা, ভালডেজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে।

ভালডেজের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে তার মাথায় একটা হাত রাখলো সোহানা। 'ইউ আর এ গুড ম্যান, ক্যাপটেন,' বললো সে। 'আপনার জন্যে কিছু করার থাকলে বলুন। কেউ আছে, যাকে খবরটা দিতে হবে? আত্মীয়-স্বজন, কিংবা ভালোবাসে এমন কেউ?'

'না,' ভালডেজের ক্লান্ত চেহারা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। 'ভালোবাসে তেমন কেউ নেই।' একটা মেয়ে আছে বটে, কিন্তু ভালডেজ তাকে ভালোবাসলেও, মেয়েটা তাকে ভালোবাসে না। তবে, তার আশা ছিলো, একদিন ওর মন জয় করতে পারবে সে। 'শুধু এই টেলিফোন নাম্বারটা রাখুন, বুলাওয়ায়োয় কখনো যদি যেতে পারেন, এই নাম্বারে ফোন করে লিসা নামের একটা মেয়েকে চাইবেন। তাকে বলবেন, ভালডেজ তোমাকে আর কখনো বিরক্ত করবে না।'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফোন নাম্বারটা লিখে নিলো সোহানা। মনে মনে বললো, হায় অভাগা।

ভালডেজ তার হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুলে পিস্তলটা বের করলো। একটা টোকারেভ ফিফটিওয়ান। উল্টো করে ধরে সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে, কিন্তু কিছু বললো না।

কয়েক সেকেণ্ড পর পিস্তলটা নিলো সোহানা। 'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন

ওরা সবাই জানে, গ্রেনেডের মতো এটাও একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে—সহজ পথে চির বিদায় নিতে সাহায্য করবে। জিনসের বেল্টে পিস্তলটা গুঁজে রাখলো সোহানা, আর তারপর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ঝুঁকে পড়ে ভালডেজের কপালে একবার ঠোঁট ছোঁয়ালো। 'ধন্যবাদ,' আবার বললো সে, দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরলো।

পথ দেখিয়ে প্রথমে হন হন করে এগোলো রানা, তারপর দুলকি চালে ছুটলো। কয়েক গজ অন্তর পিছন ফিরে তাকালো ও, ধাওয়ারত সৈনিক আর নিজেদের ঠিক মাঝখানে রাখলো ল্যাণ্ড-রোভারটাকে। ওরা যদি সন্দেহ করে তিনজনের মধ্যে থেকে দু'জন গাড়ি

ছেড়ে পালিয়েছে, ল্যাণ্ড-রোভারের ওপর হামলা করার জন্যে অর্ধেক লোককে রেখে বাকি সবাই একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে আবার ফিরে আসবে নাক বরাবর সরল রেখায়, ওদের দু'জনের পায়ের ছাপ খুঁজে নিয়ে আবার শুরু করবে ধাওয়া।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পর প্রথম অটোমেটিক ফায়ারের আওয়াজ পেলো ওরা। শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। বহু দূরে কালো একটা বিন্দুর মতো দেখালো ল্যাণ্ড-রোভারকে, সন্ধ্যের কালিমা ঝুঁকে পড়েছে সেটার ওপর। প্রথম বিস্ফোরণের জবাবে গান ফায়ারের ঝড় বয়ে গেল, গর্জে উঠলো একসাথে অনেকগুলো রাইফেল।

'দক্ষ একজন সৈনিক,' বললো রানা। 'একেবারে নিশ্চিত হয়ে তারপর প্রথম গুলিটা করেছে। বাজি ধরে বলতে পারি, এখন আর ওদের দলে আটজন নেই।'

অবাক হয়ে দেখলো ও, সোহানার দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। ধুলোর মিহি প্রলেপ লেগে রয়েছে চামড়ায়, পানির ধারা ধূসর হয়ে উঠলো।

কিছু বলতে গিয়েও কি মনে করে ক্ষান্ত হলো রানা।

'লোকটার সরলতা আমি ভুলতে পারছি না,' বলে নিজের মাথার দু'পাশে হাত রাখলো সোহানা। 'মাথাটা খুব ব্যথা করছে। ওকে আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল।'

যতো দূরে সরে এলো ওরা, ততোই অস্পষ্ট শোনালো গোলাগুলির আওয়াজ। এক সময় শুধু মৃদু ফিসফিসানির মতো হয়ে উঠলো, যেন অনেক পিছনে শুকনো পাতার ওপর কারো পা পড়ছে।

'রানা!' সোহানার ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা। দশ-

বারো গজ পিছিয়ে পড়েছে সোহানা, চেহারায় ক্লান্তি আর কষ্টের ছাপ। মাথায় খুব জোরেই লেগেছে, বিশ্রাম দরকার তার। রানা থামতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে, দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা নামালো। 'এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। মাথাটা আবার ব্যথা করতে শুরু করেছে।'

ফার্স্ট-এইড বক্স থেকে দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট বের করলো রানা। ওর হাত থেকে পানির ক্যানটিন আর ট্যাবলেট দুটো নিলো সোহানা। ওর কপালের ফোলাটা উদ্বিগ্ন করে তুললো রানাকে। দু হাত দিয়ে ধরে শক্ত করে জড়িয়ে রাখলো তাকে।

'আরাম লাগছে।' রানার গায়ে ঢলে পড়লো সোহানা।

নিস্তব্ধ মরু, হানা দিচ্ছে সন্ধ্যা, দূর থেকে ভেসে এলো ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের শব্দ। শিউরে উঠলো সোহানা। 'কিসের…?' জানে, তবু নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা বেরিয়ে আসতে চাইলো।

'হ্যাণ্ড-গ্রেনেড,' বললো রানা, হাত ঘড়ি দেখলো ও। 'প্লাটুনের সামনে আর কোনো বাধা নেই, তবে ভালডেজ আমাদেরকে পঞ্চান্ন মিনিট সময় পাইয়ে দিয়েছে। ব্লেস ইউ, ভালডেজ!'

'বসে থাকলে এই পঞ্চান্ন মিনিট নষ্ট হবে,' বলে উঠে দাঁড়ালো সোহানা। তার চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখে স্বস্তিবোধ করলো রানা। পিছন দিকে তাকালো সোহানা। 'বেচারা!' তারপরই রানা-কে অনুসরণ করলো সে।

থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনে ফেলবে ল্যাণ্ড-রোভারের আড়ালে মাত্র একজন লোক ছিলো। গাড়ির পিছনে একটু খোঁজ করলেই ওদের দু'জনের পায়ের ছাপ পেয়ে যাবে এবং সাথে সাথে অনুসরণ করবে। প্রশ্ন হলো, ভালডেজ কতোটুকু

কি করে যেতে পেরেছে। আটজনের মধ্যে ক'জন বেঁচে আছে ওরা ?

শিগগিরই জানা যাবে, ভাবলো রানা। অন্ধকার করে দিয়ে রাত নামলো চারদিকে।

নতুন চাঁদের বয়স তিন দিন, আলো আসছে শুধু তারাগুলো থেকে। আকাশের এক পাশে লম্বা হয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে কাল-পুরুষ—কোমরবন্ধের তিনটে তারা দেখে চিনলো রানা। মরুর শুকনো বাতাসের ভেতর দিয়ে তারাগুলোর উজ্জ্বলতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ছায়াপথটাকে আকাশের গায়ে সেঁটে থাকা বিশাল একটা আলোর টানেল বলে মনে হলো। আকাশের সাজসজ্জা মুগ্ধ করে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে রানা দেখলো, আলো এতো বেশি যে ওদের পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'বিশ্রাম।' বললো ও, সাথে সাথে মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সোহানা।

বেয়োনেট দিয়ে একটা ঝোপ কাটলো রানা, ডালগুলোকে এক করে তার দিয়ে বাঁধলো, তারের একটা প্রান্ত জড়িয়ে নিলো কোমরের বেল্টে। 'হাঁটো।' কম কথা বলছে রানা, শক্তি বাঁচাচ্ছে। এবার আগে আগে থাকলো সোহানা, দৌড়াচ্ছে না, হাঁটছে। রানার পিছনে থাকলো শুকনো ঝোপ, মাটি থেকে ওদের পায়ের ছাপ মুছে দিচ্ছে।

নোঙরের মতো রানাকে অনুসরণ করছে ঝোপটা, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতে হলো ওকে। এক মাইল পেরোতেই ক্লান্ত হয়ে উঠলো ও। পরবর্তী এক ঘণ্টায় তিনবার পানি খেতে চাইলো সোহানা। মরুভূমিতে বাঁচতে হলে যতোই তৃষ্ণা পাক, প্রথম দিকে তা অগ্রাহ্য

করতে হবে, কোনোমতেই পানি খাওয়া চলবে না। খেলে, প্রতি মুহূর্তে অতৃপ্তি শুধু বাড়তেই থাকবে। কিন্তু সোহানা অসুস্থ, মাথার আঘাতটা কাহিল করে ফেলেছে ওকে—কঠোর হতে মন চাইলো না রানার। কিন্তু নিজে ও পানি খেলো না। কাল, তখনও যদি টিকে থাকতে পারে, পিপাসায় আগুন ধরে যাবে ছাতিতে। ঝোঁকটা দমাবার জন্যে ক্যানটিনটা সোহানার কাছ থেকে নিয়ে নিলো ও।

মাঝ রাতের খানিক আগে বেল্ট থেকে তারটা খুললো রানা, কাঁটাঝোপের বোঝাটা টেনে আনতে বড় কষ্ট হচ্ছে। থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা এখনো যদি ওদের পায়ের ছাপ হারিয়ে না ফেলে থাকে, এতে আর তেমন কোনো কাজও হবে না। তার বদলে সোহানার কাছ থেকে র‍্যাকস্যাকটা নিয়ে নিজের কাঁধে ঝোলালো ও।

আপত্তি করলো সোহানা, 'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না অথচ মাতালের মতো টলতে টলতে হাঁটছে সে। ভুলেও একবার অভি-যোগ বা অসহায় ভাব প্রকাশ করেনি, যদিও তারার আলোয় সল্ট-প্যানের মতো সাদা দেখালো তার চেহারা।

'সীমান্ত আমরা নিশ্চই ঘণ্টা কয়েক আগেই পেরিয়ে এসেছি,' বললো রানা।

'এর মানে কি আমরা এখানে নিরাপদ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সোহানা। মিথ্যে কথা বলার ইচ্ছে হলো না বলে চুপ করে থাকলো রানা। শিউরে উঠলো সোহানা, ঠাণ্ডা লাগছে, বোধহয় জ্বর আসছে তার।

গায়ের কাপড় ভেদ করে ঠাণ্ডা হুল ফোটাচ্ছে রাতের বাতাস। ভাঁজ খুলে নাইলন গ্রাউণ্ডশিটটা দিয়ে সোহানার কাঁধ ঢেকে দিলো রানা। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে শরীরের খানিকটা ভার নিজের

হাতের ওপর নিলো।

আরো এক মাইল এগোবার পর সল্ট-প্যানের শেষ প্রান্তের কিনারায় পৌঁছুলো ওরা। রানা উপলব্ধি করলো, আজ রাতে এর বেশি হাঁটতে পারবে না সোহানা। আঠারো ইঞ্চি উঁচু পাথুরে একটা পাড় দেখা গেল, তারপর আবার শক্ত প্রান্তর শুরু হয়েছে। 'এখানে থামা যাক,' বললো ও, সাথে সাথে নেতিয়ে পড়লো সোহানা। তার গায়ে গ্রাউণ্ডশিটটা চাপিয়ে দিলো রানা।

'একটু পানি খেতে পারি ?'

'না। সকালের আগে নয়।'

পানির ক্যানটিনটা হালকা হয়ে গেছে, মাটিতে নামাবার সময় ছল ছল আওয়াজ শুনে মনে হলো অর্ধেক পানিও নেই। বেয়োনেট দিয়ে ঝোপ কেটে আনলো রানা, সোহানার সামনে একটা আড়াল তৈরি করলো, তার গায়ে যাতে বাতাস না লাগে।

রানাকে হাত বাড়াতে দেখে পা জোড়া দ্রুত টেনে নিলো সোহানা, বাঙালী মেয়ের সহজাত সংকোচবোধ। 'খবরদার !' চোখ রাঙিয়ে কৃত্রিম শাসন করলো রানা, তারপর সোহানার জগিং শু জোড়া খুলে নিলো পা থেকে।

পা দুটো ম্যাসেজ করার সময় স্পর্শ দিয়ে পরীক্ষা করলো রানা।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো সোহানা। 'উফ্, লাগে!' ঘষা খেতে খেতে তার বাঁ গোড়ালির চামড়া উঠে গেছে। সোহানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পা-টা ঝট্ করে মুখের কাছে তুলে ক্ষতটা চুষতে শুরু করলো রানা, ময়লা পরিষ্কার করলো। পানি এখন জীবনের মতোই মূল্যবান, অপব্যয় করার উপায় নেই। ক্ষতের ওপর অ্যান্টি-সেপটিক মলম লাগিয়ে দিলো ও, এক পায়ের মোজা আরেক পায়ে

পুরালো, সবশেষে জুতো পরিয়ে ফিতে বেঁধে দিলো।

'আমি ভাগ্যবতী, এমন একজন মানুষ আমাকে ভালোবাসে…' ফিসফিস করে বললো সোহানা।

'প্রলাপ ?'

'কি ! শুনে ফেলেছো ?'

'কথা নয়, চুপ

'তুমি কি ভালো.' আবার ফিস ফিস করে বললো সোহানা, গ্রাউণ্ডশিটের ভেতর ঢুকে তাকে দু'হাতের ভেতর টেনে নিলো রানা। 'আর কি গরম !'

'চুপ করো তো !' ধমক দিলো রানা, 'ঘুমাও !'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সোহানা, গুটিসুটি মেরে রানার বুকের আরো একটু ভেতরে সেঁধোলো। আর কোনো নড়াচাড়া নেই দেখে রানার মনে হলো, ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু একটু পর নরম সুরে বললো সে. 'রানা, শেষ পর্যন্ত কি হবে বলো দেখি ? কিং'স হেভেন তোমার নয়, শুধু তোমার নামে কেনা হয়েছিল। মিঃ রুবেনসনকে জবাব দেবে কি ? বিশ্ব-ব্যাংকের অতো টাকার লোনই বা শোধ করবে কিভাবে ?'

'সময় হোক, একে একে সব সমস্যার সমাধান করবো,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে আশ্বাস দিলো রানা। 'যদি বাঁচি, উমাঙ্গোকে শাস্তি পেতে হবে।'

এরপর ঘুমিয়ে পড়লো সোহানা। বুকে তার নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ার স্পর্শ পেলো রানা। আস্তে আস্তে, তার ঘুম না ভাঙিয়ে গ্রাউণ্ডশিট থেকে বেরিয়ে এলো ও।

হাঁটুর ওপর এ-কে ফরটিসেভেন নিয়ে নিচু পাড়ের ওপর বসলো

রানা, খোলা প্যানের দিকে নজর রাখলো। জানে, আসবে ওরা। জেগে বসে থেকে অপেক্ষা করতে হবে।

পাহারায় বসে কিংস হেভেনের কথা ভাবলো রানা। চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠলো কুয়াকোপা, টসনে, নিলি, আর আলায়তুনের চেহারা। আহত কুয়াকোপাকে পালিয়ে যেতে দেখেছে ও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছে কিনা কে জানে। ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে পোড়ামাটি নীতি নিয়ে হামলা চালিয়েছে গার্ড ব্রিগেড, যাকে যেখানে পাচ্ছে সেখানেই খুন করছে। কুয়াকোপার মুখে শুনেছে, তার মেয়ে নিলিকে শোনা সৈনিকরা ধর্ষণ করছে। নিলি, আলায়তুনে, টসনে, কেউই বোধহয় বেঁচে নেই। ষাঁড়গুলোর কথা মনে পড়লো, একেকটা কিনতে পনেরো হাজার ডলার করে দাম পড়েছে।

তারপর মনে পড়লো ওর কাঁধে যে দায়িত্বগুলো রয়েছে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর সেরা এজেন্টদের একজন সে। কখনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বানচালের জন্যে, কখনো দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যে, কখনো সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা সংহত করার জন্যে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে শত্রু আর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাকে। এই পেশায় প্রতিপদে রয়েছে রোমাঞ্চের হাতছানি, আবার যে-কোনো মুহূর্তে অকালে ঝরে যাবার আশংকাও। এবারের এই অ্যাসাইনমেন্ট বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ওদেরকে পাঠিয়েছেন মানবিক কারণে। তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছিলেন, জিম্বাবুইয়ে একটা উপজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এখানে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হবে, এবং জিম্বাবুইয়ের নিজস্ব সম্পত্তি পাঁচশো মিলিয়ন

ডলার মূল্যের হীরে অন্যায়ভাবে হাত করার চেষ্টা করবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে সোহানাকে আগেই জিম্বাবুইয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়, ওয়াইল্ড ল্যাইফ ট্রাস্টের একজন গবেষক এবং ফটোগ্রাফার হিসেবে জিম্বাবুইয়ে ঢোকে সোহানা। এদিকে, বিশ্ব-ব্যাংক জিম্বাবুইয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে রানার সাহায্য চাইলো। এমনিতেও অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এখানে আসতে হতো রানাকে। বিশ্ব ব্যাংক সন্দেহ করছিল, একজন মাস্টার পোচার জিম্বাবুইয়ের বন্যপ্রাণী মেরে ছাল আর শিং বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। সেই মাস্টার পোচারকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব চাপলো রানার ওপর।

কিন্তু কোনো দায়িত্বই পালন করতে পারেনি ওরা। মাস্টার পোচার হিসেবে জেনারেল টস মাজুলেটের বিরুদ্ধে ওরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, অথচ মাজুলেট মাস্টার পোচার নয়। ম্যাটাবেল উপজাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হামলা চালিয়েছে শোনা সৈনিক-দের নিয়ে তৈরি থার্ড ব্রিগেড, অথচ এখনো ম্যাটাবেলদের বাঁচাবার জন্যে কিছু করতে তো পারেইনি, প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে হচ্ছে ওদের নিজেদেরকেই।

রাজধানী হারারে-র কোনো খবর জানা নেই, সামরিক অভ্যুত্থান এখনো যদি নাও ঘটে থাকে, জেনারেল উমাঙ্গো প্রস্তুতি নিচ্ছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিদেশী যে শক্তিটা তাকে সাহায্য করছে, তাদের প্রতিনিধিও নিশ্চই উৎসাহ যোগাচ্ছে শয়তানটাকে। রানা আন্দাজ করলো, হীরেগুলো এই প্রতিনিধির মাধ্যমেই জিম্বা-বুই থেকে বেরিয়ে যাবে। হয়তো এরই মধ্যে সেগুলো উদ্ধার করে নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছে তারা।

এই সব ব্যর্থতার কারণে মন খারাপ হয়ে গেলেও, হতাশায় মুষড়ে

পড়ে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র মাসুদ রানা নয়। নিজের সমালোচনা করলো ও, সেই সাথে যুক্তি দিয়ে নিজেকে কিছু আশার বাণীও শোনালো। বিপদটা এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে, যাকে বন্ধু বলে মনে হয়েছিল সে-ই আচমকা ঘাতক হয়ে সামনে দাঁড়ায়। তবে এ-কথাও ঠিক, মিঃ রুবেনসনের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে গিয়ে নিজের কাজে অবহেলা করে ফেলেছে ও। রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ, কিছু দুর্বলতা না থেকে পারে না। মিঃ রুবেনসন নিজের সম্পত্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আইনের মারপ্যাচে তা সম্ভব হচ্ছিলো না, কাজেই সাহায্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি রানা। প্রত্যাখ্যান না করতে পারার আর একটা কারণ ছিলো, এই সম্পত্তির সাথে রেবেকার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রেবেকাকে ভালো-বেসেছিল রানা, সে মারা গেলেও, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ম্লান হবার নয়।

আরো সাবধান, আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিলো ওদের। তবে, সব শেষ হয়ে গেছে এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই, নিজেকে সান্ত্বনা দিলো রানা মাত্র কয়েক দিনে গোটা একটা উপজাতিকে মেরে সাফ করে ফেলা সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে এখনো ম্যাটাবেল-দের বাঁচানো যায়। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতেও সময় নিয়ে প্রস্তুতি দরকার, এখুনি ব্যাপারটা ঘটবে বলে মনে হয় না। আর হীরেগুলো যদি জিম্বাবুই থেকে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে, সেগুলো উদ্ধার করার সুযোগও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে আগে দরকার অস্তিত্ব রক্ষা করা। নিরাপদ একটা আশ্রয় পেলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারবে ও। অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে হলে নিখুঁত একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে ওকে।

ঘুমের মধ্যে বোধহয় স্বপ্ন দেখে গুঙিয়ে উঠলো সোহানা। উঁচু পাড় থেকে উঠে নিঃশব্দ পায়ে তার কাছে চলে এলো রানা। হাঁটু গেড়ে বসলো, ঝুঁকে পড়ে সোহানার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো। আগের চেয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে সোহানা। গায়ে হাত দেবে কিনা ভেবে ইতস্তত করতে লাগলো, যদি ঘুম ভেঙে যায়। চোখের সামনে দৃশ্যটা ভেসে উঠলো—লম্বা টেবিলের ওপর সোহানাকে নগ্ন এবং খোলা অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে, বহু লোক কদর্য দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। একটা মেয়েকে এর চেয়ে ভয়ংকরভাবে অপমান করা সম্ভব নয়।

সহানুভূতি আর দরদ ফুটে উঠলো রানার চেহারায়, ঝোঁকের মাথায় সোহানার কপালে একটা হাত রাখলো। সাথে সাথে যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেলো ও। প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সোহানা। টেম-পারেচার আন্দাজ করলো রানা, একশো সাড়ে তিন কিংবা চারও হতে পারে।

দুশ্চিন্তায় থমথমে হয়ে উঠলো রানার চেহারা। সোহানার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশাটা বাদ দিলো ও। বুঝলো, বাকি পথটুকু তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে।

প্যানের কিনারায় ফিরে এসে আবার পাহারায় বসলো রানা। চোখে ঘুম নেই, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ফেলে আসা মরু প্রান্তরের দিকে। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এলো রাত। আধ ঘণ্টা পর পর সোহানাকে দেখে এলো ও। জ্বর আগের মতোই, বাড়েনি বা কমেনি। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। ঘুম ভাঙিয়ে ট্যাবলেট খাওয়াবার কথা একবার ভাবলো বটে, কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিলো সাথে সাথে। যতোক্ষণ পারে ঘুমাক, ওষুধের চেয়ে ঘুমটা বেশি দরকার।

খোলা প্যানে গাঢ় রঙের কিছু সচল আকৃতি দেখে চমকে উঠলো রানা। চোখে বায়নোকিউলার তুলে ভালো করে তাকাতে দেখলো, ওগুলো আসলে ম্লান রঙের মরু-হরিণ—গ্যাজেল, একেকটা ঘোড়ার মতো বড়। এগুলোকে জেমসবাক-ও বলা হয়, মুখের চেহারা দেখতে হীরে আকৃতির, তাই। বাতাসের দিকে মুখ করে চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার মরুতে হারিয়ে গেল দলটা।

আকাশ-পথ ধরে নিচের দিকে নামলো কালপুরুষ, তারপর দিনের প্রথম আভা ফুটতে না ফুটতে মিলিয়ে গেল। এবার রওনা হবার সময় হয়েছে, কিন্তু সোহানার ঘুম ভাঙতে ইচ্ছে হলো না বলে বসেই থাকলো রানা। মনে মনে জানে, নতুন এই দিনটা ওদের জন্যে ভালো কিছু নিয়ে আসছে না। নিয়ে আসছে বিপদ, সমস্যা, আর চ্যালেঞ্জ। এ-সবের মধ্যে এখুনি সোহানাকে টেনে আনতে মন চাইলো না।

হঠাৎ করেই ওদেরকে দেখতে পেলো রানা। সাথে সাথে শির-শির করে উঠলো ঘাড়ের পিছনটা, মোচড় খেলো তলপেট। প্যানের ওপর এখনো ওরা অনেক দূরে, অন্ধকারের ভেতর আরো গাঢ়, লম্বা আকৃতির কালো একটা রেখা মাত্র। কিন্তু বোঝা যায়, লম্বাটে রেখাটা কোনো মরু-প্রাণীর পাল নয়। প্রতিটি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে কালো দাগ, সোজা ওর দিকে।

ওদের আসতে এতো দেরি হলো কেন আন্দাজ করতে পারলো রানা। কাঁটাঝোপের বোঝাটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসায় তাদের পায়ের ছাপ হারিয়ে ফেলেছিল সৈনিকরা। বোঝাটা রানা যেখানে ফেলে দিয়েছিল সেখান থেকে আবার পায়ের ছাপ ধরে পথের শেষটুকু দ্রুত পেরিয়ে এসেছে।

করণীয় স্থির করার জন্য দ্রুত চিন্তা করলো রানা। সামনে পিছনে আরো হয়তো শত্রু আছে, কিন্তু তাদের কথা আপাততঃ ভুলে গিয়ে যারা নাগালের মধ্যে চলে এসেছে তাদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

শত্রুর বিরুদ্ধে যদি রুখে দাঁড়াতে হয়, এখনই সময়।

দুই

নিশ্চই খোলা সল্ট-প্যানের ওপর দিয়ে আসবে শোনারা, আন্দাজ করলো রানা। ওর সামনে উঁচু পাড় থাকায় সামান্য একটু সুবিধে পাবে ও। কাঁটাঝোপগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তবে সবগুলোই হাঁটু সমান উঁচু—যদিও ওগুলোকে ব্যবহারের মতো সময় নেই হাতে।

শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, ফ্যাকাশে আকাশের গায়ে দেহ-রেখা যাতে ফুটে না ওঠে, তারপর এক ছুটে চলে এলো রাকস্যাকের কাছে। শার্টের নিচের অংশটা বুকের কাছাকাছি তুলে কোঁচড়ে পাঁচটা গ্রেনেড নিলো, হাতে নিলো ওয়্যার রোল আর সাইড কাটার, তারপর আবার মাথা নিচু করে ছুটে এলো পাড়ের সামনে।

এগিয়ে আসা পেট্রলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো ও। চার-

দিকে খোলা প্যান, তাই এক লাইনে আসছে ওরা। কিন্তু এই আকৃতি বদলে যাবে, খণ্ডযুদ্ধের সময় যেভাবে এগোয় যোদ্ধারা সেভাবে এগোবো—পাড়ের কাছাকাছি চলে এসে ছুটন্ত একটা তীর চিহ্নের আকৃতি নেবে ঝাঁকটা। ফলে অ্যামবুশের মধ্যে পড়লে পরস্পরকে কাভার দেয়ার সুযোগ থাকবে।

সে কথা মনে রেখে গ্রেনেডগুলোর জন্যে জায়গা বাছাই করলো রানা। প্রতিটি গ্রেনেড পাড়ের মাথায় ঝোপের ভেতর লুকানো থাকবে। বিস্ফোরণ খানিকটা উঁচুতে ঘটবে, ফলে ধাক্কাটা চারদিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত পৌঁছুবে।

প্রতিটি গ্রেনেড একটা করে ঝোপের সাথে তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো রানা, একটার কাছ থেকে আরেকটা বিশ গজ দূরে। প্রতিটি ফায়ারিং পিনের সাথে আলাদা একটা করে তার বাঁধলো, তারের অপর প্রান্তটা সাথে নিয়ে চলে এলো সোহানা যেখানে শুয়ে রয়েছে। এভাবে পাঁচ বারে পাঁচটা তার নিয়ে এসে রাকস্যাকের ফ্ল্যাপের সাথে আটকালো।

হাঁটুর ওপর খাড়া হয়ে কাজগুলো সারলো রানা। আকাশ খুব তাড়াতাড়ি ফর্সা হয়ে আসছে, প্রতি মিনিটে দ্রুত আরো কাছে চলে আসছে পেট্রলও। শেষ গ্রেনেডটার ফায়ারিং পিনে তার বাঁধলো ও, এবার সোহানার কাছে ফিরলো ক্রল করে। কাঁটাঝোপের আড়ালে যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে ফণার আকৃতি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে পাঁচটা তার। এ-কে ফরটিসেভেন চেক করলো ও, স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা রাখলো ডান হাতের কাছে।

এবার সোহানার ঘুম ভাঙাতে হয়। কপালে হাত দিয়ে দেখলো, জ্বর সেই আগের মতোই। অঘোরে ঘুমাচ্ছে, নড়াচড়া নেই। ঠোঁটে

আলতো করে চুমো খেলো রানা, সোহানার নাকের ডগা বার কয়েক কুঁচকে উঠলো, উম্‌ম্‌ করে মৃদু আওয়াজ করলো গলা দিয়ে। তার-পর চোখ মেললো সে। মুখের ওপর রানাকে ঝুঁকে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে চোখে ঝিক করে উঠলো ভালোবাসা। কিন্তু তারপরই ম্লান হয়ে গেল চেহারা। মনে পড়ে গেছে, বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা। উঠে বসার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তার বুকে একটা হাত রেখে বাধা দিলো রানা।

'ওরা এসে গেছে,' সোহানার কানে কানে বললো রানা। 'আমি বাধা দিতে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালো সোহানা। 'আমিও…'

'না। এই জ্বর নিয়ে তোমার আর নড়াচড়ার দরকার নেই। ভালডেজের পিস্তলটা আছে তো?'

আবার মাথা ঝাঁকালো সোহানা, জিনের ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে হাত চলে গেল।

'চালাতে পারবে বলে মনে হয়?'

'পারবো।'

'শুয়ে থাকবে, উঠবে না,' বললো রানা। 'যদি দেখো ওদের কেউ কাছে চলে এসেছে, শুধু তখনই গুলি করবে।' সোহানা আপত্তি করতে যাচ্ছে দেখে আবার বললো রানা, 'এটা আমার অর্ডার।'

ম্লান চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকলো সোহানা।

'একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে একটা বুলেট রেখে দিয়ো।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সোহানা।

'কথা দাও, ইতস্তত করবে না।'

'দিলাম,' ফিসফিস করে বললো সোহানা।

ধীরে ধীরে মাথা তুললো রানা। প্যানের কিনারা থেকে চারশো গজ দূরে রয়েছে পেট্রল। যেমন আন্দাজ করেছিল ও, লাইন ভেঙে এখুনি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ওরা, তীরচিহ্নের মাথার মতো আকৃতি নিচ্ছে দলটা।

লাইন ভাঙতে শুরু করায় ম্লান আলোয় মাথাগুলো আলাদাভাবে চেনা গেল। গোণা শেষ করে গম্ভীর হয়ে উঠলো রানা। পাঁচজন। ভালডেজের কাছ থেকে আরো বেশি কিছু আশা করেছিল ও। শোনাদের মাত্র তিনজনকে ঘায়েল করে যেতে পেরেছে সে। ওত্ পেতে অপেক্ষা করার সুবিধে থাকলেও, পাঁচজন ওর একার জন্যে খুব বেশি।

'মুখ নিচু করে রাখো,' ফিসফিস করে বললো ও। 'তা না হলে দূর থেকে আয়নার মতো চকচকে দেখাবে।' লক্ষ্মী মেয়ের মতো রানার হাতের ভাঁজে মুখ লুকালো সোহানা। নিজের মুখ ঢাকার জন্যে চোখ বাদ দিয়ে চারদিকে শার্টটা জড়িয়ে নিলো রানা। তীক্ষ্ণ-চোখে সারাক্ষণ ওদের এগিয়ে আসা দেখছে।

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। সারা রাত ধরে হাঁটার মধ্যে আছে, অথচ কেউ ওরা এতোটুকু ক্লান্ত নয়। স্বচ্ছন্দে ছুটে আসছে, পা ফেলার সাবলীল ছন্দে কোনো পতন নেই। তীরচিহ্নের মাথায় লম্বা একজন শোনা, যেন বাতাস কেটে এগিয়ে আসছে একটা বর্শা। তার এ-কে ফরটিসেভেন বাঁ কোমরের নিচের দিকে ধরে আছে, ভাবভঙ্গিতে হার না মানার একরোখা জেদ, সমগ্র অস্তিত্ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে রক্তে স্নান করার ব্যাকুলতা। ভোরের প্রথম ম্লান আলো একবার তার চোখে লাগলো, অমনি চোখ জোড়া যেন কালো মুখের মাঝখানে কামান থেকে বেরুনো আগুনের মতো জ্বলে

উঠলো। এই লোকই যে ওদের লিডার, আন্দাজ করতে পারলো রানা।

তার দু'পাশের লোক চারজন, গাঁট্টাগোঁট্টা, চওড়া আকৃতির ঘন কালো চেহারা থেকে অশুভ শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তবু লিডারের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে হলো ওদেরকে। লিডার হাত নেড়ে সংকেত দেয়ার সাথে সাথে যন্ত্রচালিত পুতুলের ভঙ্গিতে আদেশ পালন করছে ওরা।

এখন আর দলটা ছুটছে না। নিঃশব্দে হেঁটে আসছে প্যানের কিনারা লক্ষ্য করে। কিছুই দেখতে পায়নি, কিন্তু বিপদের গন্ধ ঠিকই পেয়ে গেছে।

তারগুলো বাঁ হাতের তালুতে পাশাপাশি সাজালো রানা, তারপর আঙুলের ফাঁক দিয়ে বের করে আনলো।

উঁচু পাড়টা পঞ্চাশ কদম দূরে থাকতে হাত নেড়ে সংকেত দিলো লিডার, গোটা দল সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল। লিডারের মাথা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘুরলো, পাড় আর তার সামনের কাঁটা-ঝোপগুলোর ওপর নজর বুলালো। পাঁচ কদম আগে বাড়লো সে, হালকা পায়ে, তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছু একটা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে সে। এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে সেকেণ্ডগুলো, নিজের অজান্তেই দম বন্ধ হয়ে গেল রানার।

আবার নড়লো লিডার। আগেও বাড়লো না, পিছুও হটলো না, শুধু পাক খাওয়ার ভঙ্গিতে একবার এদিক, আরেকবার ওদিক ঘুরালো শরীরটা—দু'পাশের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে তর্জনী তাক করলো, তারপর আঙুলগুলো ভাঁজ করে মুঠো পাকালো। সাথে সাথে বদলে গিয়ে তীরচিহ্নের মাথার বিপরীত আকৃতি পেলো দলটা। এই ভঙ্গি নগুনি

উপজাতির প্রিয় 'ষাঁড়ের শিং' নামে পরিচিত। দুর্ধর্ষ বীর চাকা (রাজাও বটেন) এই ভঙ্গির সাহায্য নিয়ে শত্রু সংহারে চমকপ্রদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। শিং দুটো এবার রানার পজিশন আবিষ্কারের জন্যে এগিয়ে এলো।

স্বস্তির পরশ অনুভব করলো রানা। গ্রেনেডগুলো দূরে দূরে বসিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে ও। দু'পাশের লোকগুলো প্রায় সরাসরি বাইরের দিকের গ্রেনেডগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে আসবে। তালু থেকে দুটো তার বেছে আলাদা করে নিলো ও, টেনে নিয়ে ঝুল কমালো। চোখে পলক নেই, ওদের এগিয়ে আসা দেখছে। দু'পাশের লোকদের মধ্যে লিডার লোকটা থাকলে ভালো হতো, কারণ সে-ই ভয়ের কারণ। কিন্তু লোকটা আর নড়েনি। বিস্ফোরণের রেঞ্জ থেকে অনেকটা পিছনে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখছে সে, হাত নেড়ে দলটাকে নির্দেশ দিচ্ছে।

ডান দিকের লোকটা পাড়ে পৌঁছুলো, সন্তর্পণে পা রাখলো মাথায়। কিন্তু বাঁ দিকের প্রথম লোকটা পাড় থেকে দশ ফিট দূরে এখনো।

'এক সাথে আয় শালারা,' বিড়বিড় করে বললো রানা, 'তোদের একসাথে পেতে হবে না আমার!'

পাড়ের ওপর উঠে আস্তে-ধীরে এগোলো ডান দিকের লোকটা, লুকানো গ্রেনেডের গায়ে ঘষা খেলো তার একটা পা। আরো ক'সেকেণ্ড অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। লোকটা যখন গ্রেনেড টপকাচ্ছিল তখন যদি তারটা টানতো ও, সাথে সাথে হাড়ের গুঁড়ো মেশানো মাংসের কিমা হয়ে যেতো সে।

বাঁ দিকের লোকটা পাড়ে পৌঁছুলো। তার কপাল আর মাথায়

একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো রয়েছে—নিশ্চয়ই ভালডেজের কৃতিত্ব। গ্রেনেডটা এই মুহূর্তে তার নাভির কাছাকাছি রয়েছে। 'গো টু হেল!' বিড়বিড় করে উঠেই হুটো তার ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো রানা।

টং! টং! একজোড়া ধাতব শব্দের সাথে গ্রেনেডের গা থেকে ফায়ারিং পিন খুলে গেল।

তিন সেকেণ্ড পর বিস্ফোরণ ঘটবে। ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক ওরা, পিন খোলার আওয়াজ চিনতে ভুল করলো না। সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। পাড়ে উঠে আসা লোকটা ডাইভ দিয়ে কোথায় পড়লো, তাকে আর দেখা গেল না। রানা অনুমান করলো, সরে গেলেও গ্রেনেডের এতো কাছাকাছি থাকবে যে বাঁচার কোনো আশা নেই তার। বাকি তিন জন, যারা পাড়ের কাছাকাছি পৌঁচেছে, মাটিতে পড়ে যেতে শুরু করে গুলি চালালো। মাটিতে পড়ে গড়ালো ওরা, সমানে গুলি চালালো, পাড়ের ওপর সমতল প্রান্তর ঘেঁষে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে গেল বুলেট।

শুধু বাঁ দিকের ট্রুপার, সম্ভবত আহত বলেই, ওই তিন সেকেণ্ড নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। গ্রেনেডটা ফাটলো ফ্ল্যাশ বালবের উজ্জ্বলতা নিয়ে। নাভির কাছে বিস্ফোরণ ঘটায় চোখের পলকে কোমর থেকে আলাদা হয়ে গেল শরীরটা, দুটো টুকরোই ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে পড়লো। ডান দিকে ফাটলো আরেকটা গ্রেনেড। ড্রামের ভোঁতা আওয়াজের মতো মাংসের ভেতর শ্র্যাপনেল ঢোকার শব্দ শুনলো রানা।

দু'জন গেল, ভাবলো রানা। বাকি দু'জনের খোঁজ না করে লিডারের দিকে রাইফেল তুললো ও। ঝোপের ভেতর থেকে গুলি

করলো; পাড়ের নিচে টার্গেট গড়াতে শুরু করেছে, লাগলো না। লিডারের কয়েক ইঞ্চি সামনে সাদা লবণ ছিটকে উঠলো। লক্ষ্য ব্যর্থ হলেও, টার্গেট বরাবর একই লাইনে পড়েছে গুলি। দ্বিতীয় গুলিটা পড়লো একটু বাঁ দিকে, কারণ আবার গড়াতে শুরু করেছে লিডার, সেই সাথে রাইফেল চালাচ্ছে।

হঠাৎ একজন ট্রুপার নিচে থেকে লাফ দিয়ে উঠেই পাড়ের দিকে ছুটে এলো। হাতের রাইফেল ঝট্ করে ঘুরিয়ে দেরি করলো না রানা, ট্রিগার টেনে ধরলো। এবার সবগুলো বুলেট লক্ষ্যভেদ করলো। শুরু হলো তলপেট থেকে, একের পর এক গর্ত করতে করতে ওপর দিকে উঠতে লাগলো বুলেটগুলো। ট্রুপারের হাত থেকে খসে পড়লো রাইফেল, আধ পাক ঘুরে গেল শরীরটা, তার-পর সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

দীর্ঘদেহী লিডার মৃত্যুভয় কাকে বলে জানে না। রক্ত হিম করা একটা হুংকার ছেড়ে দাঁড়ালো সে, চিৎকার করে নির্দেশ দিলো তারপর ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে এলো পাড়ের দিকে। তার সঙ্গী ত্রিশ ফিট পিছনে।

মুহূর্তের জন্যে দৃশ্যটা অবিশ্বাস করলো রানা। মৃত্যুর দিকে এ-ভাবে কেউ ছুটে আসতে পারে, কল্পনার বাইরে। রাইফেলটা তার দিকে ফিরিয়ে আনলো ও, সারা মনে উল্লাস। লক্ষ্য এখন ব্যর্থ হতে পারে না। ওর হাতে এ-কে ফরটিসেভেন একবার ঝাঁকি খেলো, তারপরই হ্যামার পড়লো খালি চেম্বারে। লিডার যেমন ছুটে আসছিল তেমনি আসতে থাকলো, অক্ষত অবস্থায়।

হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল, তবু রিলোড করতে মাইক্রো-সেকেণ্ড দেরি করে ফেললো রানা। আবার যখন ট্রিগার টানলো, লিডার

নিচু হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে। পাড়ের কিনারার ঠিক নিচেই গা ঢাকা দিয়েছে সে, গুলিগুলো কিনারার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে তিরস্কার করলো রানা, রাইফেল ঘোরালো শেষ ট্রুপারের দিকে। পাড় থেকে পাঁচ ফিট দূরে রয়েছে এখনো সে। বিস্ফোরিত হলো এক ঝাঁক বুলেট, কিন্তু লাগলো মাত্র একটা। হাঁ করে ছিলো ট্রুপার, ভেতরে ঢুকলো বুলেট, পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো মাথা। মাথার পিছনে গর্ত করে মগজ সহ বেরিয়ে গেল গুলি। মাটিতে পড়ার আগেই প্রাণবায়ু উধাও।

প্রথম দশ সেকেণ্ডে পাঁচজনের মধ্যে চারজনই নেই। এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করেনি রানা। কিন্তু শেষ লোকটা, ডেঞ্জার-ম্যান, পাড়ের নিচে লুকিয়ে রয়েছে। রানার মাজল্ ফ্ল্যাশ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে সে। জানে রানা কোথায়।

'শিটের নিচে থাকো।' সোহানাকে নির্দেশ দিয়ে বাকি তিনটে গ্রেনেডের তার ধরে টান দিলো রানা। প্রায় একসাথে বিস্ফোরিত হলো ওগুলো। ধুলো আর আগুনের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে ছুটলো রানা।

সামনে, আর ডান দিকে এগোলো ও। কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে শরীর, ত্রিশ পা ছুটে এলো, হাতে রিলোড করা এ-কে। তারপর ডাইভ দিলো ও, মাটিতে পড়ে গড়ালো। থেমে, মাটিতে পেট, অপেক্ষা করলো। পাড়ের নিচটা, লিডার যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, রাইফেলের মাজল কাভার দিচ্ছে সেদিকটা। তবে ডান আর বাঁ পাশেও ঘন ঘন চোখ বুলালো রানা।

আলো এখন আগের চেয়ে পরিষ্কার, শোনা লিডারের শরীরে

বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাড় টপকে উঠে এলো সে, সাদা সল্ট-প্যানের গায়ে পলকের জন্যে দেখা গেল তার কাঠামো, যেখানে তাকে ভুলেও আশা করেনি রানা। পাড়ের নিচে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকেনি লিডার, ক্রল করে এগিয়েছে, রানার কাছ থেকে অনেক দূরে বাঁ দিকে পাড়ের ওপর দেখা গেল তাকে।

এ-কে তুললো রানা, লক্ষ্যস্থির করলো, কিন্তু ট্রিগার টানলো না। গুলি লাগার সম্ভাবনা যেখানে কম, ট্রিগার টেনে ওর এই নতুন পজিশন ফাঁস করা বোকামি হবে। রাইফেলের মাজল অনুসরণ করলো লিডারকে, পঞ্চাশ কদম দূরে কাঁটাঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল লম্বা কাঠামো। বাধা দেয়ার জন্যে ক্রল করে এগোলো রানা, কেঁচোর মতো মন্থর বেগে, নিঃশব্দে। কোনো ধুলো উড়লো না, ঝোপের একটা ডাল নড়লো না। সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শুনছে ও, তাকিয়ে আছে। দীর্ঘ সময় বয়ে গেল, এক একটা সেকেণ্ড যেন এক একটা যুগ। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো রানা। জানে, সোহানাকে যেখানে রেখে এসেছে ও সেদিকেই যাচ্ছে লিডার।

হঠাৎ সোহানার আর্তনাদ শোনা গেল। রানার সমস্ত নার্ভের ডগায় যেন গরম ছুরির খোঁচা লাগলো। ঝোপের ভেতর থেকে ওরা দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়ালো—বুনো বিড়ালের মতো ধস্তাধস্তি করছে সোহানা, আর শোনা লিডার তার চুল ধরে আছে।

মাটিতে হাঁটু দিয়ে রয়েছে লিডার, সোহানা ধস্তাধস্তি করলেও তাকে অনায়াসে ধরে রাখতে পারলো সে। সোহানার সাথে সাথে লোকটা নিজেও ঘুরে যাচ্ছে, যেদিক থেকেই গুলি আসুক কাকে লাগবে কেউ বলতে পারে না।

রানা যেন উন্মাদ হয়ে গেল। সচেতন কোনো সিদ্ধান্ত নয়, নিজের

অজান্তেই দাঁড়ালো ও, ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটলো। মুগুরের মতো করে ধরে রাইফেলটা মাথার ওপর বন বন করে ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে সোহানাকে ছেড়ে দিলো লিডার, পিছু হটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সোহানা। ঝট্ করে ঘুরন্ত রাইফেলের নিচে মাথা নামিয়ে নিলো লিডার, হাঁটুর বদলে পায়ের ওপর দাঁড়াতে শুরু করে কাঁধ দিয়ে রানার পাঁজরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিলো সে। রানার হাত থেকে ছিটকে পড়লো রাইফেল, তাল সামলে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। হাতা-হাতি লড়াইয়ে রাইফেল কোনো কাজে আসবে না বুঝতে পেরে সেটা ছেড়ে দিলো লিডার, দু'হাতে ধরলো রানাকে।

স্পর্শ পাবার সাথে সাথে রানা বুঝলো, এ লোক তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। শুধু লম্বায় আর ওজনে বেশি নয়, কঠোর ট্রেনিং পাওয়া রেগুলার জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক, প্রায় প্রতিদিন ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করে নিজেকে একজন অজেয় গেরিলা হিসেবে তৈরি করেছে। রানার ঘাড়ের পিছনে লম্বা একটা হাত রেখে নিজের দিকে টানলো লিডার। বাধা না দিয়ে উল্টো কাজটা করলো রানা, যেদিকে টানা হলো সমস্ত শক্তি দিয়ে সেদিকেই এগোলো ও। রানার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে হতভম্ব হয়ে গেল লিডার, রানাকে বুকে নিয়ে দড়াম করে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো সে। পড়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে একটা পা চালালো রানা, কিন্তু লাথিটা তেমন জোরে লাগলো না।

মাটিতে পড়ে শরীরটা গড়িয়ে দিলো লিডার। একে অপরকে নিয়ে দু'জনেই গড়াচ্ছে, পালা করে একজনের বুকের ওপর চলে এলো আরেকজন, পরস্পরের মুখে গরম নিঃশ্বাস ছাড়লো। হলুদ

দাঁত বের করে রানার নাক কামড়ে ধরার চেষ্টা করলো লিডার। সময় মতো মাথাটা পিছিয়ে না নিলে ঠোঁট কিংবা নাক কিছু একটা হারাতে হতো রানাকে।

আশায় আশায় থাকলো রানা। এবং যা ভেবেছিল, আবার মুখ হা করে ওর নাকে কামড় দেয়ার চেষ্টা করলো লিডার। এবার রানা তৈরি ছিলো, মাথা পিছিয়ে না এনে কপালটা সবেগে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। মুখে রানার শক্ত কপালের বাড়ি খেয়ে মাড়ির গোড়া থেকে একটা দাঁত হারালো লিডার, তার মুখের ভেতরটা রক্তে ভরে গেল। মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে এসে আবার আঘাত করার জন্যে তৈরি হলো রানা, কিন্তু সেই মুহূর্তে রানার ওপর উঠে পড়লো লোকটা, এবং হঠাৎ করেই তার হাতে একটা ট্রেঞ্চ নাইফ ঝিক্ করে উঠতে দেখলো রানা। গড়ান দিয়ে রানার বুকে ওঠার সময় বেল্ট থেকে ছুরিটা বের করে নিয়েছে সে। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা গলার দিকে নেমে আসছে দেখে মরিয়া হয়ে হাত বাড়ালো রানা।

লোকটার কব্জি ধরে ফেললো, কিন্তু তাতে শুধু গলার ভেতর ঢুকতে বাধা পেলো ছুরিটা।

আবার গড়ান দিলো ওরা, আবার রানার বুকে উঠলো লিডার। ছুরিটা তার ডান হাতে, সর্বশক্তি দিয়ে রানার গলায় নামিয়ে আনছে। দুটো হাতই ব্যবহার করলো রানা, এক হাতে ধরলো লোকটার কব্জি, আরেক হাতে তার কনুইয়ের ভেতর দিকের ভাঁজ। কিন্তু গায়ের জোরে পারছে না, ছুরির ডগা ধীরে ধীরে নেমে আসছে চোখ বরাবর। পা ছুঁড়লো লোকটা, রানার দু'পায়ের মাঝখানে চেপে রাখলো একটা পা, যেন পেরেক দিয়ে গেথে আটকে রেখেছে রানাকে।

নিচে নামছে ছুরি, সেটার পিছনে লিডারের রুদ্ধশ্বাস চেহারা ফুলে উঠলো, তার ভাঙা দাঁত রক্তে লালচে হয়ে আছে, রক্ত গড়াচ্ছে চিবুক বেয়ে, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে রানার মুখে।

লোকটার চোখের দিকে তাকালো রানা। চোখের সাদা অংশটুকু সরু লাল শিরায় ভরে গেছে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। নেমে আসছে, নেমে আসছে ছুরি।

সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিলো রানা। মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো ছুরির ডগা, কিন্তু তারপরই আবার নিচে নামতে শুরু করে রানার গলার ওপর ঠেকলো, ঠিক যেখানে দুটো কলার বোন এক হয়েছে। চামড়া ফুটো করে একটু ঢুকলো ছুরির ডগা, সিরিঞ্জের সূচের মতো আটকে থাকলো। আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো রানার চোখ, পরিষ্কার অনুভব করলো, শেষ একটা চরম ধাক্কা দিয়ে ছুরিটা গলার গভীরে সেঁধিয়ে দেয়ার জন্যে সমস্ত শক্তি একত্রিত করছে লিডার। জানে, ধাক্কাটা ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা তার নেই।

অবাক কাণ্ড, এক নিমেষে লিডারের মাথা আকৃতি বদল করলো। ভূমিকম্পের সময় মাটি ফুঁড়ে যেমন গল গল করে কাদা আর পানি উথলে ওঠে তেমনি লিডারের নাক-মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো রক্ত আর মগজ। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের শব্দে রানার কানে তালা লেগে গেল। লিডার লোকটার সমস্ত শক্তি পানি হয়ে গেল, রানার ওপর থেকে নেতিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মতো লাফাতে লাগলো তার শরীরটা।

উঠে বসলো রানা। মাত্র কয়েক ফিট দূরে হাঁটুর ওপর খাড়া হয়ে রয়েছে সোহানা, দু'হাতে ধরা টোকারেভ পিস্তলটা রিবয়েলের ধাক্কা খেয়ে আকাশের দিকে মুখ করে আছে। নিশ্চই লোকটার খুলিতে

নল ঠেকিয়ে গুলি করেছিলো সে।

'তোমার গলা…!'

শার্টের কলার দিয়ে গলার রক্ত মুছলো রানা, এতোক্ষণে ক্ষতটার আকার পরিষ্কার বোঝা গেল—ক্ষুদে একটা বিন্দু। ছুরির ডগা চামড়া ভেদ করতে পারলেও, গভীরে ঢুকতে পারেনি।

পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে মাটির ওপর বসলো সোহানা, দু'হাত দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলো। লিডারের লাশের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা, সোহানার সামনে এসে বসলো। রানাকে পাশে পেয়ে তার গায়ে ঢলে পড়লো সোহানা। 'এখান থেকে নিয়ে চলো আমাকে,' ফিস ফিস করে বললো সে। 'রক্তের গন্ধে আমার বমি পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো।' সোহানাকে ধরে দাঁড় করলো রানা। সরে গিয়ে তখুনি ফিরে এলো আবার, সোহানার হাতে পানির ক্যানটিন আর দুটো ট্যাবলট ধরিয়ে দিলো।

ব্যস্ত হাতে গ্রাউণ্ডশিটটা গুটিয়ে নিলো রানা। ইতিমধ্যে আবার বসে পড়েছে সোহানা।

রাকস্যাক দুটো কাঁধে নিয়ে ফিরে এলো রানা। রাইফেলটাও নিয়েছে। 'ওদিকে যাবো আমরা,' বলে সোহানার একটা হাত ধরলো। পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরলো ওরা।

প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটার পর পানি খাবার জন্যে প্রথমবার থামলো। হঠাৎ একটা ভুল ধরতে পেরে নিজের ওপর রেগে গেল রানা। অতি ব্যস্ততার কারণে মৃত শোনার পানির বোতলটা নিয়ে আসার কথা মনে পড়েনি।

ফেলে আসা পথের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকালো ও। এখন যদি

সোহানাকে রেখে একা ফিরে যায় ও, যেতে আসতে চার ঘণ্টা লেগে যাবে। এদিকে, থার্ড ব্রিগেড পেট্রল নিশ্চই কাছাকাছি কোথাও চলে এসেছে। পানির ক্যানটিনটা হাতে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করলো ও। চার ভাগের তিন ভাগই খালি। রাত আর ঠাণ্ডার অপেক্ষায় ওরা যদি শুয়ে থাকে তাহলে আজকের দিনটা এই পানিতে চলে যাবে। কিন্তু হাঁটার মধ্যে থাকলে কুলাবে না।

কিন্তু থেমে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, জানে বাঁচতে হলে যতোটা পারা যায় দূরে সরে যেতে হবে ওদেরকে।

অথচ সোহানা অসুস্থ, তার ওপর পানির অভাব...।

স্পটার প্লেনটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলো ওকে। আওয়াজটা এলো উত্তর দিক থেকে। বোঝা গেল, এক ইঞ্জিনের কোনো প্লেন। চোখে রাগ নিয়ে ম্লান মরু আকাশের দিকে তাকালো রানা, সিংহের নাগালের মধ্যে পড়ে খরগোস যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনি অসহায় বোধ করলো।

'স্পটার প্লেন,' বিড়বিড় করে বললো সোহানা।

মাথা ঝাঁকালো রানা। আওয়াজটা কমছে, একটু পর আবার বাড়ছে, এই রকম কয়েকবার হলো। 'সার্চ করতে করতে আসছে ওরা।' কথা শেষ হতেই ওটাকে দেখতে পেলো সে। যতোটা কাছে মনে করেছিল, তারচেয়ে বেশি কাছে। সোহানার কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলো ও, গ্রাউণ্ডশিটটা দিয়ে ঢেকে দিলো তাকে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। ছোটো একটা এক ইঞ্জিনের মনোপ্লেন, দ্রুত এগিয়ে আসছে, সোজা ওদেরই দিকে। তাড়াতাড়ি সোহানার পাশে বসে গ্রাউণ্ডশিটের ভেতর ক্রল করে ঢুকে পড়লো ও।

ইঞ্জিনের আওয়াজ এবার গর্জনের মতো শোনালো। ওদেরকে

দেখে ফেলেছে পাইলট ? গ্রাউণ্ডশিটের একটা কোণা একটু উঁচু করে উঁকি দিয়ে ওপরে তাকালো রানা। দেখাদেখি সোহানাও।

'পাইপার ল্যান্স,' মৃদু গলায় বললো সোহানা।

প্লেনের পেটে জিম্বাবুই এয়ারফোর্সের প্রতীক চিহ্ন আঁকা রয়েছে। বেখাপ্পা, কিন্তু সচরাচর যা দেখা যায়, পাইলট একজন শ্বেতাঙ্গ। তবে ডান দিকের সিটে একজন কালো লোক বসে আছে, তার লালচে বেরেট আর রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ পরিষ্কার দেখা গেল। সোজা ওদের দিকে ছুটে এলো পাইপার, যেন ওদের দিকে তাক করে একটা বর্শা ছোঁড়া হয়েছে। কালো অফিসার তার মুখের সামনে একটা রেডিও মাইক্রোফোন ধরে আছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা, তারপর বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে ফিরে এলো, ওদের থেকে বেশ কিছুটা আগে খুঁজছে। আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, ওদের চারপাশে আবার জাঁকিয়ে বসলো মরু নিস্তব্ধতা। যাক, গ্রাউণ্ডশিটটা বাঁচিয়েছে এ যাত্রা।

সোহানাকে ধরে দাঁড় করালো রানা। 'হাঁটতে পারবে ?'

ঘামে ভেজা কপাল থেকে চুল সরাতে সরাতে মাথা ঝাঁকালো সোহানা। তার ঠোঁট ফাটতে শুরু করেছে, নিচের ঠোঁটের বড় ফাটলটার মুখে ক্ষুদে চুনি-র মতো বসে আছে এক ফোঁটা রক্ত।

'আমরা নিশ্চই বতসোয়ানার অনেক ভেতরে চলে এসেছি। কাছেই কোথাও বর্ডার রোড। বতসোয়ানা পুলিশ পেট্রলের দেখা পেলে...'

খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে এক জোড়া চাকার দাগ এগিয়ে গেছে, এটাই বর্ডার রোড। সামনে নরম সল্ট প্যান বা স্প্রীং হেয়ারের কলোনি থাকলে সেটাকে ঘুরে এগিয়েছে রাস্তাটা। পোচার-

দের ধরার জন্যে, এবং বিদেশী সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যে এই রাস্তায় নিয়মিত টহল দেয় বতসোয়ানা পুলিশ।

দুপুরের খানিক পর রাস্তাটা পেরোলো ওরা। ইতিমধ্যে রাইফেল আর অ্যামুনিশন ফেলে দিয়েছে রানা, একান্ত দরকারী কয়েকটা জিনিস ছাড়া রাকস্যাকেও কিছু রাখেনি। পাণ্ডুলিপিটাও মাটিতে পুঁতে রাখার কথা ভেবেছিল ও, পরে এক সময় উদ্ধার করা যেতে পারে, কিন্তু বিড়বিড় করে তাকে নিষেধ করেছে সোহানা।

পানির ক্যানটিন খালি হয়ে গেছে। শেষবার ওরা পানি খেয়েছে দুপুরের আগে। কিছুক্ষণ ব্যাপারটা চেপে রেখেছিল রানা, কিন্তু কাজটা উচিত হচ্ছে না বুঝতে পেরে দুপুরবেলা সোহানাকে জানতে দিয়েছে যে ক্যানটিনে পানি নেই। এরপর হাঁটার গতি আরো কমে আসে সোহানার, ঘণ্টায় এক মাইলে দাঁড়ায়। রানা তখন আর ঘামছে না। অনুভব করছিল, মুখের ভেতর ফুলে উঠছে শুকনো জিভ, গলার ফুটোটা বুজে আসছে—প্রচণ্ড তাপ তার শরীরের জলীয় পদার্থ শুষে নিচ্ছে সব।

রাস্তা পেরোবার সময় তাপ-মরীচিকার ভেতর দিয়ে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে ছিলো রানা, ওর সমগ্র মনোযোগ ছিলো একটা পা তুলে আরেকটার সামনে ফেলার ওপর। রাস্তাটা না দেখেই পেরিয়ে এলো ওরা, আবার সেই মরুভূমির ওপর দিয়েই হেঁটে চললো। উদ্ধার পাবার সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে এর আগেও বহু লোক মারা গেছে মরুভূমিতে—তাপদগ্ধ, তৃষ্ণায় কাতর, কতোক্ষণ বাঁচে মানুষ। টলতে টলতে আরো দু'ঘণ্টা ধরে হাঁটলো ওরা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো রানা।

'এতোক্ষণে রাস্তায় পড়া উচিত ছিলো আমাদের,' বিড়বিড়

করলো ও, কম্পাস হেডিং চেক করলো। 'কম্পাস নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিকে উত্তর হতে পারে না।' সন্দেহ আর সংশয়ে ভুগছে ও। 'এ আর কোনো কাজে আসবে না, ফেলে দেয়াই ভালো। অনেক দক্ষিণে সরে এসেছি আমরা।'

আবার হাঁটা ধরলো ওরা, অর্থাৎ সীমাহীন প্রান্তরের মাঝখানে লক্ষ্যহীন প্রথম বৃত্ত রচনার সূচনা ঘটলো। একেই বলে দিকভ্রান্ত হওয়া। গোটা মরুভূমি কবরস্থান হয়ে উঠেছে ওদের জন্যে, যেদিকেই যাক মরুভূমির শেষ একটা প্রান্তে পৌঁছুবার শক্তি নেই শরীরে, এক সময় ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে। শক্তি থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো এক দিকে বেশি দূর যেতে পারবে না ওরা, দেড় দু'মাইল একটা জায়গাকে ঘিরে বার বার শুধু চক্কর দেয়াই সার হবে।

সূর্য অস্ত যাবার এক ঘণ্টা আগে খয়েরী রঙের মাটিতে বেরিয়ে আসা শুকনো কিছু শিকড়ে হোঁচট খেলো রানা। চোখ পিট পিট করে তাকালো, জিনিসটা চিনতে পারলো না প্রথমে। মনে হলো, বাচ্চাদের খেলনা, একটা বল। আকারে আপেলের চেয়ে একটু বড়, সবুজ। হঠাৎ লোভে চকচক করে উঠলো রানার চোখ। চিনতে পেরেছে, ওটা একটা ফল।

'রস।' সোহানাকে বললো ও, বোকার মতো হাসতে গিয়ে ব্যথা পেলো ঠোঁটে, ঠোঁটের ফাটলগুলো দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। তবু ঠোঁট জোড়া নড়তে থাকলো, নিজের সাথে নিঃশব্দে কথা বলছে ও। ছুরি দিয়ে ফলটা মাঝখান থেকে দু'ভাগ করলো রানা। ভেতরের শাঁস রসালো কিন্তু আগুনের মতো গরম।

'মরু-তরমুজ,' সোহানা ওর পাশে ধপ করে বসে পড়তে বললো রানা। সোহানার চোখ দুটো নিষ্প্রভ, ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে রানার দিকে।

তরমুজের অর্ধেকটা সোহানার মুখের সামনে ধরলো রানা, গায়ে চাপ দিতে ফোঁটায় ফোঁটায় স্বচ্ছ রস পড়লো সোহানার জিভে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে সোহানার, যেন গলার বুজে আসা শুকনো ফুটো দিয়ে রসটুকু নামতে চাইছে না। একটু পরেই অবশ্য মুখের ভেতরটা ভিজে গেল, তখন আর তেমন অসুবিধে হলো না। আরামে চোখ বুজলো সে।

তরমুজের বাকি অর্ধেকটা নিংড়ে কাপের তিন চতুর্থাংশ ভরলো রানা, খাইয়ে দিলো সোহানাকে। খাওয়াবার সময় রসের গন্ধে দিশেহারা বোধ করলো ও, তৃষ্ণায় ফেটে যেতে চাইলো তপ্ত বুক। ওর চোখের সামনে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো সোহানা। কাপের শেষ ফোঁটাটুকু মুখের ভেতর নিয়ে হুঁশ হলো সোহানার, বুঝতে পারলো কী করেছে রানা।

'তুমি?' মৃদু কণ্ঠস্বর, কর্কশ।

রসহীন ছিবড়েটুকু মুখে পুরে চুষতে শুরু করলো রানা।

'দুঃখিত।' ব্যাপারটা আগে খেয়াল না করায় সোহানার মনে একটা অপরাধবোধ জাগলো, কিন্তু এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রানা।

'সামনে রাত। ঠাণ্ডা।' সোহানাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো রানা, টলতে টলতে এগোলো ওরা। থেমে পড়া মানে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এগোতে হবে ওদের।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রানা। অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, এই মাত্র সকাল হলো।

'নষ্ট।' হাতের কম্পাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও। 'ভুল পথে

নিয়ে এসেছে।' খুব জোরে ছুঁড়লেও, পায়ের কাছ থেকে সামান্য দূরে পড়লো সেটা। ঘুরলো ও, ফেলে আসা পথ ধরে ফিরে চললো আবার।

ছায়া আর গাঢ় রঙের আকৃতিতে ভরে উঠলো রানার দৃষ্টিপথ। কোনো কোনোটার মুখ নেই, দেখে ভয় পেলো ও; নিঃশব্দে চিৎকার করে তাড়াতে চাইলো সামনে থেকে। দু'একজনকে চিনতে পারলো। ক্যাপটেন ভালডেজকে দেখলো, হাসছে। এক মুহূর্ত পর ক্যাপটেনের ঘাড়ের ওপর আরেকটা আকৃতি দেখলো। ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়লো ভালডেজ, ছায়াসহ মিলিয়ে গেল মাটির নিচে, তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল রট উমাঙ্গো, থার্ড ব্রিগেডের কমাণ্ডার। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো উমাঙ্গো, কানে হাত চাপা দিতে ইচ্ছে করলো রানার। তারপর দেখলো একটা হায়েনার পিঠে চড়ে ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে শয়তান লোকটা। হায়েনাটা ভেঙাচ্ছে ওকে। হামলাটা এলো সোহানার ওপর। পিঠে উমাঙ্গোকে নিয়ে সোহানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হায়েনা। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সোহানা। তাকে তোলার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, কিন্তু তারপর আর উঠতে পারলো না, ঢলে পড়লো সোহানার পাশে। তাকে রক্ষার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো ও। জড়াজড়ি করে পড়ে থাকলো ওরা। 'হ্যাঁ, এভাবে,' বিড়বিড় করে সোহানাকে বলতে শুনলো ও, অর্থাৎ সোহানা যেন এভাবে মরতে চাইছে। নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা। ওকে মাথা নাড়তে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো সোহানা।

রাত নামলো।

ঘুম ভাঙার পর দেখলো, সকাল হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়েও

ফিরিয়ে নিলো হাতটা, সোহানার ঘুম ভাঙাতে মন চাইলো না। হাঁ করে ঘুমাচ্ছে সোহানা, নিঃশ্বাস পতনের ভারি শব্দ।

একটা সোলার স্টিল তৈরির জন্যে মাটি খুঁড়লো রানা। মাটি নরম আর ঝুরঝুরে হলেও, ঢিমে তালে এগোলো কাজটা। দাঁড়াবার শক্তি নেই, হামাগুড়ি দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে এক মুঠো মরু ঝোপের ডাল আর শিকড় যোগাড় করলো। ছুরি দিয়ে ওগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরো করার সময় মনে হলো, একেবারে শুকনো কাঠ, ভিজে কোনো ভাব পর্যন্ত নেই। সন্থ তৈরি গর্তের ভেতর রাখলো সব।

অ্যালুমিনিয়ামের খালি ক্যানটিনের মাথাটা আলাদা করলো রানা, গর্তের মাঝখানে বসালো। এই ছোটোখাটো কাজগুলো সারতেও গভীর মনোযোগের দরকার হলো। গর্তের ওপর প্লাস্টিক শিটটা বিছিয়ে দিলো ও, শিটের কিনারা বরাবর বালি চাপা দিলো। সবশেষে শিটের মাঝখানে হাতঘড়িটা সন্তর্পণে রাখলো, সরাসরি অ্যালুমিনিয়াম কাপের ওপরে।

হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার কাছে ফিরে এলো রানা. এমনভাবে বসলো যাতে ওর ছায়া পড়ে তার মুখে। 'চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে,' তাকে বললো ও। 'খানিক পরই রাস্তাটা পেয়ে যাবো আমরা। কাছে পিঠে কোথাও আছে···।'

বুঝলো না, ওর গলায় কোনো আওয়াজ নেই। কিংবা থাকলেও, শুনতে পেতো না সোহানা।

সূর্য যতো ওপরে উঠলো, ততোই সোহানার ওপর ঝুঁকতে হলো রানাকে। ত্বপুরের খানিক পর ক্রল করে স্টিল-এর কাছে ফিরে এলো। প্লাস্টিক শিটে একনাগাড়ে কড়া রোদ লাগায় বদ্ধ গর্তের

ভেতর তাপমাত্রা প্রায় বয়লিং পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। টুকরো শিকড় আর ডালপালা থেকে ওঠা বাষ্প ঘন হয়েছে শিটের উল্টো পিঠে, তারপর শিটের ঢালু গা বেয়ে ঘড়ির দিকে গড়িয়েছে, সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়েছে অ্যালুমিনিয়াম কাপে।

পোয়াটাক পানি। কাপটা দু'হাতে নিয়ে এগোলো রানা, হাত দুটো এমন কাঁপতে শুরু করলো, এই পড়ে এই পড়ে অবস্থা। কাপটা মুখের সামনে তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিলো, মুখের ভেতর রেখে দিলো পানিটুকু। গরম, তবে মধুর মতো স্বাদ। ঢোক গেলার ঝোঁকটা দমন করার জন্যে সবটুকু ইচ্ছাশক্তি খাটাতে হলো ওকে।

সোহানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো ও, ঝুঁকে সোহানার কালচে হয়ে ওঠা রক্তাক্ত ঠোঁটে মুখ রাখলো। একটু একটু করে পানি ছাড়লো ঠোঁটের ফাঁকে।

'খাও, সোহানা, ঢোক গেলো।' বিড়বিড় করে বললো রানা। চোখ বুজে পড়ে আছে সোহানা, তাকে ঢোক গিলতে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করলো ও।

এভাবে বারবার নিজের মুখ থেকে সোহানার ঠোঁটের ফাঁকে পানি ঢাললো রানা, শুধু শেষ এক চুমুক রাখলো নিজের জন্যে। সেটুকু ধীরে ধীরে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো ও। কড়া মদ খেলে যেমন হয়, তেমনি ঝিম ঝিম করে উঠলো মাথাটা। বোকার মতো একবার হেসে উঠলো ও। ওর ঠোঁট জোড়া রাবারের মতো হয়ে গেছে, রক্ত শুকিয়ে গিয়ে কালচে দেখালো। নিজের অজান্তে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়েছে, শুকনো দাগ লেগে রয়েছে দু'গালে। লাল চোখ জোড়ার কোণে শুকিয়ে গেছে পিচুটি।

আবার সোলার স্টিল তৈরি করে ফিরে এলো রানা, শুয়ে পড়লো

সোহানার পাশে। নিজের শার্ট ছিঁড়ে সোহানার মুখ ঢেকে দিয়েছে, ফিসফিস করে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো তাকে, 'ভরসা রাখো··· সাহায্য খুঁজে নেবো···একটু পরই। লক্ষী সোনা, চিন্তা করো না··· ।'

কিন্তু মনে মনে জানে, এটাই ওদের শেষ দিন। আরো একটা দিন সোহানাকে ও বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। কাল ওরা মারা যাবে। সকাল বেলা হয় সূর্য, না হয় থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা ওদের মারতে আসবে। এ পৃথিবীতে আজই ওদের শেষ দিন।

সন্ধ্যের আগে আরো আধ কাপ পানি পাওয়া গেল স্টিল থেকে। সেটুকু ভাগাভাগি করে খাওয়ার পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ওরা।

একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। মনে হলো, ঝোপের গায়ে বাতাস লাগার আওয়াজ। অনেক কষ্টে মাথা তুললো ও, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলো। এখনো মতিভ্রমে ভুগছে কিনা বুঝতে পারলো না। আসলেই কি কোনো শব্দ হচ্ছে, নাকি স্রেফ ওর কল্পনা ? মৃদু একটা শব্দ, কমছে আর বাড়ছে, আসছে যেন বহুদূর থেকে। ভোর হয়ে এসেছে, আন্দাজ করলো ও, কালো মখমল-মসৃণ আকাশের পুব প্রান্তে ফ্যাকাসে একটা ভাব।

তারপর হঠাৎ করেই আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা গেল, সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা। একটা ফোর-সিলিণ্ডার ল্যাণ্ড-রোভার ইঞ্জিন। থার্ড ব্রিগেড হাল ছাড়েনি। নাকে রক্তের গন্ধ নিয়ে এখনো খুঁজছে ওদেরকে।

একজোড়া হেডলাইট দেখতে পেলো রানা, মরু প্রান্তরের দূর

প্রান্তে। গাড়ির সাথে সাথে আলো জোড়াও দুলছে, উঁচু-নিচু হচ্ছে। আশপাশের মাটিতে হাত বুলালো ও, এ-কে রাইফেলটা খুঁজলো। না পেয়ে ভাবলো, আচ্ছা, ওটাও তাহলে উমাঙ্গো শালা নিয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমিও তোমাকে দেখে নেবো।

এগিয়ে আসছে জোড়া আলো। নিজেকে অসহায় মনে হলেও, শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। চোখে আলো লাগায় দৃষ্টিপথে বিচিত্র সব হলুদ আকৃতি কিলবিল করতে লাগলো। আচমকা উপলব্ধি করলো, ওর সামনের আকৃতিটা আসলে একজন বুশম্যানের। বুশম্যানরা হারিয়ে যাওয়া বা পলাতক মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। থার্ড ব্রিগেড একজন বুশম্যানের সাহায্য নিয়ে ওদেরকে খুঁজে পেয়েছে। ল্যাণ্ড রোভারের আগে আগে ছুটে আসছে সে, হেডলাইটের আলোয় ওদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। এই বুশম্যানরা কোনো বিরতি ছাড়া ছত্রিশ ঘণ্টা দৌড়াতে পারে।

হেডলাইটের আলো সরাসরি ওদের গায়ে পড়লো। একটা হাত তুলে চোখ আড়াল করলো রানা। তৈরি হয়ে আছে ও। অপর হাতটা পিছনে লুকিয়ে রেখেছে। উমাঙ্গোকে সামনে পেতে চায়। সোজা তার পেটে ঢুকিয়ে দেবে ছুরিটা।

সোহানাকে আশ্বাস দিলো রানা, 'একজনকে মেরে মরবো। পিস্তলটা ?... ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান, দেরি করে ফেলো না যেন।' বললো বটে, তবে কোনো আওয়াজ বেরুলো না গলা থেকে।

অর্ধ উলঙ্গ বুশম্যান ওদের সামনে দাঁড়িয়ে পাখির মতো মিষ্টি স্বরে কিচিরমিচির করলো। চোখ ধাঁধানো আলোর পিছনে ল্যাণ্ড-রোভারের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। একজন লোক এগিয়ে

এলো ওদের দিকে।

লোকটার পরনে ইউনিফর্ম। তাকে যেন চিনতে পারলো রানা। জেনারেল উমাঙ্গো।

আলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এলো লোকটা, যেখানে মাটির ওপর নির্জীব পড়ে আছে রানা আর সোহানা। বিড়বিড় করলো রানা, ওর সামনে উমাঙ্গোকে পাঠিয়েছে বলে ধন্যবাদ দিলো ভাগ্যকে। 'পেটে নয়, গলায়,' মনে মনে বললো ও, 'আমার ওপর ঝুঁকলেই ওর গলায় ছুরিটা ঢুকিয়ে দেবো।'

'বেআইনীভাবে রিপাবলিক অভ বতসোয়ানায় অনুপ্রবেশের জন্যে আপনাদের গ্রেফতার করা হলো, স্যার।'

শালা অভিনয় করছে, ভাবলো রানা। কিন্তু আমাকে বোকা বানানো এতো সহজ নয়। আরো একটু নিচু হোক, তাহলে মজাটা টের পাবে। দেখলো, জেনারেল উমাঙ্গো বতসোয়ানা সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে রয়েছে।

'আপনারা ভাগ্যবান,' বললো লোকটা। মাটিতে একটা হাঁটু রাখলো সে। 'যেখানে আপনারা রাস্তা পেরিয়েছেন, ভাগ্যগুণে জায়গাটা আমাদের চোখে পড়েছে।' রানার মুখের সামনে পানির একটা বোতল ধরলো সে। 'কাল তিনটে থেকে আপনাদের আমরা অনুসরণ করছি।'

মিষ্টি পানিতে রানার মুখের ভেতরটা ভরে গেল, চিবুক থেকে গড়িয়ে পড়লো কয়েকটা ঠাণ্ডা ধারা। ছুরিটা ছেড়ে দিয়ে বোতলটা দু'হাতে ধরলো ও, ছিনিয়ে নিলো অফিসারের হাত থেকে।

পানিতে ভরে উঠলো রানার চোখ, সোহানাকে ভালো করে দেখতে পেলো না। পানির বোতলটা তার মুখে ধরতে গিয়ে বারবার

ব্যর্থ হলো। ওকে সাহায্য করলো অফিসার।

'কি বললেন?' অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। দেখলো, লোকটা জেনারেল উমাঙ্গো নয়। 'কে আপনি?'

'প্লিজ, কথা বলবেন না।' অনুরোধ করলো অফিসার। 'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের ফ্রান্সিসটাউন হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। মরুভূমিতে একবার হারিয়ে গেলে খুব কম লোকই বাঁচে, আপনারা ভাগ্যবান!'

'কে আপনি?'

'বতসোয়ানা পুলিশ, বর্ডার পেট্রল। সার্জেন্ট রাম্বা অ্যাট ইওর সার্ভিস, স্যার।'

তিন

লোকটার সব কিছুই মিথ্যে আর উল্টো। দেখে মনে হবে ষাট বছরের বুড়ো; ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, আসলে বয়স তার এখনো চল্লিশ পেরোয়নি। পশ্চিম ইউরোপের যে পাসপোর্টটা নিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকেছে সে, সেটা জাল। তার কাগজ-পত্র থেকে জানা যায় সে একজন টিম্বার মার্চেন্ট, অথচ আসলে সে একজন এসপিওনাজ এজেন্ট। ইংরেজী, জার্মান, রুশ সহ পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে

লোকটা। জিম্বাবুইয়ে তার আসল পরিচয় একমাত্র জেনারেল রুট উমাঙ্গো ছাড়া আর কেউ জানে না।

বেশ অনেকদিন ধরে জিম্বাবুইয়ে নিজেদের পছন্দসই একটা পুতুল সরকার বসানোর স্বপ্ন দেখে আসছে তার দেশের কর্মকর্তারা। সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় যারা ছিলো, তাদের কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি ওরা। তারপর, বছর দেড়েক আগে, তালিকার শীর্ষে উঠে আসে জেনারেল উমাঙ্গো। তার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে ওরা জানতে পারে, জেনারেল নিজেই ওদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ খুঁজছিল।

এতোদিন তৃতীয় একটা পক্ষের মাধ্যমে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। জিম্বাবুইয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির যোগ্যতা জেনারেল উমাঙ্গোর আছে, এটা প্রমাণিত হবার পর এখন সরাসরি আলোচনা হওয়া দরকার। উমাঙ্গোর আমন্ত্রণে সেজন্যেই জিম্বাবুইয়ে এসেছে সে। উদ্দেশ্য, জেনারেল উমাঙ্গো সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন, এবং বিভিন্ন সমস্যা আর শর্ত নিয়ে তার সাথে আলোচনা করা।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডের চাপে পড়ে অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্র বিগ-গেম হান্টিং নিষিদ্ধ করলেও, জিম্বাবুই এখনো প্রফেশন্যাল শিকারীদের লাইসেন্স দেয়, শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত বনভূমিতে শিকার করতে পারে তারা। এতে করে যে বিদেশী মুদ্রা আয় হয়, মুমূর্ষু অর্থনীতিতে রক্ত সঞ্চালনের জন্যে তার কিছু অবদান থাকে। জেনারেল উমাঙ্গো ধনী এবং উচ্চাভিলাষী লোক, হোস্ট হিসেবে লাইসেন্স ফি সহ যাবতীয় খরচ সে-ই বহন করছে। প্রতিটি শিকারের জন্যে এক হাজার ডলার করে ফি দিতে হবে তাকে।

এই মুহূর্তে বনের ভেতর, ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে

আছে ওরা। চেহারায় গর্ব নিয়ে জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে সরাসরি তাকালো, শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রতিনিধি।

ওপর-নিচে মাথা দুলিয়ে প্রাপ্য প্রশংসাটুকু উগরে দিলো জেনারেল উমাঙ্গো, 'ওয়াণ্ডারফুল, মিঃ এক্স। আমি কল্পনাও করিনি আপনার হাত এতো ভালো!'

মিঃ এক্স পুরুষ মোষটাকে ইচ্ছে করেই মরণ আঘাত হানেনি, শুধু আহত করেছে। পিস্তল, রাইফেল, আর শটগান, তিনটেতেই সমান দক্ষ সে। ত্রিশ গজ রেঞ্জের মধ্যে ছিলো ওটা, চোখে বললে চোখেও লাগাতে পারতো গুলি। কিন্তু তা না করে, মোষের পেটে মেরেছে, ফুসফুসের এক হাত পিছনে, যাতে দম ফুরিয়ে গিয়ে ধরাশায়ী না হয়।

প্রকৃতির অদ্ভুত এক সৃষ্টি এই মোষটা, নকশা কাটা কালো শিং জোড়া খড়গের মতো উঁচু হয়ে আছে মাথার ওপর, প্রতিটি আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পঞ্চাশ ইঞ্চি বা তারও বেশি লম্বা। পঞ্চাশ ইঞ্চি শিংওয়ালা মরদ শিকার করার সৌভাগ্য সবার হয় না, মিঃ এক্সের ব্যক্তিগত সংগ্রহে দুর্লভ ট্রফি হিসেবে থাকবে ওগুলো। সে-ই প্রথম ওটার রক্ত ঝরিয়েছে, কাজেই এরপর যার হাতেই মারা পড়ুক, সম্মানটুকু তারই প্রাপ্য। একগাল হাসি নিয়ে জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে তাকিয়ে আছে সে, হিপ-ফ্লাস্ক থেকে সিলভার কাপে হুইস্কি ঢাললো।

মিঃ এক্সের বাড়ানো হাত থেকে হুইস্কির কাপটা নিলো উমাঙ্গো, এক চুমুকে তরল অনল গলা দিয়ে চালান করে দিলো পেটে, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপলো না।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো মিঃ এক্স, এটাই তার প্রশংসা করার ভঙ্গি। 'এবার দেখা যাক,' বললো সে, 'শিকারেও আপনি সমান

দক্ষ কিনা।'

এই শিকার অভিযানে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে একজন শ্বেতাঙ্গ, জিম্বাবুইয়েই তার জন্ম। খাকি শর্টস্ আর চওড়া কার্ণিশ-ওয়ালা হ্যাট পরে আছে সে, বয়স ত্রিশের কোঠা ছাড়ায়নি। তার বুকে সার সার লুপ, সেগুলোয় হেভী-ক্যালিবার বুলেট শোভা পাচ্ছে। বিরস বদনে ওদের লক্ষ্য করছে সে। বলা যায় না, আহত মোষটাকে খুঁজে বের করে মারার দায়িত্ব তার কাঁধেই হয়তো চাপানো হবে। লোকটার ভালো করেই জানা আছে, এরচেয়ে সাক্ষাৎ যমের সামনে দাঁড়ানোও অনেক সহজ।

'জেনারেল উমাঙ্গোকে পয়েন্ট ফোর-ফাইভ-এইট দিন,' বললো মিঃ এক্স। দু'নম্বর গান-বিয়ারারকে কাছে ডাকলো সরকারী হান্টার, গান বিয়ারার দ্বিতীয় রাইফেলটা নিয়ে এলো।

মিঃ এক্স ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করবেন।'

'স্যার!' দ্রুত প্রতিবাদ জানালো হান্টার। 'আপনাদের আমি একা যেতে দিতে পারি না। এটা নিয়ম নয়, কেউ জানলে আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে···।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' ভারি গলায় ধমক দিলো মিঃ এক্স। 'আমি যা বলছি তাই হবে।'

এটা যেন শালার বাপের সম্পত্তি!—ভাবলো হান্টার। মোষের খোঁজে তাকে যেতে হবে না বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে বটে, কিন্তু লাইসেন্স হারাবার ভয়টাও মন থেকে তাড়াতে পারছে না। জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে তাকালো সে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো। স্বস্তিবোধ করলো হান্টার। জেনারেলের যখন আপত্তি

নেই, সে কি করবে। সবিনয়ে এক পা পিছিয়ে এলো সে।

গান-বিয়ারারের কাছ থেকে পয়েন্ট ফোর-ফাইভ-এইট টা নিয়ে মিঃ এক্স, দেখলো নরম ডগার বুলেট লোড করা রয়েছে। ভারি রাইফেলটা উমাঙ্গোর দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

রাইফেলটা নিলো উমাঙ্গো, কিন্তু সাথে সাথে ফিরিয়ে দিলো গান-বিয়ারারকে। রূপালি ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো মিঃ এক্স। চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক।

বিয়ারারের দিকে ফিরে শোনা ভাষায় একটা নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। ছুটলো লোকটা, কালো অপর একজন বিয়ারারের কাছ থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো অন্য একটা অস্ত্র। সেটা জেনারেলের কাছে নিয়ে এলো সে, ধরিয়ে দিলো হাতে, তারপর সম্মান দেখাবার জন্যে পিছিয়ে যেতে শুরু করে হাততালি দিলো বার কয়েক।

হাতের ওপর তুলিয়ে নতুন অস্ত্রটার ওজন অনুভব করলো উমাঙ্গো। এটা একটা ছোটো হাতলের স্ট্যাবিং অ্যাসেগাই। হাতলটা শক্ত কাঠের, তামার তার দিয়ে জড়ানো। ফলাটা প্রায় দুই ফিট লম্বা, আর চার ইঞ্চি চওড়া। সতর্কতার সাথে কব্জির লোমগুলো কামালো উমাঙ্গো রূপালি ফলা দিয়ে, তারপর ট্রাউজার আর জাঙ্গল বুট খুলে ফেললো।

তার পরনে এখন শুধু জলপাই রঙের শর্টস, আর হাতে স্ট্যাবিং অ্যাসেগাই, বললো, 'দিস ইজ অ্যাফ্রিকা, মিঃ এক্স। আফ্রিকান স্টাইলের সাথে আপনার পরিচয় নেই। দেখে যান, ফিরে গিয়ে গল্প করতে পারবেন। আপনার হাতে রাইফেলটাই থাকুক, ইচ্ছে হলে ব্যবহার করবেন।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালো মিঃ এক্স। দেখতে চায়, মুখে যতো

বড়াই করছে উমাঙ্গো, কাজেও ততোটা দক্ষ কিনা। মাথা নিচু করে পায়ের ছাপের দিকে তাকালো সে। ক্ষুরের দাগগুলো একেকটা স্যুপ প্লেটের সমান, তারই পাশে অঝোর ধারায় ঝরে পড়েছে পানি মেশানো রক্ত আর হলদেটে তরল বিষ্ঠা—মোষটার ভুঁড়িতে বেশ বড় একটা ফুটো তৈরি হয়েছে।

'আমি দাগ ধরে এগোবো,' বললো সে, 'আপনি ওটার হঠাৎ ছুটে আসা খেয়াল করবেন।'

সহজ পায়ে, সাবলীল ভঙ্গিতে এগোলো ওরা। তিন গজ আগে থাকলো মিঃ এক্স, মনোযোগের সাথে রক্তের দাগের দিকে ঝুঁকে আছে। হাতে অ্যাসেগাই নিয়ে পিছনে থাকলো উমাঙ্গো, সামনে জঙ্গলের গায়ে নিয়মিত ছন্দে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে—ট্রেনিং পাওয়া চোখ গোটা মোষটাকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে না, খুঁজছে ছোটোখাটো জিনিসগুলো, ভিজে নাকের ডগা বা বিশাল শিঙের বাঁকা অংশটুকু।

বিশ পা এগোবার পর ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো জঙ্গল। দম বন্ধ হয়ে আসা গুমোট একটা পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে সবুজ গাছপালা গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পথ করে এগোনো কঠিন। ঝরা পাতা পচে নরম তুলো হয়ে গেছে, ওদের পায়ের শব্দ ভোঁতা আর অস্পষ্ট শোনালো। নিস্তব্ধতা কানে বাজে, মিঃ এক্সের জুতোর সাথে কাঁটাঝোপের সংঘর্ষ ট্রাক ইঞ্জিনের মতো আওয়াজ করলো। লোকটা দরদর করে ঘামছে। দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ভিজে গেছে শার্ট, ঘাড়ের পিছনে শিশিরের মতো জমে আছে ঘাম। কয়েক হাত পিছন থেকেও তার কর্কশ, ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলো উমাঙ্গো। জানে, এর কারণ ভয় নয়, শিকারীর

উত্তেজনা।

ভয় পাবার পাত্র উমাঙ্গোও নয়। ভীতিকর কিছু ঘটলে, বা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে আশ্চর্য একটা শীতল ভাব এসে যায় তার মধ্যে। এই গুণটা সে মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্জন করেছে। এটা একটা দরকারী কাজ, অ্যাসেগাই দিয়ে মোষটাকে ঘায়েল করা। মিঃ এক্স-কে মুগ্ধ করার এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। শীতল ভাবটা তার সমস্ত ভয় আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিলো। তৈরি হলো সে। যেন নিজস্ব প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠলো পেশীগুলো, নার্ভ-গুলোয় ভর করলো বিপুল উত্তেজনা, গোটা শরীর যেন একটা তীর, বাঁকা ধনুকের কিনারায় মুখ বেরিয়ে আছে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রক্তের দাগ যেদিকে চলে গেছে, সরাসরি সামনে, সেদিকে শুধু হালকাভাবে নজর বুলালো উমাঙ্গো; কিন্তু গভীর মনোযোগের সাথে চোখ রাখলো দু'পাশে। আফ্রিকার বন্য প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে চতুরটাকে শিকার করছে ওরা, ওটার মতো চালাক আর বোধহয় শুধু চিতা বাঘ। কিন্তু আফ্রিকান বুনো মোষের গায়ে রয়েছে একশো চিতার পশু-শক্তি। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে গোঁ গোঁ করবে সিংহ, বুকে গুলি খেয়ে ঘুরে দাঁড়াবে হাতি, কিন্তু কেপ বাফেলো আসবে নিঃশব্দে, আর শুধু একটা জিনিসই তাকে থামাতে পারবে—মৃত্যু।

বড়সড় একটা ইস্পাত-নীল মাছি বসেছে উমাঙ্গোর ঠোঁটে, এক পা দু'পা করে তার নাকের ফুটোর দিকে এগোলো সেটা। জঙ্গলের দু'পাশে এমন গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে উমাঙ্গো, স্পর্শটুকু টেরই পেলো না।

দাঁড়িয়ে পড়লো মিঃ এক্স, দাগের আকৃতি বদল পরীক্ষা করলো।

ভেজা মাটিতে খুরের দাগগুলো এখানে নিখুঁত, তরল বিষ্ঠা মেশানো রক্ত ছোটো ছোটো পুকুর তৈরি করেছে। আতংকিত হয়ে দৌড় শুরুর পর এখানেই প্রথমবার থেমেছিল মোষ। দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারে উমাঙ্গো। দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী, কালো মোষ। ছেঁড়া পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। শিকারীরা ধাওয়া করে আসছে কিনা দেখার জন্যে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে। রক্ত আর তরল বিষ্ঠা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে পেট থেকে, ছল ছল শব্দ উন্মাদ করে তুলছে ওটাকে। এখানে দাঁড়িয়ে শিকারী-দের গলা শুনেছে, এই প্রথম রাগ আর ঘৃণায় রী রী করে উঠেছে শরীর। এখান থেকেই আক্রোশের জন্ম, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উন্মাদ হওয়ার সূচনা। মাথা নিচু করে নিয়ে আবার এগোয় ওটা, পেট আর নাড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়া যন্ত্রণায় নিতম্ব সহ পিছন দিকটা আড়ষ্ট হয়ে আছে, রাগের মাত্রা প্রচণ্ড হয়ে ওঠায় ব্যথার অনুভূতি আগের মতো ততোটা তীব্র নয়।

মিঃ এক্স ঘাড় ফিরিয়ে উমাঙ্গোর দিকে তাকালো, কিন্তু কথা বলার দরকার হলো না, আবার ওরা একযোগে সামনে বাড়লো।

স্রেফ পূর্ব-পুরুষদের আচরণ অনুকরণ করছে মোষটা। তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা আর অভ্যেস এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষের মগজে ছাপ ফেলে এসেছে। প্রথম মোষটা শিকারীর প্রথম গুলি খাওয়ার পর এভাবেই উন্মাদের মতো দৌড় শুরু করে খানিকটা জায়গা পেরিয়ে এসে থেমেছিল, কিছু শোনার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল পিছন দিকে, তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে, পেশী-গুলো টান টান করে তুলে, আবার ছুটতে শুরু করেছিল। বাতাসের দিকে নাক ছিলো তার, যাতে শিকারীর গন্ধ পায়। বিশাল সশস্ত্র

মাথা ঘন ঘন এদিক থেকে ওদিক ঘোরাচ্ছিল, ওত্‌ পাতার জন্যে পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে।

দশ পা হেঁটে সরু একটা ফাঁকা জায়গা পেরোলো মোষ, চকচকে সবুজ পাতার পাঁচিলে গায়ের জোরে সেঁধিয়ে দিলো মাথা, পাতায় লেপে দিয়ে গেল তাজা লাল রক্ত, আরো পঞ্চাশ গজ এগোলো। এরপর দ্রুত এক পাশে সরলো সে, বড়সড় এক বৃত্ত রচনা করে ফিরে আসতে শুরু করলো ফাঁকা জায়গাটার দিকে। এখন সে এগোলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, প্রায় নিঃশব্দে। ঝোপ আর ডালপালার ভেতর সাবধানে শিং আর মাথা গলিয়ে দিলো, সামনে বাড়লো এক পা এক পা করে। অবশেষে ফাঁকা জায়গাটার কাছাকাছি চলে এলো।

এখানে থামলো মোষ, সরু ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকের কিনারায়। চকচকে সবুজ পাতা তার শরীর আড়াল করে রাখলো। খালি জায়গাটার মাঝখানে রক্তের দাগ রয়েছে, ওই দাগ ধরে কেউ এলে মোষটাকে দেখতে পাবে না, ওটাকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে।

এক চুল নড়লো না মোষ। চোখের পাতা পড়লো না, কানের লতি কাঁপলো না। নিজের রক্তের লম্বা দাগটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে শিকারীরা বেরিয়ে আসবে, সেই অপেক্ষায়।

হালকা পায়ে খালি জায়গাটায় বেরিয়ে এলো মিঃ এক্স, উল্টোদিকের রক্ত-রাঙা শাখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে অনুসরণ করলো উমাঙ্গো, দু'পাশের জঙ্গলে তীক্ষ্ণ নজর, ঘামে চকচক করছে প্রায়-উলঙ্গ শরীর, এগোবার ভঙ্গিতে নাচের ছন্দ। তার বুক

আর বাহুর পেশীগুলো সামান্য নড়াচড়াতেও আকৃতি বদলালো।

মোষের একটা চোখ দেখতে পেলো সে। নতুন মুদ্রার মতো ঝিক্ করে উঠলো সেটা, স্থির হয়ে গেল উমাঙ্গো। বাঁ হাতের আঙুল-গুলো খাড়া করলো সে, স্থির হয়ে গেল মিঃ এক্স। মোষের চোখে তাকিয়ে আছে উমাঙ্গো, কিন্তু সঠিকভাবে জানে না ঠিক কি দেখছে সে। শুধু আন্দাজ করলো, ওখানটাতেই থাকার কথা, ত্রিশ ফুট বাঁ দিকে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে আবার যদি ফিরে এসে থাকে মোষটা, ওখানেই থামবে।

চোখ পিট পিট করলো উমাঙ্গো, সেই সাথে ছবিটা পরিষ্কার ফুটে উঠলো। শুধু চোখ নয়, তাকিয়েছিল একটা বাঁকানো শিঙের দিকেও। ঠিক যেন গাছের একটা ডাল, এক বিন্দু নড়ছে না।

ছুটে এলো দানব। বিস্ফোরিত হলো জঙ্গল, মড়মড় করে ডাল-পালা ভাঙলো, ঝাঁক ঝাঁক পাখির মতো সবুজ পাতা উড়লো চার-দিকে। ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো মোষ, ছুটে এলো তির্যক একটা পথ ধরে। চতুর মোষের প্রিয় একটা ভান, এই ফাঁদে পড়ে অনেক শিকারী বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। তেরছাভাবে পাশ ঘেঁষে চলে যাবার ভান করে একেবারে শেষ মুহূর্তে সোজা ছুটে এসে শিং দিয়ে গেঁথে তুলে নেবে।

ঝড়ের বেগে এলো সে। এই প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে এতো জোরে ছুটে আসা অসম্ভব বলে মনে হয়। যেমন চওড়া তেমনি লম্বা, যেন গ্র্যানিট পাথরের একটা স্তূপ। ডোবা থেকে মেখে আসা কাদা তার পিঠ আর কাঁধে শুকিয়ে গেছে। ঘাড়ে আর কাঁধে ম্লান রূপালি রঙের প্রচুর কাটাকুটি দাগ—কাঁটাঝোপ কবে তাকে বাধা দিয়েছিল, আর সিংহ মেরেছিল থাবা, এ-সব তারই পুরনো চিহ্ন।

খোলা চোয়াল থেকে রূপালি লালার রশি ঝুলছে অনেকগুলো, আর চোখের পানি রোমশ গালে ভিজে দাগ এঁকে রেখেছে। একজন লোক তু'হাত দিয়ে জড়িয়ে কোনো রকমে যদি তার গলার বেড় পায়। লম্বা করা তুই হাতের আঙুল তুই শিঙের ডগার নাগাল পাবে না। গলার ঝুলে থাকা চামড়ার ভাঁজে রক্ত খেকো নীল পোকারা পাকা আঙুরের চেহারা নিয়ে বসে আছে। গা থেকে উঠে আসছে উৎকট পাঁঠা-পাঁঠা তুর্গন্ধ, ভারি হয়ে আছে জঙ্গলের বাতাস।

বীরদর্পে ছুটে এলো সে, খুনের নেশায় উন্মাদ। তার সামনে পড়ার জন্যে এগিয়ে এলো রট উমাঙ্গো। মিঃ এক্স তার হেভী ক্যালিবার রাইফেল মোষের দিকে তাক করেছে, এই সময় তাকে পাশ কাটিয়ে মাজলের সামনে দাঁড়ালো উমাঙ্গো, একেবারে শেষ মুহূর্তে মাজলটা আকাশের দিকে উঠে গেল।

তেরছা একটা পথ ধরে ছুটে আসছে মোষ, তার সামনে দিয়ে আড়াআড়িভাবে পথটা পেরিয়ে এলো উমাঙ্গো। শত্রু এভাবে দিক বদল করায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো মোষ। ভারসাম্য হারানো একজন বক্সার সরে যেতে শুরু করে প্রতিপক্ষকে যেভাবে আঘাত করে, সেভাবে আঘাত করার জন্যে মোষকে বাধ্য করলো উমাঙ্গো। শিং বাগাবার সময়ে হেরফের হয়ে গেল, শত্রুর ওপর লক্ষ্যস্থিরে খুঁত থেকে গেল। উমাঙ্গো শুধু তার উর্ধ্বাঙ্গ পিছিয়ে এনে আঘাতটা এড়ালো, শিঙের বাঁকা ডগা তার পাঁজরের এক হাত দূর দিয়ে হিস্‌স্‌ শব্দে চলে গেল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুঁতোটার আকৃতি দাঁড়ালো বাঁকা চাঁদের মতো, নিচে থেকে এক ঝটকায় ওপর দিকে উঠে শেষ সীমায় পৌঁছে গেল মোষের মাথা। ইতিমধ্যে, চোখের পলকে, শরীরটা আবার সিধে করে নিয়েছে উমাঙ্গো।

এই মুহূর্তে মোষ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ওপর দিকে খাড়া হয়ে থাকা চিবুক থেকে শুরু করে দু'পায়ের মাঝখানে নরম চামড়ার ভাঁজ পর্যন্ত। শরীরের সমস্ত ভার, আর ছুটে আসার প্রচণ্ড বেগটুকু অ্যাসেগাইয়ের ফলার পিছনে চাপিয়ে দিলো উমাঙ্গো।

তীক্ষ্ণ ডগার ওপর ছুটে এলো মোষ। ফলাটা ঘ্যাঁচ্ করে গেঁথে গেল তার গায়ে, তাজা মাংস চোখের পলকে গিলে ফেললো সেটাকে। ফলাটোকে অনুসরণ করে হাতল ধরা উমাঙ্গোর ডান হাত ক্ষতের খানিকটা ভেতরে ঢুকে গেল, ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্ত তার কাঁধ পর্যন্ত ভিজিয়ে দিলো। অ্যাসেগাইয়ের হাতল ছেড়ে দিলো সে, নাচের ভঙ্গিতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরলো। বুকের গভীরে লম্বা ইস্পাতের ফলা নিয়ে লাফ দিলো মোষ, সামনের পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ঘুরে গিয়ে উমাঙ্গোকে ধাওয়া করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু সামনের পা জোড়া পরস্পরের সাথে বাড়ি খেতে শুরু করায় দাঁড়িয়ে পড়লো, বিমূঢ় ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকলো দুঃসাহসী শিকারীর দিকে, চোখের সামনে দ্রুত নেমে এলো কালো একটা ঝাপসা ভাব।

মোষের সামনে দাঁড়ালো উমাঙ্গো, দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানালো, 'হা-হা, দেখি এবার কেমন করে মাটি কাঁপাও। হা-হা, দেখি এবার কিভাবে আকাশ ফাটাও।'

পা টেনে টেনে দু'কদম আগে বাড়লো মোষ, তারপরই তার ভেতর কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। ফুলে ওঠা নাকের ফুটো দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে এলো রক্তের মোটা দুটো ধারা। চোয়াল খুলে হাঁক ছাড়লো সে, আওয়াজ নয় বেরিয়ে এলো রক্ত-স্রোত, ভাসিয়ে দিলো গলা আর বুক। প্রকাণ্ড দেহটা টলতে শুরুকরলো, তাল

সামনে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করলো বেচারা।

'মরো, বাছাধন।' উল্লাসে মোষের সামনে নাচতে শুরু করলো উমাঙ্গো। 'একজন রাজার পথ যাতে নিষ্কণ্টক হয়, সেজন্যে তোমাকে বলি দেয়া হয়েছে। মরো।'

ধরাশায়ী হলো মোষ। ওদের পায়ের নিচে লাফ দিয়ে উঠলো মাটি।

এক পা এক পা করে মোষের মাথার সামনে এসে দাঁড়ালো উমাঙ্গো, ধীরে ধীরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো। মোষের চোখে ভাষাহীন দৃষ্টি স্থির হয়ে আসছে। তুই হাত এক করে, মোষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা স্রোত থেকে, আঁজলা ভরে রক্ত নিয়ে মুখের সামনে তুললো উমাঙ্গো। মদের মতো, ঢক ঢক করে পান করলো সেই রক্ত। চিবুক আর কনুই থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো খানিকটা। অট্টহাসি শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মিঃ এক্সের।

'মহাবীর মোষ, আমি তোমার তাজা রক্ত পান করেছি। তোমার শক্তি এখন আমার।' আকাশের দিকে মুখ করে চিৎকার করলো উমাঙ্গো। মোষের পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, মৃত্যুর আগে এটাই তার শেষ খিঁচুনি।

ক্যাম্প কর্মীরা মহোবা-হোবা গাছের নিচে একটা টেবিল ফেলেছে। চারদিকে সবুজ বনভূমি, মাঝখানে ঘাস মোড়া ফাঁকা জায়গা, আর এই একটা মাত্র গাছ। শাওয়ার সেরে কাপড় পরেছে উমাঙ্গো—তু'পাশে লালচে স্ট্রাইপসহ কালো ট্রাউজার, খাটো লাল জ্যাকেট, ল্যাপেল জোড়া কালো সিল্কের, শার্টটা সাদা, সাথে কালো বো-টাই। টেবিলের ওপর ড্রাইজিন আর শিভাস রিগালের একটা করে

বোতল রয়েছে। উমাঙ্গোর সামনের একটা চেয়ারে বসেছে মিঃ এক্স। মেইন ক্যাম্প থেকে জায়গাটা দূরে, কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না বা ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

মিঃ এক্সকে নিজের হাতে হুইস্কি পরিবেশন করলো উমাঙ্গো। আফ্রিকার আকাশ সোনালি হয়ে উঠছে, সেদিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে পান করলো ওরা।

পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছে ওরা, দু'জন একসাথে জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়ায় গভীরতা পেয়েছে ওদের বন্ধুত্ব।

অবশেষে টেবিলের ওপর গ্লাসটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে প্রসঙ্গটা তুললো মিঃ এক্স। 'এবার, বন্ধু, বলুন, কি চান আপনি?'

'গোটা এলাকা দরকার আমার,' একেবারে সহজ করে বললো উমাঙ্গো।

'সবটুকু?'

'সবটুকু।'

'শুধু জিম্বাবুই নয়?'

'শুধু জিম্বাবুই নয়।'

'আর, সবটুকু দখল করার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতে হবে আমাদের?'

'হ্যাঁ।'

'বিনিময়ে?'

'আমার বন্ধুত্ব।'

নিঃশব্দ হাসলো মিঃ এক্স। 'বন্ধুত্ব ভালো জিনিস, কিন্তু শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে তো পেট ভরে না—আন্তর্জাতিক রাজনীতিও পানি পায় না হালে। বিনিময়ে চোখে দেখা যায় এমন কি দেবেন জানতে চাই,

দু'চারটের নাম বলুন।'

'ছোট্ট, গরীব দেশ আমার,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো উমাঙ্গো, 'বিনিময়ে কি আর দিতে পারি। কিছু খনি আছে—নিকেল, ক্রোম, টাইটানিয়াম, বেরিলিয়াম, সামান্য কিছু সোনা...

'হ্যাঁ, এই তালিকাটাই চাইছিলাম, বললো মিঃ এক্স। আমার দেশে এ-সব জিনিসের দরকার আছে। কিন্তু এ-সবের দর ঠিক করবো আমরা, এবং আগামী বিশ বছরে তা বাড়ানো হবে না।'

'জানি। কিন্তু আরো জিনিস আছে, সে-সবও আমাদের কাছ থেকে রফতানী হবে,' বললো উমাঙ্গো, মুচকি মুচকি হাসছে সে। 'সেগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার দরেই কিনতে হবে।'

'আরো জিনিস?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো মিঃ এক্স। 'কি জিনিস?'

'উত্তেজিত হবেন না,' বললো উমাঙ্গো। 'আস্তে-ধীরে বলি। আমি জিম্বাবুইয়ের মালিক হবার পর, স্বভাবতই অস্থির হয়ে উঠবে আমার দৃষ্টি...'

'আচ্ছা!' মিঃ এক্স উমাঙ্গোর চোখের ওপর কড়া নজর রাখলো।

'আমার অস্থির দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে পড়তে পারে,' নরম স্বরে বললো উমাঙ্গো। 'ওদিকে অনেকদিন থেকেই জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন আপনারা।'

'তা, দক্ষিণে কি দেখবে আপনার চোখ, জেনারেল উমাঙ্গো?'

'আমি দেখতে পাবো,' গলা আরো খাদে নামিয়ে বললো উমাঙ্গো, 'ওদিকের মানুষদের ক্রীতদাস বানাবার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে ওখানকার মাটি থেকে সমস্ত সম্পদ তুলে আনার।'

'আর?'

'দেখতে পাবো উইটওয়াটারসর‍্যাণ্ড আর "ফ্রি স্টেট" ফিল্ডস, দেখতে পাবো কিমবারলি'র ডায়মণ্ড, ইউরেনিয়াম, প্ল্যাটিনাম, সিলভার, কপার···সংক্ষেপে, এই এলাকার যাবতীয় গুপ্তধন সবই আমি দেখতে পাবো।'

'বলে যান, বলে যান,' উৎসাহ দিলো মিঃ এক্স। এই উচ্চাভিলাষী জেনারেলকে তার মনে ধরেছে। লোকটার ঘটে বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, উদ্যম আছে—বহুদিন থেকে এরকম একজন লৌহ-মানবকেই খুঁজছে তার দেশের কর্মকর্তারা।

'আমি একটা বেস দেখতে পাবো, আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেটা। গালফ আর ইউরোপের মাঝখানে যে অয়েল লাইন, সেই লাইনের ওপর থাকবে বেসটা···'

'এ-সব চিন্তা-ভাবনা কোথায় নিয়ে যাবে আপনাকে?'

'আপনাদের ঋণ শোধ করার জন্যে আমি চাইবো জিম্বাবুইয়ের দক্ষিণে যে-সব এলাকা রয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক ফোরামে শুধু আপনাদেরই গান গাইবে··· '

মিঃ এক্স পুলক অনুভব করলো, তার দেশের প্ল্যান-পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে বুঝে নিতে পেরেছে জেনারেল উমাঙ্গো। দক্ষিণ মস্ত একটা উপহার, কিন্তু সেটা পেতে হলে উত্তরের সাহায্য একান্তভাবে দরকার। উত্তর হলো জিম্বাবুই। পুব দিকে মোজাম্বিক, পশ্চিমে অ্যাঙ্গোলা—এগুলো এরইমধ্যে তাদের দলে ভিড়েছে। নামিবিয়াও ভিড়বে। দখল সম্পূর্ণ করার জন্যে এখন শুধু দক্ষিণটুকু দরকার তাদের। চেয়ারের ওপর খাড়া হয়ে বসলো মিঃ এক্স। 'কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে, নিজের মাটিতে আপনার সম্ভাবনা কতোটুকু?'

'অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি,' বললো উমাঙ্গো। 'ইন্টার-ট্রাইবাল ওঅরফেয়ার তুঙ্গে। এখন শুধু হু'একটা কলকাঠি নেড়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পতন ঘটাতে পারলেই আমি রাজা।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালো মিঃ এক্স। জেনারেল সত্যি কথা বলছে, জানে সে। 'শুনেছি, এরইমধ্যে আপনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কিং'স হেভেন না কি যেন নাম, ওটা তো এখন আপনার হাতে। ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে প্রচুর রক্তপাতও ঘটিয়েছেন।'

'সব খবরই রাখেন দেখছি। এ-সবই করা হচ্ছে জনগণ আর দেশের স্বার্থে।'

'তাতো বটেই, তাতো বটেই। সেজন্যেই তো টিভিতে রোজ হু'বেলা করে আপনাকে দেখানো হচ্ছে। হারারে-র রাস্তাগুলো আপনার পোস্টারে ছেয়ে গেছে। জাতীয় দৈনিকগুলো আপনার সাফল্যের খবর বড় বড় হেডিঙে ছাপছে

'কারণ ওরা সবাই শক্তের ভক্ত।'

'কারণ আপনার পিছনে রয়েছে বিরাট একটা ফোর্স—থার্ড ব্রিগেড। আর, থার্ড ব্রিগেডকে টিকিয়ে রাখার জন্যে রয়েছে আমাদের আশীর্বাদ।'

'থার্ড ব্রিগেডের প্রসঙ্গ যখন উঠলোই মিঃ এক্স,' ভারি গলায় বললো উমাঙ্গো, 'জরুরী আলাপটা এখুনি সেরে ফেলা দরকার। আপনাদের আমি অনেকদিন থেকেই বলছি, আমাদের আরো অস্ত্র দরকার।'

মাথা ঝাঁকালো মিঃ এক্স। 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু আগেই আপনাকে আমি বলেছি, শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে কাজ হয় না। প্রথম হুটো চালানের জন্যে আমরা কোনো টাকা চাইনি। কথা ছিলো, এরপর আপ-

নাদের যে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র, হেলিকপ্টার, আর গোলা-বারুদ দরকার হবে তার জন্যে আপনারা পেমেন্ট করবেন। আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন, নগদ ডলার দিতে পারবেন না, চেষ্টা করবেন সম-মূল্যের হীরে দিতে। সেই হীরে যোগাড় হয়েছে কিনা বলুন। এরপর দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটাও শুনি আগে।'

'ম্যাটাবেলদের নিয়ে কি করতে চান? এমনিতে শান্ত, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে ওরা যোদ্ধা জাতি। আপাততঃ হয়তো ওদেরকে আপনি দমিয়ে দিতে পারলেন, কিন্তু পরে? আপনার ক্ষমতা গ্রহণের পর ওরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

'একজনের নাম বলবো আমি, তাতেই আপনার দুটো প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।'

'কে সে?'

'টস মাজুলেট।'

'হোয়াট! জেনারেল মাজুলেট? ম্যাটাবেলদের নেতা? কিন্তু তাঁকে তো আপনি জেলে ভরেছেন। নাকি এরই মধ্যে মারা গেছেন ভদ্রলোক?'

'না।'

'ব্যাখ্যা করুন, প্লিজ। আমি যতোদূর জানি, জেনারেল মাজুলেট ধনী নন।'

'ধনী নয়, না?' বললো উমাঙ্গো। 'কিন্তু তার কাছে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলারের চাবি আছে।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো মিঃ এক্স। 'কি রকম?'

'ডলার নয়, ওই পরিমাণ ডলারের হীরে…'

'কোথায় পেলেন তিনি? রেখেছেন কোথায়?'

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে। এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক। না, ম্যাটাবেলদের সবাইকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। গোটা দুনিয়ায় মহা হৈ-চৈ বেধে যাবে। শুনুন, আমি কি ভেবে রেখেছি বলি। আমি ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে ভোজবাজির মতো আবার উদয় হবে মাজুলেট। তাকে দেখে ম্যাটাবেলরা স্বস্তিতে, আনন্দে নাচতে শুরু করবে। মাজুলেটকে আমি ভাইস-প্রেসিডেন্ট বানাবো।'

'কি? অসম্ভব! তিনি আপনাকে ঘৃণা করেন। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ...'

'আরে না!' আধবোজা চোখে তাকালো উমাঙ্গো, হাসলো। 'তাকে প্রথমে আমি আপনাদের দেশে পাঠাবো। কঠিন কেস-গুলোর জন্যে আপনাদের ওখানে স্পেশাল ক্লিনিক আছে, তাই না? সেখানে আপনারা তার চিকিৎসা করবেন। চিকিৎসা মানে, ব্রেন-ওয়াশ, ঠিক?'

উমাঙ্গোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো মিঃ এক্স। তার-পর ফিসফিস করে বললো সে, 'সত্যি আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না!'

'ব্রেনওয়াশের পর এখানে ফিরে এসে মাজুলেট কি করবে?' জিজ্ঞেস করলো উমাঙ্গো।

'তার ব্রেন বলে কিছু থাকবে না...

'তার শরীরটা দরকার আমার, ব্রেন নয়। দরকার একটা পুতুলের, মানুষ নয়।'

'সে-ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। ফিরে এসে জেনারেল মাজু-লেট আপনার কথায় উঠবে, আপনার কথায় বসবে। সত্যি, চমৎকার

সমাধান বটে। কবে তাঁকে পাঠাচ্ছেন ?'

'তার আগে হীরেগুলো ওর কাছ থেকে আদায় করতে হবে।'

'ও, হ্যাঁ। কি রকম সময় লাগবে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো উমাঙ্গো। 'বেশি দিন না।'

'যে রুটে আইভরি যায়, সেই রুটেই তাঁকে পাঠাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'ভদ্রলোককে রেখেছেন কোথায় ?'

'কাছেই, একটা পুনর্বাসন কেন্দ্রে। কেউ জানে না··· '

'কাছেই ? তাহলে তো ভালোই হলো। তাঁকে একবার দেখবো আমি।'

'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে ?'

'উচিত অনুচিত আমি বুঝবো, প্লিজ !' মিঃ এক্স একটু চড়া সুরে বললো কথাটা, একটু যেন ধমকের মতো শোনালো।

উমাঙ্গো আর কথা বাড়ালো না।

টুটি পুনর্বাসন কেন্দ্র। দুর্গম বনভূমির মাঝখানে আসলে এটা একটা কারাগার, রাজনৈতিক কর্মী আর ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় এখানে।

দুপুরের কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। মাঝখানে জেনারেল মাজুলেট, দু'পাশে দু'জন ম্যাটাবেল বিদ্রোহী। কয়েক হাত সামনে দুধ-সাদা একটা পাঁচিল, রোদের চোখ ধাঁধানো আলো আর তাপ পাঁচিলে লেগে ফিরে আসছে ওদের দিকে। রোজকার মতো, সেই ভোর বেলা থেকে ওদেরকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

তিনজনই ওরা সম্পূর্ণ নগ্ন। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলো ওরা, মাত্র ক'হপ্তায় হাড্ডিসার হয়ে গেছে। পাঁজর আর শিরদাঁড়ার প্রতিটি হাড় আলাদা করে গোণা যায়। তীব্র আলোর পীড়ন থেকে বাঁচার জন্যে চোখ বন্ধ করে রাখার উপায় নেই, কারণ বন্ধ করলেই চোখে আর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখের পাতা নামিয়ে রেখেছে মাজুলেট, সরু ফাটলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে সাদা পাঁচিলের গায়ে, অস্পষ্ট একটা কালচে দাগের ওপর। নির্দিষ্ট একটা দাগের ওপর তাকিয়ে থাকায় এখনো সে একবারও মাথা ঘুরে পড়ে যায়নি। তার দু'পাশের লোক দু'জন কয়েকবার করে পড়েছে, প্রতি-বার চাবুকের বাড়ি খেয়ে উঠতে হয়েছে তাদের। এখনো টলছে তারা।

'সহ্য করো, ভাই,' সিনভেবেল ভাষায় বিড়বিড় করে বললো মাজুলেট। 'শোনা কুকুরগুলোকে বুঝতে দিয়ো না আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা ভাঙবো, কিন্তু মচকাবো না।' মুহূর্তের জন্যেও অস্পষ্ট দাগটা থেকে চোখ সরালো না সে। ওটা একটা বুলেটের দাগ, চুন-কাম করার পরও পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি। ফায়ারিং স্কোয়াড প্রতিবার গুলি করার পরপরই পাঁচিলটা আবার চুনকাম করা হয়।

'পানি!' মাজুলেটের ডান পাশ থেকে কাতরে উঠলো লোকটা। 'এক ফোঁটা পানি!'

'ভুলে থাকতে চেষ্টা করো, ভাই। পানির কথা চিন্তা করলে পাগল হয়ে যাবে তুমি।'

পাঁচিল থেকে ঠিকরে আসা আঁচ নিরেট ঘুসির মতো আঘাত করছে।

'অন্ধ হয়ে গেছি,' বাঁ পাশ থেকে দ্বিতীয় লোকটা ককিয়ে উঠলো,

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' সাদা আলোর ঝলক তার চোখের তারাকে অকেজো করে দিয়েছে।

হঠাৎ পিছন থেকে কর্কশ শোনা কণ্ঠের কমাণ্ড ভেসে এলো। প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওপর দিয়ে কয়েক জোড়া বুট জুতো এগিয়ে আসছে।

'ওরা আসছে, অন্ধ ম্যাটাবেল বিড়বিড় করে বললো।

মাজুলেট জানে, আজ তার পালা।

রোজ এই দুপুরবেলাই আসে ফায়ারিং স্কোয়াড, তার চোখের সামনে পাঁচ-সাতজন ম্যাটাবেলকে খুন করা হয়। শোনা গার্ডরা মজা করার জন্যে আগের দিন রাতেই জানিয়ে দেয় তালিকাটা। তালিকায় যাদের নাম থাকে তারা আর ঘুমাতে পারে না। ওরা সবাই মাতৃভূমির বীর সন্তান, ভাবলো মাজুলেট। শত অত্যাচারের মুখেও কেউ মুক্ত বিদ্রোহীদের নাম বা ঠিকানা প্রকাশ করে না, প্রাণভিক্ষার সুযোগ পায়ে ঠেলে বরণ করে নেয় সম্মানজনক মৃত্যুকে। কাল রাতে গার্ডরা তিনজনের নাম জানিয়েছিল। সেই তিনজনকেই আজ ভোরে নিয়ে আসা হয়েছে সাদা পাঁচিলের সামনে।

মৃত্যুকে ভয় করে না মাজুলেট। কিন্তু তার দুঃখ, ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সংগঠিত করে যেতে পারলো না। থার্ড ব্রিগেড ম্যাটাবেলদের ওপর আঘাত হানবে জানতো সে, কিন্তু ঘটনাগুলো এতো তাড়াতাড়ি ঘটতে শুরু করবে কল্পনা করেনি।

নির্দয় এক জোড়া হাত তাকে ধরে ঘোরালো, এক পাশে খানিক দূর টেনে নিয়ে এসে একটা কাঠের খুঁটির সাথে বাঁধা হলো তাকে। পাশে আরো অনেকগুলো খুঁটি রয়েছে, তার দু'পাশের দুটো খুঁটির সাথে বাকি দু'জনকেও বাঁধা হলো। পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরে

রয়েছে ওরা, সামনে আটজনের একটা সশস্ত্র দল। তাদের কমাণ্ডার একজন ক্যাপটেন। প্রত্যেকের পরনে থার্ড ব্রিগেডের ইউনিফর্ম।

এক এক করে খুনীদের সামনে থামলো ক্যাপটেন, সবার রাইফেল চেক করলো। সৈনিকদের সাথে রসিকতা করলো লোকটা, অশ্লীল হাসিতে ফেটে পড়লো তারা। এই হত্যাকাণ্ড তাদের কাছে একটা উপভোগ্য নেশার মতো।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ফায়ারিং স্কোয়াড, লাইনের মাথায় ফিরে এসে বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো ক্যাপটেন। ইংরেজীতে লেখা ঘোষণাটা পড়লো সে, 'রাষ্ট্র এবং জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছে আপনাদের। জিম্বাবুই প্রজাতন্ত্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আপনাদের ডেথ ওয়ারেন্ট সই করেছেন… '

চিবুক উঁচু করে ম্যাটাবেলদের প্রাচীন একটা যুদ্ধের গান ধরলো জেনারেল মাজুলেট। কয়েক লাইন গাওয়ার পর দু'পাশে তাকালো সে, সঙ্গীদের বললো, 'গাও, ভায়েরা! শোনা কুকুরগুলোকে জানিয়ে দাও আমরা যোদ্ধা জাতি, হাসি মুখে মরতে পারি।'

ওদের সামনে থেকে নির্দেশ দিলো ক্যাপটেন, স্কোয়াডের আটজন সৈনিক একযোগে বাম পা সামনে বাড়িয়ে রাইফেল উঁচু করলো। গেয়ে চলেছে মাজুলেট, তার সাথে এখন সঙ্গী দু'জনও গাইছে। হঠাৎ দূরে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর।

মাজুলেটের গান বন্দীদের কানে গেছে। নিজেদের কুঁড়েঘর থেকে তারাও গাইছে তার সাথে। কয়েক শো বন্দীর মিলিত কণ্ঠস্বর, ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠলো।

গর্বে ফুলে উঠলো ম্যাটাবেল নেতার বুক। ওরা মাতৃভূমির বীর সন্তান, ভাবলো সে, আমি না থাকলেও ওরা অত্যাচারীদের

ঠেকাতে পারবে।

উঁচু করা হাতটা আচমকা সবেগে নামিয়ে আনলো ক্যাপটেন, নির্দেশ দিলো, 'ফায়ার!'

একসাথে গর্জে উঠলো আটটা রাইফেল। সঙ্গীদের গলা স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের ওপর ঝুলে পড়লো তাদের মাথা। সৈনিকরা রাইফেল নামিয়ে নিয়ে পরস্পরের গা টেপাটেপি করলো, খিক খিক করে হাসলো। গোটা ব্যাপারটা যেন মস্ত একটা কৌতুক।

মাজুলেট এখন আর গাইছে না। বন্দীরাও চুপ করে গেছে। নিহত সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকালো মাজুলেট, আটটা বুলেট ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেছে তাদের বুক। এতোক্ষণ পর, হঠাৎ মাজুলেটের পা দুটো কাঁপতে শুরু করলো। গালভরা হাসি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাপটেন। 'পানি, জলদি!'

ধীরে ধীরে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে নিজেকে শান্ত করলো মাজুলেট। একজন ট্রুপার এনামেলের একটা ডিশ নিয়ে এলো। ডিশটা তার হাত থেকে নিলো ক্যাপটেন। নাকে পানির গন্ধ পেলো মাজুলেট। বলা হয়, খর্বকায় বুশম্যানরা নাকি বহু মাইল দূর থেকেও পানির গন্ধ পায়, কথাটা এর আগে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি সে। এই পানির গন্ধ সদ্য ফালি করা তাজা তরমুজের মতো। ঢোক গেলার সময় যে-সব পেশী নড়ে, আপনা থেকেই সেগুলো টান টান হয়ে উঠলো। ডিশ থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না মাজুলেট।

ডিশটা নিজের মুখের সামনে তুললো ক্যাপটেন, ছোট্ট একটা চুমুক দিলো। মুখের ভেতর পানি নিয়ে কুলকুল শব্দ করে নাড়লো সে, তারপর পিচকারী দিয়ে ফেলে দিলো মাটিতে, মাজুলেটের চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হাসলো। এবার তার মুখের সামনে

তুললো ডিশটা, ধীরে ধীরে কাত করলো সেটা। পানির মোটা ধারা নামলো, মাজুলেটের হাঁটু আর পা ভিজিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

পানির জন্যে মোচড় খেতে শুরু করলো মাজুলেটের শরীর, যেন প্রতিটি পেশী জ্যান্ত হয়ে উঠে 'পানি চাই পানি চাই' বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। ডিশ থেকে শেষ ফোঁটাটাও মাটিতে ফেলে দিলো ক্যাপটেন। ঘুরে দাঁড়ালো সে, চিৎকার করে নির্দেশ দিলো।

প্যারেড গ্রাউণ্ড ধরে ছুটে চলে গেল ফায়ারিং স্কোয়াড। লাশ, মাছি আর রোদের মধ্যে একা রয়ে গেল মাজুলেট।

সন্ধ্যের সময় তাকে নিতে এলো ওরা। কব্জির বাঁধন খুলতেই রক্ত-প্রবাহ শুরু হলো, অসহ্য যন্ত্রণা হলো হাতে; গুঙিয়ে উঠলো মাজু-লেট, মাটিতে হাঁটু দিয়ে পড়ে গেল সে। হাঁটার শক্তি নেই, টেনে-হিঁচড়ে তাকে কুঁড়েঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

ছোটো একটা ঘর। এক কোণে একটা ঢাকনা ছাড়া বালতি রয়েছে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় ব্যবহার করতে হবে। আর এক কোণে দুটো মাটির শানকি, একটায় আধ সের পানি, আরেকটায় মুঠো আকৃতির শক্ত, সাদা রঙের কেক। কেকটা খেলে কাল সারাদিন পিপাসায় কষ্ট পাবে সে, তবু শক্তি পাবার জন্যে খেতে হবে ওটা।

অর্ধেকটা পানি খেয়ে বাকিটুকু সকালের জন্যে রেখে দিলো সে, পা লম্বা করে দিয়ে নেতিয়ে পড়লো মাটির ওপর। টিনের ছাদ এখনো ঠাণ্ডা হয়নি, গরমে সেদ্ধ হতে থাকলো সে। ভোরের দিকে, সে জানে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হি হি করতে হবে তাকে। শরীরের প্রতিটি পেশী, প্রতিটি হাড়ের জোড়া ব্যথায় টনটন করছে, পাঁচিল থেকে

প্রতিফলিত রোদের সাদা ঝলক মাথার ভেতর এখনো যেন আগুন ধরিয়ে রেখেছে—মনে হলো চোখ দুটো ভাঙা ডিমের মতো গলে যাবে, খুলি ফেটে বেরিয়ে আসবে মগজ।

বাইরে ঘোর অন্ধকার, কাঁটাতারের ওদিকে প্রিয় খাবার পেয়ে হায়েনা আর নেকড়ের দল মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ধারালো দাঁত দিয়ে হাড় ভাঙছে ওগুলো, প্রতিটি মট মট শব্দের সাথে শিউরে শিউরে উঠলো মাজুলেট।

তবু এক সময় ঘুম এলো তার। ভোরে বুটের আওয়াজ আর অশ্রাব্য গালিগালাজের শব্দে ঘুম ভাঙলো। তাড়াহুড়ো করে প্রথমেই শানকির পানিটুকু খেয়ে নিলো, গার্ড দেখতে পেলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলবে শানকিটা। কাল তার শরীর প্রায় ভেঙে পড়েছিল, আজ তা ঘটতে দেবে না মাজুলেট।

সাদা পাঁচিলের সামনে নিয়ে আসা হলো তাকে। আগেই নিয়ে আসা হয়েছে তিনজন ম্যাটাবেল কয়েদীকে। নির্লিপ্ত চোখে মাজু-লেট লক্ষ্য করলো, এরই মধ্যে পাঁচিলটা আবার চুনকাম করা হয়েছে।

দুপুরবেলা তিনজন ম্যাটাবেলকে খুন করলো ওরা। তাদের সাহস যোগাবার জন্যে আজ মাজুলেট গাইতে পারলো না। চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুলো না গলা দিয়ে। বিকেলের দিকে চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করলো সে, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো মুচড়ে ধরে আবার খাড়া করা হলো তাকে। প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে জানান দিয়ে গেল, কোনো পেশী এখনো অসাড় হয়ে যায়নি।

তৃষ্ণায় পাগল হলো মাজুলেট। পানি চাইলো সে, কিন্তু গলা

দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে, এই সময় পিছন থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'ছি-ছি, কী দুঃখজনক। বীর পুরুষের একি হেনস্তা।'

উমাঙ্গোর কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো আঘাত করলো মাজুলেটকে, চোখের সামনে থেকে অন্ধকার ভাবটা কেটে গেল, সারা শরীরে নতুন একটা শক্তি অনুভব করলো সে। আজ এই প্রথম উপলব্ধি করলো, ঘৃণাও টনিকের কাজ করে। মাথা তুললো সে, সরাসরি সামনে তাকালো।

সামনে এসে দাঁড়ালো উমাঙ্গো, তার পাশে একজন শ্বেতাঙ্গ। পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরে আছে উমাঙ্গো, রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ রোদ লেগে ঝলমল করছে, হাতে একটা স্টিক। তার সঙ্গী লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি মাজুলেট। লোকটার চোখ জোড়া নীল, সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

'দুঃখিত, মিঃ এক্স,' সঙ্গীকে বললো উমাঙ্গো, 'জেনারেল মাজুলেটকে ভদ্রোচিতভাবে আপনার সামনে আনা সম্ভব হলো না। আহা, বেচারা দেখছি রোগা একেবারে দড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এই জায়গায় সব ঠিক আছে…।'

স্টিক দিয়ে মাজুলেটের তলপেটের নিচে পুরুষাঙ্গে খোঁচা মারলো উমাঙ্গো। 'এরকম আগে কখনো দেখেছেন?' সঙ্গীকে প্রশ্ন করলো সে। 'সাধারণ তিনজন লোকের জিনিস একাই বয়ে বেড়াচ্ছে ব্যাটা।'

মুখ বুজে সহ্য করলো মাজুলেট। একজন মানুষকে এরচেয়ে বিশ্রীভাবে অপমান করা যায় না।

মিঃ এক্স অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে বিরক্তি প্রকাশ করলো।

'ঠিক,' দ্রুত বললো উমাঙ্গো, 'আমরা সময় নষ্ট করছি।' রিস্ট-

ওয়াচ দেখলো সে, কাছাকাছি দাঁড়ানো ক্যাপটেনকে বললো, 'বন্দীকে দুর্গে নিয়ে এসো।'

জেনারেল মাজুলেটকে বয়ে নিয়ে যেতে হলো।

মজলিকাজি ছিলেন প্রথম ম্যাটাবেল। আঠারো শো আটষট্টি সালে তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে লোবেনগুলা ম্যাটাবেলদের রাজা হন। প্রায় ওই একই সময়ে আরো দুটো ঘটনা ঘটে, যার ফলে আফ্রিকার ভাগ্যাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। একদল শ্বেতাঙ্গ পাথরের স্তূপ সরিয়ে আবিষ্কার করে ফেললো হীরক খনি, খনির নাম রাখলো তারা কিমবারলি। আরেক শ্বেতাঙ্গ, সিসিল রোডস, আফ্রিকার কূলে তরী ভিড়ালো।

সিসিল রোডস ছিলো সাক্ষাৎ শয়তান। খনিটা যারা আবিষ্কার করলো, তাদেরকে ছলেবলে-কৌশলে ভাগিয়ে দিলো সে, পুরোটা একা দখল করে বসলো। প্রায় রাতারাতি দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোক বনে গেল সে।

খনি থেকে হীরে উদ্ধারের জন্যে দরকার হলো হাজার হাজার শ্রমিক। সাধারণ খাবার, সস্তা একটা আগ্নেয়াস্ত্র, আর নাম মাত্র কিছু পয়সার বিনিময়ে কালোদের কাজ করতে ডাকলো সে। রাজা লোবেনগুলার মনে প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, দেশের সম্পদ একজন বিদেশী লুঠ করে নিয়ে যাবে এটা কোনো দেশপ্রেমিকের পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ করে সিসিল রোডস-এর সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জেতা যাবে না, তাই কৌশলের আশ্রয় নিলেন লোবেনগুলা। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণের খনিতে কাজ করতে এলো দশ হাজার তরুণ ম্যাটাবেল। তাদের ওপর নির্দেশ

থাকলো, হীরে চুরি করে তার কোষাগারে জমা দিতে হবে।

কিমধারলি খনি থেকে সেরা জাতের হীরে তোলা শুরু হলো, সেগুলো আকারে যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল। সেই সাথেই শুরু হলো চুরি। কেউ বলতে পারে না ম্যাটাবেলরা কতো হীরে চুরি করেছিল। একজন ম্যাটাবেল একটা হীরে গিলে ফেলতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়, সেটার ওজন ছিলো তিনশো আটচল্লিশ ক্যারেট, তখনকার দিনে ওটার দাম ছিলো তিন হাজার পাউণ্ড—এখনকার বাজার দর অনুসারে তিন লাখ পাউণ্ডের কম নয়। আরেকজন ম্যাটাবেলের উরুর ক্ষত কেটে ভেতর থেকে বের করা হয় দুশো ক্যারেট ওজনের একটা হীরে।

ধরা পড়লো মাত্র দু'দশজন, বাকি হাজার হাজার ম্যাটাবেল বিভিন্ন কৌশলে হীরে পাচারের কাজ চালিয়ে গেল। তখনকার দিনে শ্রমিকদের ওপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ছিলো না, যে যার খুশি মতো আসতো যেতো। তিন বছরের চুক্তি থাকলেও, অনেকে মাত্র এক হপ্তা কাজ করেই কেটে পড়তো। কেউ দু'এক মাস, কেউ এক বছর, কেউ হয়তো পুরো তিন বছর কাজ করতো, এবং ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে যেতো হীরে। এভাবে হাজার হাজার ক্যারেট জমা হতে লাগলো লোবেনগুলার কোষাগারে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা বেশি দিন থাকলো না, অবস্থা বেগতিক দেখে কম্পাউণ্ড সিস্টেম চালু করলো রোডস্। এবার পুরো তিন বছর কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর থাকতে হলো শ্রমিকদের। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে সবাইকে বিবস্ত্র করে দশ দিনের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হলো কোয়ারানটাইনে। এখানে তাদের চুল কামানো হলো, শ্বেতাঙ্গ ডাক্তাররা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো প্রত্যেককে। নতুন বা

পুরনো কোনো ক্ষত দেখলে ছুরি দিয়ে কাটা হলো সেটা, মলদ্বার দিয়ে ভেতরে পাইপ ঢোকানো হলো। ক্যাস্টর-অয়েলের ডবল ডোজ খাওয়ানো হলো, ল্যাট্রিনের নিচে থাকলো ছাকনি। কিন্তু ম্যাটাবেলরাও ধুরন্ধর, এতো রকম সতর্কতা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঠিকই তারা নিজেদের কাজ হাসিল করে চললো। তবে আগের সেই নদীর মতো প্রবাহ আর থাকলো না, নেমে এলো ক্ষীণ একটা ধারায়।

এভাবে কতো হীরে পাচার হয়েছে বলা মুশকিল। টস মাজু-লেটের প্রপিতামহ বাজো নাকি কোমরের বেল্টে ভরে প্রচুর হীরে নিয়ে এসেছিলেন। গুজব আছে, লোবেনগুলার সামনে বেল্ট থেকে যে হীরেগুলো বের করেন তিনি সেগুলোর ওজন ছিলো দশটা উট পাখির ডিমের সমান। দুই ডজন মুরগীর ডিমের সমান জায়গা দখল করে একটা উটপাখির ডিম, কাজেই অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে হিসেব করলেও আজকের বাজারে ওগুলোর দাম পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ড ধরা যায়।

আরেকটা গুজব, পাঁচটা এক গ্যালনের পাত্র ভর্তি হীরে ছিলো লোবেনগুলার কাছে। এখনকার বাজারে ওগুলোর দাম হতে পারে পাঁচশো থেকে হাজার মিলিয়ন পাউণ্ডের মধ্যে। এর থেকে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দামের হীরে দিয়ে অস্ত্র কেনার কথা ভেবে রেখেছে উমাঙ্গো। তার আগে অবশ্য পাঁচ গ্যালন হীরে হাতে আনা চাই।...যাই হোক, ওদিকে, কিমবারলিতে বসে, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকটা উত্তর দিকে তাকিয়ে নিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। সাবধানী লোক, একটু একটু করে এগোলো সে। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের রাণীর কাছ থেকে রয়্যাল চার্টার কোম্পানী গঠন করার

অনুমতি নিলো। তারপর ম্যাশোনাল্যাণ্ডে খনন কাজের অনুমতি চেয়ে দূত পাঠালো লোবেনগুলার কাছে। অল্প ক'জন লোক মাটি খুড়ে খনির সন্ধান করবে, লোবেনগুলা আপত্তি করলেন না। কিন্তু রোডস এই সুযোগে বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী পাঠালো বিশাল এলাকা জবর দখল করার জন্যে। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না লোবেনগুলা, তিনি প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ কানে তুললো না রোডস্। তার বাহিনী এগোতেই থাকলো, এবং কারণে অকারণে ম্যাটাবেলদের ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালালো। অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে দেখে যোদ্ধাদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করলেন লোবেনগুলা। এটাকেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করলো রোডস্, সে তার নির্দয় সশস্ত্র বাহিনীকে ম্যাটা-বেলদের ওপর লেলিয়ে দিলো। ম্যাটাবেল যোদ্ধাদের কাছে আগ্নে-য়াস্ত্র ছিলো না, ফলে শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর গুলিতে কাতারে কাতারে মারা পড়তে লাগলো তারা। অগত্যা বাধ্য হয়ে উত্তর দিকে পিছু হটতে হলো লোবেনগুলা আর তার অবশিষ্ট যোদ্ধাকে—সাথে থাকলো স্ত্রী, বাচ্চা কাচ্চা, পশুর পাল— আর, হীরে।

দুর্গম, নির্জন এক জায়গায় বিশ্রামের জন্যে থামলেন লোবেন-গুলা। মাতৃভূমির বীর সন্তানদের হারিয়ে তাঁর মন ভেঙে গেছে। ম্যাটাবেল উপজাতির এই দুর্দশার জন্যে নিজেকে দায়ী করলেন তিনি। তাঁর সৎ ভাই, গানডাংকে কাছে ডেকে বললেন, আজ থেকে তুমিই ম্যাটাবেলদের রাজা। ওঝাকে ডেকে বললেন, বিষ তৈরি করো।

একটা গুহার ভেতর লোবেনগুলার লাশকে খাড়াভাবে বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। লাশের চারদিকে তাঁর ব্যক্তিগত

জিনিস-পত্র সব সাজিয়ে দিলেন গানডাং—তার অ্যাসেগাই, যুদ্ধ জয়ের প্রতীক পাখির পালক, পশমের পোশাক, বিছানা-বালিশ, আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি, মদ খাওয়ার পাত্র, আর হীরে। একটা চিতাবাঘের ছাল দিয়ে মুড়ে দেয়া হলো লাশ, লাশের পায়ের কাছে থাকলো পাঁচটা এক গ্যালনের পাত্র। এরপর গুহামুখ বন্ধ করে দেয়া হলো, মুখটা যাতে কেউ চিনতে না পারে সে-ব্যবস্থাও করা হলো।

বিষ পানের আগে লোবেনগুলা নাকি বলে গেছেন, এমন একদিন আসবে যখন আমার ম্যাটাবেল উপজাতির দরকার হবে এই হীরে। সেইদিন না আসা পর্যন্ত রাজার ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলের ছেলে এই গুপ্তধন পাহারা দিয়ে রাখবে।

•

'ম্যাটাবেল উপজাতির শেষ রাজার একমাত্র ছেলে তুমি,' জেনারেল মাজুলেটকে বললো উমাঙ্গো। 'কাজেই হয় তোমার দাদা, না হয় তোমার বাবা তোমাকে বলে গেছে কোথায় আছে সেই গুপ্তধন। গুহাটা তুমি চেনো।'

পুনর্বাসন কেন্দ্রের অফিসার্স মেসে একটা টেবিলের পিছনে পাশাপাশি বসে রয়েছে উমাঙ্গো আর মিঃ এক্স। টেবিলের সামনে লম্বা একটা বেঞ্চ, তাতে বসে আছে জেনারেল মাজুলেট। গোসল করার, আর কাপড় পরার সুযোগ দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু পানি বা আর কিছু খেতে দেয়া হয়নি।

টেবিলের ওপর ভোদকা আর হুইস্কির বোতল, একজোড়া গ্লাস, দু'প্লেট কেক, ইত্যাদি রয়েছে। যে যার গ্লাসে চুমুক দিলো ওরা দু'জন, মাজুলেটকে একবারও সাধলো না। মাজুলেট চুপ করে আছে দেখে আবার বললো উমাঙ্গো, 'তুমি জানো, নিশ্চই জানো। এখান

থেকে বিশ মাইলের মধ্যে কোথাও আত্মহত্যা করেছিল লোবেনগুলা, তার সামাধিও আশেপাশে কোথাও আছে।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে মাজুলেট। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি, বোতল আর গ্লাসের দিক থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে রাখলো সে। 'বোকার স্বর্গে বাস করছো তুমি, উমাঙ্গো,' শান্তভাবে বললো সে। 'গুহাটা কোথায় আমি জানি না। আর জানলেও...'

হেসে উঠে মাজুলেটকে থামিয়ে দিলো উমাঙ্গো। 'ধৈর্যের অভাব নেই আমার। প্রায় নব্বুই বছর ওখানে আছে হীরেগুলো, আরো কিছুদিন থাকলে ক্ষতি নেই। জানো যখন, এক সময় না এক সময় ঠিকই বলতে হবে তোমাকে। নিজের প্রাণ, আর প্রেমিকা, দুটোই তোমার কাছে প্রিয়, আমরা জানি। তাকে নিয়ে যদি নিরাপদে অন্য কোনো দেশে চলে যেতে চাও, গুহাটা কোথায় বলতেই হবে তোমাকে।'

চমকে উঠলো মাজুলেট।

'হ্যাঁ,' একটা চোখ টিপে ব্যঙ্গ করলো উমাঙ্গো। 'তোমার প্রেমিকা মিরাণ্ডা নয়নি এখন আমাদের হাতে।'

'বিশ্বাস করি না,' বললো মাজুলেট। কোর্টরুমে সংকেত দিয়ে মিরাণ্ডাকে সাবধান করেছিল সে, লুকিয়ে পড়তে বলেছিল। তার নির্দেশ মিরাণ্ডা অমান্য করবে না। 'মিরাণ্ডা তোমাদের হাতে থাকলে তাকে তোমরা আমার সামনে আনতে।'

'আছে কিনা সময় হলেই দেখতে পাবে।'

'থাকলেও কিছু এসে যায় না,' বললো মাজুলেট ; ভাবলো, সম্ভবত মিরাণ্ডাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ওরা। 'সাধারণ একটা মেয়ে বৈ তো নয়, তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তোমরা।

হয়তো একটু দুঃখ পাবো, তার বেশি কিছু না।' তার কাছে মিরা-ণ্ডার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই এটা বোঝাতে পারলে ওরা হয়তো মিরাণ্ডাকে খুঁজবে না।

'ক্যাপটেন, বন্দীকে নিয়ে যাও।' হুকুম করলো উমাঙ্গো।

মেসে আর কেউ যখন নেই, মিঃ এক্স জানতে চাইলো, 'মেয়েটা কোথায় সত্যি জানেন আপনি?'

'না। কিন্তু এ শুধু সময়ের ব্যাপার, তাকে আমরা ঠিকই খুঁজে বের করবো।'

'সময়, হ্যাঁ,' চিন্তিতভাবে বললো মিঃ এক্স। 'সব কিছুর জন্যেই একটা সময়-সীমা থাকে। আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন, এখানে বেশিদিন থাকতে পারবো না আমি। ফিরে গিয়ে কি বলবো কর্তাদের? বলবো, জেনারেল উমাঙ্গো গুপ্তধনের সন্ধানে আছেন? ওরা আমাকে পাগলাগারদে পাঠাবে।'

'এক মাস, তার বেশি নয়,' বললো উমাঙ্গো। 'এক মাসের মধ্যে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার, মানে, ওই ডলারের হীরে পেয়ে যাবেন আপনারা।'

'আজ দশ তারিখ, এ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সময় দেয়া গেল আপনাকে,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো মিঃ এক্স।

'কিন্তু...'

'আগামী মাসের এক তারিখে ফিরে যাবো আমি,' জানিয়ে দিলো মিঃ এক্স। 'তার আগে হীরে চাই, জেনারেল মাজুলেটকেও চাই। তাঁকে খাইয়েদাইয়ে সুস্থ করুন, তা না হলে চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে। আর যদি ফেল করেন, আমার বসদের আমি এই প্রজেক্ট বাতিল করতে বলবো।'

চার

পরদিন থেকে আবার সাদা পাঁচিলের সামনে দাঁড় করানো হলো মাজুলেটকে। পানি ছাড়া শুধু কেক খেতে দেয়া হলো। একজন ডাক্তার এলো, মাজুলেট শুধু মৃত্যুর কিনারায় পৌছুলে উমাঙ্গোকে সাবধান করবে। সকালে পাঁচিলের সামনে নিয়ে যাবার আগে, আর সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনার পর বন্দীকে গুণে গুণে পঁচিশটা করে চাবুক মারা হলো।

যন্ত্রণা আর পিপাসায় খানিক পর পর জ্ঞান হারালো মাজুলেট, জ্ঞান ফেরার পরও গায়ে জ্বর-জ্বালা নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকলো সে। বোধ শক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে, সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এর মধ্যে একদিন তাকে দেখতে এলো উমাঙ্গো।

প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে বললো সে। লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়া হবে একটা হায়েনা আর মাজুলেটকে। হায়েনার গলায় লোহার শিকল থাকবে, ফলে ওটা শুধু মাজুলেটের হাঁটু পর্যন্ত পায়ের নাগাল পাবে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল মাজুলেটের, তবু মুখ খুললো না। লোবেনগুলার গুপ্তধন ম্যাশোনা শয়তানটার হাতে তুলে দিতে রাজি

নয় সে। মরতে হয় সে-ও ভালো।

মাজুলেট আন্দাজ করলো, উমাঙ্গোর লোকেরা জঙ্গলের ভেতর ফাঁদ পেতে হায়েনা ধরার চেষ্টা করছে। মনে মনে প্রার্থনা করলো সে, তার আগেই যেন মারা যাই আমি।

সাদা পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে আরো ক'টা দিন কাটলো। প্রতিদিন তিন চার জন ম্যাটাবেলকে গুলি করে মারলো ফায়ারিং স্কোয়াড। এক সকালে ঘুম ভাঙার পর নড়ার শক্তি পেলো না মাজুলেট, বুঝলো আজ তাকে পাঁচিলের সামনে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ক্যাম্প জেগে উঠছে। ঘরের সামনে দিয়ে মার্চ করে গেল গার্ডরা। চড়-চাপড়ের শব্দ ভেসে এলো, গুঙিয়ে উঠলো বন্দীরা। কয়েক-জনকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো বধ্যভূমিতে।

একটু পরই তাকে নিতে আসবে ওরা। আজ পাঁচ দিন এক ফোঁটা পানি দেয়া হয়নি তাকে। ঘরের কোণে একটা মাত্র শানকিতে কেক থাকে, পানির শানকিটা অদৃশ্য হয়েছে। নেই জানে, তবু ঘরের কোণে করুণ চোখে তাকালো সে।

একটা মাটির হাঁড়ি। দেখেও যেন বিশ্বাস হলো না। অনেক কষ্টে হাত তুলে চোখ রগড়ালো মাজুলেট। না, ঠিকই দেখছে সে, দৃষ্টিভ্রম নয়। হাঁড়ি কেন? কি আছে ওতে? তারপর মনে পড়লো, ক'দিন আগেও হাঁড়িটা দেখেছে সে। পানি আছে মনে করে সামনে গিয়ে দেখেছিল, খালি। আরেকবার, সত্যি সত্যি হাঁড়িতে পানি ছিলো। লোভীর মতো তাড়াহুড়ো করে গলায় পানি ঢালতেই বমি করে ফেলেছিল সে। পানি নয়, গার্ডেরা প্রস্রাব করে রেখেছিল, তাতে আবার মেশানো ছিলো প্রচুর লবণ।

জানে হাঁড়িটায় পানি নেই, তবু নিজের অজান্তেই বারবার ওদিকে

চোখ যাচ্ছে। তারপর কখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করেছে, নিজেও বলতে পারবে না। তিন হাত দুরত্ব পেরোতে যেন এক যুগ লেগে গেল। খানিক দুর থেকেই পানির গন্ধ পেলো মাজুলেট, তারপর দেখলো হাঁড়িটা কানায় কানায় ভরা। বাকি দুরত্বটুকু এক নিমেষে পেরিয়ে এলো সে, এটাও যে একটা ফাঁকি হতে পারে সে-চিন্তা জোর করে ভুলে থাকলো। পানিতে একটা আঙুল ডুবিয়ে জিভে ঠেকালো, মিষ্টি—মধুর স্বাদ।

খুশিতে আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো মাজুলেট, হাঁড়িতে মুখ দিয়ে চুমুক দিলো। হঠাৎ ভয় হলো, এখুনি কেউ ভেতরে ঢুকে হাঁড়িটা কেড়ে নেবে। কোথা থেকে শক্তি এসে গেল, উঠে বসে হাঁড়িটা দু'হাতে ধরে মুখের সামনে তুললো সে, ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করলো।

খালি পেট ফুলে উঠলো। শুয়ে পড়লো মাজুলেট, পরিষ্কার অনুভব করলো, শুকিয়ে যাওয়া টিস্যুগুলো পানি পেয়ে সজীব হয়ে উঠছে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ঢক ঢক করে পানি খেলো সে। ধীরে ধীরে বল ফিরে আসছে হাত-পায়ে। দু'ঢোক করে পানি খেলো, তারপর খানিক বিশ্রাম নিলো, এভাবে চললো যতোক্ষণ না খালি হলো হাঁড়ি। তিন ঘণ্টা পর আজ অনেকদিন বাদে প্রথম প্রস্রাব করলো সে।

এরপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো মাজুলেট। ঘুম ভাঙার পর বিস্মিত হয়ে ভাবলো, কি ব্যাপার, আজ তাকে পাঁচিলের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো না কেন!

দুপুরবেলা এলো ওরা। প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে যাবে মাজুলেটকে। পানিতে ভরা পেট টবটব করছে, মনে নতুন শক্তি পেয়েছে মাজুলেট।

তার মনে হলো, এদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনন্তকাল যুঝতে পারবে সে।

প্যারেড গ্রাউণ্ড অর্ধেক পেরিয়ে এসে হঠাৎ খটকা লাগলো তার। পাঁচিলের দিকে মুখ করা একটা একচালা দেখলো সে, দেয়াল নেই। ছায়ায় একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার রয়েছে, টেবিলের ওপর লাঞ্চ।

একটা চেয়ার খালি, অপরটায় বসে আছে উমাঙ্গো। একচালার পাশ দিয়ে পাঁচিলের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো মাজুলেটকে, উমাঙ্গো একবার ফিরেও তাকালো না।

সাদা পাঁচিলের সামনে আজ মাত্র একজন বন্দীকে দেখলো মাজুলেট, খুঁটির সাথে বাঁধা। চোখে রোদ আর সাদা ঝলক লাগছে বলে বন্দীকে চিনতে পারলো না সে। কিন্তু দ্বিতীয় বার তাকাতে হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো, বন্দী নয়, বন্দিনী—একটা মেয়ে।

মেয়েটা নগ্ন—একজন যুবতী। কড়া রোদে কোমল মখমলের মতো দেখালো তার চামড়া। পা দুটো লম্বা, সুগঠিত নিতম্ব, গম্বুজ আকৃতির ভরাট স্তন। হাত-পা বাঁধা, তাই লজ্জা ঢাকার কোনো উপায় নেই বেচারির। মাজুলেটের দৃষ্টি পা থেকে ক্রমশ ওপর দিকে উঠলো, তাকালো মুখের দিকে।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। সব শেষ।

হাত ছেড়ে দিলো গার্ড, টলতে টলতে মেয়েটার দিকে এগোলো মাজুলেট। মেয়েটার চোখ দুটো আতংকে আর লজ্জায় বিস্ফারিত, তবু প্রিয়জনকে দেখে নিজের কথা ভুলে গেল সে। 'মাজুলেট! ওরা তোমার একি অবস্থা করেছে!'

'মিরাণ্ডা!' দুর্বল শরীরে প্রিয়তমাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও

নিজেকে সামলে নিলো মাজুলেট, দুটো নগ্ন শরীরকে এক হতে দেখলে অশ্লীল শব্দে হেসে উঠবে গার্ডরা। 'ওরা তোমাকে পেলো কিভাবে?'

'তোমার আদেশ আমি ভুলিনি,' ম্লান গলায় বললো মিরাণ্ডা নয়নি। 'পাহাড়ে লুকিয়েছিলাম, এই সময় একটা মেসেজ পেলাম, আমার এক ছাত্রী মারা যাচ্ছে। ডিসেন্ট্রি হয়েছে, কিন্তু কোনো ডাক্তার নেই। খবরটা শুনে স্থির থাকতে পারিনি...'

'মিথ্যে খবর দিয়ে...'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার কথা ভেবো না, আমাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা, তুমি...'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মাজুলেট। আজ, এই মুহূর্তে হঠাৎ করে মনে হলো, মিরাণ্ডার মতো সুন্দরী এবং ভালো মেয়ে দুনিয়ায় বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। একটা আঙুল দিয়ে মিরাণ্ডার ঠোঁট স্পর্শ করলো সে, আঙুলটায় চুমো খেলো মিরাণ্ডা।

ঘুরে দাঁড়ালো মাজুলেট, গার্ডরা তার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো। সোজা হেঁটে এসে একচালার নিচে ঢুকলো সে। মুখ তুলে তাকালো উমাঙ্গো, কথা বললো না, ইঙ্গিতে শুধু খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো।

'প্রথমে ওর বাঁধন খুলে দিয়ে ওকে কাপড় পরতে দাও।'

গার্ডদের নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। একটা চাদর নিয়ে নিজেকে ঢাকলো মিরাণ্ডা, গার্ডদের পিছু পিছু একটা কুঁড়েঘরের দিকে এগোলো।

'বতসোয়ানায় পাঠাতে হবে ওকে,' বললো মাজুলেট। 'ফ্রান্সিস-টাউনে। ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।'

'টুটি এয়ারফিল্ডে হালকা একটা প্লেন অপেক্ষা করছে। খাও, মাজুলেট, গায়ে তোমার শক্তি হওয়া দরকার।'

'নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুবার পর, রেডিও বা টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলবে মিরাণ্ডা,' বললো মাজুলেট। 'ওকে আমি একটা কোড-ওয়ার্ড বলে দেবো, সেটা রিপিট করবে ও।'

'রাজি।' মাজুলেটের জন্যে কাপে মিষ্টি চা ঢাললো উমাঙ্গো।

প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিরাণ্ডার সাথে কথা বললো মাজুলেট। ওদের দিকে রাইফেল তাক করে একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গার্ডরা। চোখে পানি নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো মিরাণ্ডা, তাকে থামিয়ে দিলো মাজুলেট।

'সময় কম, যা বলছি মন দিয়ে শোনো।' মাজুলেটকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখলো মিরাণ্ডা। 'আমার কয়েকজন বন্ধু থার্ড ব্রিগেডের হাত থেকে পালিয়ে গেছে। আমার ধারণা, পালিয়ে বতসোয়ানায় চলে গেছে ওরা। যেখানেই থাকুক, ওদের তুমি খুঁজে বের করবে। বলবে···।'

যা শুনলো সব আবার পুনরাবৃত্তি করলো মিরাণ্ডা।

চোখের কোণ দিয়ে মাজুলেট দেখলো, গার্ডরা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁচ মিনিট সময়-সীমা শেষ হয়ে গেছে। 'তুমি ফ্রান্সিসটাউনে পৌঁছুবার পর, ওরা আমাকে তোমার সাথে টেলিফোনে কথা বলতে দেবে। সব খবর যদি ভালো হয়, তুমি আমাকে সিনডেবেল ভাষায় বলবে, সব খবর ভালো...ভেবো না। কি বলবে?'

'সব খবর ভালো···ভেবো না। কিন্তু তুমি···তোমার কি হবে?'

'জানি না,' মৃদু কণ্ঠে বললো মাজুলেট। 'শুধু জানি, বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো। অনেক কিছু নির্ভর করছে আমার বন্ধুদের সাথে

তোমার দেখা হওয়ার ওপর।'

'আমি যাবো না…' ডুকরে উঠলো মিরাণ্ডা।

দু'জন গার্ড পাশে এসে দাঁড়ালো। উল্টোদিক থেকে এলো একটা ল্যাণ্ড-রোভার।

'শক্ত হও,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো মাজুলেট। 'বিপদের সময় ভেঙে পড়তে নেই। যাও।' মিরাণ্ডাকে একরকম জোর করে ল্যাণ্ড-রোভারে তুলে দিলো সে।

তিন দিন পর অফিসার্স মেসে ডাক পড়লো মাজুলেটের। তার হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা ধরিয়ে দিলো উমাঙ্গো।

'মাজুলেট।'

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো মিরাণ্ডার কণ্ঠস্বর। 'আমি মিরাণ্ডা। মাজুলেট, কেমন আছো তুমি?'

'ভালো। তুমি?'

'ভালো। ফ্রান্সিসটাউনে আছি। রেডক্রস আমার দেখাশোনা করছে।'

'কোনো অসুবিধে নেই?'

সিনডেবেল ভাষায় মিরাণ্ডা বললো, 'সব খবর ভালো…ভেবো না।' তারপর ইংরেজীতে বললো সে, 'এদের যত্নে কোনো ত্রুটি নেই। চিন্তা করো না…'

ছোঁ দিয়ে মাজুলেটের হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিলো উমাঙ্গো। 'দুঃখিত, বিলটা আমি দিচ্ছি।' একজন গার্ডকে টেবিলের ওপর রাখা টেপ-রেকর্ডারটা দেখিয়ে বললো, 'এটা নিয়ে যাও; একজন ম্যাটাবেল কয়েদীকে দিয়ে কথাগুলো ইংরেজী করে আনো।'

গার্ড বেরিয়ে যেতে মাজুলেটের দিকে ফিরলো সে। 'জেনারেল মাজুলেট, তোমার ছুটি শেষ। এবার আমরা অভিযানে বেরুবো, তাই না?'

বিশ বছর আগে ওর দাদা ওকে লোবেনগুলার সমাধিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রওনা হবার পর আজ তার একটাই চিন্তা, যতোটা সম্ভব দেরি করে পৌঁছুতে হবে সমাধিতে। যতো দেরি করবে ততোই বাড়বে তার আয়ু। তবে আরেকটা চিন্তা বারবার উঁকি দিলো মনে, এতো বছর পর সমাধির পথ খুঁজে পাবে তো?

উমাঙ্গোর প্রস্তাব ছিলো হেলিকপ্টার নিয়ে সরাসরি সমাধিতে পৌঁছুবে ওরা। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে মাজুলেট। ওখানে মাত্র একবার গেছে সে, পায়ে হেঁটে, আবার খুঁজে বের করতে হলে ওই পায়ে হেঁটেই যেতে হবে তাকে।

মেটো পথ ধরে রওনা হলো ওরা, প্রথম চিহ্নটা খুঁজে বের করতে হবে: পুরনো নদী-পথের ওপর বিশাল সব পাথরের স্তম্ভ নেমে এসেছে, আর, বোল্ডারের প্রকাণ্ড স্তূপটা হাতির মাথার মতো দেখতে।

মাজুলেট যে সত্যি সত্যি চিহ্নটা খুঁজে পাচ্ছে না, উমাঙ্গোকে বিশ্বাস করানো কঠিন হয়ে উঠলো। ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে তিন দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর ক্ষুদে একটা গ্রামে পৌঁছুলো ওরা। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল, পুরনো পথটা এখন আর নেই, ব্রিজটাও ভেঙে গেছে।

ঝোপের ভেতর ঢাকা পড়া পুরনো পথটা অবশেষে পাওয়া গেল, সেটা ধরে হেঁটে চার ঘণ্টা পর শুকনো নদীর মেঝেতে নেমে এলো

দলটা। ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে, ভাঙা অংশগুলো ঢাকা পড়ে আছে লতা-পাতায়। তবে উজানের দিকে উঠে যাওয়া পাথুরে দেয়াল আগে যেমন ছিলো তেমনি আছে, একটু বদলায়নি।

পিছনে সশস্ত্র ট্রুপারদের নিয়ে এগোলো মাজুলেট। ধীরেসুস্থে, থেমে থেমে আগে বাড়লো সে, গার্ডদের পিছনে অধৈর্য উমাঙ্গো নিষ্ফল রাগে ফুঁসতে লাগলো।

তিন বার ইচ্ছে করে পথ হারালো মাজুলেট, শেষবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো উমাঙ্গোর। তার নির্দেশে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হলো বন্দীকে, গোড়ালি আর কব্জি জোড়া এক করে বাঁধা হলো রশি দিয়ে। উপুড় করে শোয়ানো মাজুলেটের পিঠে সপাং সপাং চাবুক মারলো উমাঙ্গো, অশ্রাব্য খিস্তির বন্যা বইয়ে দিলো।

আবার পথ চিহ্ন খুঁজে নিয়ে এগোতে হলো। অবশেষে এক সময় পাহাড়টার কাছে পৌঁছুলো সে। ওদের সামনে অকস্মাৎ উদয় হলো পাহাড়, ঠিক যেভাবে প্রথমবার উদয় হতে দেখেছিল মাজুলেট।

কালো পাথরে ঢাকা একটা খাদ ধরে এগোচ্ছিল ওরা, হাজার বছরের বৃষ্টির পানি খরবেগে বয়ে যাওয়ায় চকচকে মসৃণ হয়ে আছে পাথরের গা। খাদের গভীর তলদেশে ঝলমলে সবুজ পানি, পানির নিস্তরঙ্গ গা ভেদ করে মাঝে মধ্যে লাফ দিয়ে উঠছে রূপালি মাছ। ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছে ক্ষুদে লেজ নিয়ে লাল নীল প্রজাপতি।

খাদের একটা বাঁক ঘুরে এলো ওরা, হাতির রঙ আর আকৃতি নিয়ে পড়ে থাকা পাথরগুলো টপকে। হঠাৎ করেই ওদেরকে ঘিরে থাকা পাহাড়-প্রাচীর দূরে সরে গিয়ে উন্মুক্ত করে দিলো চারদিক, পিছিয়ে পড়লো বনভূমি। ওদের সামনে হঠাৎ উন্মোচিত হলো ফারাওদের পিরামিডের মতো আকাশ ছোঁয়া লোবেনগুলার

পাহাড়।

খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিশ-বাইশ রঙের শেওলা জমেছে, বেশির ভাগই সাদাটে হলুদ থেকে গাঢ় হলুদের মাঝখানে। ওপরের দিকের কার্ণিশগুলোয় শকুনদের আস্তানা, শিশুদের বাসায় রেখে মা-বাবারা লম্বা ডানা মেলে পাহাড়ের মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে। 'এটাই সেই রাজার পাহাড়,' বিড়বিড় করে বললো মাজুলেট।

চূড়ায় ওঠার পথটা একটা ফাটল ধরে ওপর দিকে উঠে গেছে, সারাটা পথে কালো পাথরের ওপর লাইমস্টোনের আচ্ছাদন। পথটা কোথাও কোথাও প্রায় খাড়া আর সরু, অস্ত্র আর বোঝা নিয়ে এগোতে শুরু করে ভয়ে ভয়ে নিচের খাদের দিকে তাকালো ট্রুপাররা। কিনারা ঘেঁষে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপর দিকে উঠলো ওরা, ভেতরের দিকের খাড়া পাঁচিলে বুক ঠেকিয়ে। মাজুলেট আর উমাঙ্গো অবশ্য দিব্যি উঠে গেল, বিপজ্জনক সরু কিনারার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেও ওদের পা কাঁপলো না—ফলে অনেক নিচে পিছিয়ে পড়লো ট্রুপাররা।

মাজুলেট ভাবলো, একটু অসতর্ক পেলে ওকে আমি ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, দেখলো, দশ পা পিছনে রয়েছে উমাঙ্গো। তার ডান হাতে টোকারেভ পিস্তল, চোখাচোখি হতে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো। বললো, 'না।'

দু জনেই দু জনেই মনের কথা বুঝলো ওরা। আপাততঃ প্রতিশোধের কথা ভুলে গিয়ে ওপর দিকে উঠতে থাকলো মাজুলেট। একটা বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কাঁধে উঠে এলো ওরা, গভীর খাদ থেকে পাঁচশো ফিট ওপরে।

পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, গায়ে সাদাটে রোদ

নিয়ে দু'জনেই ঘামছে. বহু নিচে চওড়া জাম্বেজি উপত্যকার দিকে তাকালো ওরা। ওদের দৃষ্টি পথের শেষ সীমায় লেক কারিবা-র পানি ঝিলমিল করছে। লেক আর পাহাড়ের মাঝখানে গভীর বন-ভূমি, খরা মৌসুমের প্রথম ক্ষুদে দাবানল থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে। পাহাড়ের কাঁধে উঠে এসে হাঁপাতে লাগলো ট্রুপাররা। মাজুলেটের দিকে তাকালো উমাঙ্গো।

'কাছেই,' বললো মাজুলেট।

আরেকটা বাঁক নিয়ে কাঁধের আরেক দিকে চলে এলো ওরা। পাথরের গড়ন আর চেহারা এদিকে বদলে গেছে। একটা ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামলো মাজুলেট, ফাটল ধরা পাঁচিলের গায়ে কাত হয়ে পড়া স্তম্ভের মতো ঠেস দিয়ে রয়েছে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর সারি। ফাটলগুলোর ভেতর গাছের মোটা শিকড় দেখা গেল, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে অসংখ্য সরীসৃপের মতো ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো চার-দিকে। ভাঙাচোরা পাথর আর গাছের শিকড় টপকে একটা নালার মুখে এসে থামলো ওরা। নালায় প্রাচীন একটা বুনো ডুমুর গাছ, হলুদ রঙের শাখাগুলো ফলের ভারে নুয়ে আছে। গাছটার কাছা-কাছি আসতে এক ঝাঁক সবুজ ডানার তোতা ডুমুর খাওয়া ফেলে আকাশে উড়লো। গাছের গোড়ায় পাহাড়-প্রাচীরে অসংখ্য ফাটল দেখা গেল, শিকড়গুলো পথ করে নিয়ে সে-ফাটল দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

পাহাড়-প্রাচীরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো মাজুলেট। আড়চোখে তাকিয়ে উমাঙ্গো দেখলো, তার ঠোঁট জোড়া নিঃশব্দে নড়ছে। আরো সতর্কতার সাথে পাহাড়ের গায়ে চোখ বুলালো উমাঙ্গো। হঠাৎ উপলব্ধি করলো সে, পাথরের গায়ে ফাটলগুলো পরস্পরের

কাছ থেকে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে রয়েছে, প্রকৃতি ওগুলোকে এভাবে সাজিয়ে রাখতে পারে না।

'এদিকে।' ট্রুপারদের ডাকলো সে। প্রাচীরের মুখে বসানো একটা পাথরের চাঙের দিকে আঙুল তাক করলো। বেয়নেট আর খালি হাত সম্বল করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রুপাররা।

পনেরো মিনিট ঘাম ঝরিয়ে চাঙটা খুলে আনলো ওরা। সেই সাথে পরিষ্কার হয়ে গেল, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে এই অংশটুকু রাজমিস্ত্রীদের তৈরি একটা দেয়াল ছাড়া কিছু নয়। চাঙটা সরাবার পর হাতে তৈরি আরো একটা দেয়াল দেখতে পেলো ওরা।

মুখের দু'পাশের পাথর সরাতেই সন্ধ্যে হয়ে এলো। সামনের সারির চাঙগুলো সরিয়ে চওড়ায় আর গভীরতায় সামান্য একটু জায়গা বের করতে পেরেছে ওরা, সেখানে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মাত্র দু'জন লোক ভেতরের দেয়াল ভাঙার কাজ করতে পারবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাতের মতো কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। একজন ট্রুপার আর মাজুলেটের হাত এক করে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো, তবু ক্লান্ত শরীর নিয়ে অঘোরে ঘুমালো মাজুলেট। ভোরে উমাঙ্গোর লাথি খেয়ে ঘুম ভাঙলো ওর। ভুট্টা দিয়ে তৈরি কেক আর মিষ্টি চা খেতে দেয়া হলো। ওগুলো নাকে মুখে গুঁজে আবার কাজে হাত লাগালো ওরা।

কাল কাজ করতে গিয়ে আঙুলের নখ ভেঙে গেছে মাজুলেটের। আজ তাই হাত চলছে না তার, আর না চললেই পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়ছে।

মাজুলেট একাই সোয়া মন ওজনের একটা পাথর সরিয়ে ভেতরের দেয়ালের ভিত দুর্বল করে তুললো। এরপর একজন ট্রুপারকে সাথে

নিয়ে, মোটা একটা গাছের ডালের সাহায্যে, বিশাল একটা পাথরকে সরিয়ে আনলো। পাথরটা নড়তে শুরু করতেই ভেতরের দেয়াল কাত হয়ে পড়লো ওদের দিকে। লাফ দিয়ে সরে গেল সবাই, নাকে মুখে ধুলো ঢুকে যাওয়ায় খক খক কাশতে শুরু করলো।

গুহার ভেতরটা অন্ধকার, ভেতর থেকে ভ্যাপসা একটা গরম ভাপ বেরিয়ে এলো। 'তুমি আগে,' মাজুলেটকে নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো।

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে পা বাড়ালো মাজুলেট। গুহামুখে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো সে। পিছন থেকে টর্চের আলো ফেললো উমাঙ্গো।

পায়ের নিচে মসৃণ মেঝে, নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সন্দেহ নেই, একজন রাজার সমাধি হবার আগে পর্যন্ত গুহাটা কয়েক হাজার বছর ধরে বুনো পশুদের আস্তানা ছিলো।

মাজুলেটের পিছনে থেকে ওপর দিকের দেয়াল আর ছাদে টর্চের আলো ফেললো উমাঙ্গো। এক সময় বুশম্যানরাও বসবাস করতো এই গুহায়, দেয়ালের গায়ে তাদের আঁকা ছবিগুলো এখনো অক্ষত রয়েছে। সোজা সামনের দিকে আলো ফেললো উমাঙ্গো, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে গুহাটা, তারপর বাঁক নিয়ে চলে গেছে আরেক দিকে। বাঁকের কাছে পৌঁছে ইতস্তত করতে লাগলো মাজুলেট, বিড়বিড় করে পূর্ব-পুরুষদের কাছে ক্ষমা চাইলো।

'কি হলো!' ধমক দিলো উমাঙ্গো।

বাঁকের কাছে ছাদ এতো নিচু যে কোমরের কাছে শরীর ভাঁজ করে এগোতে হলো ওদেরকে। বাঁক ঘুরে সুড়ঙ্গ ধরে এগোলো ওরা, পঞ্চাশ পা হেঁটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুড়ঙ্গ থেকে প্রশস্ত একটা গুহায় বেরিয়ে এসেছে মাজুলেট। মেঝেটা সমতল,

কিন্তু ছাদ থেকে খসে পড়া পাথর ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। ছাদটা ওদের মাথার ওপরে ত্রিশ ফুট উঁচুতে, গম্বুজ আকৃতির। চারদিকে টর্চের আলো ফেললো উমাঙ্গো। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা কার্ণিশ দেখা গেল, কাঁধ সমান উঁচুতে, তাতে অদ্ভুত আকৃতির কি যেন সব রয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ওগুলো চিনতে পারলো মাজুলেট। এক শো বছর আগে তৈরি একটা ওয়াগনের এক জোড়া চাকা এরপর একে একে ওয়াগনের ফ্রেম আর অন্যান্য অংশও চিনতে পারলো সে। বাহনটাকে খুলে গুহার ভেতর নিয়ে আসা হয়েছিল। রাজা লোবেনগুলার অত্যন্ত প্রিয় বাহন ছিলো এটা।

মাজুলেটের পিঠে টোকারেভ পিস্তলের মাজল ঠেকলো, ছড়ানো পাথর টপকে সামনের দিকে এগোলো সে। পিরামিডের আকৃতি নিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে তিনটে রাইফেল, পুরনো লী-এন ফিল্ড ওগুলো—সিসিল রোডস খননের অনুমতি পাবার বিনিময়ে লোবেনগুলাকে উপহার দিয়েছিল। এই সামান্য মূল্যেই একটা জাতি তার জমি আর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়, তিক্ত মনে ভাবলো মাজুলেট। কার্ণিশের ওপর আরো অনেক জিনিস স্তূপ করে রাখা হয়েছে—চামড়ার তৈরি লবণের ব্যাগ, লোহার তৈরি অস্ত্র আর ছুরি, হাতির দাঁত, মুক্তো বসানো অলংকার, চওড়া ফলার অ্যাসে-গাই, ইত্যাদি।

'তাড়াতাড়ি করো!' তাগাদা দিলো উমাঙ্গো। 'লাশটা কোথায় দেখতে চাই আমি। হীরেগুলো লাশের সাথেই থাকবে।'

হাড়! টর্চের আলোয় চকচক করে উঠলো ওগুলো, কার্ণিশের নিচে একটা স্তূপ হয়ে রয়েছে।

একটা খুলি। ভয় দেখিয়ে হাসছে সেটা, পশমের আবরণ মাথা-টাকে ঢেকে রেখেছে আজও।

'ওই তো!' উল্লাসে লাফ দিলো উমাঙ্গো। 'শয়তানের বাচ্চা-টাকে পাওয়া গেছে!' খুলি আর হাড়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে।

একটু দূরে নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাজুলেট। হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে, কংকালটা একজন খর্বকায় বুড়ো লোকের, যার সামনের সারির তিনটে দাঁত নেই। লোবেনগুলা ছিলেন প্রকাণ্ড দেহী পুরুষ, তাঁর প্রতিটি দাঁত অক্ষত ছিলো। এটা সম্ভবত ওঝা বুড়োর কংকাল।

ভুলটা বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে সিধে হলো উমাঙ্গো। 'এ লোবেনগুলা নয়! ম্যাটাবেল খুনীরা নিশ্চই তার ওঝাকে বলি দিয়ে এখানে রেখে গিয়েছিল, পাহারাদার হিসেবে।' ব্যস্তভাবে গুহার এদিক সেদিক টর্চের আলো ফেললো সে। 'কোথায় লোবেন-গুলা?' মাজুলেটের দিকে ঝট করে ফিরলো এবার। 'তুমি নিশ্চই জানো ওরা তোমাকে নিশ্চই বলে গেছে!'

মাজুলেট কিছু বললো না। ওঝার কংকালের ওপর, কার্ণিশটা অস্বাভাবিক চওড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, যেন একটা মঞ্চ। মঞ্চের চারধারে রাজার ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র সাজানো ওগুলোর মাঝ-খানেই রাজার লাশ থাকার কথা। মাজুলেটের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে টর্চের আলো ফেললো উমাঙ্গো।

মঞ্চটা সম্পূর্ণ খালি।

'নেই সে!' ফিসফিস করে বললো উমাঙ্গো। 'লোবেনগুলার লাশ গায়েব হয়ে গেছে!' একাধারে হতাশ এবং উত্তেজিত দেখালো

তাকে।

গুহায় ঢোকার সময় দেয়ালের যে নমুনা দেখেছে মাজুলেট, তা থেকে একটাই উপসংহারে পৌঁছুনো যায়। অনেক যুগ আগেই রাজার সমাধিতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা সব নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় অযত্নের সাথে আবার বন্ধ করেছে গুহা-মুখ, সেজন্যেই এতো সহজে দেয়াল ভেঙে ঢুকতে পারলো আজ ওরা। কিন্তু সব নিয়ে পালাবার সময় গুহা-মুখটা বন্ধ করার দরকার পড়লো কেন? এর একটাই উত্তর হতে পারে, ডাকাতির ঘটনা গোপন রাখতে চেয়েছিল ওরা।

আহত পশুর মতো গোঙাতে গোঙাতে পাথুরে মঞ্চের ওপর উঠে পড়লো উমাঙ্গো। মঞ্চের মেঝেতে হাঁটু আর কনুই রেখে পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করছে সে, রাজ্যের জিনিসের ভেতর হাতড়াচ্ছে। তার লোভ আর আশা উপলব্ধি করতে পেরে শিউরে উঠলো মাজুলেট।

'দেখো, এই দেখো!' কালো একটা জিনিস উঁচু করে ধরলো উমাঙ্গো, কয়েক পা সামনে বাড়লো মাজুলেট। মাটির একটা পাত্রের ভাঙা টুকরো ওটা। এ-ধরনের পাত্রে মদ খেতো ম্যাটাবেলরা, কিনারায় রঙিন নকশা থাকতো নকশা করা কিনারার একটা অংশই ধরে রয়েছে উমাঙ্গো। হঠাৎ সে ওটা ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, যেন একটা মাছি ধরতে চায়, দেরি করলে উড়ে যাবে।

'এই যে!' আরো কি যেন একটা পেয়েছে উমাঙ্গো। খুব ছোটো একটা জিনিস। দু'আঙুলে ধরে আছে। টর্চের আলো ফেললো সেটার ওপর। ছোটো আখরোট আকৃতির একটা পাথর, আলো পড়তেই রঙধনুর মতো বিচিত্র রঙ ছড়ালো চারদিকে।

'হীরে!' বহু রঙা আলোর বর্শা লেগে উমাঙ্গোর মুখ ঝলমলে হয়ে উঠলো। 'কি সুন্দর! কি অপূর্ব সুন্দর!' বিড়বিড় করলো সে। তারপরই কালো হয়ে গেল তার চেহারা। 'মাত্র একটা! তাড়াহুড়ো করে নিয়ে যাবার সময় এটা ওরা ফেলে গেছে! কানায় কানায় ভরা পাঁচ পাত্র হীরে—নেই!'

হীরের দিক থেকে মাজুলেটের দিকে চোখ ফেরালো উমাঙ্গো। 'তুমি জানতে! প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো আমার, কি যেন গোপন করে যাচ্ছো তুমি! হীরেগুলো অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তুমি জানতে!'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো মাজুলেট।

চিতার মতো লাফ দিয়ে কার্ণিশ থেকে নেমে এলো উমাঙ্গো, থরথর করে কাঁপছে। পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে মাজুলেটের মুখে বাড়ি মারলো সে। 'বলো!' গর্জে উঠলো। 'কোথায় হীরেগুলো!' একজন ট্রুপার পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো মাজুলেটকে। পিস্তলের ব্যারেলটা বার বার মাজুলেটের গালের ওপর নরম মাংসে থ্যাচ থ্যাচ করে আঘাত করলো।

'হীরে কোথায় বলো!' উন্মাদ হয়ে গেছে উমাঙ্গো। বিস্ফারিত চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো। পিস্তল দিয়ে বার বার আঘাত করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেল তার, নিজেকে সরিয়ে এনে শান্ত করার জন্যে একটা পাথরকে আলিঙ্গন করলো। হিস হিস শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

'এভাবে হবে না!' চোখের পাতা থেকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘামের ফোঁটা মুছে বললো সে। 'তোর জন্যে আরো ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা করবো আমি। তখন তুই আমার পায়ে ধরে মাফ

চাইবি, আর বলবি দয়া করে আমাকে মেরে ফেলো!'

পাঁচ

শরীরের পানি প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিলো সোহানার। ফ্রান্সিসটাউন হসপিটালের ডাক্তাররা রীন্যাল ফেইলার আশংকা করেছিল। তিন দিন স্যালাইন দিয়ে রাখার পর ভয়টা কেটে যায়। ওর কপালের ফোলাটাও ডাক্তারদের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে, তবে এক্স-রে রিপোর্ট নেগেটিভ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রানা। খুব জোরে চোট পেলেও, হাড় কোথাও ভাঙেনি বা চিড় ধরেনি। আরো এক হপ্তা পরিপূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দেয়া হলো ওকে।

বতসোয়ানায় পৌঁছেই নিজেদের জন্যে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলো রানা, কিন্তু জিম্বাবুই সরকার ওদেরকে ফেরত দেয়ার দাবি জানানোয় কর্তৃপক্ষ ইতস্তত করতে লাগলো। প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিকে তারবার্তা পাঠালো রানা, তিনি বতসোয়ানা সরকারের সাথে যোগাযোগ করার পর আর কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু চোখ উল্টে নিলো বিশ্ব-ব্যাংক আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট।

রানা বিশ্ব ব্যাংক, আর সোহানা ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের কাজ নিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকেছিল। এই দুই প্রতিষ্ঠানের আন অফিশিয়াল প্রতি-

নিধি হিশেবে জিম্বাবুইয়ে দায়িত্ব পালন করছে ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে জঁা মন্টিপিলার। ওরা বতসোয়ানায় পৌচেছে, এই খবর পেয়েই প্লেনে করে ফ্রান্সিসটাউনে চলে এলো মন্টিপিলার। তার কাছ থেকে রানা জানলো, মুগাবে সরকার ওদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ষড়যন্ত্র, সরকার উৎখাতের গোপচেষ্টা, জিম্বাবুই নাগরিকদের পাইকারীভাবে হত্যা, লুটতরাজ, ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগ এনেছে। ওদের অনুপস্থিতিতেই বিচার শুরুর আয়োজন চলছে, নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায় বিচারে ওদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

রানাকে অবাক করে দিয়ে মন্টিপিলার বললো, জেনারেল উমাঙ্গোর বিরুদ্ধে ওদের লাগতে যাওয়া উচিত হয়নি। রানা যতোই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—উমাঙ্গোই মাস্টার পোচার, সে-ই ম্যাটাবেলদের পাইকারীভাবে খুন করছে, এমন কি একটা সুপার পাওয়ারের সহযোগিতায় জিম্বাবুইয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবারও চেষ্টা করছে—ততোই বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে মন্টিপিলার। তার ধারণা, সব কিছুর জন্যে ম্যাটাবেলরাই দায়ী, মাজুলেটই মাস্টার পোচার, জেনারেল উমাঙ্গো তার দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করছে। সোহানার তোলা কিছু ফটো দেখানো হলো তাকে, থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা নিরীহ ম্যাটাবেলদের খুন করে রেখে গেছে। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে মন্টিপিলার বললো মনে হতে পারে জেনারেল উমাঙ্গো বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু আসলে ওরা সবাই নিশ্চয়ই বিদ্রোহী ছিলো।

বিশ্ব-ব্যাংক আর ওয়াইল্ডলাইফ কর্তৃপক্ষেরও বিশ্বাস, জিম্বাবুইয়ে তাদের স্বার্থ জেনারেল উমাঙ্গোই রক্ষা করছে। কাজেই তার বিরুদ্ধে গিয়ে ভুল করেছে ওরা।

বিশ্ব-ব্যাংক আর ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের সাথে রানা এজেন্সীর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ওদের আচরণ বা নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান দুটো এখন থেকে আর কোনোভাবে দায়ী থাকবে না।

রানা বুঝলো, উমাঙ্গোর ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না, যা করার নিজেকেই করতে হবে ওর।

জিম্বাবুইয়ে ফিরে যাবার সময় একটা হুমকি মতো দিয়ে গেল মন্টিপিলার। বিশ্ব-ব্যাংকের কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ ডলার ঋণ করেছে রানা, জিম্বাবুই সরকার ওকে শত্রু বলে ঘোষণা করায় টাকা-টা সুদসহ এখুনি ফেরত চায় ওরা। ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাসটিন চ্যাপেল এ-ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে রানাকে নিউইয়র্কে ডেকেছেন।

কিন্তু রানাকে আবার ফিরতে হবে জিম্বাবুইয়ে। অপমান আর বেঈমানীর প্রতিশোধ নেবে ও। থুথু ফেলে চাটছে উমাঙ্গো, কাপড় ভিজিয়ে ফেলে নাকে খত দিচ্ছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে নিজের রক্তের ওপর, এই দৃশ্যগুলো চোখে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই ওর।

বেঁচে থাকলে উদ্ধার করতে হবে মাজুলেটকে। ফিরে পেতে হবে মিঃ রুবেনসনের সম্পত্তি।

সকাল দশটায় হাসপাতালে পৌছুলো রানা, আজ ছাড়া পাবে সোহানা। নতুন জিনস আর শার্ট পরে তৈরি হয়েই আছে সে। রানার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, নতুন ল্যাণ্ড-রোভার দেখে অবাক হয়ে গেছে। 'মানে? তুমি না বললে আমরা ফকির হয়ে গেছি!'

'আমার আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডগুলো এখনো ওরা বাতিল

করেনি।' শহরের একমাত্র মেইন রোডে উঠে এলো ল্যাণ্ড-রোভার। উত্তরের অলংকার বলা হয় ফ্রান্সিসটাউনকে, জনসংখ্যা দু'হাজার। গোটা শহরে একটাই হোটেল।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা অল্পবয়েসী। 'মিঃ রানা,' ওরা লবিতে ঢুকছে এই সময় পিছন থেকে বললো সে, 'ওখানে আপনার জন্যে এক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন।' মেয়েটাকে দূর থেকে দেখে প্রথমে চিনতে পারলো না রানা। সোহানা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

'মিরাণ্ডা!' চিৎকার করলো সে। 'তুমি কোত্থেকে? জানলে কিভাবে আমরা এখানে?'

রানার কামরাটা ছোট্ট। দুটো সিঙ্গেল বিছানার মাঝখানে একটা ড্রেসিং টেবিল। একটা বিছানায় জোড়া নারী-মূর্তির আকৃতি নিয়ে বসলো সোহানা আর মিরাণ্ডা—ভাঁজ করা পা শরীরের নিচে চাপা পড়লো, হাঁটু দু'জোড়া থাকলো সামনাসামনি।

'রেড-ক্রসের ওরা বললো, সীমান্ত থেকে পুলিশ আপনাদের নিয়ে এসেছে,' বললো মিরাণ্ডা নয়নি। 'তার আগে আমার বন্ধুদের কাছে শুনেছি থার্ড ব্রিগেডের লোকেরা আপনাদের খুন করার চেষ্টা করেছিল। ভাবলাম, ইতিমধ্যে আপনারা নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন যে জেনারেল মাজুলেট ক্রিমিন্যাল নয়...'

একটা চেয়ার টেনে বসলো রানা। বিষণ্ণ দেখালো ওকে। 'হ্যাঁ, বুঝেছি—কিন্তু অনেক দেরিতে।'

'মাজুলেটের মুখে আপনার সম্পর্কে শুনেছি, মিঃ রানা,' বললো মিরাণ্ডা। 'সে শুধু আপনার বন্ধু নয়, আপনার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা...'

'কিন্তু…' শুরু করলো রানা।

বাধা দিয়ে মিরাণ্ডা বললো, 'কি বলবেন জানি। আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে মাজুলেট। কিন্তু কেন করেছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। জিম্বাবুইয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে, মাজুলেটের চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ তা জানতো না। সে চায়নি আপনি বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। অন্য কোনো ভাবে নিষেধ করলে আপনি শুনতেন না, বন্ধু বিপদে পড়তে যাচ্ছে দেখে তাকে সাহায্য করতে চাইতেন। তাই এই পথটা বেছে নেয় সে—আপনাকে অপমান করে, আপনি যাতে অভিমান করে জিম্বাবুই থেকে চলে যান।'

কাঠের চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রানা। মাজুলেটের অফিসে ওদের ঝগড়ার দৃশ্যটা স্মরণ করলো ও। গোটা ব্যাপারটা তাহলে অভিনয় ছিলো মাজুলেটের? এমনকি এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না। এমন কড়া মেজাজ দেখিয়েছিল মাজুলেট, ঘৃণার ভাবটুকু এমন জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল চেহারায়…

'এখন আর কিছু এসে যায় না,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'মাজুলেটকে বোধহয় ইতিমধ্যে মেরে ফেলেছে ওরা।'

'না!' এই প্রথম মিরাণ্ডার গলা চড়লো, প্রায় রেগে গেছে সে। 'না, এ-কথা বলবেন না! সে বেঁচে আছে! তার সাথে আমার কথা হয়েছে!'

হঠাৎ রানা সামনে ঝুঁকে পড়ায় চেয়ারটা ককিয়ে উঠলো। 'তাকে আপনি দেখেছেন? কবে?'

'দু'হপ্তা আগে।'

'কোথায়? কোথায় সে?'

'টুটিতে—পুনর্বাসন কেন্দ্রে।'

'মাজুলেট বেঁচে আছে!' চেহারা বদলে গেল রানার। উঁচু হয়ে উঠলো কাঁধ জোড়া, চোখ দুটো উজ্জ্বল, সতর্ক ভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে থাকলো মাথা। ঠিক মিরাণ্ডার দিকে নয়, মিরাণ্ডার মাথার ওপর দিয়ে সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে—আচমকা উথলে ওঠা ভাবাবেগের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে ভিড় করে গজিয়ে ওঠা ধারণাগুলো থেকে দু'একটা বেছে নিতে। দেখতেই পেলো না নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে মিরাণ্ডা।

'খেতে না পেয়ে কংকাল হয়ে গেছে মাজুলেট,…' ফোঁপাতে শুরু করলো মিরাণ্ডা, তার কাঁধে একটা হাত রাখলো সোহানা।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা, অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করলো। প্যাকেট হাতড়ে মোচড়ানো একটা টিস্যু বের করে মিরাণ্ডার হাতে গুঁজে দিলো সোহানা।

'তোমার সেসনা রেডি হবে কবে?' জানতে চাইলো রানা, সার্ভিসিঙের জন্যে কেনিয়ায় রয়েছে ওটা।

মিরাণ্ডাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত সোহানা, অন্যমনস্কভাবে বললো, 'রেডি তো হয়েই আছে।'

'ক্যাপাসিটি…' নিজের মনে কথা বলছে রানা।

প্রশ্ন নয়, তবু আনমনে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে সোহানা, 'ঠাসাঠাসি করে ছ'জনের জায়গা হয়…।'

'রেঞ্জ…।'

'টুয়েলভ হানড্রেড নটিক্যাল মাইলস…।

বিড়বিড় করছে রানা, 'ল্যাণ্ড-রোভারে করে গোটা দুই ড্রাম নিয়ে যেতে পারি আমি। তুমি বর্ডারে কোথাও একটা প্যানে ল্যাণ্ড করে রিফুয়েলিং সেরে নিতে পারো। পাণ্ডা মাতেঙ্গার কাছে একটা জায়গা

চিনি আমি, এখান থেকে পাঁচশো কিলোমিটার উত্তরে। ওটাই সবচেয়ে কাছের এন্ট্রি পয়েন্ট···।'

টিস্যুটা নাকে চেপে ধরে আছে মিরাণ্ডা, ঘন ঘন ওদের দু'জনের দিকে তাকালো।

'উইপনস,' ফিসফিস করছে রানা। 'আমাদের অস্ত্র দরকার।'

ঝট করে রানার দিকে তাকালো মিরাণ্ডা। 'তারমানে?'

'ভিনসেন্ট গগলকে খবর দেয়া গেলে···সে তো একজন আর্মস ডিলার?' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা ভুরু উঁচু করলো সোহানা।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে মিরাণ্ডার চোখ। 'মাই গড! আপনারা সিরিয়াস!'

মাথা নাড়লো রানা। 'অতো সময় কোথায়! অস্ত্র আমাদের এই মুহূর্তে দরকার···'

'রাইফেল···'

'আর গ্রেনেড···'

'মিঃ রানা, আপনি জানেন, ধরতে পারলে ওরা আপনাদের নিয়ে কি করবে?'

'চোরাবাজার থেকে···'

সোহানাকে থামিয়ে দিলো রানা, 'আমাদের টাকা নেই।'

'বতসোয়ানা সরকার কোনো সাহায্য করবে না,' বললো সোহানা। 'সেক্ষেত্রে একটা আর্মস ডিপো লুঠ করা ছাড়া আমি তো কোনো উপায় দেখছি না।'

'বলো কি!' ঢোক গিললো মিরাণ্ডা।

'তুমি চাও না তোমার মাজুলেট···?' প্রায় মারমুখো হয়ে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'চাই, নিশ্চই চাই, কিন্তু তোমরা কেন এতো বড় ঝুঁকি নেবে…!'

'ও আমার বন্ধু,' এই উত্তেজনার মধ্যে রানার মৃদু কণ্ঠ বিস্ফোরণের মতো শোনালো।

কিছুটা হতভম্ব দেখালো মিরাণ্ডাকে, কিছুটা মুগ্ধ। আবার একটা ঢোক গিললো সে, অস্ফুটে বললো, 'রাইফেলের ব্যবস্থা আমি বোধ হয় করতে পারবো। আমাদের কিছু লোক পালিয়ে এসেছে এখানে। জঙ্গলে ওদের কিছু অস্ত্রপাতি লুকানো আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার…।'

'কি রাইফেল?' রানা আর সোহানার মিলিত কণ্ঠস্বর মিরাণ্ডাকে চমকে দিল।

'ব্যানানা গানস অ্যাণ্ড গ্রেনেডস।'

'এ-কে!' রানার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। 'মিরাণ্ডা তুমি একটা জুয়েল।'

'আপনারা দু'জন?' হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মিরাণ্ডা। 'একটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে?'

'না, তুমিও আমাদের সাথে যাচ্ছো,' ঘোষণা করলো সোহানা। 'আমরা তিনজন হবো!'

'তিনজন, চমৎকার!' বললো মিরাণ্ডা, খুশিতে এবং কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেছে তার। 'তিনজন, ব্লাডি মার্ভেলাস!'

পায়চারী থামিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো রানা। 'প্রথম কাজ টুটি ক্যাম্পের একটা ম্যাপ আঁকা—সমস্ত খুঁটিনাটি থাকতে হবে তাতে।' আবার পায়চারী শুরু হলো, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। 'তারপর মিরাণ্ডার বন্ধুদের সাথে দেখা করে জানতে হবে কি ধরনের সাহায্য করতে পারবে ওরা। সোহানা, সেসনা নিয়ে

আসতে ক'দিন লাগবে ?'

'তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসবো।'

'গুড। ইতিমধ্যে অনেক কাজ গুছিয়ে নেবো আমরা।' হাতের তালু এক করে ঘষলো রানা। 'এখনই আমরা ম্যাপ আঁকতে বসতে পারি···।'

বিয়ার আর স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিলো রানা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করলো ওরা। সন্ধ্যের খানিক আগে মিরাণ্ডাকে রেডক্রসের একটা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে এলো রানা। ঠিক হয়ে থাকলো, কাল সকালে হোটেলে চলে আসবে মিরাণ্ডা, ওকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে রানা। সোহানা আরো আগে বেরিয়ে যাবে।

তিনদিন পর।

ধূসর মরুর স্থির বাতাসে কালিঝুলি মেশানো ধোঁয়ার দুটো কালো স্তম্ভ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেল। ল্যাণ্ড-রোভারের বনেটে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে রানা আর মিরাণ্ডা। বতসোয়ানার উত্তর-পুবে শুকনো নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড এটা, জিম্বাবুই সীমান্ত এখান থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

সেসনার আওয়াজ তাপ-দগ্ধ বাতাসে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। 'ওই তো!' হাত তুলে মশা আকৃতির একটা বিন্দু দেখালো মিরাণ্ডা দিগন্তরেখার কাছাকাছি।

ঘাড় ফিরিয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাকালো রানা, চেহারায় উদ্বেগ। সল্ট-প্যানের কিনারায় শুধু যেখানে মাটি শক্ত, তার ওপর দিয়ে অন্তত দুশো বার ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে যাওয়া-আসা করেছে

ও চাকার দাগ দেখে এয়ারস্ট্রিপ কতোটুকু চওড়া বুঝে নিতে হবে সোহানাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই নরম মাটিতে বাধা পেয়ে উল্টে যাবে সেসনা। ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার পরপরই এয়ারস্ট্রিপের দুই প্রান্তে ছেঁড়া কম্বল জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা।

নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো সোহানা। তাকে নিচে নামতে সাহায্য করলো রানা। সোহানার পা মাটি স্পর্শ করার আগেই ওকে চুমো খেলো রানা।

'আরে শালা, লোকে বলবে কি!'

ল্যাণ্ড-রোভারের ছায়ায় দু'জন ম্যাটাবেল বসে রয়েছে, সোহানার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো রানা। সবিনয় ভদ্রতার সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সোহানার সামনে মাথা নত করলো তারা। 'হিটন আর আমান, মাজুলেটের শিষ্য,' বললো রানা। 'নেতার বিপদে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ওরা। কিছু অস্ত্রও যোগাড় হয়েছে।'

গম্ভীর চেহারার যুবক ওরা, হাসতে জানে না। চোখগুলো এমন অদ্ভুতভাবে স্থির, যেন বীভৎস অনেক কিছু দেখে পাথর হয়ে গেছে। তবে পেশীতে জোর আছে, নেতার জন্যে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে রাজি।

ড্রামগুলো থেকে সরাসরি সেসনার উইং ট্যাংকে ফুয়েল ভরা হলো, ওদিকে রানা ব্যস্ত হাতে ককপিটের পিছন দিককার সিটগুলো খুলে ফেলে দিলো নিচে। ওজনও কমানো দরকার, কার্গোর জন্যেও জায়গা লাগবে। একটু পরই লোডিঙের কাজ শুরু হলো। স্প্রীং ব্যালেন্সে ফেলে প্রতিটি কার্গো ওজন করলো সোহানা। সবচেয়ে ভারি অ্যামুনিশনগুলো। আট হাজার রাউণ্ড। ওজন কমাবার জন্যে

কাঠের বাক্স ফেলে দিয়ে ওগুলো প্লাস্টিক ব্যাগে ভরেছে রানা। বহু বছর আগে মুক্তিযোদ্ধারা এগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিল, কিছু কিছু রাউণ্ডে এমন মরচে ধরেছে যে কোনো কাজেই আসবে না। প্রচুর সময় নিয়ে ভালোগুলো বেছে আলাদা করতে হয়েছে ওকে, প্রতিটি কেস থেকে কয়েক রাউণ্ড নিয়ে টেস্ট করেছে ও, একটাও মিস ফায়ার হয়নি।

বেশিরভাগ রাইফেলেও মরচে ধরে গেছে। গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় গোটা একটা রাত জেগে বাছাই করা পঁচিশটা রাইফেল পরিষ্কার করেছে রানা। পাঁচটা টোকারেভ পিস্তল, আর দুই কেস ভর্তি গ্রেনেডও পেয়েছে ওরা রাইফেলের চেয়ে এগুলোর অবস্থা ভালো। প্রতিটি কেস থেকে একটা করে গ্রেনেড নিয়ে উই-পোকার ঢিবি উড়িয়েছে রানা। পঞ্চাশটা থেকে দুটো খরচ হওয়ার পর হাতে থাকলো আটচল্লিশটা। ক্যানভাসের তৈরি পাঁচটা হ্যাভারস্যাকে ভরা হয়েছে ওগুলো।

বাকি ইকুইপমেন্ট ফ্রান্সিসটাউন থেকে কিনে এনেছে রানা। ওআয়ার-কাটার, বোল্ট-কাটার, নাইলন রোপ, তলোয়ার আকৃতির ছোরা, টর্চ, অতিরিক্ত ব্যাটারী, ক্যানটিন আর পানির বোতালসহ আরো প্রায় বারোটা আইটেম। ফ্রান্সিসটাউন ছাড়ার আগে মিরাণ্ডাকে দিয়েও কিছু কেনাকাটা করিয়েছে রানা। মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। ফার্স্ট-এইড কিটের জন্যে যা যা দরকার সব সাথে করে নিয়ে এসেছে সে। খাবারদাবারও কেনা হয়েছে প্রচুর, পাঁচটা প্লাস্টিক ব্যাগ ঠাসা।

'ব্যস করো, আর নয়,' লোডিং বন্ধ করার নির্দেশ দিলো সোহানা। 'আর যদি এক আউন্সও তোলা হয়, মাটি থেকে উঠতে

হবে না। বাকি যা থাকলো সব সেকেণ্ড ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হবে।'

সন্ধ্যের পর আগুনের চারধারে বসে খাওয়াদাওয়া সারলো ওরা। তারপর মিষ্টি সিনডেবেল ভাষায় একটা গান ধরলো মিরাণ্ডা, গানের কথাগুলো এই রকম: ঝর্ণার পানিতেগা ধুয়েছি, জ্যোছনায় বসে অঙ্গেমেখেছি ফুলের সুবাস, পাহাড়ী বাতাস আমার চুল বেঁধে দিয়ে গেছে, মাথায় পরেছি বুনো ফুল—তবু মন কাঁদে, কাঁদে প্রতি অঙ্গ, তুমি কাছে নেই, কিছু ভালো লাগে না···।'

সবাই যখন গান শুনতে মগ্ন, নিজেদের চাদর নিয়ে চুপিসারে খানিকটা দূরে পালিয়ে এলো রানা আর সোহানা। এখান থেকে ওদের কথা কেউ শুনতে পাবে না, ওদের দেখতেও পাবে না। আকাশের গায়ে হলুদ রঙ দিয়ে আঁকা কাস্তে আকৃতির চাঁদের দিকে মুখ করে বসলো দুজন। মন খুলে এমন অনেক কথা বললো দুজন যা কোনোদিন কাউকে বলেনি।

অন্ধকারে ব্রেকফাস্ট সারলো ওরা। চাঁদ ডুবে গেছে, পুব আকাশে আলোর ক্ষীণ আভাস। ল্যাণ্ড-রোভারের পাহারায় হিটন আর আমানকে রেখে যাচ্ছে ওরা, দ্বিতীয়বার লোডিং আর রিফুয়েলিঙের জন্যেও সোহানাকে সাহায্য করবে তারা। সেসনা নিয়ে স্ট্রিপের শেষ মাথায় চলে এলো সোহানা, ভোরের ক্ষীণ আলোয় কোনো রকমে দেখা যায় মাটির চেহারা। এয়ারস্ট্রিপ ছেড়ে খুব ধীর ভঙ্গিতে আলোকিত পুব আকাশের দিকে উঠতে শুরু করলো সেসনা।

'জিম্বাবুই সীমান্ত,' বিড়বিড় করে বললো সোহানা। সোহানার পাশে, অ্যামুনিশনের ব্যাগের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে রানা। মিরাণ্ডাও মালপত্তরের মাথায় ঠাঁই নিয়েছে, ওদের পিছনে। কোলে ফেলে রাখা ম্যাপে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোর্স সামান্য একটু বদল

করলো সোহানা। কাছের একটা খনি শহর থেকে পনেরো মাইল দক্ষিণে রয়েছে রেললাইন, আরো ক'মাইল সামনে মেইন রোড।

ঘুর পথে যাচ্ছে ওরা, জন বসতিগুলোকে পাশ কাটিয়ে। ওদের নিচের দৃশ্য দ্রুত বদলে যেতে শুরু করলো। পিছিয়ে পড়লো মরুভূমি, সোনালি ঘাস-মোড়া ক্ষুদে আকারের মাঠ আর মাঠগুলোকে ঘিরে থাকা গভীর বনভূমি জায়গা দখল করে নিলো। উত্তর কোণে কিছু মেঘ দেখা গেল, স্থির হয়ে আছে। বাকি আকাশ নীল আর খালি। চোখের চারপাশ কুঁচকে সামনের দিকে তাকালো রানা। 'ওই তো রেললাইন!'

থ্রটল বন্ধ করলো সোহানা নিচের দিকে প্রায় খাড়া ভাবে নেমে এলো প্লেন। গাছের মাথা থেকে পঞ্চাশ ফিট ওপর দিয়ে সগর্জনে রেললাইন পেরিয়ে এলো ওরা, তার ক'মিনিট পর পেরোলো মেইন রোড। নীলচে-ধূসর টারমাকের ওপর মন্থরগতির একটা ট্রাককে পলকের জন্যে দেখা গেল, তবে সেটার পিছন দিয়ে উড়ে এলো ওরা।

নিচের ঠোঁট একবার কামড়ে ধরে, ছেড়ে দিলো সোহানা। 'কি বুঝবে ওরা কে জানে। হালকা প্লেন নিশ্চয়ই ঘন ঘন দেখা যায় এদিকে।' হাতঘড়ি দেখলো সে। 'আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

অ্যামুনিশন ব্যাগের ওপর নড়েচড়ে বসলো রানা, কয়েকটা নির্দেশ বুঝিয়ে দিলো সোহানাকে। এদেরকে নামিয়ে দিয়েই ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে ফিরে যাবে সে। আবার আসবে দু'দিন পর, কিন্তু শুধু স্মোক সিগন্যাল দেখলে ল্যাণ্ড করবে। দু'দিন পর আবার একবার চেষ্টা করবে, কিন্তু এবারও যদি সিগন্যাল না দেখে, চলে গিয়ে আর ফিরে আসবে না।

রানা থামতে ওর একটা হাত চেপে ধরলো সোহানা। 'ও-কথা মুখেও এনো না।' বাকিটা পথ বেশিরভাগ সময় পরস্পরের হাত ধরে থাকলো ওরা।

'শিঙ্গারিরা!' ফিসফিস করে বললো রানা। খয়েরি মাটির ওপর সবুজ একটা পাইথন সাপের মতো দেখালো শিঙ্গারিরা নদীটাকে, গাছের ফাঁক দিয়ে চকচকে পানি দেখা গেল।

ওদের নিজ হাতে তৈরি ক্যাম্পগুলো থেকে দূরে থাকলো সোহানা। গাছগুলোর কাছাকাছি নেমে এসে বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে পাহাড়ের দিকে ফিরে চললো সেসনা।

ঘাস মোড়া সমতল মাটিতে ল্যাণ্ড করলো ওরা, খাদের মাথাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দ্রুত হাতে কার্গো নামাতে শুরু করলো রানা, ওকে সাহায্য করলো মিরাণ্ডা। রাইফেল হাতে পাহারায় থাকলো সোহানা।

সব নামানোর পর উঁচু একটা স্তূপ মতো হলো, স্তূপটা চাপা দেয়া হলো নাইলন নেট দিয়ে। সোহানার হাত থেকে রাইফেল নিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরলো মিরাণ্ডা। গোটা এলাকা এখন উমাঙ্গোর দখলে, তার লোকেরা কে কখন কোন্ দিক দিয়ে এসে পড়ে বলা যায় না।

রানার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ককপিটের দিকে ছুটলো সোহানা। হালকা সেসনা খানিক দূর ছুটেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লো শূন্যে। দেখতে দেখতে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা।

সেসনার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর আকাশ থেকে চোখ নামালো রানা। রাইফেল আর হ্যাভারস্যাক তুলে নিয়ে কাঁধে

ঝোলালো, তাকালো মিরাণ্ডার দিকে। ডেনিম আর নীল ক্যানভাস জুতো পরে আছে সে। হাতে দুটো ব্যাগ, কোমরের বেল্টে টোকারেভ পিস্তল। 'রেডি ?' জানতে চাইলো রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে অনুসরণ করলো মিরাণ্ডা।

শিজারিরার এই এলাকাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গেরিলাদের খোঁজে থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যের পর আরো দু'ঘণ্টা হাঁটলো ওরা, কোনো বিরতি ছাড়াই। শিজারিরা নদীর পাড় ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে উঁচু-নিচু পথ, অন্ধকারে প্রতি পদে হোঁচট খেতে হলো। অবশেষে গেরিলা ক্যাম্পে পৌঁছুলো ওরা।

তিনজন গেরিলা ওদেরকে এসকর্ট করে ক্যাম্পের ভেতর নিয়ে এলো। ফাঁকা একটা জায়গায় রান্না হচ্ছে, প্রায় নগ্ন এক যুবতী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো মিরাণ্ডাকে। 'ও আমার চাচাতো বোন,' ব্যাখ্যা করলো মিরাণ্ডা। ইতিমধ্যে গেরিলা লিডারের কাছে ওদের আগমন সংবাদ পৌঁছে গেছে।

ক্যাম্প বলতে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার কিছু গুহা, আরাম-আয়েশের কোনো ব্যবস্থা নেই। গুহাগুলো নদীর উঁচু পাড়ের গা কেটে তৈরি করা হয়েছে, মাটির দিকে ঝুঁকে পড়া গাছের ডালপালা আড়াল করে রেখেছে প্রতিটি গুহামুখ। গেরিলাদের সাথে জিনিস-পত্র সামান্যই, যাতে মুহূর্তের নোটিশে সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না ওরা।

একটা গুহা থেকে বেরিয়ে এলো গেরিলা নেতা, রানাকে দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। চোখ রগড়ে আবার তাকালো মেজর কুকি। 'মাই গড! মিঃ অ্যাডভাইজার, আপনি তাহলে বেঁচে আছেন!' হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

একটা গুহার ভেতর বসে কথা বললো ওরা। মেয়েরা ওদের জন্যে খাবার নিয়ে এলো।

রানার প্রশ্ন শুনে মাথা নিচু করলো মেজর। 'নেতা বন্দি হয়ে আছেন আমরা জানি। কিন্তু কি করবো বলুন, আমাদের কাছে যে অস্ত্র নেই।'

'এখানে তোমরা ক'জন আছো?'

'আমার গ্রুপে ছাব্বিশ জন,' বললো মেজর কুকি। 'কাছাকাছি আরো একটা গ্রুপ আছে। আমাদের ছাব্বিশজনের কাছে রাইফেল আছে মাত্র ছ'টা ··'

ছাব্বিশ জনই যথেষ্ট, ভাবলো রানা। গেরিলাদের না পেলে ওরা তিনজনই তো চেষ্টা করতে যাচ্ছিলো। 'এবার শোনো আমাদের কাছে কি আছে···।' সবশেষে প্রস্তাবটা দিলো ও।

গেরিলারা সবাই আলোচনায় বসলো। রানা ওদেরকে আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছে, এটা একটা সুইসাইড স্কোয়াড হতে যাচ্ছে। শুধু যারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না তাদেরই যোগ দেয়া উচিত। কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছে করলে গেরিলারা এই ঝুঁকি না নিলেও পারে।

গভীর রাতে সিদ্ধান্ত হলো। প্রস্তাব মেনে নিতে কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একটা শর্ত আছে। স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিতে হবে মেজর রানাকে।

ম্যাপের হিসেবে ষাট মাইল পথ। কিন্তু শোনা সৈনিকদের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যে ঘুর পথে যেতে হবে ওদেরকে, একান্ত বাধ্য না হলে পাহাড় আর উপত্যকা ছেড়ে সমভূমিতে নামবে না। লোহার

মতো শক্ত পাথর সারাদিন রোদের তাপ শুষে নিয়ে গরম আগুন হয়ে আছে, সরু কার্ণিশ ধরে এগোবার সময় তার আঁচে সেদ্ধ হলো দলটা। দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকায় নামলো ওরা, ঢাল বেয়ে নামার সময় পিঠের বোঝা মুগুরের বাড়ি মারলো শিরদাঁড়ায়। প্রাচীন এলিফ্যান্ট ট্রেইল ধরে এগোলো ওরা, সারাটা পথের ওপর গোলাকার পাথর ছড়িয়ে আছে, পায়ের তলায় ,বল-বেয়ারিঙের মতো ঘুরলো সেগুলো।

মেয়েদেরকে সঙ্গে নেয়নি গেরিলারা, রওনা হবার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছে। উনত্রিশ জনের সুইসাইড স্কোয়াডে মেয়ে মাত্র দু'জন, সোহানা আর মিরাণ্ডা। সেসনা নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে ওরা শশংগিরের গ্রামের ওপর দিয়ে বার কয়েক উড়ে জানতে চেষ্টা করবে জায়গাটা নিরাপদ কিনা। বিপদের আভাস পেলে ফিরে আসবে সেসনা, গেরিলাদের সাবধান করে দিয়ে ফিরে যাবে সীমান্তের দিকে, ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে। আর যদি কোনো বিপদ না দেখে, গ্রামের আশপাশে কোথাও ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করবে সোহানা। শশংগিরের গ্রাম থেকে টুটি মিশন বেশি দূরে নয়।

গেরিলাদের একজন পড়ে গেল, তবে কার্ণিশ থেকে খসে তিন শো ফিট নিচে পড়ার আগেই অন্যান্যরা ধরে ফেললো তাকে। প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু গোড়ালি ফুলে উঠলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর দাঁড় করানো গেল না। গেরিলাদের চেহারায় যেমন হাসি নেই, তেমনি মায়া মমতাও নেই। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করে দিলো তারা। পড়েনি, কিন্তু এবার তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ঝামেলা চোকানো হবে।

ভাগ্যিস ওদের কথা শুনে ফেললো রানা। কয়েকজনকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে এগিয়ে এলো ও। একজন গোঁয়ারের মতো বাধা দেয়ায় চড় খেতে হলো তাকে। এরপর কাউকে কিছু না বলে আহত লোকটাকে পরীক্ষা করলো ও। বুঝলো, ওদের সাথে এই লোক যেতে পারবে না।

লোকটাকে একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিলো রানা, ট্যাবলেট খাওয়ালো দুটো। সবশেষে তার হাতে একটা টোকারেভ পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করে বললো কি করতে হবে। অন্তত ঘণ্টা চারেক গোড়ালিতে কোনো ব্যথা থাকবে না, মেয়েদের যেখানে রেখে আসা হয়েছে সেখানে পৌঁছুতেও প্রায় ওই একই সময় লাগবে। পথে যদি কোনো শোনা পেট্রল তাকে দেখে ফেলে, শেষ গুলিটা নিজের জন্যে রাখবে সে। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবার জন্যে আরো ক'টা ট্যাবলেট দেয়া হলো তাকে।

লোকটা চলে যাবার পর মেজর কুকির সাথে কথা বললো রানা। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো মেজর। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে রানা বললো, 'প্রথম ঘটনা বলে কাউকে কোনো শাস্তি দিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেউ কিছু করতে চেষ্টা করো, তার কপালে দুঃখ আছে।'

গেরিলারা সবাই চুপ। আহত সঙ্গীকে একটা সমস্যা বলে মনে করেছিল তারা, সেটার যে এমন সহজ সমাধান থাকতে পারে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। রানার হুমকি শুনে কেউ রাগলো না, বরং মনে মনে ওর সিদ্ধান্তের প্রশংসাই করলো।

দিনের বেলা হামলা চালালো মোপানি মৌমাছির ঝাঁক। ছোটো ছোটো ঝাঁকে ভাগ হয়ে হামলা চালালো ওগুলো। প্রত্যেককে

তিনটে করে ঝাঁকের সাথে লড়তে হলো। নাক, চোখ, আর ঠোঁট, আক্রমণের লক্ষ্য এই তিনটেজায়গা—কারণ ভেজা ভেজা অংশগুলো ওদের ভারি প্রিয়। রাতের বেলা ডোবাগুলো থেকে উঠে এসে মৌমাছিদের সাথে জায়গা বদল করলো সুবিশাল মশা বাহিনী। এবং এক পর্যায়ে, সুবিস্তৃত ফ্লাই-বেল্টের কিনারা দিয়ে যাবার সময়, যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে তুললো ৎসেৎসি মাছির ঝাঁক। এগুলোর পা এতো নরম, শরীরের কোথায় কখন বসলো কিচ্ছুটি টের পাবার উপায় নেই। গরম-লাল সূচ কানের পিছনে বা বগলের তলার নরম মাংসে ঢুকে তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

সারাটা পথে শোনা সৈনিকদের আক্রমণের আশংকা থাকলো। মূল দলের পিছনে আর সামনে থাকলো স্কাউটরা, দু'এক মাইল পরপরই সংকেত পাঠালো তারা, সাথে সাথে ডাইভ দিয়ে কাভার নিলো ওরা, ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করলো যতোক্ষণ না অলক্লিয়ার সিগন্যাল পাওয়া যায়।

হিম শীতল ভোর, জ্বলন্ত দুপুর, গাঢ় অন্ধকার রাত, কিচ্ছু পরোয়া না করে শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে দলটা। প্রত্যেকের নার্ভের ওপর চাপ পড়লো। অবশেষে, প্রায় একটানা দুদিন হাঁটার পর শশংগিরের গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছুলো ওরা।

মিরাণ্ডার বাবা শশংগিরে একজন জাদুকর। অলৌকিক যাবতীয় বিপদ-আপদ, সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর ব্যক্তিগত বালা-মুসিবত থেকে ম্যাটাবেলদের রক্ষা করে সে। ম্যাটাবেলরা তাকে শ্রদ্ধা করে বটে, কিন্তু বিপদে না পড়লে ভুলেও ধারেকাছে ঘেঁষে না। ছোট্ট এই গ্রামে শুধু স্ত্রী আর নিকটাত্মীয়দের নিয়ে বাস করে সে।

পথের এক জায়গায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল সোহানা আর

মিরাণ্ডা।

'সেসনা?' প্রথমেই জানতে চাইলো রানা।

'মাইল পাঁচেক দূরে ঘাসের ওপর ল্যাণ্ড করেছি,' বললো সোহানা। 'দু ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করার পর যখন দেখলাম কেউ এলো না, বুঝলাম, কারো চোখে পড়েনি ওটা। এখানে আসার আগে গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে এসেছি।'

'গুড,' বললো রানা। 'এখানকার অবস্থা?'

'বাবা তোমার সাথে কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন, রানা,' বললো মিরাণ্ডা। 'বন্ধুর জন্যে তুমি এতো কিছু করছো শুনে···'

হাত নেড়ে মিরাণ্ডাকে থামিয়ে দিলো রানা, বললো 'চলো।' একটা কুঁড়েঘরের ভিতর ঢুকলো ওরা।

শশংগিরেকে দেখে অবাকই হলো রানা। লোকটার বয়স এক-শোর কম হবে না; তারমানে, মিরাণ্ডা নিশ্চই তার শেষ বয়েসের মেয়ে। শান্ত, ঠাণ্ডা চেহারা বুড়োর; দাড়ি-গোঁফ-চুল সব ধবধবে সাদা। রানার সামনে নত হতে গেল সে, তাড়াতাড়ি তাকে ধরে আলিঙ্গন করলো রানা।

শশংগিরে বললো, 'টস মাজুলেট ম্যাটাবেলদের রাজা। রাজাকে উদ্ধার করার জন্যে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি আমরা।'

ঘরের ভেতর ছয় সাতটা মেয়ে ঢুকলো, প্রায় উলঙ্গই বলা চলে। সবচেয়ে ছোটোটার বয়স হবে বারো কি তেরো। রানার কানে কানে ফিসফিস করলো সোহানা, 'এরা সবাই বুড়োর বউ। আরো দশ-বারোটা আছে।'

খেতে দেয়া হলো ওদেরকে। খাওয়ার ফাঁকে এক এক করে প্রশ্ন

করে কয়েকটা তথ্য জেনে নিলো রানা।

'টুটি মিশন আর টুটি ক্যাম্পের মাঝখানের রাস্তাটা এই গ্রামের কাছ দিয়ে গেছে, তাই না?'

খোলা দরজা দিয়ে পাহাড়ের দিকে হাত তুললো শশংগিরে। 'ওই পাহাড়ের পিছন দিয়ে।'

'মিরাণ্ডার কাছে শুনেছি, ফি হপ্তায় নির্দিষ্ট একটা দিনে এই পথ দিয়ে ট্রাক যায়, সৈনিক আর বন্দীদের জন্যে খাবার নিয়ে যায় ক্যাম্পে—সত্যি?'

'হ্যাঁ। প্রতি সোমবার বিকেলে এখান দিয়ে যায় ওগুলো। বস্তা ভর্তি ভুট্টা, টিনের খাবার, মাংস, ইত্যাদি নিয়ে যায়। পরদিন সকালে খালি অবস্থায় ফিরে যায় আবার।

'ক'টা ট্রাক?'

'দুটো, মাঝে মধ্যে তিনটে।'

'গার্ড থাকে ক'জন?'

'সামনে, ড্রাইভারের পাশে দু'জন; তিনজন বা তারও বেশি পিছনে। একজন থাকে ছাদে, বড় একটা কামান নিয়ে।' রানা অন্দাজ করলো বড় কামান বলতে হেভী মেশিন গান বোঝাতে চাইছে শশংগিরে। 'শোনা সৈনিকরা সাংঘাতিক সতর্ক থাকে, ট্রাক-গুলোও ঝড়ের বেগে ছুটে চলে যায়।'

'গত সোমবারেও এ পথ দিয়ে গেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ওপর নিচে মাথা দোলালো বুড়ো জাদুকর।

'মিশন স্টেশন এখান থেকে কতোদূর?'

রানার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো শশংগিরে। ওপর দিকে

আঙুল তুলে আকাশের ছুটো জায়গা নির্দেশ করলো সে। রানা আন্দাজ করলো, ছুই বিন্দুর মাঝখানের পথটুকু পেরোতে চার ঘণ্টা সময় লাগবে সূর্যের। একজন মানুষের হাঁটার গতির সাথে মিলিয়ে হিসেব করলে ধরে নেয়া চলে, প্রায় পনেরো মাইল দূরত্ব।

এরপর রানা জানতে চাইলো, 'এখান থেকে বন্দীদের ক্যাম্প কতোদূরে?'

কাঁধ ঝাঁকালো বুড়ো। 'সমান দূরত্ব।'

ঘরে ফিরে এলো ওরা। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে মেয়েরা দেশী মদ পরিবেশন করলো।

ম্যাপ খুলে সময়, দুরত্ব ইত্যাদি হিসেব করে মার্জিনে নোট রাখলো রানা। খানিক পর মুখ তুললো ও, বললো, 'ভালোই হলো, হাতে একটা দিন পাচ্ছি আমরা। বিশ্রাম আর প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাওয়া গেল।'

বাবার পাশে বসেছে মিরাণ্ডা, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো শশংগিরে। 'বাবা, আমার এই মেয়েটার ওপর একটু খেয়াল রেখো, ওর মা নেই··'

'নিশ্চয়ই রাখবো,' আশ্বাস দিলো রানা। 'ভালো কথা, সোম বারে আপনাদের আরো কয়েকজনকে দরকার হবে আমার।'

'কিন্তু বাবা, এখানে তো আমি ছাড়া পুরুষ মানুষ কেউ নেই আর। সব মেয়ে··'

'মেয়েরই দরকার আমার—যুবতী, সুন্দরী মেয়ে।'

ছয়

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লো ওরা, সাথে থাকলো মেজর কুকি আর একজন রানার। নিচু পাহাড় সারির সামনেই রাস্তাটা, অ্যামবুশের আশংকা দূর করার জন্যে দু'পাশের ঝোপ-ঝাড় সব কেটে সাফ করে রেখেছে শোনা সৈনিকরা।

দুপুরের খানিক পর চৌরাস্তায় পৌছুলো ওরা, প্রথমবার জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে টুটি ক্যাম্পে যাবার সময় লাঞ্চ খাবার জন্যে এখানেই থেমেছিল রানা আর সোহানা। সামনেই নদী, দুই পাড়ে মাথা নুয়ে পড়া দশ ফিট লম্বা ঘাসের পাঁচিল। নদীর ওপর বাঁশের একটা সেতু, নিচে ঠাণ্ডা সবুজ স্বচ্ছ পানি।

উপত্যকার ঢাল বেয়ে প্রায় খাড়া হয়ে নেমে এসেছে রাস্তাটা, সেতু খানিকটা সামনে থাকতে দু'পাশে শুরু হয়েছে মাটির উঁচু পাড়, রাস্তা এখানটায় খুব সরু। এখানে পৌছে সাপ্লাই কনভয়কে স্পীড কমাতে হবে, লো গিয়্যার দিতে হবে ড্রাইভারকে। অ্যামবুশের জন্যে আদর্শ একটা স্পট, রানা আর সাহানা দু'জনেই একমত হলো। রানারকে ফেরত পাঠালো ওরা, বাকি ফোর্সকে নিয়ে আসবে সে। অপেক্ষার সময়টায় প্ল্যান নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা

করলো ওরা।

মূল আক্রমণটা চালানো হবে সেতুর ওপর। কিন্তু সেটা যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, কনভয়কে বাধা দেয়ার জন্যে একটা ব্যাক-আপ প্ল্যানও থাকবে। গেরিলাদের বাকি সবাই পৌঁছুতেই মেজর কুকির অধীনে তাদের পাঁচজনকে সেতুর ওপারে, খানিকটা সামনে পাঠিয়ে দিলো রানা। রাস্তার ওপর একটা মহোবা-হোবা গাছ ফেললো তারা, রোডব্লকের কাজ করবে। সেতু থেকে জায়গাটা দেখা যায় না।

গেরিলাদের মধ্যে দু'একজন শোনা ভাষায় কথা বলতে পারে, তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে থাকতে বলা হলো। ক্যাম্পে পৌঁছে ওদেরকে দরকার হবে

'এবার মেয়েদের ডাকো,' বললো সোহানা। গ্রাম থেকে তিন সৎ বোনকে সাথে করে নিয়ে এসেছে মিরাণ্ডা, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে বয়স তাদের। বুড়ো জাদুকর শশংগিরের যুবতী মেয়ের সংখ্যা পঁচিশের ওপর, এই তিনজনই সবচেয়ে সুন্দরী। মিরাণ্ডা তার বোনদের ডেকে কি করতে হবে বুঝিয়ে বলে দিলো। খিক খিক করে হাসতে লাগলো তারা, চোখ নামিয়ে হাত চাপা দিলো মুখে, কুমারীসুলভ সংকোচ আর লজ্জায় আড়ষ্ট। তবে, বোঝা গেল, ব্যাপারটাকে তারা খুব আগ্রহের সাথে নিচ্ছে। সবাই পুলকিত, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে; যৌবনে পা দেয়ার পর থেকে তাদের জীবনে এ-ধরনের কিছু ঘটেনি।

'ব্যাপারটা ওরা বুঝেছে তো?' মিরাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'ঠিক যা বলা হচ্ছে তাই করতে হবে, তা না হলে কিন্তু মারা পড়বে ওরা।'

একটু হেসে মিরাণ্ডা বললো, 'চিন্তা করো না, ওদের সাথে আমিও তো থাকছি।'

মনে মনে একটু অবাক হলেও, সেটা প্রকাশ করলো না সোহানা।

আফ্রিকান মেয়েরা আজও বাড়ি-ঘরে বা রাস্তাঘাটে প্রায় বিবস্ত্র থাকতেই ভালোবাসে। গ্রাম এলাকায় তো কথাই নেই, এমন কি শহরের শিক্ষিত মেয়েরাও পুরুষদের সামনে প্রায় নগ্ন থাকতে সংকোচ বোধ করে না।

বোন আর গেরিলাদের মধ্যে কি চলছে, মিরাণ্ডা ভালো করেই জানে। তার বাবার গ্রামে পুরুষ মানুষ কম, কাজেই যুবক গেরিলাদের দেখে মেয়েগুলো প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। চোখে চোখে, হাত ইশারায় কথা বলছে ওরা, সুযোগ পেলে দু'পক্ষই অঘটন ঘটিয়ে বসার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তাদেরকে খেদিয়ে কাঁটাঝোপের একটা ঘেরের মধ্যে নিয়ে গেল মিরাণ্ডা, ঘেরটা ওদেরকে দিয়েই তৈরি করিয়েছে সে। ঘেরের মুখে পা ছড়িয়ে বসলো, রাতটা এখানে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেবে।

গেরিলারা রাস্তা আর ব্রিজ থেকে অনেকটা দূরে পিছিয়ে গিয়ে নিচু পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিলো। আর সোহানাকে নিয়ে রানা ঢুকলো দশ ফিট উঁচু ঘাসের ভেতর।

কাঁটাঝোপের সামনে থেকে সেদিকে একবার তাকালো মিরাণ্ডা। ঘাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ওরা দু'জন, এতোটা দূর থেকে ঘাসের নড়াচড়াও টের পাওয়া যাবে না। মুচকি হেসে একটা গান ধরলো মিরাণ্ডা।

মাথার ওপর সূর্য, সেতুর ওপারে এক জোড়া বোল্ডারের মাঝখানে উপুড় হয়ে আছে রানা। সামনে লম্বা হয়ে আছে এ কে ফরটি-সেভেন, সেতু আর সেতুর দূর প্রান্তের দুই উঁচু পাড় কাভার দিচ্ছে। হ্যাণ্ডরেইল থেকে একশো বিশ গজ দূরে রয়েছে ও।

সেতুর নিচে রয়েছে চারজন গেরিলা, সোহানাকে নিয়ে পাঁচজন। রাইফেল রয়েছে শুধু সোহানার হাতে, অন্যান্যদের হাতে তীর-ধনুক। ওরা ওদের রাইফেল সেতুর থামের গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছে।

তীর-ধনুকে কাজ হবে কিনা সন্দেহ ছিলো রানার। এগুলোকে এলিফ্যান্ট বো বলা হয়। একটা ধনুককে যতোটা বাঁকানো সম্ভব, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনেও ততোটা বাঁকাতে পারেনি রানা। বিশেষ ব্যায়ামের সাহায্যে আঙুল, বুক আর হাতের পেশী আলাদা-ভাবে তৈরি করে নিয়ে তবেই কারো পক্ষে এই তীর-ধনুক ব্যবহার করা সম্ভব।

তীরের মাথা নরম ইস্পাত দিয়ে তৈরি, আগাটা ছুঁচালো করে নেয়া হয়েছে। একজন গেরিলা একটা তীর ছুঁড়ে অবাক করে দিয়েছে রানাকে। ত্রিশ পা দূর থেকে ছুটে গিয়ে বেওবাব গাছের গায়ে বিশ ইঞ্চি ঢুকে গেল তীরটা। কুঠার দিয়ে গাছের গা কেটে তারপর বের করা হলো সেটা। এই তীরটাই একজন মানুষকে ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারতো, বুক দিয়ে ঢুকে শোল্ডার ব্লেড ফুটো করে বেরিয়ে যাবার সময়ও এর গতি খুব একটা কমতো না।

সেতুর তলায় আরো দশ-বারোজন গেরিলা রয়েছে, শুধু তাদের মাথা জেগে আছে পানির ওপর। নদীর পাড় প্রায় খাড়া বলে ওপর থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না, তাছাড়া লম্বা ঘাসের পাঁচিলও আড়াল করে রেখেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে যাওয়ায় বোঝা গেল, পাহাড় থেকে উপত্যকায় নামতে শুরু করেছে আর্মি কনভয়। ঢালু মেঠো পথ ধরে ছুটে আসছে ট্রাকগুলো। বাঁক ঘুরলেই সেতুর ওপার থেকে ওগুলোকে দেখতে পাবে রানা। এই ঢালু পথের ওপর দিয়ে কয়েকবার যাওয়া-আসা করেছে রানা, এমন কিছু চোখে পড়েনি যা দেখে সন্দেহ হতে পারে এখানে কোনো অ্যামবুশ পাতা হয়েছে।

সেতুর তলা থেকে নির্দেশ দিলো সোহানা, 'মিরাণ্ডা, গো অ্যাহেড!'

নদীর ওপারের উঁচু ঘাস ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো মিরাণ্ডা, ব্যস্ত হাতে খুলে ফেললো স্কার্ট আর ব্লাউজ। সেতুর তলা থেকে পাঁচজনের মধ্যে একা শুধু সোহানাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মিরাণ্ডার দিকে, গেরিলারা সবাই কনভয়ের শব্দের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। এক ঝটকায় ব্রেসিয়ারটাও খুলে ফেললো মিরাণ্ডা, তারপর পিছন ফিরে তাকালো।

মিরাণ্ডার পিছনে ওর বোনেরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। ওদের কারো পরনে কোনো কাপড় নেই, শুধু কোমরে লটকে আছে একগাদা করে রঙিন পুঁতির মালা।

মিরাণ্ডার দেখাদেখি একসাথে নদীর সবুজ পানিতে লাফিয়ে পড়লো মেয়েগুলো।

'হাসো!' ধমক লাগালো মিরাণ্ডা। 'খেলো! ছুটোছুটি করো!'

পরস্পরকে লক্ষ্য করে পানি ছুঁড়তে লাগলো ওরা ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া শুরু করে নদীর মাঝখানে চলে এলো। ওদের মিষ্টি গলার খিল খিল হাসি যে-কোনো পুরুষকে আকৃষ্ট করবে। অথচ, সোহানা লক্ষ্য করলো, গেরিলারা কেউ একবার ফিরেও তাকালো

না। কাজের সময় এরা সবাই প্রফেশনাল, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

বাঁক নিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এলো প্রথম ট্রাক। বালি রঙের পাঁচটনী একটা টয়োটা। ক্যাবের ওপর বসানো রয়েছে হেভিমেশিন-গান, পিছনে একজন ট্রুপার। পিছনে দেখা গেল দ্বিতীয় ট্রাক, শোনা সৈনিক গিজ গিজ করছে।

'আর নয়, বাবা, দুটোই যথেষ্ট,' রুদ্ধশ্বাসে বিড়বিড় করলো রানা, এ-কে ফরটিসেভেনের বাট রাখলো কাঁধে। শুকনো ঘাস দিয়ে রাইফেলের ব্যারেল ঢেকে রাখা হয়েছে, নদীর কিনারা থেকে কালো কাদা তুলে মুখ আর হাতে লেপে নিয়েছে রানা।

ট্রাক ওই দুটোই। ঢাল বেয়ে সরু পথের ওপর নেমে এলো ওগুলো, দু'পাশে এখন উঁচু পাড়। ইতিমধ্যে নদীর মাঝখান থেকে এ-পারের দিকে আরো খানিকটা সরে এসেছে মেয়েরা, সেতুর নিচে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে, সৈনিকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। সামনের ট্রাকটার গতি মন্থর হলো, ভেজা কোমর বাঁকালো মেয়েরা, স্তন দোলালো, হাসিতে ঝরলো আমন্ত্রণ।

সামনের ট্রাকের ক্যাবে ড্রাইভারের পাশে আরো একজন লোক রয়েছে, ধুলোয় ঝাপসা উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর তার লালচে ক্যাপ-ব্যাজ দেখতে পেলো রানা, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। ড্রাইভারকে কি যেন বললো সে, অমনি ব্রেকের আওয়াজ করে সেতুর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রাক। পিছনেরটাও বাধ্য হলো দাঁড়িয়ে পড়তে।

দরজা খুলে রানিং বোর্ডে দাঁড়ালো যুবক অফিসার। ট্রাকের পিছনের ট্রুপাররা সামনের দিকে ঝুঁকে পরস্পরের গা টেপাটেপি

করলো. রসালো মন্তব্য ছুঁড়ে উৎসাহ দিলো মেয়েদের। মেয়েরা, মিরাণ্ডার দেখাদেখি, পানির নিচে কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়ে পাল্টা মন্তব্য করতে শুরু করলো। দ্বিতীয় ট্রাকের কিছু ট্রুপার, আহ্লাদে আটখানা হয়ে, লাফ দিয়ে নেমে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। তাদেরকে ঠেলে সামনের সারিতে পৌঁছুলো প্রথম ট্রাকের অফিসার, দেখাদেখি প্রথম ট্রাকের ট্রুপাররাও ভিড় করলো ব্রিজের কিনারায়।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মেয়েটা হাত দিয়ে অশ্লীল একটা ভঙ্গি করলো। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে পুরুষালি হাসিতে ফেটে পড়লো ট্রুপাররা। যুবক অফিসার আরো অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে পাল্টা জবাব দিলো। এবার ট্রাক দুটোর বাকি ট্রুপাররাও নেমে এলো নিচে শুধু হেভি মেশিনগানের গানার দু'জন নিজেদের পজিশন ছেড়ে নড়লো না।

চকিতে একবার ব্রিজের তলাটা দেখে নিলো রানা সোহানার নির্দেশে তীরন্দাজরা ক্রল করে এগোচ্ছে, কাঠের থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে।

পাড়ের ঠিক নিচে চলে এসেছে মেয়েরা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী মেয়েটা হাতছানি দিয়ে ডাকলো ট্রুপারদের, চিৎকার করে বললো, লাফ দাও, বুকে তুলে নেবো। তারপর পিছন দিকে শিরদাঁড়া বাঁকা করলো সে, স্তন জোড়া যেন তাক করছে ট্রুপারদের দিকে। উল্লাসে ফেটে পড়লো ট্রুপাররা। সবাই শুধু এই একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঢালু পাড় বেয়ে, ট্রুপারদের পিছনে রাস্তায় উঠে এলো সোহানা আর তার তীরন্দাজ বাহিনী। এখনো তারা ক্রল করে এগোচ্ছে।

জোড়া বোল্ডারের মাঝখান থেকে গানারদের দিকে তাকিয়ে

আছে রানা। পজিশন ছেড়ে নড়ছে না ওরা।

দুই ট্রাকের মাঝখানে পৌঁছুলো তীরন্দাজরা। একপাশে সরে গেল সোহানা। একযোগে উঠে দাঁড়ালো তীরন্দাজরা, এক সাথে ধনুক টানলো।

বাঁকা হাতে শুরু করলো ধনুক, তীরন্দাজদের ডান হাত ধীরে ধীরে ফিরে এলো ঠোঁটের কাছে। তারপরই ছুটে গেল তীরগুলো।

কোনো শব্দ হলো না, ভোজবাজির মতো শুধু বাঁকা হয়ে গেল ব্রিজের কিনারায় দাঁড়ানো চারজন ট্রুপারের শিরদাঁড়া। শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তীরগুলো।

একজন গানার পজিশন ছেড়ে ট্রাকের কিনারায় দাঁড়ালো, উঁকি দিয়ে তাকালো ব্রিজের দিকে। জোড়া বোল্ডারের মাঝখান থেকে সিধে হলো রানা। ওর হাতে গর্জে উঠলো এ-কে ফরটিসেভেন। প্রথম ট্রাকের গানার একটা ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় গানার ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাতেই দেখে ফেললো সোহানাকে, একই সময়ে গর্জে উঠলো সোহানার হাতের রাইফেল। গানারের গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল বুলেট

চারজন সঙ্গী ধরাশায়ী হতেই বাকি ট্রুপাররা বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালো। সামনাসামনি হলো তীরন্দাজদের। সেই মুহূর্তে লম্বা ঘাস বিস্ফোরিত হলো তাদের পিছনে, হাতে অনলবর্ষী রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এলো দশ-বারোজন গেরিলা সামনে তীর, পিছনে রাইফেল, টপাটপ পড়তে লাগলো ট্রুপাররা। ইতিমধ্যে ব্রিজের ওপর উঠে দৌড়াতে শুরু করেছে রানা। ব্রিজের মাঝামাঝি এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ালো। লম্বা ফলার ছোরা চালাচ্ছে গেরিলারা। যুবক অফিসারকে দেখলো ও, ট্রুপারদের লাশ টপকে

ছুটছে। একটা ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো একজন গেরিলা, পিঠ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বেরিয়ে এলো ছোরার রূপালি ফলা, লাল রক্ত মাখা।

একটা গুলির আওয়াজ হলো, সেই সাথে শেষ ট্রুপারটাও পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। গেরিলারা আহত ট্রুপারদের জান কবজ করতে ব্যস্ত।

'মিরাণ্ডা!' লাশগুলো টপকে ব্রিজের কিনারায় এসে নদীর দিকে ঝুঁকলো সোহানা। 'মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও!'

সন্ত্রস্ত, বিহ্বল মেয়েগুলোকে নিয়ে ঘাসের ভেতর ঢুকলো মিরাণ্ডা একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো।

কোমরের কাছে রাইফেল নিয়ে সোহানার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। 'কেউ আহত হয়েছে?' শেষ গুলির আওয়াজটায় উদ্বিগ্ন বোধ করছে। জানা গেল, ওদের দলের কারো গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। গেরিলাদের দু'মিনিট সময় দিলো রানা, তারপর একটা পেট্রল পাঠালো ঢালের মাথায়, শোনা ট্রুপারদের আর কোনো ট্রাক এলে জানা যাবে।

লাশগুলোর দিকে ফিরলো ও। 'তাড়াতাড়ি গর্তে ফেলে মাটি চাপা দাও!' বড়সড় একটা কবর আগের দিনই খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

দুটো ট্রাকের গায়েই রক্ত লেগেছে। গানার দু'জন গুলি খেয়ে ঝুলে পড়েছিল নিচের দিকে। দু'জন গেরিলা নদী থেকে পানি তুলে এনে ধুয়ে ফেললো দাগগুলো। ট্রুপারদের কবর দেয়ার কাজ শেষ হবার আগেই ফিরে এলো মিরাণ্ডা। কাপড় চোপড় পরে নিয়েছে সে। তার কাছ থেকে জানা গেল, মেয়েরা রওনা হয়ে গেছে গ্রামের পথে।

ট্রুপারদের কবর দেয়ার আগে ইউনিফর্ম খুলে রাখা হয়েছে, সেগুলো এখন ধোয়ার কাজ চলছে। এক ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যাবে সব।

প্রথম ট্রাকের ক্যাবে উঠলো রানা। ইগনিশনে চাবি রয়েছে। লাশ-গুলো মাটি চাপা দিয়ে ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো উলঙ্গ গেরিলারা, নদীতে নেমে একটা করে ডুব দিয়ে উঠে এলো রাস্তায়। তাদের ডেকে কিছু নির্দেশ দিলো রানা। একজন গেরিলাকে দ্বিতীয় ট্রাকের দায়িত্ব দেয়া হলো, ক্যাবে চড়ে স্টার্ট দিলো সে। ইতিমধ্যে গেরিলারা দু'দলে ভাগ হয়ে উঠে পড়েছে ট্রাক দুটোয়।

ব্রিজ পেরিয়ে এলো কনভয়, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওপর দিকে। গোটা অপারেশনে সময় লেগেছে মাত্র ত্রিশ মিনিট। ঢালের মাথা টপকে এসে রোডব্লকের সামনে থামলো কনভয়। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো মেজর কুকি, পথ দেখিয়ে ট্রাকগুলোকে রাস্তা থেকে একপাশে সরে যেতে সাহায্য করলো।

ঘন ঝোপের আড়ালে থামলো ট্রাক দুটো। গেরিলাদের একটা দল তাড়াহুড়ো করে গাছের ডাল কেটে এনে ঢেকে দিলো ওগুলো। আরেক দল কার্গো নামাতে শুরু করলো। তৃতীয় দলটা সরালো রোডব্লক।

বারো বস্তা ভুট্টা, ক্যানে ভরা মাংসের কেস পঁচিশটা, ত্রিশটা কম্বল, ছয় বাক্স ওষুধ-পত্র, একশো আশি কার্টন সিগারেট, প্রচুর অ্যামুনিশন, প্রচুর সিগারেট ছাড়াও সাবান, চিনি, লবণ ইত্যাদি বহু জিনিস পাওয়া গেল, সবই গেরিলাদের কাজে লাগবে। একটা জিনিস দেখে অবাক হলো সবাই। ক্যাম্পের ভেতর কোন্ কাজে

লাগবে ওটা কেউ বুঝতে পারলো না। একটা মটরসাইকেল, ইয়ামাহা। একেবারে নতুন না হলেও, ঝকঝক করছে।

লুটের মাল-পত্তর মাথায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল গেরিলাদের একটা দল। আপাততঃ সব তারা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে, পরে একসময় সুযোগ মতো উদ্ধার করে কাজে লাগাবে। ইয়ামাহাটা রেখে দিলো রানা।

বাকি গেরিলারা থার্ড ব্রিগেডের ইউনিফর্ম পরে নিলো। হাতঘড়ি দেখলো রানা। পাঁচটা বত্রিশ।

মনে আছে, টুটি ক্যাম্পের রেডিও অপারেটর রোজ সন্ধ্যে সাতটায় জেনারেটর চালু করে রুটিন রিপোর্ট পাঠায়। ট্রাকের রেডিওটা চেক করলো ও। ফিফটিন-এ. এম. পি. আউটপুট, তারমানে টুটি ক্যাম্প পর্যন্ত রেঞ্জ, হারারে হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত নয়।

সোহানাকে নিজের পাশে বসিয়ে মিরাণ্ডা আর মেজর কুকিকে ডাকলো রানা। প্রত্যেকে ওরা যে যার নোট বুক বের করে আলোচনা শুরু করলো।

'মটরসাইকেলটা খুব কাজে আসবে,' বললো রানা। 'কিন্তু তার আগে জানতে হবে,' মিরাণ্ডার দিকে ফিরলো রানা, 'ক্যাম্প থেকে তোমার বাবার গ্রামে আসার পথটা নিরাপদ কিনা।'

'দিনের বেলা হলে তেমন ভয় নেই,' বললো মিরাণ্ডা। 'পথের ওপর হাতি বা গণ্ডার থাকতে পারে, কিন্তু চোখ খোলা রাখলে আগে থেকে টের পাওয়া যাবে। পথের ওপর বেশিক্ষণ থাকে না ওরা।'

'পথটা কেমন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'মটরসাইকেল নিয়ে আসা যাবে?'

গম্ভীর হয়ে গেল মিরাণ্ডা। মেজর কুকির দিকে তাকালো সে।

'আমি একটা ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দেবো,' বললো মেজর কুকি। 'পাহাড় এড়িয়েও জাদুকরের গ্রামে আসা যায়।'

'গুড,' বললো রানা। 'ক্যাম্প দখল করার জন্যে সোহানাকে আমাদের দরকার, তা না হলে এখান থেকেই সেসনার কাছে ফেরত পাঠাতাম ওকে। ক্যাম্প দখল করার পরপরই রওনা হয়ে যাবে ও।'

'মটরসাইকেল নিয়ে?' জিজ্ঞেস করলো মিরাণ্ডা।

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'বন্দীরা সংখ্যায় অনেক, ট্রাকে করে তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে হবে। ওখানে একটা ল্যাণ্ড রোভার থাকার কথা, সেটা নিয়ে আমরা রওনা হয়ে যাবো টুটি এয়ার-স্ট্রিপের দিকে। সেসনা নিয়ে ওখানে আসবে সোহানা। তাহলে অন্তত দশ-বারো মাইল ছোটো হয়ে আসবে রাস্তাটা।' সোহানার দিকে ফিরলো ও। 'কিন্তু আমাদের সিগন্যাল না পেলে এয়ারস্ট্রিপে তুমি ল্যাণ্ড করবে না। ওখানে তুমি পৌঁছুবে কাল সকাল পাঁচটার পর। আমরা তার আগেই দখল করে নেবো এয়ারস্ট্রিপ। ফুয়েল যা আছে, তাতে তুমি আটটা পর্যন্ত এয়ারস্ট্রিপের মাথায় চক্কর দিতে পারবে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো সোহানা।

তারমানে, ক্যাম্পে ওদেরকে আজ রাত বারোটার দিকে পৌঁছুতে হবে। ক্যাম্প দখল করার জন্যে রাখা হয়েছে আড়াই ঘণ্টা সময়। এই সময়ের মধ্যেই স্টোরেজ ট্যাংক থেকে ট্রাকে পেট্রল ভরতে হবে, মুক্ত করতে হবে মাজুলেট আর বন্দীদের, তারপর রওনা হতে হবে এয়ারস্ট্রিপের উদ্দেশে।

'এবার নোট দেখে বলো কার কি দায়িত্ব। প্রথমে, মেজর কুকি…।'

'বোল্ট-কাটারদের নিয়ে সরাসরি আমরা নাম্বার ওয়ান হাটমেন্টে যাবো…' দু'জন গেরিলাকে নিয়ে মিরাণ্ডা আর মেজর কুকি যাবে প্রথম সারির কুঁড়েঘর থেকে জেনারেল মাজুলেটকে উদ্ধার করতে। প্রথম সারির কুঁড়েঘরগুলো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর, অন্যান্য-গুলোর কাছ থেকে একটু দূরে, ওগুলোকে সিকিউরিটি সেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্যাম্পে বন্দী থাকার সময় মাজুলেটকে ওদিক থেকেই বের করে আনতে দেখেছিল মিরাণ্ডা। 'জেনারেল মাজু-লেটকে নিয়ে মেইন গেটে চলে আসবো আমরা। যদি দেখি তিনি হাঁটতে পারেন, দু'জনকে ওখানে রেখে আমরা বাকি সেলগুলো খুলে দিতে যাবো।'

'গুড। এবার দ্বিতীয় গ্রুপ…'

সোহানা শুরু করলো, 'পাঁচজনকে নিয়ে পেরিমিটার গার্ড টাওয়া-রের দিকে…।'

সোহানা থামতে রানা বললো, 'ভেরি গুড। কিন্তু আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, ওরা ট্র্যান্সমিট শুরু করার আগেই রেডিওটা দখল করতে হবে। প্রথম গুলি হবার পর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পাবো আমরা। কি ঘটছে বুঝতে দু'মিনিট সময় নেবে অপারেটর, দু'মিনিট লাগবে জেনারেটর চালু করে ফুল পাওয়ার পেতে, বাকি এক মিনিট লাগবে হারারে-র সাথে যোগাযোগ করে হেডকোয়ার্টারকে সাবধান করতে। তা যদি করতে পারে, আমরা কেউ বাঁচবো না।' হাতঘড়ি দেখলো ও। 'সাতটা পাঁচ। এবার ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। শোনা ভাষা জানে সেই ছেলেটা কোথায়?'

ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে পড়লো রানা, ইতিমধ্যে শোনা-জানা

লোকটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে সব কথা বুঝিয়ে দিলো ও। রানাকে সে বললো, 'আমি ওদের বলবো, ক্যাম্পে পৌছুতে দেরি হবে কনভয়ের। একটা ট্রাকে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তবে চিন্তার কিছু নেই, মেরামতের কাজ চলছে। আশা করা যায় মাঝরাতের দিকে পৌছুবো আমরা।'

'হ্যাঁ।'

'ওরা যদি জেরা শুরু করে, বলবো, তোমাদের কথা বোঝা যাচ্ছে না। অ্যারাইভিং লেট, বলে যোগাযোগ কেটে দেবো।'

টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, টুটি ক্যাম্পের সাথে কথা শেষ করে মাইক্রোফোন রেখে দিলো গেরিলা। 'অপারেটর কিছু সন্দেহ করেছে বলে মনে হলো না। বলে দিয়েছি, মাঝরাতের দিকে পৌছুবো।'

সন্দেহ হয়তো ঠিকই করেছে, কিন্তু প্রকাশ করেনি। ক্যাম্পে পৌছে হয়তো দেখা যাবে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওদেরকে। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'ঠিক আছে, খাওয়াদাওয়া সেরে নেয়া যাক। তারপর বিশ্রাম।'

'সেরেছে, এতো আলো!' আপন মনেই বিড়বিড় করলো রানা। প্রথম ট্রাকের পিছনে, ক্যানভাসের নিচে বসে আছে ও, সরু একটা ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। আর চার দিন পর পূর্ণ আকৃতি পাবে চাঁদ। এখনই এতো উজ্জ্বল যে গাঢ় দেখাচ্ছে ছায়াগুলোর কিনারা। মেটো পথের ওপর হেলেদুলে এগোচ্ছে ট্রাক, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে। ক্যানভাসের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ধুলো।

মুখ আর হাতে কালো রঙ মাখলেও, ট্রাকের ক্যাবে বসতে সাহস পায়নি রানা বা সোহানা। তীক্ষ্ণ চোখে কেউ তাকালে, আবছা আলোতেও বোঝা যাবে ওরা আফ্রিকান নয়। ড্রাইভারের পাশে বসেছে মেজর কুকি, যুবক অফিসারের ইউনিফর্ম পরে রয়েছে সে, বেরেট আর ব্যাজ সহ। তার পাশে বসেছে শোনাভাষী ম্যাটাবেল গেরিলা। হেভি মেশিনগান দুটো লোড আর কক্ করা হয়েছে, গানারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দু'জন গেরিলাকে। ট্রাকের ওপর, ক্যানভাসের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো আটজন গেরিলা, প্রত্যে-কের পরনে থার্ড ব্রিগেডের ইউনিফর্ম। বাকি সবাই রানার সাথে ক্যানভাসের তলায় লুকিয়ে আছে।

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো চলছে,' ফিসফিস করে বললো সোহানা।

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'শুরুটা ভালোই হয়েছে। এখন শেষটা ভালো হলেই হয়।'

ক্যাবের গায়ে তিনটে টোকা পড়লো। মেজর কুকির সংকেত, দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এসেছে ক্যাম্প। শরীর বাঁকা করে ক্যানভা-সের ফুটোয় চোখ রাখলো রানা।

ক্যাম্পের ওয়াচটাওয়ারগুলো দেখা গেল, জ্যোছনা ভরা আকা-শের গায়ে অয়েল-রিগের মতো মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। চাঁদের আলো লেগে চকচক করে উঠলো কাঁটাতারের বেড়া। তারপর হঠাৎ ওদেরকে চমকে দিয়ে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশ। ক্যাম্প পেরিমিটারের চারদিকে কয়েকটা পোলের মাথায় জ্বলে উঠলো ফ্লাডলাইটের সাদা আলো। গোটা ক্যাম্প এলাকা রোদ-জ্বলা দুপুরের মতো ঝলমলে হয়ে উঠেছে।

'জেনারেটর,' প্রায় গুঙিয়ে উঠলো রানা। 'সর্বনাশ!'

রানার ভুলটা ধরা পড়লো। অন্ধকারে সব কিছু সারা যাবে, শুধু ট্রাকের হেডলাইট জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে ক্যাম্প গার্ডদের, এটা ধরে নিয়ে প্ল্যান করা হয়েছে। কনভয়কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ফ্লাডলাইট অবশ্যই জ্বালা হবে, এই সহজ সত্যটা মনে পড়েনি কারো।

এখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই, ঢিল ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। বাঘের মুখে পড়তে হবে জেনেও আলোর এই বন্যার ভেতর ঢুকতে হবে ওদের। ক্যানভাসের নিচে অসহায় বোধ করলো রানা, ওর সামনে ক্যাবে বসা মেজর কুকির সাথেও এখন আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। ফুটোয় চোখ রেখে নিজেকে তিরস্কার করলো ও।

গার্ডেরা গেট খুলছে না। গার্ড-হাউসের একদিকে বালির বস্তা দিয়ে একটা ঘের তৈরি করা হয়েছে, ঘেরের ভেতর একটা হেভি মেশিনগান। ব্যারেলটা ধীরে ধীরে প্রথম ট্রাকের দিকে ঘুরছে। ঘের থেকে বেরিয়ে এলো শোনা সৈনিকরা, চারজন ট্রুপার, একজন নন-কমিশনড অফিসার। গার্ডরুমের সামনে পজিশন নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালো তারা।

গেটের দিকে এগোচ্ছে প্রথম ট্রাক, সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের মতো একটা হাত তুলে থামতে নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। ট্রাক থামলো। পাশের জানালায় দেখা গেল সার্জেন্টকে। শোনা ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করলো সে।

ক্যানভাসের ভেতর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা।

ট্রাকের ক্যাব থেকে শোনাভাষী গেরিলা চটপট জবাব দিলো। সাথে সাথে বদলে গেল সার্জেন্টের চেহারা। জবাবে নিশ্চয়ই কিছু

ভুল হয়েছে।

সশস্ত্র গার্ডরা ঝাঁকি খেলো। কাঁধে ঝুলে থাকা রাইফেলে হাত উঠে গেল। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

ইউনিফর্ম পরা একজন গেরিলার পায়ে দ্বিতীয়বার টোকা দিলো রানা। গেরিলার ডান হাতে একটা গ্রেনেড ছিলো, পিনটা আগেই খুলে রেখেছে সে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে অলস ভঙ্গিতে ছুটে গেল গ্রেনেড, পড়লো ঘেরের ঠিক মাঝখানে। একই সময়ে এক ঝটকায় ক্যানভাস সরিয়ে মাথাচাড়া দিলো রানা, ওর হাতে গর্জে উঠলো এ-কে ফরটিসেভেন। 'কিল দেম! কিল দেম! কিল দেম!'

গার্ডদের মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। একজনও রাইফেল নামাতে পারেনি, বুলেটের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন শরীর নিয়ে ছিটকে পড়লো গার্ডরুমের সামনে। ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো সার্জেন্ট, কিন্তু ট্রাক থেকে ঝুঁকে তার পিঠে পরপর দুটো গুলি করলো মেজর কুকি।

সার্জেন্ট ধরাশায়ী হতেই ঘেরের ভেতর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, মেশিনগানের ব্যারেল লক্ষ্যহীনভাবে উঠে গেল আকাশের দিকে। শ্র্যাপনেলের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল গানার।

'ড্রাইভ!' ঝুঁকে ক্যাবের জানালায় মুখ নামালো রানা। 'গেট ভেঙে ফেলো!'

টয়োটার ইঞ্জিন গর্জে উঠলো, ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ছুটলো ট্রাক। সংঘর্ষের ধাক্কায় ট্রাকের মেঝেতে ছিটকে পড়লো ওরা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো গেট। মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্তত করলো ট্রাক, তারপরই হুংকার ছেড়ে লাফ দিয়ে পড়লো আলোয় আলোময় উঠনে, পিছনে বাধিয়ে টেনে নিয়ে এলো খানিকটা কাঁটাতারের

বেড়া, আর ভাঙাচোরা কয়েকটা তক্তা।

ক্যাবের মাথায়, গানারের পাশে উঠে এলো রানা। 'বাঁ দিকে...' ব্যারাকের দিকে আঙুল তাক করলো ও। ব্যারেল ঘুরিয়ে নিলো গানার। ব্যারাক থেকে অর্ধনগ্ন একদল শোনা সৈনিক মাত্র বেরিয়ে এসেছে, দীর্ঘ একটানা বিস্ফোরণে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সব ক'জন।

'ডান দিকে...গার্ড টাওয়ার।'

টাওয়ারের মাথা থেকে দু'জন শোনা এলোপাথাড়ি গুলি করছে, ওদের মাথার ওপর হিস হিস শব্দ করছে বুলেটগুলো। বন বন করে হাতল ঘুরিয়ে মেশিনগানের ব্যারেল ওপর দিকেউঁচু করলো গানার। মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে ব্রিচেরভেতর অ্যামুনিশনবেল্ট ঢুকলো। টাওয়ারের দেয়াল আর জানালা থেকে বাঁশ, কাঠ, আর কাঁচের টুকরো সবেগে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। বুলেটের ধাক্কায় পিছন দিকে ছিটকে পড়লো গার্ড দু'জন।

'সামনে এক নম্বর সিকিউরিটি সেল।' রানার পিছন থেকে মিরাণ্ডাকে সাবধান করে দিলো সোহানা। হঠাৎ একজন গেরিলা আধ পাক ঘুরে আলিঙ্গন করলো তাকে, তারপর পড়ে গেল ওর পায়ের ওপর। সোহানার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত রাঙা হয়ে গেল তাজা রক্তে। একটা টাওয়ার থেকে ছুটে এসে লোকটার বুক দু'ফাঁক করে দিয়েছে এক পশলা বুলেট। টয়োটার গতি একটু মন্থর হলো। পেছন থেকে মিরাণ্ডা আর দু'জন গেরিলা, ক্যাব থেকে মেজর কুকি—চারজন এক সাথে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো প্যারেড গ্রাউণ্ডে। মিরাণ্ডার হাতে বোল্ট-কাটার, গেরিলাদের হাতে রাইফেল, মেজর কুকির হাতে টোকারেভ পিস্তল। মিরাণ্ডাকে পিছনে নিয়ে গেরিলা দু'জন আগে আগে ছুটলো, একনাগাড়ে গুলি করলো ওরা, সবার পিছনে থেকে

ওদেরকে কাভার দিলো মেজর কুকি।

ক্যাবের মাথা থেকে পিছলে রানিংবোর্ডে নেমে এলো রানা, লটকে থাকলো ক্যাবের গায়ে। পাহাড়ী ঢালের ওপর কালচে বোল্ডার ফেলা জায়গাটার মাথার দিকে তাকালো ও, বললো, 'দুর্গের দিকে চলো! রেডিওটা…।'

মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থেমে গেল রানা। বুঝতে পারেনি কোন্ দিক থেকে এলো বুলেটগুলো।

ঢালের ওপর বোল্ডার ফেলে জায়গাটাকে দুর্গম করে তোলা হয়েছে। মাথায় তৈরি করা হয়েছে বালির বস্তা-ঘেরা ক্ষুদে একটা দুর্গ, দুই দেয়ালের মাঝখানে মেশিনগান বসাবার মুখ খোলা টানেল, ফায়ারিং প্ল্যাটফর্ম, কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ, আর ডাগ-আউট। রেডিওটা আছে একটা ডাগ-আউটের ভেতর।

দুর্গটা সরাসরি ওদের সামনে, কিন্তু দুর্গের গোড়ায় পৌঁছুতে হলে আলোকিত প্যারেড গ্রাউণ্ড সবটুকু পেরোতে হবে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। মেজর কুকি তার দল নিয়ে এক নম্বর সিকিউরিটি সেলের বাইরে পৌঁছে গেছে। বোল্ট-কাটাররা বেড়া কাটছে। চোখ ফিরিয়ে নেয়ার আগেই রানা দেখলো, খানিকটা বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকছে ওরা।

ট্রাকের পিছন থেকে ক্যাবের অপর দিকে চলে এলো সোহানা। এক হাতে জানালা ধরলো সে, অপর হাতে রাইফেল চালালো। বাঁ দিকের টাওয়ারের মাথা থেকে আর্তনাদ করে উঠেই পড়ে গেল একজন সৈনিক।

দ্বিতীয় ট্রাকের দিকে তাকালো রানা। ক্যাম্প ঘিরে থাকা কাঁটা-

তারের বেড়া ঘেঁষে উন্মত্ত হাতির মতো সগর্জনে চক্কর দিচ্ছে সেটা, রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া মাত্র একটা করে টাওয়ারের ওপর হামলা চালাচ্ছে হেভী মেশিনগানের গানার। এরই মধ্যে চারটে টাওয়ার অকেজো করে দিয়েছে ওরা, বাকি আর দুটো।

দ্বিতীয় ট্রাক থেকে গেরিলাদের একটা দল নেমে পড়লো, কোমরের কাছ থেকে গুলি করতে করতে কারাগারের মূল অংশের দিকে ছুটলো তারা। আঁতকে উঠে সোহানা দেখলো, ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে শোনা সৈনিকরা রাইফেল তুললো গেরিলাদের দিকে। পকেট থেকে একটা গ্রেনেড নিয়ে দাঁত দিয়ে পিন খুললো সে, 'সাবধান!' চিৎকার করলো, তারপর ছুঁড়ে দিলো গ্রেনেডটা।

সোহানার চিৎকার শুনে ডাইভ দিয়ে পড়লো গেরিলারা। শোনা সৈনিকদের মাঝখানে পড়লো গ্রেনেড। তারাও ডাইভ দিলো, কেউ পালাবার জন্যে, কেউ গ্রেনেডটা ধরার জন্যে। বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠলো গোটা ক্যাম্প। সাত-আটজন শোনা চোখের পলকে ছিটকে পড়লো মাটিতে।

ক্রল করে কারাগারের দেয়ালের নিচে পৌঁছুলো গেরিলারা, সামনের সারির ঘরগুলোয় সদ্য ঘুম থেকে ওঠা শোনা সৈনিকরা ছুটোছুটি করছে। গেরিলাদের একজন চিৎকার করে উঠলো, 'রেডি ...ওয়ান...টু...থ্রি!' চারটে জানালা দিয়ে প্রায় একসাথে ভেতরে ঢুকলো চারটে গ্রেনেড।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গোটা ক্যাম্প ওদের দখলে চলে এসেছে। টাওয়ারগুলো ধ্বংস হয়েছে, গার্ড-হাউস মিশে গেছে ধুলোয়, দুটো ব্যারাকই এখন ওদের নিয়ন্ত্রণে। বিজয়ের একটা উল্লাস অনুভব করলো রানা, পরমুহূর্তে সামনের দিকে তাকিয়ে দমে গেল সে।

প্যারেড গ্রাউণ্ডের শেষ মাথায় দুর্গ টা এখনো শত্রুদের দখলে।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে যাবে রানা, বালির বস্তা-ঘেরা ওপরের ঢাল থেকে ছুটে এলো সাদা ট্রেসারের একটা রেখা। উজ্জ্বল সাদা পুঁতির একটা মালার মতো দেখালো ওগুলোকে। প্রথম দিকে মনে হলো, ধীরগতিতে আসছে। কিন্তু যতো কাছে চলে এলো ততোই ভোজবাজির মতো বাড়তে লাগলো গতি। তারপর হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠলো ধুলো, ওদের চারদিকে রিকোশের তীক্ষ্ণ শব্দ ছুটোছুটি শুরু করলো। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আঘাত করলো স্টীল-বডি ট্রাকের গায়ে।

রিয়্যার ভিউ মিররের স্ট্যাণ্ড ধরে ঝুলে পড়লো রানা, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো সোহানার গলা থেকে।

'ট্রাক থামাও!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো সোহানা। চোখ জোড়া বিস্ফারিত, উদভ্রান্ত দেখালো তাকে। তার ধারণা, রানাকে গুলি লেগেছে।

'না! চালিয়ে যাও! রেডিওটা আমাদের পেতেই হবে।'

'থ্যাঙ্ক, গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সোহানা।

সাদা পাঁচিলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে ফিরলো ট্রাক। সাথে সাথে মেশিনগান ফায়ারের দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা আঘাত করলো। বিস্ফোরিত হলো উইণ্ডস্ক্রীন, ধাক্কা খেয়ে ক্যাবের দরজায় সেঁটে গেল ড্রাইভারের লাশ, তার বুকের অর্ধেক, আর মাথার একটা পাশ স্রেফ উড়ে গেছে। অ্যাকসিলারেটর প্যাডেল থেকে পা সরে যাওয়ায় মন্থর হয়ে পড়লো ট্রাকের গতি।

খপ্ করে হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেললো রানা। সিট থেকে খসে পড়লো ড্রাইভারের লাশ, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে

গেল বাইরে। ড্রাইভিং সিটে বসে অ্যাকসিলারেটরের ওপর পা চেপে ধরলো ও। একটা ঝাঁকি খেয়ে আবার দুর্বার বেগে ছুটলো ট্রাক।

ক্যাবের আরেক দিকের গায়ে ঝুলছিল সোহানা, ধপ করে রানার পাশে বসলো সে, উইণ্ডস্ক্রীনের গর্তের ভেতর রাইফেলের ব্যারেল ঢুকিয়ে দিলো। তার এ-কে ফরটিসেভেনের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল হেভি মেশিনগানের একটানা গর্জনে। দুর্গের মাথা থেকে শোনাদের মেশিনগান গুলি বর্ষণ করছে, তারই পাল্টা জবাব দিলো ওদের গানার। দুই পক্ষের ঝাঁক ঝাঁক ট্রেসার খালি প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে পরস্পরের সাথে মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেল। হঠাৎ আরেক দিকে চোখ পড়তেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো রানার।

ঢালের গোড়ায় বালির বস্তা দিয়ে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, পাঁচিলের গায়ে খানিক পরপর একটা করে ফাঁক, তারই একটা থেকে ওদের দিকে উড়ে এলো আনারস আকৃতির একটা মিসাইল, পিছনে ক্ষুদে একটা জ্বলন্ত লেজ। দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলো রানা, কিন্তু কাউকে সাবধান করার আগেই আর. পি. জি. রকেট মিসাইল আঘাত করলো ওদেরকে।

ট্রাকের সামনে, নিচের দিকে বিস্ফোরিত হলো রকেট, সেজন্যেই বেঁচে গেল ওরা। বিস্ফোরণের বেশিরভাগ ধাক্কা হজম করলো নিরেট ইঞ্জিন, ট্রাক থেকে সামনের অংশটা চোখের পলকে উধাও হলো। ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়লো যেন লোহার দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সময়, দাঁড়িয়ে পড়েছে ওদের বাহন। তারপরই ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ট্রাক, এতোই অবিশ্বাস্য রকম মন্থর গতিতে, যেন গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নের

ভেতর ঘটছে।

খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে পড়লো রানা। মাটি খামচে ধরে মাথা উঁচু করলো ও। ঢালের মাথা থেকে হেভি মেশিনগানের মাজল ধীরে ধীরে আরো একটু নিচের দিকে নেমে স্থির হলো ওর ওপর। পরমুহূর্তে ওর আশপাশে নাচতে শুরু করলো ধুলো আর মাটি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানা।

কোনো ব্যথা অনুভব করলো না রানা। বুঝলো, অনেকগুলো বুলেট ছোবল দিয়ে গেছে ওকে। স্থিরভাবে কিছু চিন্তা করতে পারলো না, ভাবলো, একেই কি মৃত্যু বলে? আর কতোক্ষণ বেঁচে আছি? শেষ ইচ্ছেটা জাগলো মনে—সোহানাকে একবার দেখতে চাই। সারা শরীর আশ্চর্য ভারি হয়ে উঠেছে। কিসের যেন চাপ, ধীরে ধীরে উঠে এলো শরীরের ওপর, গ্রাস করে ফেললো ওকে। শীত শীত করতে লাগলো।

মৃত্যু নয়, হামাগুড়ি দিয়ে রানার ওপর উঠে এসেছে সোহানা। দু'জন প্রায় একই সাথে ট্রাকের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ওরা। মেশিনগানের বুলেটে রানা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে দেখে তিন গজ দূর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে রানার গায়ের ওপর চলে এসেছে সোহানা। মেশিনগানের বাকি গুলি রানার গায়ে লাগতে দেবে না, নিজের শরীর দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে ওকে।

চোখ মেললো রানা। ডান হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। কনুইয়ের নিচেও একই রকম একটা ক্ষত। পা নাড়লো রানা, ঘাড় ঝাঁকালো—বুঝলো, কোনো হাড় ভাঙেনি। ওকে নড়তে দেখে ফিসফিস করে বললো সোহানা, 'আমি তোমাকে পাঁচিলের কাছে নিয়ে যাবো⋯'

সোহানাকে নিজের পিঠ থেকে ফেলে দিলো রানা, বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেলো। বিধ্বস্ত ট্রাকটার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আহত গেরিলারা, একজন ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে। গলার রগগুলো ফুলে উঠলো রানার, চিৎকার করে বললো, 'ছোটো! ছোটো! ছোটো! পাঁচিলের দিকে…!'

সোহানার হাত ধরে লাফ দিলো রানা, দৌড় দিলো প্রাণপণে। সাদা চুনকাম করা পাঁচিলটা ওদের ডান দিকে, সত্তর গজ দূরে। আহতদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন শুনতে পেলো ওর নির্দেশ, হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে তারাও ছুটলো ওদের সাথে। রানাকে পড়ে যেতে দেখে মাজল ঘুরিয়ে নিয়েছিল গানার, ওরা ছুটতে শুরু করতেই আবার ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো। রানার সামনের লোকটা আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, আর উঠলো না, হাঁটুর নিচে দুটো পায়ের হাড়ই চুরমার হয়ে গেছে। রানা তাকে পাশ কাটাবার সময় একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো লোকটা, হাতের রাইফেলটা ছুঁড়ে দিলো রানার দিকে। 'এই নিন, লিডার, ধরুন। আমি নেই।'

ছোটার গতিতে কোনো বিরতি না দিয়ে রাইফেলটা লুফে নিলো রানা। 'ইউ আর এ ম্যান!' মুমূর্ষু গেরিলাকে বললো সে, তাকে পিছনে ফেলে ছুটে চললো। সামনে, পাঁচিলের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে সোহানা। এতোক্ষণ তাকেই অনুসরণ করে অগ্নিবর্ষণ করেছে মেশিনগানের মাজল, এবার রানার দিকে ফিরলো সেটা।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো রানা, ওর মাথার আধ হাত ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। ক্রল করে দ্রুত এগোলো ও। আবার বিস্ফোরিত হলো মেশিনগান, রানার চারপাশের মাটি লাফ দিলো। এগিয়ে আসছে সোহানা, হঠাৎ লাফ

দিয়ে তার ওপর পড়লো রানা, তাকে নিয়ে পড়ে গেল, গড়াতে শুরু করে পাঁচিলের গায়ে এসে ধাক্কা খেয়ে থামলো।

'বোকা মেয়ে!' মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে রানা, বেশি কথা বলার শক্তি নেই।

সোহানা বাদে আর মাত্র একজন গেরিলা পাঁচিলের নিচে আসতে পেরেছে। বাকিরা মারা গেছে ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে, না হয় খোলা মাঠে গুলি খেয়ে।

'মেশিনগানটা,' বললো রানা। 'ওটাকে আমাদের থামাতে হবে!'

'যাও,' রানার শার্ট আর ট্রাউজারের বোতাম খুলে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করলো সোহানা। বুলেট আর শ্র্যাপনেল কোথাও কোথাও মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরে ঢুকে রয়ে যায়নি। 'হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেবো।'

আরেকটা আর. পি. জি. রকেট মিসাইল ধাক্কা খেলো পাঁচিলের মাথায়, কানে তালা লেগে গেল ওদের, সাদা ধুলোয় ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক।

একটা গড়ান দিয়ে এ-কে ফরটিসেভেন চেক করলো রানা। পুরো একটা ম্যাগাজিন রয়েছে। সোহানার কাঁধের হ্যাভারস্যাক থেকে আরেকটা ম্যাগাজিন নিলো ও। বেল্টে আছে টোকারেভ পিস্তল, অবশিষ্ট গ্রেনেড দুটো বুক পকেটে।

'মানে?' ভুরু কুঁচকে রানার মতিগতি বোঝার চেষ্টা করলো সোহানা।

পাঁচিলের কোণে উঁকি দিয়ে চট করে একবার দুর্গের দিকে তাকালো রানা। সাথে সথে মেশিনগান ফায়ারের একটা বিস্ফোরণ ওর মাথার ওপর পাঁচিলের গা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেল।

গড়িয়ে পিছিয়ে এলো রানা। ঢালের গোড়া মাত্র একশো ফিট দূরে, কিন্তু মনে হলো একশো মাইল। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা, ঢালের মাথা থেকে গোটা কম্পাউণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে শোনা গানার। মেশিনগানের গুলি বা আর. পি. জি. লঞ্চারের রকেট এড়িয়ে আলোর এই সাগর পেরোনো অসম্ভব।

অস্থির চোখে দ্বিতীয় ট্রাকটাকে খুঁজলো রানা। কোথাও নেই সেটা। আর. পি. জি. মিসাইল ছুঁড়ছে দেখে বুদ্ধিমান ড্রাইভার নিশ্চই কোনো একটা বিল্ডিঙের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। গেরিলা-দেরও কোথাও দেখা গেল না, সবাই কাভার নিয়েছে। তবে হতা-হতের সংখ্যাও প্রচুর।

'এভাবে এটা শেষ হতে পারে না!' নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। 'যেভাবে হোক মেশিনগানটা দখল করতে হবে আমাদের!'

কোনো টার্গেট না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে মেশিনগান। নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধার আগেই, হঠাৎ করে একটা গুঞ্জন ঢুকলো কানে। প্রথমে আওয়াজটা চেনা গেল না, তারপর গমগমে হয়ে উঠতে চেনা গেল। বহু লোক একসাথে গান ধরেছে। ম্যাটাবেলদের এটা একটা যুদ্ধের গান। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার, কারণ কথাগুলো আলাদা হলেও, বিদ্রোহী বাঙালী কবির সেই বিখ্যাত গানের সুর অনেকটাই যেন এই সিনডেবেল গানে লুকিয়ে আছে—কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট...।'

আর তারপরই কুঁড়েঘরগুলো ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ওরা। নগ্ন-দেহী বন্দীদের একটা কালো পাঁচিল। কেউ কেউ এতো দুর্বল যে টলছে, বাকিরা ছুটে আসছে, কেউ নিরস্ত্র নয়। কারো হাতে ইট

বা পাথর, কারো হাতে বাঁশ বা লাঠি। অল্প দু'একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গেল, নিহত গার্ডদের কাছ থেকে পেয়েছে। বিস্ফারিত চোখ, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঠোঁটে যুদ্ধের পাগল করা গান।

পাহাড়ী জলস্রোতের মতো ধেয়ে এলো ওরা, হামলা চালালো ঢাল লক্ষ্য করে।

'হায় খোদা!' আঁতকে উঠলো রানা। 'ম্যাসাকার হয়ে যাবে!'

নগ্নদেহী বন্দীদের প্রথম সারিতে একজন দীর্ঘকায় পুরুষকে দেখা গেল, তার কোমরের কাছে একটা এ-কে ফরটিসেভেন ঝুলছে। সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে বন্দীদের। প্রথমবার তাকিয়েই তাকে চিনতে পারলো রানা।

'মাজুলেট!' বন্ধুর নাম ধরে চিৎকার করলো রানা। 'ফিরে যাও, মাজুলেট, ফিরে যাও!' কিন্তু বৃথা, রানার চিৎকার ওদের কারো কানে গেল না।

'মেশিনগান এখন ওদের দিকে ঘুরবে,' বললো সোহানা। 'এটাই আমাদের শেষ সুযোগ!'

'তৈরি হও,' নির্দেশ দিলো রানা। সোহানার কথাই ঠিক, রানা থামতেই আবার গর্জে উঠলো মেশিনগান।

'থামো!' সোহানার একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেললো রানা। 'একটু পরেই বেল্ট বদলাবে গানার।'

ফুঁপিয়ে উঠে চোখে হাত চাপা দিলো সোহানা, এই নারকীয় দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। ট্রেসারের প্রথম ঝাঁকটা বন্দীদের ওপর যেন আগুনের হলকা ছড়িয়ে দিলো। পতন হলো প্রথম সারির, এক সেকেণ্ডও লাগলো না ফাঁকটা পূরণ হতে, কাতারে কাতারে ছুটে আসছে মানুষ। সামনের সারির সবাই মুখ থুবড়ে পড়লেও

ম্যাজুলেট যেন অজেয় অমর দেবদূত, অসম সাহসী দিগ্বিজয়ী বীর যোদ্ধার মতো ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে সে, মেশিনগানের একটা গুলিও তাকে স্পর্শ করলো না।

হঠাৎ করেই থেমে গেল মেশিনগান।

'গান এম্পটি!' হুংকার ছাড়লো রানা। 'গো! গো! গো!'

সবার পায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, ছোট্, ছোট্, ছোট্। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানার মনে হলো দুর্গটা যেন এখনো দুনিয়ার শেষ প্রান্তে।

আরেকটা রকেট মিসাইল ছুটে এলো। ছোটার মধ্যেই ঝট্ করে মাথা নিচু করলো রানা। তবে ভয়ের কিছু ছিলো না, মাথার অনেক ওপর দিয়ে গেল সেটা, গানার আতংকিত হয়ে পড়েছে। প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গার্ড ব্যারাকের পাশে, ঢাউস ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাংকের গায়ে বিস্ফোরিত হলো রকেট। বিকট হুস আওয়াজটাকে অপার্থিব মনে হলো, একলাফে আকাশে মাথাচাড়া দিলো দুশো ফিট উঁচু রক্তবর্ণ শিখা। বিস্ফোরণের গরম নিঃশ্বাস ছেঁকে ধরলো রানাকে, গুলি করতে করতে ছুটলো ও।

সারা শরীরে ক্ষত নিয়ে পিছিয়ে পড়লো রানা, কয়েকজন গেরি-লার সাথে অনেকটা এগিয়ে গেছে সোহানা। ছুটছে, আর মনে মনে একটা হিসেব করছে ও। দক্ষ একজন লোক অ্যামুনিশন বক্স বদলে মেশিনগান রিলোড করতে দশ সেকেণ্ডের বেশি নেবে না। পাঁচিল থেকে রওনা হবার পর সাত সেকেণ্ড পেরিয়েছে—আট, নয়, দশ—শুরু হলো, শুরু হলো! অথচ এখনো বিশ পা পেরোতে হবে রানাকে।

শেষ কয়েক গজ থাকতে ডাইভ দিয়ে বালির বস্তার গোড়ায় গিয়ে

পড়লো সোহানা।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লো রানা, ওর চারদিকে মুষলধারে বৃষ্টির মতো গুলি পড়তে লাগলো। কয়েকটা গড়ান দিয়ে আবার সিধে হয়েই ছুটলো ও। ওকে পড়ে যেতে দেখে ইতিমধ্যে মেশিনগান অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে গানার, পাখি শিকারের মতো টপাটপ ফেলে দিচ্ছে সদ্য কারামুক্ত বন্দীদের।

গুলি নয়, ছিটকে আসা মাটির ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিল রানা। সোহানার বাড়িয়ে ধরা দু'বাহুর মাঝখানে সেঁধিয়ে গেল ও। পর-মুহূর্তে পরস্পরকে ছেড়ে ঘুরলো ওরা, লাফ দিয়ে বালির বস্তার পাঁচিল আঁকড়ে ধরলো, আঁচড়ে খামচে উঠে পড়লো পাঁচিলের মাথায়, পিছলে নেমে পড়লো নির্জন ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মের চত্বরে।

সরু প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চে নামলো সোহানা, ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানা। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছুবার আগেই ধস্তাধস্তি আর গোঙানির আওয়াজ পেলো সোহানা। বাঁক নেয়ার পর দেখলো থার্ড ব্রিগেডের একজন ট্রুপারের লাশ ছেড়ে দিয়ে সিধে হচ্ছে রানা। আর. পি. জি. ফেলে পালাচ্ছিল লোকটা।

'মেশিনগান, সোহানা!' নির্দেশ নিলো রানা। 'আমি রেডিও রুমে যাচ্ছি!'

প্যাসেজ থেকে বালির বস্তার ওপর উঠে পড়লো রানা। ছুটতে ছুটতে পাশ কাটালো পরিচিত একটা ডাগ-আউট, প্রথমবার এখানে আসার পর এই ডাগ-আউটে থাকতে দেয়া হয়েছিল ওকে।

বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আরেকটা প্যাসেজে চলে এলো রানা। প্যাসেজের শেষ মাথা, রেডিও অপারেটরের ডাগ-আউট থেকে

চিৎকার ভেসে এলো। দেরি করে ফেলেছে ও। দরজার পাশে পৌঁছে এক সেকেণ্ডের জন্যে থামলো। ডাগ-আউটের শেষ প্রান্তের দেয়ালের কাছে রেডিও সেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে অপারেটর। রেডিও সেটটা একটা বেঞ্চের ওপর রয়েছে, মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে ইংরেজীতে মেসেজ পাঠাচ্ছে লোকটা, রিপিট করছে বারবার।

হারারে হেডকোয়ার্টার থেকে জবাব আসতে শুরু করলো, 'মেসেজ রিসিভড অ্যাণ্ড আণ্ডারস্টুড। হোল্ড অন। উই উইল রি-এনফোর্স ইউ ইমিডিয়েটলি…।'

এ-কে থেকে দীর্ঘ একটা বিস্ফোরণ বেরিয়ে এলো, চুরমার হয়ে গেল রেডিও সেট। মাইক্রোফোন ছেড়ে দিয়ে বালির বস্তার গায়ে সেঁটে গেল অপারেটর, রানার দিকে তাকিয়ে আতংকে তোতলাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকলো রানা। দরজার কাছ থেকে গর্জে উঠলো অটোমেটিক রাইফেল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল অপারেটর। ঝট্ করে পিছন ফিরে জেনারেল মাজুলেটকে দেখতে পেলো রানা।

'হ্যালো, রানা, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড!' দিগম্বর জেনারেল হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে দু'হাতে আলিঙ্গন করলো রানাকে। 'তোমার এই ঋণ সাত জনমেও শোধ হবার নয়।'

সাত

প্রথম ট্রাকটা বাতিল লোহায় পরিণত হয়েছে, দ্বিতীয়টার পিছনের দুটো চাকাই ফেটে গেছে। দুটোর কোনোটাতে পেট্রল নেই।

যতোটা সংক্ষেপে সম্ভব মাজুলেটকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো রানা। 'শেষ সময় সকাল আটটা, তার আগেই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে না পারলে পায়ে হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।'

'এয়ারস্ট্রিপ এখান থেকে ত্রিশ মাইল,' চিন্তিত দেখালো জেনা-রেলকে। 'এখানে আর কোনো গাড়ি নেই। দু'দিন আগে ল্যাণ্ড-রোভারটা নিয়ে গেছে উমাঙ্গো।'

'চাকাগুলো একটা থেকে খুলে আরেকটাতে লাগাতে পারবো, কিন্তু ফুয়েল? মাজুলেট, আমাদের ফুয়েল দরকার!'

দু'জনেই ওরা জ্বলন্ত ট্যাংকের দিকে তাকালো। রাতের আকাশে এখনো বিশাল স্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে আগুনের শিখা, ঘন কালো ধোঁয়া পাক খেতে খেতে নেমে আসছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে, মাঝেমধ্যে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলোকে। প্রচুর গেরিলা মারা গেছে, তবে শোনা গার্ডরাও কেউ বেঁচে নেই। বন্দীরা তাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই ধরে ছিঁড়ে ফেলেছে,

ছাতু হয়ে গেছে কেউ কেউ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো রানা।

সোহানার কথা মনে পড়তেই অস্থির হয়ে উঠলো ও। খানিক আগে মটরসাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে সে। সময় মতো ওদেরকেও এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে হবে। তা না হলে সেসনা নিয়ে ফিরে যাবে সোহানা। 'আমি চাকা বদলাই, তুমি ফুয়েল খুঁজে বের করো। কুইক, মাজুলেট, কুইক!'

প্রথম ট্রাকের সামনে মেজর কুকি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। 'চোদ্দজনকে হারিয়েছি আমরা, মিঃ অ্যাডভাইজার।'

'দুঃখিত,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। ভাবলো, ওরা মরেছে তিনগুণ, কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়। 'এসো, কাজটা শেষ করি।'

এক ঘণ্টা পর ফিরে এলো মাজুলেট, সাথে মিরাণ্ডা! গ্রিজ মাখা কালো ভূতের বিকট চেহারা নিয়ে ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

'কোথাও ফুয়েল নেই,' বললো মাজুলেট। 'খুঁজে দেখেছি।'

'দুটো ট্যাংকের তলানি এক করে পনেরো লিটারের মতো হয়েছে,' শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে বললো রানা। 'ভাগ্য ভালো হলে মাইল পনেরো যেতে পারবো।' হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলো ও। 'কিভাবে যাচ্ছে সময়, তিনটে বাজে!' সময় মতো পৌঁছুতে পারবো বলে মনে হয় না...।'

'রানা, মিরাণ্ডার মুখে সব কথা শুনলাম। তুমি যা করেছো...।'

'আর সময় পেলে না?' ধমকে উঠলো রানা। 'তোমার লোকদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নাও, এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

মাজুলেটের নির্দেশে গেরিলা আর বন্দীরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হলো। দ্বিতীয় ট্রাকের বনেটে উঠে দাঁড়ালো মাজুলেট। ছোট্ট একটা বক্তৃতা মতো দিলো সে। সবশেষে বললো, 'আপাততঃ বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো আমি। ফিরে আসবো তোমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে।'

'বাবা! বাবা!' বন্দীরা হাহাকার করে উঠলো।

'শোনা কুকুরগুলো রওনা হয়ে গেছে,' বললো মাজুলেট। 'এখানে আসছে ওরা। কাজেই জঙ্গলে পালাতে হবে তোমাদের। গেরিলাদের সাথে যাও, ওরা তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। বিদায়, বন্ধুরা!'

এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করলো মেজর কুকি। 'আপনার গল্প ম্যাটাবেলদের মুখে মুখে ফিরবে, মিঃ অ্যাডভাইজার। ম্যাটাবেলদের রাজাকে আপনি উদ্ধার করেছেন, আমরা সবাই সেজন্যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'গুডবাই, মেজর কুকি!'

ট্রাকের পাশে রানা, মাজুলেট আর মিরাণ্ডা দাঁড়িয়ে রইলো। বন্দীদের নিয়ে চলে গেল গেরিলারা। ওরা সবাই চলে যাওয়ায় নির্জন পরিবেশটা হঠাৎ চারদিক থেকে যেন চেপে ধরলো ওদেরকে, কেউ কথা বলতে পারলো না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানাই। 'উমাঙ্গো নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে রিইনফোর্সমেণ্ট পাঠিয়েছে। হারারে আর এই ক্যাম্পের মাঝখানে কোথাও কোনো ট্রুপার আছে কিনা জানো?'

'মনে হয় নেই,' বললো মাজুলেট। 'কারুই-এ কিছু লোক আছে বটে, কিন্তু এরকম একটা হামলার কথা শুনে সাড়া দেয়ার মতো

যথেষ্ট শক্তি নেই তাদের।'

'ধরা যাক, মেসেজ পাবার পর ট্রুপারদের জড়ো করতে এক ঘণ্টা সময় নেবে হেডকোয়ার্টার,' বললো রানা। 'হারারে থেকে ট্টিতে পৌঁছুতে লাগবে পাঁচ ঘণ্টা।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতে মাজুলেট মাথা ঝাঁকালো।

'তারমানে ঠিক ছ'টায় মিশনে পৌঁছুবে ওরা, আর সোহানা এয়ার-স্ট্রিপের মাথায় থাকবে পাঁচটায়। কিন্তু শেষ ক'মাইল আমাদের যদি হাঁটতে হয়...' কাঁধ ঝাঁকালো রানা, '...আগে থেকে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, চলো রওনা হয়ে পড়ি।'

মাজুলেট আর মিরাণ্ডা ট্রাকের ক্যাবে উঠলো। কিন্তু রানা নড়লো না। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে ও। আগুন ইতিমধ্যে প্রায় নিভে গেছে, ধোঁয়া নেই বললেই চলে। ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে প্যারেড গ্রাউণ্ড। এই আলোটাই রানার মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। এই আলোর সাথে কিসের যেন একটা সম্পর্ক আছে।

জেনারেটর? হ্যাঁ, জেনারেটরের সাথে কিসের যেন একটা সম্পর্ক। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রানা। 'ইউরেকা!'

ক্যাব থেকে মাথা বের করে মাজুলেট জানতে চাইলো, 'তার-মানে?'

'জেনারেটর চলছে কিভাবে? নিশ্চই ফুয়েল আছে ওখানে...।'

ট্রাক নিয়ে পাহাড়ের পিছনে চলে এলো ওরা, ইঞ্জিন রুমটা এদিকেই।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির, আঁকাবাঁকা অজগরের মতো মেটো পথ। ভর-

পেট ফুয়েল নিয়ে হেলেদুলে এগোচ্ছে টয়োটা। ঢালগুলো খাড়া, কাছিমের মতো মন্থর হয়ে এলো গতি। তারপর মাথা টপকে এসে এতো দ্রুত নামতে শুরু করলো, মনে হলো উল্টে যাবে।

বাঁশের ব্রিজটা পেরিয়ে এলো রানা। 'সময় ?'

ড্যাশবোর্ডের আলোয় হাতঘড়ি দেখলো মিরাণ্ডা। 'চারটে তিপান্ন।'

হেডলাইটের জোড়া টানেল থেকে চোখ তুললো রানা, আকাশের গায়ে এই প্রথম গাছের মাথা দেখতে পেলো, ভোর হতে শুরু করেছে। ঢালের মাথায় উঠে এসে কিনারায় থামলো ও, সুইচ টিপে রেডিও খুললো। ধীরে ধীরে নব ঘুরিয়ে চ্যানেল পাবার চেষ্টা করলো রানা, মিলিটারী ট্রাফিক শুনতে পাবে এই আশায় কান খাড়া করে থাকলো, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলো না।

'রেঞ্জের ভেতর থাকলে, কোনো আওয়াজ করছে না।' সুইচ অফ করে দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিলো রানা, কি দ্রুত আফ্রিকান ভোর চার-দিক উদ্ভাসিত করে তুলছে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ও। ওদের নিচে উপত্যকায়, অন্ধকারের কালো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন সবুজ সমতল বনভূমি, পাহাড়সারির গোড়া থেকে শুরু করে মিশন স্টেশন পর্যন্ত তার বিস্তৃতি।

'দশ মাইল,' বললো মাজুলেট।

'আরো আধ ঘন্টা।' শেষ পাহাড়টা থেকে নিচে নামছে ওরা। হেডলাইট অফ করে দিলো রানা।

হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর, টয়োটার আওয়াজ বদলে গেছে। পরমুহূর্তে বুঝলো, নতুন এই কর্কশ আওয়াজ, ট্রাক থেকে আসছে না, আসছে ট্রাকের বাইরে অন্য কোনো মটর থেকে। প্রতি

মুহূর্তে বাড়ছে আওয়াজটা, কাছে চলে আসছে। জানালার কাঁচ নামিয়ে বাইরে, টানা ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা বের করে দিলো।

ওদের পিছন থেকে সগর্জনে নেমে আসছে সোহানার সেসনা, রাস্তা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপরে, সকালের প্রথম রোদে ঝল-মল করছে যেন রূপালি আর নীল রঙের একটা প্রজাপতি।

'হাই!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে ঘন ঘন হাত নাড়লো রানা।

গোত্তা খাওয়া শেষ করে টয়োটার সামনে চলে এলো প্লেন, কক-পিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে রানার দিকে তাকালো সোহানা। সোনালী রঙের একটা স্কার্ফ জড়িয়েছে মাথায়, রানাকে চিনতে পেরে প্রাণখোলা নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চেহারা। পরমুহূর্তে দ্রুত সামনে ছুটে গেল প্লেন, ডানা কাত করে কোর্স বদলে চলে গেল এয়ারস্ট্রিপের দিকে।

জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ওরা, ক্ষুদে মিশন গ্রামটাকে ঘিরে থাকা ভুট্টা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটলো। গির্জা আর স্কুলের টিনের ছাদ রোদ লেগে চকমক করছে, রাস্তার পাশের ঘরগুলো থেকে দু'চারজন গ্রামবাসী বাইরে বেরিয়ে এসে ঘুম জড়ানো চোখে তাকালো, গা চুলকাচ্ছে আর হাই তুলছে। ট্রাকের গতি কমিয়ে আনলো রানা, জানালা দিয়ে মাথা বের করে চিৎকার করে বললো মিরাণ্ডা, 'শোনা সৈনিকরা আসছে, সাবধান! শোনা সৈনিকরা আসছে, সাবধান! মহাবিপদ, সাবধান! সবাইকে নিয়ে জঙ্গলে পালাও তোমরা! পালাও, পালাও, পালাও!'

গ্রামের ভেতর দিয়ে আবার তুমুলবেগে ছুটলো ট্রাক। এয়ারস্ট্রিপ আর এক কিলোমিটার দূরে। টারমাকের ওপর চক্কর দিচ্ছিলো সোহানা, এবার আণ্ডারক্যারিজ নামালো সেসনার, বৃত্ত শেষ করে

ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিলো।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো মাজুলেট, ওদের বাঁ দিক থেকে স-গর্জনে ছুটে এলো আরেকটা প্লেন। এটা একটা টুইন-ইঞ্জিন ডাকোটা ট্রান্সপোর্ট। সেসনার চেয়ে আকারে বড়, আসছে খুব নিচ দিয়ে। ডানার পাশে মেইন হ্যাচটা খোলা, দোরগোড়ায় কয়েকজন লোক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরনে ক্যামোফ্লেজ জাম্প স্মক, আর হেলমেট। প্রত্যেকের নিতম্বের নিচে প্যারাস্যুটের ভারি বাণ্ডিল ঝুলছে। সামনের সারিতে রয়েছে দু'জন, বাকিরা তাদের পিছনে।

'প্যারাট্রুপার!' চিৎকার করে বললো রানা, গোত্তা খেয়ে ওদের দিকে নেমে এলো ডাকোটা। এতো নিচে দিয়ে ওদেরকে পাশ কাটালো, বাতাস লেগে নুয়ে পড়লো ভুট্টা ক্ষেত। ওদের একজনকে চিনতে পারলো রানা।

'উমাঙ্গো!' দাঁতে দাঁত ঘষে বললো মাজুলেট। এক ঝটকায় দরজা খুলে ট্রাকের বাইরে বেরিয়ে এলো সে, মেশিনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করলো, ডাকোটা তখনও রেঞ্জের বাইরে সরে যেতে পারেনি। শত্রু বিমানের পোর্ট উইঙের নিচে দিয়ে ছুটে গেল ট্রেসার, পাইলটকে আতংকিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। প্রায় খাড়া উঠে রেঞ্জের বাইরে চলে গেল ডাকোটা।

'প্যারাট্রুপাররা লাফ দেবে, তাই ওপরে উঠছে পাইলট,' রানার কথা শুনে মাথা ঝাঁকালো মাজুলেট।

রূপালি আর নীল রঙের সেসনাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে উমাঙ্গো। বুঝে নিয়েছে সেসনায় চড়ে পালাবার প্ল্যান করেছে ওরা, ট্রাকটাও এয়ারস্ট্রিপের দিকে যাচ্ছে। ডাকোটা নিয়ে ল্যাণ্ড করার

চাইতে প্যারাট্রুপারদের নামিয়ে দিয়ে এয়ারস্ট্রিপ দখল করা সহজ হবে, সময়ও অনেক কম লাগবে। উমাঙ্গো জানে সেসনা ল্যাণ্ড করলে টেক-অফ করার সুযোগ পাবে না, তার আগেই প্যারাট্রুপাররা ঘিরে ফেলবে ওটাকে। নিরাপদ ড্রপ অলটিচ্যুড এক হাজার ফিট, কিন্তু এরা সবাই ক্র্যাক ট্রুপার, পাঁচ শো ফিট উঠে সিধে হলো ডাকোটা।

এয়ারস্ট্রিপের দূর প্রান্তে দেখা গেল সেসনাকে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে এসে টারমাক স্পর্শ করলো। ট্রাক এবং সেসনা, পরস্পরের দিকে ছুটলো তীরবেগে।

এয়ারস্ট্রিপের মাথায় ঝুলছে সবুজ সিল্ক প্যারাস্যুট, অনেক-গুলো।

স্ট্রিপের শেষ মাথায় পৌঁছে তীক্ষ্ণ একটা কোণ রচনা করে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিলো সেসনা।

ক্যাবের গায়ে ঝুলে থেকে মেশিনগান চালালো মাজুলেট, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় প্রতি মুহূর্তে দোল খাচ্ছে প্যারাস্যুট, লক্ষ্যস্থির করা প্রায় অসম্ভব।

ককপিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করলো সোহানা, হাতছানি দিয়ে ডাকলো। সমস্ত শক্তি নিয়ে গর্জন করছে ইঞ্জিন, হুইল ব্রেকের সাহায্যে আটকে রাখা হয়েছে সেসনাকে। রানওয়ের কিনারা টপকাবার সময় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো টয়োটা, কংক্রিটের সাথে টায়ারের ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ উঠলো।

'গেট আউট!' রানার নির্দেশ শুনে ছিটকে নেমে পড়লো মিরাণ্ডা, প্লেনের দিকে ছুটলো। তার হাত আঁকড়ে ধরলো সোহানা, হ্যাঁচকা টানে তুলে নিলো ওপরে, ব্যাক সিটে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মিরাণ্ডা।

শেষ এক পশলা গুলি করলো মাজুলেট। প্রথম তিনজন প্যারা রানওয়েতে নেমেছে, বাতাসে ঢেউ খেলছে প্যারাস্যুট, মেশিন্-গানের গুলি তাদের চারদিকে ধুলো ওড়ালো। একজন প্যারাট্রুপারকে পড়ে যেতে দেখলো ওরা। ছোঁ দিয়ে এ-কে ফরটিসেভেন, আর স্পেয়ার অ্যামুনিশনের ব্যাগটা তুলে নিলো রানা। 'লেট'স গো, মাজুলেট, লেট'স গো।'

সেসনা লক্ষ্য করে ছুটলো ওরা। দুর্বল মাজুলেট হুমড়ি খেয়ে পড়লো সিঁড়ির ওপর। তাকে ধরে দাঁড় করালো রানা, ঠেলা দিয়ে তুলে দিলো ওপরে।

মাজুলেট প্লেনের ভেতর ঢোকার আগেই ব্রেক রিলিজ করলো সোহানা। প্লেনের গতি বাড়লো, তার সাথে ছুটতে শুরু করলো রানা। ব্যাক সিটে, মিরাণ্ডার পাশে মুখ থুবড়ে পড়লো মাজুলেট। লাফ দিয়ে দরজার কিনারা ধরে ঝুলে পড়লো রানা, তারপর হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়লো সোহানার পাশে।

'দরজা বন্ধ করো!' গলার সব ক'টা রগ ফুলে উঠলো মাজু-লেটের, সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ঝুলন্ত সিট-বেল্ট দরজায় আটকে গেছে, সেটাকে ছাড়াবার জন্যে টানাটানি শুরু করলো রানা। দরজা বন্ধ করে মুখ তুলে দেখে, সেসনাকে বাধা দেয়ার জন্যে রানওয়ের কিনারা থেকে ছুটে মাঝখানে চলে আসছে প্যারাট্রুপাররা।

উমাঙ্গোর হেলমেটে চকচক করছে তারকাচিহ্ন, তার পিছনে ছড়িয়ে রয়েছে প্যারাট্রুপাররা—প্রায় সরাসরি সেসনার সামনে চলে এসেছে তারা, চার কি পাঁচশো পা দূরে।

শূন্যে নাক তুললো সেসনা, ক্ষুদে একটা লাফ দিয়ে রানওয়ে

ত্যাগ করলো। উমাঙ্গো আর তার ট্রুপাররা সেসনার নাক আর ইঞ্জিনের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল, তবে ওদের মাথা থেকে মাত্র কয়েক গজ ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্লেন।

'খোদা, রহম করো!' বিড় বিড় করে উঠলো সোহানা, তার কথা শেষ হওয়া মাত্র রানার সামনে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল বিস্ফোরিত হলো, সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়লো চুরচুর কাঁচ, ওর বুকের কাছে শার্টে ছিটিয়ে পড়লো হাইড্রলিক ফ্লুয়িড।

মেঝে ফুঁড়ে উঠে এলো মেশিনগানের গুলি, বেরিয়ে গেল ছাদের ধাতব আবরণ ভেদ করে, বাতাসের তীব্র ঘূর্ণি ঢুকলো ফুটোগুলো দিয়ে।

পিছনের সিটে আর্তনাদ করে উঠলো মিরাণ্ডা, এ-কে ফরটি-সেভেনের প্রতিটি বুলেট একটা করে ঝাঁকি দিয়ে গেল প্লেনকে। মেটাল ফ্রেমে গুলি লাগায় রানার নিচে লাফ দিয়ে উঠলো সিট। জানালার ঠিক বাইরে, ডানার গোড়ায় গর্ত দেখা গেল, কিনারা-গুলো এবড়োখেবড়ো।

ঝটকা দিয়ে কন্ট্রোল কলাম সামনের দিকে ঠেলে দিলো সোহানা, তলপেটে সুড়সুড়ি দিয়ে আবার এয়ারস্ট্রিপের দিকে নামতে শুরু করলো সেসনা, ঝাঁক ঝাঁক মেশিনগানের গুলির নিচে নেমে এসে গা বাঁচাতে চাইলো সে। খয়েরি রঙের টারমাক ধেয়ে এলো ওদের দিকে, আত্মধ্বংসী ডাইভ শেষ করে প্লেন সিধে করে নিলো সোহানা, কিন্তু চাকাগুলো ধাক্কা খেলো রানওয়েতে, ড্রপ খেয়ে উঠে এলো ত্রিশ ফিট ওপরে। দু'জন প্যারাট্রুপারকে দেখলো রানা, সেসনাকে ছুটে আসতে দেখে লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল।

ওদের সামনে, বাঁ দিকে, এয়ারস্ট্রিপের কিনারা থেকে একশো গজ

দুরে নিঃসঙ্গ একটা গাছ চারদিকে ছড়ানো শাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা মারুলা, নব্বুই ফিট লম্বা।

ডানা সিধে হলো, মারুলাকে লক্ষ্য করে ছুটলো সেসনা। বাই-রের দিকে ছড়ানো পাতা ঢাকা শাখা-প্রশাখা ছুঁয়ে গেল ডানার ডগা। গাছটাকে পেরিয়ে এসেই প্লেন একটু নিচে নামলো, প্রকাণ্ড মহীরুহ মাঝখানে পড়ে যাওয়ায় প্যারাট্রুপাররা এখন ওদেরকে দেখতে পাবে না।

খুব নিচে দিয়ে ছুটলো সেসনা, খোলা ক্ষেতে লকলকিয়ে ওঠা ভুট্টা গাছের ডগার সাথে ঘষা খেলো আণ্ডারক্যারিজ।

'ডাকোটা?' তীব্র বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো রানার কণ্ঠস্বর।

'ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে,' বললো মাজুলেট। সিটের ওপর মোচড় খেলো রানার শরীর, পিছনে তাকিয়ে দেখলো গাছের মাথা ছুঁয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে দ্রুত নামতে শুরু করেছে ডাকোটা।

'আণ্ডারক্যারিজ তুলতে পারছি না!' বললো সোহানা, তালু দিয়ে সুইচের ওপর ঘন ঘন ধাক্কা দিলো সে, কিন্তু আণ্ডারক্যারি-জের তিনটে সবুজ সতর্কীকরণ আলো জ্বলজ্বল করছে কনসোলে। 'উঠবে না, কলকব্জার বারোটা বেজে গেছে।'

খোলা ক্ষেতের পর ঘন সবুজ বনভূমি, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো ওদের দিকে। কন্ট্রোল কলাম আলতোভাবে পিছিয়ে নিয়ে এসে সেসনাকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করলো সোহানা। ক্ষত-বিক্ষত ইঞ্জিন হাউজিঙের নিচে একটা হাইড্রলিক লীড বিস্ফোরিত হলো। তরল, আঠালো হাইড্রলিক ফ্লুয়িড নিশ্ছিদ্র একটা পর্দার মতো ঢেকে দিলো উইণ্ডস্ক্রীন।

'কিছুই দেখছি না!' আর্তনাদ করে উঠলো সোহানা, পাশের জানালা খুলে ফেললো সে, ডানার ডগার নিচে দিগন্তরেখায় চোখ রেখে পথ-নির্দেশ পাবার চেষ্টা করলো।

'ইন্সট্রুমেন্ট বলতে কিছু নেই,' বিধ্বস্ত প্যানেল পরীক্ষা করে বললো রানা। 'এয়ারস্পীড, রেট অভ ক্লাইম্ব, আর্টিফিশিয়াল-হরাইজন, অলটিমিটার, জাইরো কম্পাস…।'

'আণ্ডারক্যারিজ—,' বাধা দিলো সোহানা, 'বিরাট একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রেঞ্জ কমে যাবে, ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

এখনো ওপর দিকে উঠছে সেসনা। হঠাৎ কর্কশ একটা আওয়াজ, তারপরই স্তব্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। পরমুহূর্তে আবার সগর্জনে চালু হলো। পাওয়ার সেটিং নতুন করে অ্যাডজাস্ট করলো সোহানা, ফিসফিস করে বললো, 'লক্ষণ খারাপ, সম্ভবত ফুয়েল নেই। নিশ্চই ফুয়েল লাইনে কোথাও গুলি লেগেছে।' রানার দিকে ফিরলো সে, ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি, কিছু বলতে গিয়েও বললো না।

সোহানার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিলো রানা, সে-ও কিছু বললো না।

'টাইম চেক।' প্লেন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো সোহানা।

'জিরো-ফাইভ-ওয়ান-সেভেন।' সামনের দিকে তাকালো রানা, কালো একটা সাপের মতো উত্তর দিকে বেঁকে গেছে টুটি রোড, পর্বতমালার প্রথম সারিটা পেরোচ্ছে ওরা। কয়েক মাইল সামনে শশংগিরের গ্রাম।

আবার বিরতি নিলো ইঞ্জিন। ভয় কাকে বলে জানে না সোহানা, কিংবা ভয় পেলেও চেহারায় সহজে সেটা ধরা পড়ে না, তবু আরো

থমথমে, আরো কঠোর হয়ে উঠলো চোখ-মুখ। আবার জানতে চাইলো, 'টাইম ?'

'জিরো ফাইভ—টু সেভেন।'

'এয়ারস্ট্রিপ থেকে ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, বা আওয়াজও পাচ্ছে না।'

'উমাঙ্গো জানে না আমরা কোথায়, বা কোন দিকে যাচ্ছি।'

'ভিক্টোরিয়া ফলস-এ ওদের একটা হেলিকপ্টার গানশিপ আছে,' বললো মাজুলেট। সিটের ওপর দিয়ে, ওদের দু'জনের মাঝখানে ঝুঁকে পড়লো সে। 'যদি জানতে পারে আমরা বতসোয়ানার দিকে যাচ্ছি, বাধা দেয়ার জন্যে ওটাকে পাঠাবে ওরা।'

'বতসোয়ানার দিকে যাচ্ছি না,' বললো রানা। 'নিরাপদ যে-কোনো একটা জায়গায় তোমাদেরকে নামিয়ে দিতে চাই।'

'তারপর ?'

'আমি আর সোহানা ফিরে আসবো, উমাঙ্গোর সাথে আমাদের একটা বোঝাপড়া আছে।'

'আমার নেই ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো মাজুলেট। 'আমিও তোমাদের সাথে আছি।'

'আমিও,' মাজুলেটের পাশ থেকে বললো মিরাণ্ডা।

'কিন্তু এরমধ্যে অতিরিক্ত ঝুঁকি...,' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল রানা।

মৃদু শব্দে হাসলো মাজুলেট। 'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মাই ফ্রেণ্ড কিন্তু ভুলে যেয়ো না, এটা শুধু আমার অস্তিত্ব আর ক্যারিয়ারের প্রশ্নই নয়, ম্যাটাবেল উপজাতির টিকে থাকার প্রশ্নও বটে। বর্তমানে আমিই ওদের রাজা, বেজন্মা উমাঙ্গোর বিরুদ্ধে

লড়তে হবে আমাকেই।'

'আণ্ডারক্যারিজ নামানো অবস্থায় বেশি দূর আমরা যেতে পারবো না,' বললো সোহানা। পরমুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন, কিন্তু এবার আর চালু হলো না।

ভৌতিক নিস্তব্ধতা নামলো প্লেনের ভেতর। শুধু বুলেটের ফুটো-গুলো দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ঢুকছে। প্রপেলারটা কয়েক সেকেণ্ড ঘুরলো, তারপর সেটাও একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। 'ইঞ্জিন আউট,' ফিসফিস করে বললো সোহানা। 'কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। এখানেই আমাদের নামতে হবে, যদি পারি।' ফোর্সড ল্যাণ্ডিঙের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। ওদের সামনে এবড়োখেবড়ো পাহাড়, তার নিচে ঘন বনভূমি। অলস-ভঙ্গিতে সেদিকে নেমে যাচ্ছে সেসনা।

'সিট বেল্ট!' নির্দেশ দিলো রানা। 'শোল্ডার স্ট্র্যাপ!'

মাস্টার সুইচ, ফুয়েল ট্যাংক সুইচ অফ করে দিলো সোহানা, কিছুর সাথে ধাক্কা লাগলে প্লেনে যাতে আগুন ধরে না যায়। 'খোলা কোনো জায়গা দেখতে পাও?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সে। ঝাপসা উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনেটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

'না।' ওদের নিচে ঘন সবুজ জঙ্গলে কোনো ছেদ নেই।

'ছুটো বড় গাছ বেছে নেবো, গাছ ছুটোর মাঝখানে পড়বো প্লেন নিয়ে,' প্ল্যানটা বললো সোহানা। 'ডানা ছুটো ভেঙে গেলে স্পীড কমে আসবে। ধাক্কাটা...'

'বলো রাম-ধাক্কাটা...' বাধা দিয়ে ফোড়ন কাটলো রানা।

'হ্যাঁ। কাজেই এই শেষ সুযোগ, একটু আধটু প্রার্থনা করে নিতে পারো।' পাশের জানালার প্যানেল টানাটানি করলো সোহানা,

তার হয়ে তিনটে ঘুসি দিয়ে ফ্রেম থেকে পারসপেক্স শিট খসিয়ে আনলো মাজুলেট। জানালা দিয়ে বাইরে মাথা বের করলো সোহানা, তীব্রগতি বাতাসে সরু একজোড়া ফাটল হয়ে উঠলো চোখ।

পাহাড়, মাটি, আর বনভূমি দ্রুত ছুটে এলো ওদের দিকে। প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হলো পাহাড়গুলো, আকাশের দিকে উঠতে শুরু করে ওদেরকে ছাড়িয়ে গেল, দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গ্লাইড করে একটা উপত্যকার দিকে নামছে সেসনা। ঝাপসা উইণ্ড-স্ক্রীন দিয়ে গাছের মাথা দেখতে পেলো রানা।

'দরজা খোলো।' বললো সোহানা। 'প্লেন যতোক্ষণ নড়বে, কেউ স্ট্র্যাপ খুলবে না। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমেই দৌড় দেবে।'

সেসনার নাক উঁচু হলো, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া পাথরের মতো খসে পড়তে শুরু করলো নিচের দিকে। হিসেবে চুল পরিমাণ ভুল করেনি সোহানা, দুই গাছের মাঝখানে পড়লো প্লেন, প্রথম ধাক্কাতেই গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ডানা দুটো। স্ট্র্যাপে টান পড়ায় চামড়া ছড়ে গেল ওদের, মাংস থেঁতলে গেল। ধাক্কা লাগায় প্লেনটা তার বেশিরভাগ গতি হারালেও, ডানাহীন ধড়টা হেলেদুলে, এটা-সেটার সাথে বাড়ি খেতে খেতে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লো। আরোহীরা একবার ডান দিকে ছিটকে পড়লো, পরমুহূর্তে বাঁ দিকে। এরপর ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ফিউজিলাজ, মাটিতে নাক ঠেকিয়ে খাড়া হলো, কিন্তু পুরোপুরি খাড়া না হয়ে সবেগে আবার নেমে এলো নিচের দিকে, মাটিতে লেজ দিয়ে প্রচণ্ড একটা আছাড় খেলো।

'আউট!' হুংকার ছাড়লো রানা। 'গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছি! গেট

আউট অ্যাণ্ড রান।'

খোলা দরজা কব্জা থেকে ছিঁড়ে অদৃশ্য হয়েছে, সিট বেল্ট খুলে ফাঁকটা দিয়ে পাথুরে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওরা। তারপর ছুটলো।

সোহানাকে ধরে ফেললো রানা, দু'জন পাশাপাশি ছুটলো। সোহানার মাথা থেকে স্কার্ফটা খসে পড়েছে, তার এলো চুল যেন কালো সিল্ক, বাতাসে উড়ছে। কাঁধে একটা স্পর্শ পেলো সে, রানা তাকে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো শুকনো একটা নালার ঠোঁটে। লাফ দিয়ে পড়লো ওরা, তলায় নরম বালি। গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকলো।

'আগুন ধরবে বলে মনে হয়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'দেখা যাক।' এক হাতে সোহানার পিঠ জড়িয়ে ধরেছে রানা। যে-কোনো মুহূর্তে গ্যাসোলিনে আগুন ধরে যেতে পারে। তারপরই বিস্ফোরিত হবে মেইন ট্যাংক।

কিছুই ঘটলো না, বনভূমির জমাট নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরলো ওদেরকে। ফিসফিস করে কথা বললো ওরা।

'পরীর মতো উড়তে পারো তুমি।'

'ডানা ভাঙা পরী।'

আরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ওরা। 'দাঁড়াও,' বললো রানা। 'দেখি কি অবস্থা।'

সাবধানে উঠে দাঁড়ালো ওরা, নালার কিনারা দিয়ে উঁকি দিলো। ফিউজিলাজ বিধ্বস্ত হয়েছে, সেসনার ধাতব ছাল-চামড়া কাগজের মতো দুমড়েমুচড়ে গেছে। কিন্তু আগুনের কোনো লক্ষণ নেই।

'মাজুলেট !' হাঁক ছাড়লো রানা। 'মিরাণ্ডা !'

উপত্যকার পাথুরে কিনারায় গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা, ডাক শুনে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

সবাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কোনো বিপদ না ঘটায় বোকার মতো হাসলো। প্রত্যেকেরই হাত-পায়ের চামড়া ছিলে গেছে, সামান্য রক্ত পড়েছে মিরাণ্ডার নাক দিয়ে, কিন্তু মারাত্মক-ভাবে আহত হয়নি কেউ।

'এখন কি করবো আমরা ?' জিজ্ঞেস করলো মাজুলেট, পরস্প-রের দিকে অসহায় চোখে তাকালো ওরা।

বিধ্বস্ত সেসনা থেকে টুলবক্স, ফার্স্ট এইড কিট, সারভাইভাল কিট, টর্চ, পাঁচ লিটারের একটা অ্যালুমিনিয়াম ওয়াটারবটল, কম্বল, পিস্তল, রাইফেল, অ্যামুনিশন, ম্যাপ কেস, কম্পাস, আর মল্ট ট্যাবলেট সহ প্রয়োজনীয় আরো কিছু জিনিস বের করে নিলো ওরা। এরপর এক ঘণ্টা ব্যয় করলো দুর্ঘটনার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে। রানা আর মাজুলেট ডানা দুটো ধরাধরি করে নালায় নামালো, শুকনো ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ওগুলো। ফিউজিলাজ আর ইঞ্জিন সরানো সম্ভব হলো না, ঝোপ কেটে এনে চাপা দেয়া হলো। কাজ করার সময় দু'বার প্লেনের আওয়াজ ঢুকলো কানে, দূরে কোথাও রয়েছে।

'ডাকোটা,' বললো সোহানা।

'আমাদের খুঁজছে।'

'কিন্তু ওদের তো জানার কথা নয় আমরা নেমেছি।'

'আন্দাজ করে নেবে,' বললো রানা। 'সেসনায় একটা দুটো গুলি

লাগেনি, ওরা জানে। তল্লাশী চালাবার জন্যে ফুট পেট্রল পাঠাবে ওরা। গ্রামের লোকদের জেরা করবে।'

'তাহলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদের...।'

'সরে যাবোটা কোন দিকে ?'

'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' আলোচনায় যোগ দিলো মিরাণ্ডা। 'আমাদের খাবার দরকার, দরকার একজন গাইডের। চেষ্টা করলে আমি বোধহয় পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে আমার বাবার গ্রামে নিয়ে যেতে পারবো।'

'কিন্তু তাতে তোমার বাবাকেই শুধু নয়, গ্রামের সবাইকে বিপদে ফেলা হবে,' বললো রানা।

'বাবা আমাদেরকে গ্রামে রাখবে না,' বললো মিরাণ্ডা। 'আশ-পাশের গোটা এলাকা ভালো করে চেনে সে, একটা লুকাবার জায়গা দেখিয়ে দিতে পারবে।'

ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'কে বললো আমরা লুকাতে চাই ?'

'না, আমি বলছিলাম, আপাততঃ আর কি !'

'মিরাণ্ডার প্রস্তাবটা কিন্তু মন্দ নয়,' সায় দিলো সোহানা। 'উমাঙ্গোর বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে প্রথমেই নিরাপদ একটা ঘাটি দরকার আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'তা বটে।'

'কাজেই দেরি না করে চলো রওনা দিই,' তাগাদা দিলো মাজু-লেট।

রাইফেল নিয়ে আধ মাইল আগে থাকলো রানা, পথের পাশে

চিহ্ন রেখে এগোতে লাগলো। মাজুলেট দুর্বল, তাই সবার পিছনে থাকলো সে, মাঝখানে থাকলো সোহানা আর মিরাণ্ডা।

সন্ধ্যায় থামলো একটা নদীর তলা খুঁড়ে পানি বের করলো রানা, চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়ার আগে সবাই একটা করে মল্ট ট্যাবলেট চুষলো। টসে হেরে গিয়ে ঘুমাতে গেল রানা আর মাজুলেট, রাতের প্রথম প্রহরে পাহারায় থাকলো মেয়েরা।

পরদিন ভোরে একটা মেটো পথ পেরিয়ে থামলো রানা। দেখা মাত্র পথটা চিনতে পারলো মিরাণ্ডা। দু'ঘণ্টাপর শশংগিরেরগ্রামের নিচে, উপত্যকায় পৌঁছুলো ওরা। ভুট্টা ক্ষেতের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকলো তিনজন, পাহাড়ের মাথায় গ্রামে উঠে গেল মিরাণ্ডা। এক ঘণ্টা পর জাদুকর বাবাকে নিয়ে ফিরে এলো সে।

হবু জামাতা হলেও, জেনারেল মাজুলেট ম্যাটাবেলদের মুকুটহীন রাজা, তাই রীতি অনুসারে তার পা জড়িয়ে ধরে সম্মান দেখাতে গেল শশংগিরে। কিন্তু বাধা দিলো মাজুলেট, বুড়ো জাদুকরকে আলিঙ্গন করলো সে।

'এই জায়গা নিরাপদ নয়,' ফিসফিস করে বললো শশংগিরে। 'চারদিকে ঘুর ঘুর করছে শোনারা। আমার সাথে আসুন, নিরাপদ একটা জায়গায় আপনাদের পৌঁছে দিই।' দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ লিকলিকে পা ফেলে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলো। মাজুলেট আর মেয়েরা পিছিয়ে পড়লো, খানিক পর পর থামতে বাধ্য হলো শশংগিরে। একনাগাড়ে প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটলো ওরা, শেষের এক ঘণ্টা হাঁটলো ঘন কাঁটাঝোপ আর ভাঙাচোরা পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে। কোথাও কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই, শশংগিরে ছাড়া কেউ জানে না কোন্‌দিকে কোথায় যাচ্ছে তারা।

'আমার ভালো ঠেকছে না,' ফিসফিস করে রানাকে বললো মাজুলেট।

মাজুলেট কি বলতে চায় বুঝতে পারলো রানা। এদিকে একটা পাখি নেই, ঝোপের ভেতর থেকে একটা পোকা পর্যন্ত ডাকছে না। কেমন যেন ভৌতিক একটা পরিবেশ। কালচে পাথরগুলোকে মনে হলো আগুনে পোড়া, গাছের ডালগুলো কয়লার মতো, গায়ে শ্যাওলা জমেছে। হঠাৎ করেই যেন কালো পাথর গ্রাস করলো বৃদ্ধ জাদুকরকে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

জায়গাটায় পৌঁছে চারদিকে তাকালো ওরা, কিন্তু শশংগিরের ছায়াও দেখা গেল না।

'এদিকে,' সহস্র ফাটল ধরা পাথরের ভেতর থেকে প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এলো, 'বাঁকের সামনে।'

পাহাড়-প্রাচীর ভাঁজ খেয়ে আরেক দিকে এগিয়ে গেছে, সরু একটা লুকিয়ে থাকা ফাটল দেখতে পেলো ওরা, কোনো রকমে এক-জন মানুষ গলতে পারে। ভেতরে ঢুকে অল্প আলোয় চারদিকে তাকালো রানা। মাথার ওপরের কার্ণিশ থেকে একটা কুপি নামিয়ে জ্বেলেছে শশংগিরে।

'আসুন,' ডাকলো বৃদ্ধ। 'ভয় পাবার কিছু নেই, এ অত্যন্ত পবিত্র জায়গা।' তার পিছু পিছু প্যাসেজ ধরে এগোলো ওরা।

'এদিকের সবগুলো পাহাড় আসলে একটা করে গোলক ধাঁধা,' বিড়বিড় করে বললো মিরাণ্ডা। 'গুহা, সুড়ঙ্গ, কুয়া, আর ফাটল—একবার পথ হারালে আর রক্ষে নেই।'

দেড়শো গজ এগিয়ে প্যাসেজটা বড় একটা গুহায় এসে থেমেছে। গম্বুজ আকৃতির ছাদের একটা খোলা অংশ থেকে আলো ঢুকছে।

ঘরের একধারে আগুন জ্বালাবার আয়োজন দেখা গেল, কুপিটা নিভিয়ে সেখানে রেখে দিলো শশংগিরে। 'জাদু শিখতে এসে এখানেই সাধনায় বসে শিষ্যরা,' বললো সে। 'এখানে বসেই আমি আমার বাবার কাছ থেকে জাদু শিখেছি। আপনারা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।' তার ইঙ্গিতে পাথরের মেঝেতে বসে পড়লো সবাই, ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো কেউ কেউ। 'এটা ম্যাটাবেলদের গোপন এলাকা, শোনারা চেনে না।'

সন্ধ্যের আগেই মিরাণ্ডার দুই সৎ বোন মাথায় করে খাবার নিয়ে এলো। মিরাণ্ডার মতোই বয়স তাদের, শরীরে উথলানো যৌবন, কিন্তু পরনে কিছু না থাকারই মতো। আগুন জ্বেলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো দুই যুবতী। ঠিক হলো, একদিন পর পর খাবার নিয়ে আসবে তারা।

খেতে বসার আগে দেশী মদ পরিবেশন করলো শশংগিরে। মাজুলেটের সাথে কথা হলো তার। জানা গেল, মাজুলেট সেবার টুটিতে আসছিলই শশংগিরের সাথে দেখা করার জন্যে। শশংগিরে তাকে জরুরী খবর পাঠিয়েছিল। কিন্তু পথে জেনারেল উমাঙ্গো তার শোনা সৈনিকদের নিয়ে মাজুলেটকে অনুসরণ করে, পোচিঙের মিথ্যে অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করা হয় তাকে।

রানার দিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে নিয়ে শশংগিরে বললো, 'যে কথাটা বলবো বলে আপনাকে ডেকেছিলাম সেটা অত্যন্ত গোপনীয়। বিষয়টা নিয়ে বাইরের কারো সামনে আলোচনা করা যায় না।'

'এখনো যে আমি বেঁচে আছি, সে তো ওদেরই জন্যে,' রানা আর সোহানাকে দেখিয়ে বললো মাজুলেট। 'রানা শুধু আমার

বন্ধু নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু। যা বলার ওদের সামনেই বলতে পারেন আপনি।'

থমথমে চেহারা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো বৃদ্ধ জাদুকর, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি রাজা লোবেনগুলার সমাধিতে গিয়েছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালো মাজুলেট। 'আপনি বোধহয় পাঁচ গ্যালন হীরের কথা জানতে চাইছেন। না, ওখানে কোনো হীরে নেই।'

বৃদ্ধের ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'থাকবে কি করে! হীরে তো সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'তারমানে!' আকাশ থেকে পড়লো মাজুলেট।

এরপর বৃদ্ধ জাদুকর যে গল্পটা শোনালো, সংক্ষেপে তা এই রকম:

লোবেনগুলা আত্মহত্যা করার পর ম্যাটাবেলদের রাজা হলো গ্যানডাং। গ্যানডাং ম্যাটাবেল সৈনিকদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল। শ্বেতাঙ্গদের একজন সেনাপতি, ম্যাটাবেলরা তার নাম দিয়েছিল টাকা-টাকা, গ্যানডাঙের সৈনিকদের বন্দী করে। এই বন্দীদের মধ্যে অন্তত একজন লোক ছিলো যে লোবেনগুলার সমাধি চিনতো। টাকা-টাকার আসল পরিচয়, স্যার রালফ ব্যালেন্টাইন, রোডেশিয়ার প্রথম প্রাইম মিনিস্টার। লোবেনগুলার সমাধিতে পাঁচ পাত্র হীরে আছে এই গুজব আগেই শুনেছিল টাকা-টাকা। বন্দীকে লোভ দেখায় সে, স্বজাতির সাথে বেঈমানী করতে রাজি হয় বন্দী। ছোটো একটা দল নিয়ে লোবেনগুলার সমাধির উদ্দেশে রওনা হয়ে যায় তারা।

গ্যানডাং তার লোকজন নিয়ে সমাধি থেকে চলে এলেও, এক-

জন লোক পাহাড়ে রয়ে যায়, তার নাম ছিলো ইনস্নুতসা—তীর। সমাধি পাহারা দেয়ার জন্যে থেকে যায় সে, সমাধির কাছাকাছি একটা গ্রাম গড়ে তোলে। এই ইনস্নুতসা ছিলো শশংগিরের পিতামহ।

টাকা-টাকা তার দলবল নিয়ে একটা পাহাড়ে আস্তানা গাড়লো। খবর পেয়ে সন্দেহ হলো ইনস্নুতসার। সে তার তিন যুবতী মেয়েকে পাঠালো শ্বেতাঙ্গদের আস্তানায়। মেয়ে গোয়েন্দারা টাকা-টাকার সাথে কথা বলে আসল কথা কিছুই জানতে পারলো না। সুযোগের অপেক্ষায়থাকলো তারা। একসময় ঠিকই জানা গেল সব খবর। একটু প্রেমের অভিনয় করতেই টাকা-টাকার সাথে তার কি কথা হয়েছে সব গড়গড় করে বলে ফেললো বিশ্বাসঘাতক ম্যাটাবেল।

সব জানার পর বিশ্বস্ত কিছু লোক নিয়ে লোবেনগুলার সমাধিতে হাজির হলো ইনস্নুতসা, তাদের মধ্যে শশংগিরের বাবাও ছিলো। পাঁচ পাত্র হীরে বের করে আনে তারা, বের করে আনে রাজার মরদেহ। বাইরে বেরিয়ে এসে প্রবেশ-পথটা আবার তারা সীল করে দেয়।

প্রায় মাস খানেক পর, অনেক খোঁজাখুঁজি করে লোবেনগুলার সমাধি পায় টাকা-টাকা। কিন্তু ভেতরে ঢুকে লোবেনগুলার মরদেহ বা হীরে কিছুই পায়নি সে।

'কিন্তু একটা হীরে ওখানে রয়ে গিয়েছিল,' বললো মাজুলেট। 'ইনস্নুতসা বা টাকা-টাকা, দু'জনের কারো চোখেই পড়েনি সেটা।'

'হতে পারে,' হঠাৎ নির্লিপ্ত দেখালো বৃদ্ধ জাদুকরকে। 'আপনারা ক্লান্তি বোধ করলে এবার শুয়ে পড়তে পারেন। কি? আরো শুনতে চান? কিন্তু আর তো কিছু বলার নেই। গল্প আমার শেষ...'

'কিন্তু হীরে আর রাজার মরদেহ?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলো মাজুলেট। 'সমাধি থেকে বের করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো ওগুলো? আপনি জানেন না?'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে একগাল হাসলো বৃদ্ধ জাদুকর। 'জানি বৈকি, রাজা মাজুলেট, নিশ্চই জানি। আমার বাবা আমাকে বলে গেছে।'

'ওখানে আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন?'

'আমি কি বলিনি, এটা একটা পবিত্র জায়গা?'

'মাই গড!'

'এখানে!' মিরাণ্ডা আর সোহানা দু'জন একসাথে বিড়বিড় করলো, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে দু'জোড়া চোখ। হাঁ হয়ে গেছে রানাও। ওদের সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো বৃদ্ধ।

পরদিন সকালে নাস্তা খাবার পর প্রস্তুতি শুরু হলো। গুহার মেঝে থেকে একটা পাথর সরিয়ে ভেতর থেকে বের করা হলো একটা কেরোসিন ল্যাম্প, কুণ্ডলী পাকানো তিন প্রস্থ নাইলনের রশি, ছোটো আকারের তিনটে কুঠার। রশিগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছিল। রওনা হবার আগের মুহূর্তে বৃদ্ধ জাদুকর হঠাৎ বলে বসলো, জায়গাটা ভয়ানক দুর্গম, মেয়েরা সাথে থাকলে বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু সোহানা আর মিরাণ্ডার জেদের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো তাকে।

গুহার গায়ে অনেকগুলো প্যাসেজের খোলা মুখ রয়েছে, তারই একটা ধরে শুরু হলো যাত্রা। ল্যাম্প হাতে আগে আগে থাকলো

শশংগিরে, তার পিছনে এক প্রস্থ রশি নিয়ে মাজুলেট, সবার পিছনে দ্বিতীয় প্রস্থ রশি আর কুপি নিয়ে থাকলো রানা, ওর সামনে মেয়েরা।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে প্যাসেজ, যতোই এগোলো ওরা ততোই সরু হয়ে এলো সেটা। একটা তেমাথায় পৌছুলো ওরা, কোনো রকম ইতস্তত না করে ডানদিকের প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোলো শশংগিরে ছোটো একটা ছুরি দিয়ে প্যাসেজের গায়ে একটা চিহ্ন রাখলো রানা। লাইমস্টোনের দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে, পাথরের গায়ে সরু সুতোর মতো অসংখ্য ফাটল। কোথাও কোথাও ছাদ এতো নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। পায়ের তলায় পিচ্ছিল মেঝে। প্রকৃতির তৈরি একটা সিঁড়ির মাথায় এসে থামলো ওরা, লাইমস্টোনের ধাপ ধীরে ধীরে উঠে গেছে অন্ধকারের ভেতর। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় মাথার ওপর একদল বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনলো ওরা।

বিশ মিনিট পর সামনে একটা ফাটল দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। মসৃণ লাইমস্টোনের কিনারা থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ফাটলের গা, এতো গভীর যে ল্যাম্পের আলো তলা পর্যন্ত পৌছুলো না। শশংগিরের নির্দেশে লাইমস্টোনের একটা পিলারের সাথে রশির একটা প্রান্ত বাঁধা হলো, প্রতিবার একজন করে রশি ধরে ঝুলে নেমে এলো পঞ্চাশ ফিট। পাথরের মেঝে দু'ভাগ হয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে এই ফাটল, এতোই সরু যে রশি ধরে নামার সময় দু'দিকের দেয়াল ছুঁতে পারলো রানা। যতো নামলো, ততোই চওড়া হলো ফাটলটা, মাথার ওপর অন্ধকারে হারিয়ে গেল ছাদ রশি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় নিচের ল্যাণ্ডিঙে ওদেরকে দেখতে পেলো

রানা। শেষ ঢালটা পেরিয়ে চওড়া একটা সমতল চত্বরে নামলো ও। দেখলো, চত্বরের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। নিচে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড লেক দেখা গেল।

'এখন?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা, বিশাল শ্যাফটের দেয়াল আর ছাদে বাড়ি খেয়ে চারদিক থেকে ফিরে এলো প্রতিধ্বনিগুলো। 'এখন…এখন…এখন…এখন… এখন?'

লাইমস্টোনের শ্যাফট-টা লেকের পানিতে ভরে আছে। পানির উল্টোদিকের সীমানায়, দেড়শো ফিট দূরে, শ্যাফটের ছাদ নামতে শুরু করে পানি স্পর্শ করেছে। সেসনা থেকে উদ্ধার করা ফ্ল্যাশ-লাইটটা এই প্রথম ব্যবহার করলো রানা। যুগ যুগ ধরে স্পর্শ করা হয়নি এই পানি, টর্চের আলোয় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ দেখালো, লেকের তলা পর্যন্ত দেখা যায়। পানির নিচে দেয়ালগুলো ভেতর দিকে তোবড়ানো, ফলে লেকের ওপর থেকে দেয়ালে কোনো ফাটল বা আর কিছু আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

'রানা, এই একটা সুযোগ তোমার,' বললো মাজুলেট, 'ইচ্ছে করলেই একটা মাছ হয়ে যেতে পারো।'

'এখান থেকে কোন্‌দিকে, বাবা?' জিজ্ঞেস করলো মিরাণ্ডা।

বৃদ্ধ জাদুকর অনেকক্ষণ ধরে যা ব্যাখ্যা করলো তার সারমর্ম এই রকম: রাজা লোবেনগুলার মরদেহ এখানে রেখে যাবার সময় এ-দেশে দীর্ঘ সাত বছর ধরে খরা চলছিল। লেকের পানি অনেক নিচে ছিলো তখন। পানির ওপর, দেয়ালের গায়ে একটা প্যাসেজের মুখ ছিলো, এখন সেটা পানির তলায়। সেই প্যাসেজ ধরে উঠলে তবে লোবেনগুলার সমাধিতে যাওয়া সম্ভব। রাজাকে ওখানে রেখে যাবার পর দেশের এই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাতে করে প্রতি

বছর পানির লেভেল ওপর দিকে উঠে এসেছে। একটা চোখা পাথরের ডগা দেখালো শশংগিরে, সারফেস থেকে ত্রিশ ফিট নিচে। শেষবার যখন এখানে এসেছিল সে, পানির লেভেল ওই পাথরের নিচে ছিলো।

রানা জানতে চাইলো, 'তারমানে লোবেনগুলার সমাধি নিজের চোখে আপনি দেখেননি কখনো ?'

'না। তবে আমার বাবা আমাকে বর্ণনা দিয়ে গেছেন।'

লেকের কিনারায় হাঁটু মুড়ে বসলো রানা, পানিতে হাত ডোবালো। এতো ঠাণ্ডা যে ঝট্ করে হাতটা তুলে নিতে হলো, সারা শরীরে শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল।

'মাজুলেট, সব ভুলে যাওয়াই ভালো হে,' বললো রানা। 'এই পানিতে কেউ নামলে তাকে আর উঠতে হবে না।'

'লক্ষ্মী, ভাই!' মাজুলেটের চেহারায় আর গলার সুরে আবদার ঝরে পড়লো। 'আমি যদি সাঁতার জানতাম তাহলে তোমাকে…'

'মাসুদ ভাই, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আপনার জন্যে আমি খানিকটা দেশী মদ নিয়ে এসেছি…।'

মিরাণ্ডাকে থামিয়ে দিয়ে সোহানা বললো, 'প্লিজ, রানা, সবাই যখন এতো করে বলছে…।'

'তুমিও!'

'না, মানে, কই, পানির নিচে তো একটাও হাঙর বা কুমির দেখতে পাচ্ছি না, তাই বলছিলাম…।'

সবাই হেসে উঠলো, অগত্যা শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো রানা। রশি টেনে নিয়ে একটা প্রান্ত রানার কোমরে বাঁধলো মাজুলেট। ওদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে, চত্বরের শেষ মাথায় বসেছে

শশংগিরে, একটা চুরুট ধরিয়ে একমনে টানছে।

শুধু আণ্ডারঅয়্যার পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। নিচু গলায় মাজুলেট বললো, 'ওটাই বা ভেজাবার দরকার কি?'

'মিরাণ্ডা,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা।

'ও একজন ম্যাটাবেল। ন্যুডিটি ডাজ নট অফেণ্ড আস।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলো মিরাণ্ডা। 'থাক, থাক—কেন শুধু শুধু বেচারাকে লজ্জা দিচ্ছো! যে গোপন করে রাখতে চায়, রাখুক, অবশ্য আমার কিন্তু কিছুই গোপন থাকেনি।'

ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়লো রানা, সাঁতরে লেকের মাঝখানে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ঠাণ্ডাটা সয়ে এলো শরীরে, নামতে শুরু করে ত্রিশ ফিট নিচের লাইমস্টোনের তীক্ষ্ণ ডগাটা লক্ষ্য করে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো।

পাশ কাটিয়ে এসে পাথরটার গায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিলো রানা। আগের চেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ও। লাইমস্টোনের চকচকে দেয়াল একটা ঝলকের মতো উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। দেয়ালের গায়ে চোখ রেখে কোনো পথ আছে কিনা খুঁজছে ও।

কোমরে বাঁধা রশিতে টান পড়লো, পর পর দু'বার। তারমানে এক মিনিট পেরিয়ে গেছে। সমাধিতে ঢোকার পথটা দেখতে পেলো রানা। প্রায় গোল একটা প্রবেশ-মুখ, মানুষের খুলির খালি চোখের কথা মনে করিয়ে দিলো ওকে। ফাঁকটার মাথায় সরু কার্ণিশ ধরে থামলো ও। প্রবেশ-মুখটা যথেষ্ট বড়, একজন মানুষ অনায়াসে ভেতরে ঢুকতে পারে। ফাঁকের ভেতর দেয়ালের গায়ে হাত বুলালো, আঠালো কাদা লাগলো আঙুলে। আন্দাজ করলো, মাটির ওপর থেকে এটা একটা টানেল, পাতালে নেমে এসেছে, এই পথেই নিচে

নামার সুযোগ পায় বৃষ্টির পানি।

হঠাৎ করে ভয় ভয় লাগলো রানার। এই অন্ধকার টানেলের ভেতর ভৌতিক কি যেন ওত পেতে আছে। মুখ তুলে ওপরে, সারফেসের দিকে তাকালো ও। চল্লিশ ফিট ওপরে শশংগিরের ল্যাম্পের আলো আবছাভাবে দেখা গেল। ইচ্ছে হলো, টানেলের মুখ থেকে এই মুহূর্তে পালিয়ে যায়।

এই প্রথম অনুভব করলো রানা, অক্সিজেন পাবার জন্যে মোচড় খেতে শুরু করেছে ফুসফুস। পরপর দু'বার টান পড়লো কোমরে। দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, তারমানে সময় প্রায় শেষ।

যা থাকে কপালে, টানেলের মুখ গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো রানা। তির্যকভাবে উঠে গেছে টানেল, পাইপের মতো গোল। সামনে টর্চের আলো ফেলে বিশ ফিটের মতো ঢালের গা ছুঁয়ে সাঁতার কেটে উঠলো রানা। মেঝে থেকে কাদা তুলে আনছে ও, সামনেটা ঝাপসা দেখালো।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল টানেল, কর্কশ পাথরের ওপর হাত বুলালো রানা। বুকের ভেতর তড়পাতে শুরু করেছে ফুসফুস, কানের ভেতর একটানা গুঞ্জন। আচ্ছন্নবোধ করলো ও, কিন্তু নিজেকে বাধ্য করলো ওখানে থাকতে। টানেলের বন্ধ মুখ পরীক্ষা না করে ফিরবে না।

হাত বুলিয়ে বুঝলো, লাইমস্টোনের সমতল টুকরো দিয়ে রাজমিস্ত্রীরা বন্ধ করে দিয়েছে টানেল। ঢালু মেঝেতে মসৃণ, ধাতব কি যেন একটা হাতে ঠেকলো, দেয়ালের গোড়ায় পড়ে রয়েছে। জিনিসটা নিয়ে ঘুরলো ও, টানেল ধরে নিচে নামতে শুরু করলো।

টানেলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো রানা, মাথার ওপর অনেক

উঁচুতে ল্যাম্পের আলো অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। সাঁতার কেটে উঠছে ও, প্রতি মুহূর্তে বোধশক্তি কমে যাচ্ছে। চোখের সামনে থেকে নিভে গেল আলো, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে তারা দেখতে শুরু করলো, পাথরের মতো ভারি হয়ে এলো হাত-পা।

একটা ঝাঁকি খেয়ে টান টান হলো কোমরে বাঁধা রশি, অনুভব করলো সবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে সে। তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে, ওকে টেনে তুলে নিচ্ছে মাজুলেট।

দুই বগলের নিচে রশি নিয়ে পানিতে নেমে এসেছে মাজুলেট, রানাকে ধরে পানির ওপর তুলে আনলো সে। পাথুরে চত্বরে শুয়ে পড়লো রানা, কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা ভ্রূণের আকৃতি পেলো, খক খক করে কেশে ফুসফুস থেকে বের করে দিলো পানি। ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে ও। ওকে উপুড় করে শোয়ালো সোহানা, দু'হাত দিয়ে চাপ দিতে শুরু করলো পিঠে। হড়হড় করে বমি করলো রানা। তবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস-প্রশ্বাস।

'কেমন লাগছে এখন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সোহানা। রানার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে।

'হেরে গেলে যেমন লাগে।' ঝাঁঝের সাথে বললো রানা। 'খুশিতে বগল বাজাতে ইচ্ছে করছে।'

'ভালো আছে ও,' সবাইকে আশ্বস্ত করলো মাজুলেট। 'রেগে গেছে যখন, তারমানে ভালো আছে।'

হাতের তালুতে লালচে মরচে দেখে মনে পড়লো রানার, পাশ থেকে তুলে নিলো ধাতব জিনিসটা। 'একটা চেইন, ওয়্যাগন বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হয়। ওখানে কোত্থেকে এলো?'

ল্যাম্পের আলোর শেষ সীমানায় একা বসে আছে বৃদ্ধ জাদুকর,

বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, গরুর গাড়ি বাঁধা হয় ওটা দিয়ে। রাজাকে নামাবার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'তারমানে,' মাজুলেটের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, 'রানা, রাজার সমাধি আবিষ্কার করেছো তুমি!'

নিচে কি দেখে এসেছে সব ব্যাখ্যা করে বললো রানা। সবশেষে জানালো, 'হীরে উদ্ধার করার আশা ছেড়ে দেয়াই ভালো। ডাইভিং অ্যাপারেটাস ছাড়া ওই দেয়াল ভাঙা যাবে না।'

'কিন্তু সমাধি সত্যি আছে এ-কথা জানার পর...'

মিরাণ্ডাকে থামিয়ে দিয়ে সোহানা বললো, 'হাল ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সমাধিতে আমাদের পৌঁছুতেই হবে।

'সোহানা, তোমার পকেটে একটা স্কুবা দেখেছিলাম, বের করো তো,' রানা গম্ভীর।

'ঠাট্টা করো না,' বললো সোহানা। 'নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা উপায় বেরিয়েই যাবে... ।'

'যতোক্ষণ না বেরোয়, মুখে তালা দিয়ে থাকো—আর লোবেন-গুলার সমাধির কথা ভুলে যাও,' বলে লেকের পানিতে মরচে ধরা চেইনের টুকরোটা ফেলে দিলো রানা। 'বিদায় লোবেনগুলা, তোমার হীরে তোমার কাছেই থাক।'

শশংগিরে গ্রামে ফিরে যাবার পর কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। গুহার ভেতর সময় ওদের কাটতে চায় না। পাথর দিয়ে ঘিরে দুটো আড়াল তৈরি করেছে ওরা, একটায় মিরাণ্ডার সাথে মাজুলেট থাকে, আরেকটায় সোহানার সাথে রানা। ঘুমোবার সময়টা ছাড়া আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের নানান বিষয় নিয়ে আলাপ

করে ওরা। নাগালের বাইরে বলে মনে হলেও, মাজুলেটের বিশ্বাস একদিন না একদিন লোবেনগুলার হীরে উদ্ধার করা সম্ভব হবে, যদি সত্যি তা থাকে। এই হীরে নিয়ে ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডের উন্নতি করার স্বপ্ন দেখে সে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে স্কুল দরকার, দরকার হাসপাতাল আর কমিউনিটি সেণ্টার। অবশ্য, সে জানে, তার আগে দেশের পরিবেশটা ম্যাটাবেলদের অনুকূলে আনতে হবে। এ তো জানা কথা, থার্ড ব্রিগেডের অত্যাচার যদি থামানো না যায়, গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর থার্ড ব্রিগেডকে থামাতে হলে উমাঙ্গোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যাটাবেলদের সবচেয়ে বড় শত্রু সে-ই। হারারে-তে শত্রু অবশ্য আরো আছে, তবে উমাঙ্গো ধ্বংস হলে তারা আপনা থেকেই মুখ লুকাবে গর্তে।

রানা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, উমাঙ্গোর ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। শয়তানটাকে শায়েস্তা না করে দেশে ফিরবে না ও।

একদিন খাবার নিয়ে এসে মেয়েরা খবর দিলো, থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা গ্রামে এসেছিল। প্রথমে তারা গোটা গ্রামটাকে ঘিরে ফেলে, তারপর ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশী চালায়। যুবতী কয়েকটা মেয়েকে উঠনে শোয়ায় তারা, উলঙ্গ করে হুমকি দেয় রানা আর মাজুলেটের খবর না জানালে ওদেরকে রেপ করা হবে। কিন্তু শশং-গিয়ে ওদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শোনারা চলে যায়। বৃদ্ধ জাদুকরকে শ্রদ্ধা না করলেও, ভীষণ ভয় পায় শোনারা। ফেরার সময় দু'চারটে মুরগী ছাড়া আর কিছু চুরি করেনি তারা। তবে বলে গেছে, আবার আসবে।

আরো জানা গেল, গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক তল্লাশী চলছে

এখনো। শুধু পায়ে হেঁটে নয়, হেলিকপ্টার নিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে ওদের। পাহাড় আর বনভূমির প্রতিটি ইঞ্চিতে চোখ বুলাচ্ছে শোনারা। আড়াল থেকে গ্রামের লোকেরা দেখেছে, সার্চ পার্টির সাথে মাঝে মধ্যে জেনারেল উমাঙ্গোকেও দেখা যায়। ইতিমধ্যে কিছু পলাতক কয়েদী ধরাও পড়েছে, চেইন দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ট্রাকে তুলতে দেখা গেছে তাদের।

শশংগিরে খবর পাঠিয়েছে, বিপদ এখনো কাটেনি, কাজেই গুহা থেকে ওদের বেরুনো চলবে না। সময় এবং সুযোগ হলে ওদের সাথে দেখা করবে সে।

মেয়েগুলো চলে যাবার পর গুহার ভেতর নিরানন্দ হয়ে উঠলো পরিবেশ। রানার ইচ্ছে, অ্যামবুশ পেতে উমাঙ্গোকে ঘায়েল করা। উমাঙ্গো ওদের হাতে ধরা পড়লে থার্ড ব্রিগেডকে ম্যাটাবেলিল্যাণ্ড থেকে সরিয়ে দেয়ার একটা পরিবেশ তৈরি হবে। কিন্তু সোহানা ওর সাথে একমত হতে পারলো না। তার ধারণা, অ্যামবুশ ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা প্রচুর, আর যদি ব্যর্থ হয়, ওরা যে এই এলাকায় আত্মগোপন করে আছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে—তখন কোণঠাসা অবস্থায় পড়তে হবে ওদের। তারচেয়ে তল্লাশীটা শেষ করুক থার্ড ব্রিগেড, আরো একটু ক্লান্ত হোক, যখন ভাবতে শুরু করবে এই এলাকায় ওরা নেই তখন পাল্টা আঘাত হানার কথা ভাবা যাবে। মাজুলেটেরও সেই কথা।

মাজুলেট আর রানা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে, মিরাণ্ডার সাথে ফিসফিস করে কি যেন কথা বলছে সোহানা। রানা বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, জানে, সময় পেলেই মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে লোবেনগুলার হীরে নিয়ে কথা বলে ওরা। হঠাৎ সোহানার তীক্ষ্ণ

চিৎকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ওরা।

'ইউরেকা!'

'মানে?'

'অক্সিজেন!' আবার চেঁচিয়ে উঠলো সোহানা। 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করো—জলদি!'

রানা আর মাজুলেট মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

'ভুলে গেছো?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'হাই অলটিচ্যুড ফ্লাইটের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ইকুইপমেন্ট ছিলো সেসনায়?'

'মাই গড, তাই তো!' উঠে দাঁড়ালো রানা। 'লাইফ-জ্যাকেট ছিলো ওতে?'

'ছিলো না মানে! এখনো আছে, গেলেই পাবে,' বললো সোহানা। 'সীট কুশনের নিচে···।'

'অক্সিজেন সিস্টেম? ওটা কি রিসাইক্লিং সারকিট?'

'অবশ্যই!'

'এ-সবের মানে কি, আমাকে বলবে?' জিজ্ঞেস করলো মাজুলেট।

'বলবো না, দেখাবো,' বললো রানা। 'চলো, মাজুলেট, অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, সেসনার কাছে। অবশ্য এখনো যদি ওটা ওখানে থাকে, তবেই···'

দু'মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলো ওরা।

আট

গাছগুলোর মাথা থেকে খানিকটা ওপরে স্থির হয়ে আছে হেলিকপ্টার, স্টীল কেবলের শেষ মাথায় ঝুলছে জেনারেল উমাঙ্গো। ওপর থেকে রোটরের তীব্র বাতাস নেমে এসে বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিলো তার ক্যামোফ্লেজ ব্যাটল-স্মক। মাটি থেকে ছ'ফিট ওপরে স্থির হলো সে, প্যাড লাগানো স্লিং খুলে বিড়ালের মতো লাফ দিয়ে পড়লো সবুজ ঘাসে। অপেক্ষারত সার্জেন্ট স্যালুট করলো, মৃদু মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো।

কোনো কথা হলো না, ঢাল বেয়ে উপত্যকায় উঠতে শুরু করলো ওরা। শশংগিরের গ্রাম ঘিরে রাখা হয়েছে, এ-খবর আগেই রেডিওতে পেয়েছে উমাঙ্গো।

বিধ্বস্ত সেসনার কাছে পৌঁছে থামলো ওরা।

'দেখুন, জেনারেল। এটাই কি?'

'রেজিস্ট্রেশন, জেড-এস/কে ওয়াই-এ। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই। এই প্লেনে আমি চড়েছি।' ঝুঁকে ফিউজিলাজের তলাটা দেখলো উমাঙ্গো। 'আরো প্রমাণ রয়েছে, সরাসরি নিচ থেকে

মেশিনগানের গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে পেট। কোনো লাশ?'

'না। রক্তের দাগ পর্যন্ত নেই। বিধ্বস্ত হবার পর যা কিছু ছিলো সব নিয়ে গেছে ওরা।'

'কাছে পিঠের গ্রাম থেকে লোকজন এসে লুট করে যেতে পারে।'

'মনে হয় না, স্যার। ট্র্যাকাররা বলছে, ছ'দিন আগে প্লেনটা বিধ্বস্ত হবার পর চারজন মানুষ চলে গেছে এখান থেকে—দু'জন পুরুষ, দু'জন মেয়ে। তারপর, গত ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে, এখানে আবার ফিরে আসে পুরুষ দু'জন। ওরা যে একই লোক, তাতে ওদের কোনো সন্দেহ নেই—বুট প্রিন্ট মিলছে।'

মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো।

'দ্বিতীয়বার এসে আলগা কিছু জিনিস নিয়ে গেছে ওরা। চলে যাবার সময় ওদের সাথে ভারি মাল-পত্তর ছিলো। এখান থেকে ছ'মাইল পর্যন্ত পাওয়া গেছে ওদের পায়ের ছাপ, উপত্যকার মাথা পর্যন্ত, কিন্তু তারপর অনেক ছাপের ভেতর থেকে ওদেরগুলো আলাদাভাবে চেনা যায়নি।'

'রানা আর মাজুলেট।' ক্ষীণ, নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটলো উমাঙ্গোর ঠোঁটে। 'নাগালের মধ্যেই আছো, সেজন্যে ধন্যবাদ, বন্ধুরা!'

'আমার বিশ্বাস,' সার্জেন্ট জোর দিয়ে বললো, 'শশংগিরের গ্রামে বা আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা, কারণ এই এলাকায় আর কোনো গ্রাম নেই। গ্রামের লোকদের সাহায্য ছাড়া…'

'চলো, দু'একজনকে পুড়িয়ে মারলেই বেরিয়ে আসবে সত্যি খবরটা।'

'জী-স্যার!' উৎসাহে চকচক করে উঠলো সার্জেন্টের চোখ।

'আমারও সেই কথা।'

'আমি তোমাদের আপন সন্তানের মতো দেখি,' মৃদু হেসে বললো উমাঙ্গো। 'আমি জানি, তোমরা আমাকে সত্যি কথাটা বলবে।'

'বানরটা কিচিরমিচির করে কি বলে?' সবিনয়ে জানতে চাইলো বৃদ্ধ শশংগিরে।

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকালো উমাঙ্গো। 'দোভাষী কোথায়?'

'আসছে, স্যার, এই এলো বলে।'

উরুর ওপর স্টিকের মৃদু বাড়ি দিতে দিতে লাইন করে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে গেল উমাঙ্গো। গ্রামটাকে ঘেরাও দেয়ার পর ভুট্টা ক্ষেত থেকে ধরে আনা হয়েছে পুরুষদের, আর প্রতিটি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে মেয়েদের। যুবতী প্রায় সব মেয়ের পিঠের ঝোলায় একটা করে দুধের বাচ্চা রয়েছে। বুড়ো-বুড়িদেরও রেহাই দেয়া হয়নি, দাঁড় করানো হয়েছে লাইনে।

প্রত্যেকের সামনে দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে থামলো উমাঙ্গো, চেহারায় স্নেহ আর দরদ। কিন্তু গ্রামবাসীদের কারো চেহারায় কোনো ভাব নেই।

'স্যার,' নেড়ী কুত্তার মতো উমাঙ্গোর পায়ে পায়ে ঘুরছে সার্জেন্ট, 'বুড়ো শয়তানটা মুখ খুলবে বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ, জানি।' শশংগিরের দিকে একবার তাকালো উমাঙ্গো। 'আত্ম-সম্মোহনের কলা-কৌশল জানা আছে ব্যাটার, কোনো ব্যথাই অনুভব করবে না। তবে ওকে সরিয়ে দেয়ার পর পরিস্থিতি বদলে

যাবে।'

টুটি পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে একজন বন্দীকে নিয়ে ফিরে এলো হেলিকপ্টার। ধাক্কা খেয়ে উমাঙ্গোর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। তার হাতকড়া খুলে দেয়া হলো।

'বুড়োকে নিয়ে এসো,' হুকুম করলো উমাঙ্গো।

খোলা উঠনে নিয়ে আসা হলো শশংগিরেকে।

'ওকে বলো, আমি ওর বাবা,' নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো।

'হুজুর,' দোভাষী বললো, 'ও বলছে, ওর বাবা একজন পুরুষ-মানুষ ছিলো, আপনার মতো বেহায়া হায়েনা ছিলো না।'

'ওকে বলো, ওর জবাবে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।'

'হুজুর, ও বলছে, আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে পারায় ও খুশি।'

'বলো, আমার লোকদেরকে মিথ্যে কথা বলেছে ও।'

'হুজুর, ও বলছে, শোনাদেরকে সত্যি কথা বলার কোনো গরজ ওর নেই।'

'ওকে বলো, আমি জানি, দেশের শত্রুদের আশ্রয় দিচ্ছে ও, তাদেরকে খাওয়াচ্ছে।'

'হুজুর, ও বলছে, আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন। দেশের শত্রু নাকি আপনি, আর কাউকে সে দেশের শত্রু বলে জানে না।'

'ভেরি গুড।' মৃদু, সস্নেহ হাসিটুকু লেগেই আছে উমাঙ্গোর ঠোঁটে। 'এবার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলো, দেশের শত্রুরা কোথায় লুকিয়ে আছে আমি জানতে চাই। যে বলবে, তাকে এবং তার পরিবারকে আমি প্রচুর এনাম দেবো।'

চড়া গলায় কথা বললো দোভাষী। তার কথা শেষ হতে জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। গ্রামবাসীরা সবাই ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকলো।

'সার্জেন্ট!' বদলে গেল উমাঙ্গোর চেহারা, হিংস্র বাঘের মতো হুংকার ছাড়লো সে।

উঠনের মাঝখানে উঁচু একটা গাছ রয়েছে, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা মোটা রশির ফাঁস। বৃদ্ধ জাদুকরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হলো গাছতলায়। তার গলায় পরিয়ে দেয়া হলো ফাঁসটা। শশংগিরে চিৎকার করে বললো, 'কেউ মুখ খুললে আমার অভিশাপ লাগবে তাকে। খবরদার, আমি তার কবরে গিয়ে তাকে শায়েস্তা করবো!'

ফাঁসের রশিটা টান টান হলো, গলায় চেপে বসলো। শরীরটা ওপর দিকে উঠলো খানিক, মাটিতে শুধু ঠেকে থাকলো পায়ের আঙুল।

'যে মুখ খুলতে চায় তাকে হাত তুলতে বলো।'

বন্দীদের সামনে ছুটোছুটি করে উমাঙ্গোর তর্জমা করা নির্দেশ বার বার আওড়ালো দোভাষী, কিন্তু কেউ হাত তুললো না।

কাঁধ ঝাঁকালো উমাঙ্গো। 'ঠিক আছে, ওর একটা পা ভাঙো। এমনভাবে ভাঙবে, হাড় ভাঙার আওয়াজ যেন সবাই আমরা শুনতে পাই।'

রাইফেলটা কাঁধের ওপর উল্টো করে ধরে তৈরি হয়েই ছিলো সার্জেন্ট, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটা শশংগিরের ডান হাঁটুর নিচে নামিয়ে আনলো সে। বুড়ো হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনে ককিয়ে কেঁদে উঠলো বাচ্চা আর মেয়েরা।

'তোমাদের জাদুকর খামোখা একটা পা হারালো, এর জন্যে কিন্তু তোমরা দায়ী,' বললো উমাঙ্গো। 'এখনো সময় আছে, যে কেউ

একজন হাত তোলো।'

দোভাষীর কথায় এবারও কেউ নড়লো না।

এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ জাদুকর, তার মাথা কাত হয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। তার ভাঙা পা বেলুনের মতো ফুলে উঠছে।

মেয়েদের কান্নার রোলকে ছাপিয়ে উঠলো উমাঙ্গোর ভারি গলার গর্জন, 'আরেকটা পা।'

একই ভঙ্গিতে, এবার শশংগিরের বাঁ হাঁটুর নিচে রাইফেল দিয়ে বাড়ি মারলো সার্জেন্ট। গ্রামের সব মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে এখন, হাড় ভাঙার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে ফেললো শশংগিরে।

'এই শেষ সুযোগ,' বললো উমাঙ্গো। 'গ্রাম-প্রধানের জন্যে কারো মনে এতোটুকু দয়া নেই? কেউ তাকে বাঁচাতে চায় না? ভেবে দেখো, এটাই শেষ সুযোগ। তোমরা কেউ মুখ খুললেই লোকটা বেঁচে যেতে পারে।'

দোভাষীর চোখে অশ্রুর বন্যা, কিন্তু এবারও কেউ তার কথায় সাড়া দিলো না।

রশির মুক্ত প্রান্তটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সৈনিক, তাদের দিকে ফিরে মাথার ওপর একটা হাত তুললো উমাঙ্গো। কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকলো হাতটা, তারপর বিদ্যুৎবেগে শরীরের পাশে নেমে এলো। সেই সাথে গলায় ফাঁস নিয়ে মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়লো বৃদ্ধ জাদুকর। ছটফট করলো শরীরটা, খোলা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আধ হাত জিভ।

'বুড়োকে সরিয়ে দিয়ে পরিবেশটা তৈরি করলাম,' চাপা গলায় সার্জেন্টকে বললো উমাঙ্গো। 'মেয়েদের চেহারা দেখেছো, ভয়ে

একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মুখ খুললে ওদের মধ্যে থেকেই কেউ খুলবে।' মেয়েদের প্রথম সারির সামনে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে, প্রত্যেকের চেহারা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

'ওদের জিজ্ঞেস করো, দেশের শত্রুরা কোথায় লুকিয়ে আছে।'

যুবতী একটা মায়ের কাছে ফিরে এলো উমাঙ্গো। মেয়েটা নিজেই বলতে গেলে একটা বাচ্চা, তার সন্তান পিঠের ঝোলায় চোখ বুজে আরামে ঘুমাচ্ছে।

'আগুন কই?' মেয়েটার চোখে চোখ রেখে হাসলো উমাঙ্গো।

উমাঙ্গোর পিছনে একটা বড়সড় চুলো তৈরি করা হয়েছে, আগুন জ্বললো তাতে। জ্বলন্ত কাঠগুলো নেড়েচেড়ে দিলো একজন সৈনিক, গনগনে হয়ে উঠলো আগুন। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল মা। কিন্তু ইতিমধ্যে তার পিছনে দু'জন শোনা এসে দাঁড়িয়েছে, তারা ধরে ফেললো তাকে।

ঝোলা থেকে তুলে আনা হলো শিশুকে। বন্দী গ্রামবাসীরা বোবা চোখে তাকিয়ে আছে, কান্না ভুলে গেছে মেয়েরা।

ধস্তাধস্তি শুরু করলো মা, কিন্তু দু'জন তাগড়া সৈনিকের সাথে পারবে কেন সে।

একজন সৈনিকের হাত থেকে শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিলো উমাঙ্গো। আদর করে চুমো খেলো মাসুম বাচ্চার গালে। তার গায়ের রঙ মধুর মতো, পেটটা ঢব ঢব করছে মায়ের দুধে, মোটা-তাজা শরীর। তাকে হঠাৎ শূন্যে ছুঁড়ে দিলো উমাঙ্গো, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগে একটা গোড়ালি ধরে ফেললো। নিচের দিকে মাথা দিয়ে ঝুলে থাকলো বাচ্চাটা। তার স্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

'কোথায় ? দেশের শত্রুরা কোথায় ?'

বাচ্চার মুখ ফুলে উঠেছে, রক্তের চাপে গাঢ় হয়ে উঠেছে চেহারা।

'ওর মা বলছে, সে জানে না।'

বাচ্চাকে আগুনের ওপর উঁচু করে ধরলো উমাঙ্গো। 'দেশের শত্রুরা কোথায় ?'

প্রতিবার প্রশ্নের সাথে বাচ্চাটাকে আগুনের দিকে আরেকটু করে নামালো উমাঙ্গো।

'বলছে, জানে না।'

অকস্মাৎ মোচড়ানো ছোট্ট শরীরটা শিখার একেবারে মাঝখানে নামালো উমাঙ্গো, বাচ্চার গলা থেকে এবার সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো। এক সেকেণ্ড পর শিখা থেকে তাকে তুলে নিয়ে মায়ের মুখের সামনে দোলালো তাকে। আগুনের শিখা বাচ্চা-টার ভুরু আর চুল পুড়িয়ে দিয়েছে।

'ওকে বলো, ধীরে ধীরে ঝলসাবো ওর বাচ্চাকে, তারপর জোর করে খাওয়াবো ওকে দিয়ে।'

কাতর মা চিৎকার করে শুধু একটা কথাই বলে গেল, বারবার। বাকি সব মেয়েরা ফুঁপিয়ে উঠে মুখ ঢাকলো দু'হাতে।

'ও বলছে, আপনাকে সে ওদের কাছে নিয়ে যাবে।'

শোনারা ছেড়ে দিলো মেয়েটাকে,মায়ের কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিলো উমাঙ্গো। তার চোখে বিজয়ের উল্লাস।

লেকের চল্লিশ ফিট নিচে, সমাধির দেয়ালের সামনে, পিঠে অক্সি-জেন ইকুইপমেন্ট নিয়ে ঝুলছে রানা। লাইফ-জ্যাকেটের সাথে লটকানো ল্যাম্পের হলদেটে আলোয় রাজমিস্ত্রীদের কাজটা সতর্ক-

তার সাথে পরীক্ষা করলো ও। কোথাও কোনো ফাঁক বা ফাটল পাওয়া গেল না। ব্যাটারির আয়ু শেষ হয়ে যাবে বলে সেটা অফ করে দিলো ও। মুখের ভেতর টেনে নেয়া অক্সিজেনের স্বাদ কেমন বিস্বাদ ঠেকলো, মাস্কটা মুখের চারদিকে ভালো করে ফিট করেনি, মাঝে মধ্যে পানি ঢুকে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। কাশি পাচ্ছে, কিন্তু কাশতে চাইছে না, তাহলে মাস্কটা হয়তো আরেকদিকে সরে যাবে।

ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা। কিন্তু প্রতিটি সেকেণ্ড কাজে লাগালো ও। নিরাপদ সময় আধ ঘণ্টা, তার বেশি পানির নিচে থাকতে পারবে না ও। এই আধ ঘণ্টায় পাথরের টুকরো সরিয়ে তিন-কি চার ফিট একটা গর্ত করেছে দেয়ালের গায়ে। কিন্তু তবু জানা গেল না এরপর আরো কতোটা চওড়া এই দেয়াল। খসিয়ে আনা পাথরগুলোয় পা দিয়ে ধাক্কা দিলো ও, ঢাল বেয়ে নেমে গেল সেগুলো, টানেলের মুখ থেকে বেরিয়ে লেকের তলায় পড়লো।

টানেল থেকে বেরিয়ে এসে লেকের ওপর, পানি থেকে মাথা তুললো রানা। পাথরের চত্বরে উঠতে ওকে সাহায্য করলো মাজুলেট। পিঠ থেকে অক্সিজেন সেটটা নামিয়ে ভারমুক্ত করলো। ওদিকে ব্যস্ত হাতে একটা কাপে ওর জন্যে গরম চা ঢালছে মিরাণ্ডা।

'সোহানা?'

'ওপরের গুহায় পাহারায় আছে।'

নিচের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলো রানা। তারপর বললো, 'দেয়াল ভাঙার জন্যে কতোবার ডুব দিতে হবে বলা যাচ্ছে না। আরেকটা কথা—হীরে যদি পাই, আনবো কিভাবে? মনে আছে, ইনস্নুতসা মাটির একটা পাত্র ভেঙে ফেলেছিলেন? ক্যানভাসের

সিট কাভার দিয়ে যে ব্যাগগুলো তৈরি করেছি, তার একটা দরকার। তোমার পালা শুরু হলে, মিরাণ্ডা, সোহানাকে একটা ব্যাগ নিয়ে আসতে বলো।'

আধ ঘণ্টা পর আবার পানিতে নামলো রানা। সদ্য তৈরি গর্তের ভেতর ঢুকে কাজ শুরু করলো ও। প্রথম দশ মিনিটে আরো ছ'-ফিটের মতো গভীর হলো ফাঁকটা। তারপরই হুড়মুড় করে খসে পড়লো একগাদা পাথর। অন্ধকার ফাঁকের ভেতরটা হাতড়ালো ও, কিছুই ঠেকলো না আঙুলে। একটু একটু করে ওপরে উঠলো, ছাদে ঘষা খেলো অক্সিজেন বটল, কিন্তু সামনে কোনো বাধা নেই।

টানেল ক্রমশ উঠে গেছে ওপর দিকে, রানাও সাঁতার কেটে উঠতে লাগলো। হঠাৎ করেই পানির ওপর মাথাচাড়া দিলো ও, একটা কর্কের মতো দুলতে লাগলো ওর মাথা। এক ঝটকায় মাস্কটা খুলে ফেললো মুখ থেকে, ফুসফুস ভরে শ্বাস নিলো। ঠাণ্ডা বাতাস, তবে বাদুড়ের চিমসে একটা গন্ধ আছে। নাক-মুখ দিয়ে ঘন ঘন বাতাস টানলো ও।

একটু পরই কব্জিতে বাঁধা রশিতে টান পড়লো—পর পর ছয়বার। মাজুলেট জানতে চাইছে, তুমি সুস্থ তো? টানেল ধরে হঠাৎ খুব দ্রুত উঠতে শুরু করেছিল ও, তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মাজুলেট। সংকেত পাঠিয়ে মাজুলেটকে আশ্বস্ত করলো ও, তারপর ল্যাম্পের সুইচ টিপলো।

ল্যাম্পের ম্লান আলো ধাঁধিয়ে দিলো চোখ। আলো একটু সয়ে এলে চারদিকে তাকালো ও। দেয়াল ভেঙে পানির ওপর উঠেছে বটে, কিন্তু টানেলটা এখানেই শেষ হয়নি। লেকের তলা থেকে টানেলটা খাড়া ভাবে নয়, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে, কিন্তু পানি

থেকে টানেলের ওপরের অংশটা একেবারে খাড়া। ইনস্তুতসার লোকেরা দেয়ালের গায়ে গর্ত করে তার ভেতরে গজাল ঢুকিয়েছে, গজালের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে আটকানো হয়েছে বাঁশের একটা মই। বাঁশের একটা ধাপ ধরে মইটা পরীক্ষা করলো ও। মচমচ করে উঠলো, ঝুলে পড়লো খানিকটা, তবে মনে হলো ওর ওজন সইতে পারবে। মই বেয়ে ওপর দিকে উঠে গেল ওর দৃষ্টি, মাত্র কয়েকটা ধাপ দেখা গেল, তারপর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মই। এই টানেল কোথায় শেষ হয়েছে আন্দাজ করা মুশকিল।

মাথাটা ব্যথা করছে, একটু বিশ্রাম নিয়ে মই বেয়ে উঠবে। এক মিনিটও পেরোলো না, পরপর তিনটে টান পড়লো কব্জির রশিতে। জরুরী ডাক। শুধু ভয়ংকর কোনো বিপদ হলে এই সংকেত পাঠাবার কথা মাজুলেটের। শুধু বিপদের কথা বলছে না মাজুলেট, সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে।

দ্রুত হাতে মাস্ক পরে সংকেত পাঠালো রানা, 'আমাকে তোলো।'

টান পড়লো রশিতে, হুস করে পানির নিচে ডুবে গেল রানা।

বাচ্চাকে বোনেদের হাতে তুলে দিয়ে কিশোরী মা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ওদের। তার কব্জি দুটো এক করে হাতকড়া পরানো হয়েছে।

পলাতক আসামীদের ধরার জন্যে হেলিকপ্টার ব্যবহারের কথা একবার ভাবলেও, চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দেয় উমাঙ্গো। সিদ্ধান্ত নেয়, খালি পায়ে, নিঃশব্দে যেতে হবে ওদেরকে। শত্রুদের ভালো করে চেনে সে। বিশেষ করে মাসুদ রানা আর সোহানা

চৌধুরী এসপিওনাজ এজেন্ট, নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হয় তার ট্রেনিং নেয়া আছে। এরই মধ্যে সৈনিকদের ফাঁকি দিয়ে একবার পালিয়েছে তারা। না, হেলিকপ্টারের আওয়াজ ওদেরকে সতর্ক করে দেবে, আবার একবার জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। একই কারণে অ্যাডভান্স পার্টিটাকে বড় করেনি সে—বাছাই করা ত্রিশ জন সৈনিককে নিয়েছে শুধু। প্রত্যেককে আলাদাভাবে ব্রিফ করা হয়েছে।

'মেয়েগুলো মরুক, তাতে দুঃখ নেই; বিদেশী এজেন্ট লোকটা মরুক, আমি খুশি হবো; কিন্তু ম্যাটাবেল নেতাকে আমি জ্যান্ত চাই। তোমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

শত্রুদের হদিশ পাবার সাথে সাথে রেডিওর সাহায্যে ডেকে নেয়া হবে হেলিকপ্টার, সেই সাথে চলে আসবে তিনশো সৈনিকের একটা বাহিনী। গোটা এলাকা সীল করে দেবে ওরা।

ছোট দলটা দ্রুত পায়ে এগোলো। পিছন থেকে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে হোঁচট খেতে খেতে প্রায় ছুটছে মেয়েটা। অঝোর ধারায় পানি ঝরছে তার গাল বেয়ে, স্বজাতির সাথে বেঈমানী করার অপরাধে অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকে। একটা করে রাইফেলের গুঁতো খেলো সে, অস্পষ্ট পথের দিকে হাত তুলে দেখালো কোন্ দিকে যেতে হবে।

'গ্রামের লোকেরা ওদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল,' সার্জেন্টকে বললো উমাঙ্গো। 'এই পথে নিয়মিত লোক চলাচল করেছে।'

চোখ তুলে উপত্যকার দিকে তাকালো সার্জেন্ট। 'অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা দারুণ। ওদের সাথে পলাতক কয়েদীরাও থাকতে

পারে।'

'অ্যামবুশ মানে যোগাযোগ, সেটাই তো চাইছি আমি,' মৃদু কণ্ঠে বললো উমাঙ্গো।

কিছুক্ষণ পর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে সতর্ক হয়ে উঠলো উমাঙ্গো। সরু হয়ে এসেছে উপত্যকা, ঢালগুলো আগের চেয়ে অনেক খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে, পাথর আর গাছের রঙ কালো। জঙ্গলের বেঢপ চেহারা দেখে গা ছম ছম করে উঠলো সার্জেন্টের।

পাথরের ওপর দিয়ে সতর্কতার সাথে এগোলো ওরা। পিছিয়ে পড়লো উমাঙ্গো, তার সামনে মেয়েটার পাশে রয়েছে সার্জেন্ট। হঠাৎ নিজের ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিলো মেয়েটা, কথাগুলো বোঝা গেল না। তার কণ্ঠস্বর পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। বোঝা না গেলেও, এটা যে একটা সতর্ক বাণী, সেটা পরিষ্কার।

প্রায় দৌড়ে মেয়েটার পিছনে চলে এলো উমাঙ্গো। কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কিশোরীর চিবুক ধরলো সে, অপর হাত রাখলো তার ঘাড়ের নিচে, তারপর প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টানে পিছন দিকে নিয়ে এলো মাথাটা। মট্ করে ভেঙে গেল ঘাড়, সেই সাথে থেমে গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাশটা পড়ে গেল, দ্রুত হাত নেড়ে ট্রুপারদের সংকেত দিলো উমাঙ্গো। ঝড়ের বেগে এগিয়ে এলো তারা, পথ থেকে সরে গিয়ে সচল একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করলো।

পজিশন নিয়ে থামলো ট্রুপাররা। সার্জেন্টের দিকে তাকালো উমাঙ্গো। সার্জেন্ট মাথা ঝাঁকালো। দু'জন একসাথে, নিঃশব্দে সামনে বাড়লো ওরা, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, দু'জোড়া চোখ সদা সতর্ক।

অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন ফাটলের কাছে নিয়ে এলো ওদেরকে। ফাঁক-টার দু'দিকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো উমাঙ্গো আর সার্জেন্ট।

'ম্যাটাবেলদের রাজা, এবার?' হায়েনার মতো কর্কশ হাসলো উমাঙ্গো। 'বিদেশী গুপ্তচর, এবার? তোমাদের কপালে রয়েছে জ্যান্ত কবর, আমি কি করবো।'

নয়

'পালাও গো! ওগো তোমরা পালাও। গু-খেকো শোনারা এসে গেছে।' গুহার বাইরে থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো। 'পালাও, পালাও, শোনারা··' হঠাৎ থেমে গেল চিৎকার, যেন কেউ তার গলা চেপে ধরলো।

আগুনের সামনে থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো মিরাণ্ডা, লোহার পায়াওয়ালা পাতিলটা উল্টে পড়লো পায়ের ধাক্কায়। ছুটে গুহার এক প্রান্তে চলে এলো সে, কুপিটা তুলে নিয়ে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো দৌড়ে বেরিয়ে এলো প্যাসেজে।

লাইমস্টোনের সিঁড়ির ধাপ টপকে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মিরাণ্ডা, হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চিৎকার করে বললো, 'মাজুলেট, শোনারা পৌঁছে গেছে। আমরা কোথায় ওরা জানে!' পাথুরে পাতালে তার আতংকিত কণ্ঠস্বর

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো।

'আমি আসছি,' মাজুলেটের গমগমে গলা ভেসে এলো শ্যাফটের নিচে থেকে। রশি বেয়ে উঠলো সে, প্যাসেজ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো মিরাণ্ডার কাছে। 'কোথায়?'

'গুহার মুখে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মিরাণ্ডা, আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ। 'একটা মেয়ে চিৎকার করে সাবধান করছিল, হঠাৎ থেমে গেল সে। নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে তাকে।'

'নিচে যাও, রানাকে তোলো!'

'মাজুলেট, আমরা আটকা পড়ে গেছি। এখান থেকে বেরুবার আর কোনো পথ নেই।'

'আমরা লড়বো,' দৃঢ় কণ্ঠে আশ্বাস দিলো মাজুলেট। 'রানাকে তোলো, ও জানে কি করতে হবে।' হাতে রাইফেল নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

রশি বেয়ে লেকের ওপর, পাথুরে চত্বরে নেমে এলো মিরাণ্ডা। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, পানিতে ডুবে থাকা রশি ধরে প্রাণপণে টানছে, কিন্তু নিচে কোথাও আটকে যাওয়ায় রশি উঠছে না। 'এসো,' রুদ্ধশ্বাসে বললো সে, 'দু'জন একসাথে টানি।'

টানেলের মুখে অক্সিজেন বটল আটকে গেছে, লেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না রানা। রশিতে একটু ঢিল পড়লো, তারপর আবার টান টান হলো সেটা, এবার টানেলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ও।

'শোনারা এসে গেছে,' সোহানার সাথে রশি টানতে টানতে

বললো মিরাণ্ডা।

'শুনেছি।'

'এখন কি হবে, ভাই?'

'প্রথম কাজ, সাহস হারানো চলবে না। রানাকে তুলি, শোনা যাক ও কি বলে।'

একরাশ বুদ বুদ উঠলো পানির ওপর, তারপর ভুস করে ভেসে উঠলো রানা। মেয়েলি দু'জোড়া হাত পানি থেকে টেনে তুললো ওকে। ফেস মাস্ক খুলে বুক ভরে শ্বাস টানলো ও। 'কি হয়েছে?'

দু'জন একসাথে কথা বললো, 'শোনারা পৌঁছে গেছে!'

'ওহ্ গড!' চত্বরের ওপর শুয়ে পড়লো রানা।

'এখন উপায়?' কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করলো মিরাণ্ডা।

আচমকা বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিলো। প্রতিধ্বনিগুলো থামার আগেই বিড়বিড় করে বললো রানা, 'গান-ফায়ার। মাজুলেট বাধা দিচ্ছে।'

'কতোক্ষণ ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব?'

'নির্ভর করে ওরা গ্রেনেড আর গ্যাস ব্যবহার করে কিনা...,' কথাটা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালো রানা, ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে। দ্রুত হাতে অক্সিজেন বটল বদল করলো ও। 'মিরাণ্ডা, কখনো অ্যাকুয়ালাঙ ব্যবহার করেছো?'

'না।'

'তৈরি থাকো, সোহানার পর তোমার পালা,' বললো রানা। 'ওর সাথে আমিও যাচ্ছি, অক্সিজেন গিয়ার নিয়ে ফিরে আসবো—দশ মিনিটের মধ্যে।'

পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। চত্বরে একা বসে কাঁদতে

শুরু করলো মিরাণ্ডা। শ্যাফটের ওপর থেকে আবার বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ফিরে এলো রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় ঘাড় থেকে খসে পড়তে চাইলো মাথাটা, ফুসফুসেও যেন আগুন জ্বলছে। এখুনি যদি আবার পানির তলায় যেতে হয় ওকে, একটা বিপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আর কোনো উপায় ওদের সামনে খোলা নেই। গুহা বেদখল হয়ে যাওয়াটা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র, খুব বেশিক্ষণ শোনাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না মাজুলেট। প্রাণ বাঁচাতে হলে লেকের তলায় নেমে টানেলের ভেতর দিয়ে মইয়ের কাছে পৌঁছুতে হবে ওদের—তাতেও প্রাণ বাঁচবে কিনা সন্দেহ, তবে আয়ু কিছুটা বাড়বে। 'রেডি, মিরাণ্ডা?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলো ও।

'আমি সাঁতার জানি না,' ফুঁপিয়ে উঠে বললো মিরাণ্ডা। 'পানিতে নামলে স্রেফ দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো আমি।'

'কিচ্ছু হবে না।'

'না!'

'শোনারা তোমাকে নিয়ে কি করবে, জানো?' মিরাণ্ডার মাথা দিয়ে অক্সিজেন সেটটা গলিয়ে দিলো রানা। আরেক দফা মেশিন-গানের আওয়াজ ভেসে এলো ওপর থেকে। প্রতিধ্বনি থামার আগেই গর্জে উঠলো গ্রেনেড-লঞ্চার। পাথরের গা বেয়ে, খটাখট আওয়াজ তুলে কি যেন গড়িয়ে নামলো, পরমুহূর্তে তীব্র নীল ফস-ফরাস ফ্লেয়ারের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ, আলোকিত হয়ে উঠলো গোটা শ্যাফট। ব্যস্ত হাতে পেট মোটা একটা ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে নিলো রানা, ফেস মাস্ক পরালো মিরাণ্ডাকে। গ্যাঁট হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে মিরাণ্ডা, রানার কোনো কথাই তার কানে ঢুকছে না। অগত্যা তাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে নিজেও লাফ দিলো ও।

লেকের তলা পর্যন্ত নামতে কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু টানেলের খোলা, কালো মুখ দেখে ভীষণ ভয় পেলো মিরাণ্ডা, কোনোমতে ভেতরে ঢুকবে না। ল্যাম্পের আলোয় নিজেকে দেখিয়ে রানা তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো, ইঙ্গিতে বোঝালো, আমি আছি, কোনো ভয় নেই। কিন্তু বুঝলো না মিরাণ্ডা, টানেলের মুখ থেকে সরে গিয়ে লেকের ওপর উঠতে চেষ্টা করলো সে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

জোর করে তাকে ধরে টানেলের ভেতর আনলো রানা। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেল মিরাণ্ডা। প্রথমেই কনুইয়ের গুঁতোয় চ্যাপ্টা করে দিলো রানার নাক, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেললো ফেস মাস্ক। মাস্কটা আবার পরাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলো রানা, টানাটানিতে ছিঁড়ে গেল মাস্ক আর অক্সিজেন বটলের মাঝখানের হোস-টা। টানেলের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল, নেতিয়ে পড়লো মিরাণ্ডা।

নিস্তেজ নারীদেহ জড়িয়ে ধরে টানেল বেয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু দম ফুরিয়ে গেছে ওর, অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারাবার অবস্থা। আরো খানিকটা উঠলো বটে, কিন্তু মিরাণ্ডা আর ব্যাগের ভার নিচের দিকে টানলো ওকে। তলিয়ে যেতে শুরু করলো ও। এমনি সময়ে অনুভব করলো কে যেন তার মাথার চুল খামচে ধরে ওপর দিকে টানছে।

মইয়ের ধাপে বসে ছিলো সোহানা, পানির নিচে ল্যাম্পের ম্লান

আলো দেখে বুঝতে পারে মিরাণ্ডাকে নিয়ে উঠে আসছে রানা। কিন্তু আলোটা আবার নিচে নামতে শুরু করায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে ওর বুক, তাড়াতাড়ি পানির নিচে ডুব দিয়ে রানার চুল ধরে ফেলে।

পানির ওপর মাথা তুলে হাঁপাতে লাগলো রানা। ধাপের ওপর বসে মিরাণ্ডার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে রানাকে ভারমুক্ত করলো সোহানা, তারপর মিরাণ্ডার পিঠ থেকে অকেজো অক্সিজেন সেটটা খুলে নিলো।

জ্ঞান ফিরে আসার কোনো লক্ষণ নেই মিরাণ্ডার। দম একটু ফিরে পেয়েই মিরাণ্ডার খোলা মুখের ভেতর একটা আঙুল ভরে দিলো রানা, হড় হড় করে বমি করলো মিরাণ্ডা, একটু নড়ে উঠলো।

আঁতকে উঠে সোহানা বললো, 'কিন্তু শ্বাস তো বইছে না।'

মিরাণ্ডার ঠোঁট থেকে বমি মুছলো রানা, তারপর মুখে মুখ চেপে ধরে নিজের ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস জোর করে ঢুকিয়ে দিলো তার ফুসফুসে।

'আবার নিঃশ্বাস ফেলছে!'

মুখ মুছলো রানা। দুর্বল আর অসুস্থ বোধ করলো ও। 'ডাইভিং সেট ভেঙে গেছে।' হোসটা খুঁজলো ও, কিন্তু পেলো না, পানির তলায় নেমে গেছে। 'মাজুলেট,' ফিসফিস করে বললো আবার, 'ওর জন্যে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'না, আমি যাবো।' দ্রুত বললো সোহানা। 'আবার পানির নিচে নামলে মারা যাবে তুমি।'

'মাজুলেট সাঁতার জানে না। শুধু আমি যদি ওকে পানিতে নামাতে পারি।'

'বেশ। তাহলে রশি বাঁধো কোমরে, দরকার হলে আমি যাতে

টেনে তুলতে পারি তোমাদের।'

টানেলের নিচে নেমে এলো রানা, মুখ থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত সাঁতার কেটে উঠে এলো লেকের ওপর। পানির ওপর মাথা তুলেই দেখলো, শ্যাফটের চারদিক সাদাটে ধোঁয়ায় ভরে গেছে। 'টিয়ার গ্যাস!' বিড়বিড় করে বললো ও।

ভিজে কাপড় নাকে-মুখে চেপে চত্বরে বসে রয়েছে মাজুলেট। 'সবগুলো প্যাসেজে গিজ গিজ করছে শোনারা,' রানাকে বললো সে। আমার বোধহয়…'

যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ইলেকট্রনিক মেগাফোন ব্যবহার করছে শোনারা। 'আপনারা যদি এই মুহূর্তে সারেণ্ডার করেন, সবাইকে ক্ষমা করা হবে।' পরমুহূর্তে গর্জে উঠলো গ্রেনেড লঞ্চার, ওপর থেকে ছুটে এল আরেকটা টিয়ার গ্যাস সেল। লেকের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালে আঘাত করলো সেটা, বিস্ফোরিত হলো সাদাটে ধোঁয়া।

'ওপর থেকে এখন যদি একটা গ্রেনেড পড়ে?'

'আমি জানি আমি মারা যাচ্ছি,' বললো মাজুলেট। 'কিন্তু তুমি কেন মরতে এসেছো?' চত্বরের মাঝখানে সরে গিয়ে রাইফেলটা ওপর দিকে তাক করলো সে। ট্রিগারে চাপ দিলো, গুলি বেরোলো বটে, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। 'ম্যাগাজিন শেষ।'

'আমি জানি তুমি মারা যাচ্ছো না,' বললো রানা। 'পানিকে তোমার ভয়, এই তো? মন দিয়ে শোনো, শিখিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে। বুক ভরে শ্বাস টানো, বাতাসটুকু আটকে রাখো ফুসফুসে। নিজের ওপর জোর খাটাও, কোনোমতেই আর নিঃশ্বাস ফেলবে

না ।'

'কিন্তু রানা...

'একজন জেনারেল শুধু ভয় পেয়ে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে, ভাবতেও আমার ঘৃণা হবে, মাজুলেট ।'

'কি করতে হবে বলো !' মুখ ভার করে বললো মাজুলেট ।

মাথার ওপর অন্ধকার শ্যাফট, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কেউ জানে না। মুখ তুলে সবাই তাকিয়ে আছে ওরা, কারো মুখে কথা নেই। ওরা যেন একটা কুয়ার ভেতর পানিতে মাথা তুলে থাকা একদল ইঁদুর, পিচ্ছিল বাঁশের মই ধরে ভেসে আছে, প্রচণ্ড শীতে হি হি করে কাঁপছে।

ঘাড়ের ওপর থেকে মাজুলেটের ভারি হাত সরিয়ে দিয়ে মইটা পরীক্ষা করলো রানা। ষাট বছর আগে তৈরি করা হয়েছে মইটা, মাঝখানে চেরা বাঁশের টুকরো পাটের রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে লম্বা একজোড়া পোলের সাথে, মইয়ের গোটা কাঠামো কাত হয়ে পড়েছে একদিকে। 'একজন করে উঠতে হবে,' বললো ও। 'সবার আগে সোহানা, কারণ তুমিই সবচেয়ে হালকা। সাথে রশি নিয়ে যাও, মাথায় উঠে ল্যাম্প আর ব্যাগগুলো টেনে নেবে।'

রশির কুণ্ডলী কাঁধে তুলে নিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করলো সোহানা। দুলতে শুরু করলো মই, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানালো, কিন্তু পায়ের চাপে খসে পড়লো না ধাপগুলো। ওপরে উঠে যাচ্ছে সে, ল্যাম্পের আলোয় কালো ছায়া শ্যাফটের গা বেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ওপর দিকে। এক সময় নিচ থেকে ওরা শুধু ল্যাম্পের আলো দেখতে পেলো, তারপর সেই আলোও হঠাৎ করে অদৃশ্য

হয়ে গেল।

'সোহানা!'

'এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে!' গমগম করে উঠলো সোহানার সুরেলা কণ্ঠস্বর।

'কতো বড়?'

'অনেক বড়। রশি ফেলছি।' সাপের মতো এঁকেবেঁকে নেমে এলো রশির একটা প্রান্ত। ব্যাগগুলো এক এক করে তুলে নিলো সোহানা। 'এবার মিরাণ্ডাকে পাঠাও।'

সবশেষে উঠে এলো রানা। মুখ তুলে মাথার ওপর তাকালো ও। খাড়া শ্যাফট আরো উঠে গেছে ওপরদিকে, অদৃশ্য হয়েছে অন্ধকারের ভেতর, দেয়ালগুলো মসৃণ, গা বেয়ে ওঠার কোনো উপায় নেই। ষাট বছর আগে এই প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত ওঠার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল মইটা। কান পেতে থাকায় ওপরে কোথাও পানির ফোঁটা পড়ার আওয়াজ পেলো রানা, বাদুড়ের কিচকিচ শোনা গেল। হাতের ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরলো সোহানা, কিন্তু শ্যাফটের মাথাটা দেখা গেল না।

কার্ণিশ অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের চারদিকে চোখ বুলালো রানা। প্রায় আট ফিট চওড়া, শেষপ্রান্তের দেয়ালে একটা সুড়ঙ্গের মুখ রয়েছে। 'মনে হচ্ছে এটাই একমাত্র পথ,' বললো ও। 'ইনসুতসা তার লোকদের নিয়ে নিশ্চয়ই এই সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকেছিল।'

কেউ কোনো মন্তব্য করলো না, সবাই খুব ক্লান্ত।

'বসে থাকলে চলবে না,' সাবধান করে দিলো রানা। 'প্রথম কাজ এখান থেকে বেরুবার একটা পথ খুঁজে বের করা।' উঠে দাঁড়ালো ও, জোরে নিঃশ্বাস ফেলায় ব্যথা অনুভব করলো বুকে।' ব্যাগ-ট্যাগ

সব এখানে থাক। পরে নিয়ে যাবো। সোহানার হাত থেকে ল্যাম্প নিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে এগোলো ও।

সুড়ঙ্গের মুখটা চওড়ায় তিন ফিটের মতো, ওপর-নিচে আরো বরং একটু কম। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হলো ওদের। প্রথমে রানা, পিছনে সোহানা আর মিরাণ্ডা, সবশেষে মাজুলেট। পঞ্চাশ ফিটের মতো এগোলো ওরা, এখান থেকে একটু একটু করে উঁচু হতে শুরু করেছে সুড়ঙ্গের ছাদ। মাথা নিচু করে দাঁড়াতে পারলো ওরা। আরো একশো ফিট এগোবার পর প্রকৃতির তৈরি একটা দরজার সামনে থামলো রানা। মাথা নিচু করে চৌকাঠ পেরোলো ও, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো। বিস্ময়ের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেল রানা, টেরও পেল না দরজা পেরিয়ে বাকি সবাই ভিড় করেছে ওর দু'পাশে।

ওদের মাথা ধীরে ধীরে একদিক থেকে ঘুরলো আরেক দিকে।

'ওহ্ খোদা, কি সুন্দর!' ফিসফিস করে বললো সোহানা। রানার কাছ থেকে ল্যাম্প নিয়ে মাথার ওপর লম্বা করে দিলো হাতটা।

আলোময় একটা গুহার ভেতর ঢুকেছে ওরা, স্ফটিক দিয়ে সাজানো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খিলান আকৃতির সিলিঙের চিড় গলে পানির ধারার সাথে দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে চিনির মতো ক্রিস্ট্যালাইন ক্যালশিয়াম, ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেতে পড়ে শক্ত নিরেট আকৃতি পেয়েছে।

গুহার ভেতর যেদিকে চোখ পড়লো, মন ভোলানো স্ফটিকের ভাস্কর্য দেখলো ওরা। প্রতিটি আকৃতি থেকে বিচিত্র সব ঝলমলে রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেয়ালে ঝুলে রয়েছে বহু-রঙা ঝালর, পর্দা, রশি, জাল। ল্যাম্পের আলোয় বহুমূল্য চীনামাটির মতো দেখালো

ওগুলোকে। ছাদ থেকে নেমে এসেছে মসৃণ স্তম্ভ, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত ঝুলে আছে স্বচ্ছ সেতু। সিঁড়ির ধাপের মতো সিলিং থেকে নেমে এসেছে স্ফটিকের ধাপ। দেয়ালের গায়ে তৈরি হয়েছে ঝলমলে কার্ণিশ, শূন্যে ঝুলে আছে রঙচঙে ডানা নিয়ে আকাশপরী। সিলিং থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝাড়বাতি থেকে ফুটে বেরুচ্ছে স্বর্গীয় আলো। মেঝেতে কোথাও কোথাও পদাতিক বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও তৈরি হয়েছে হাঙর আর নেকড়ের পাল। মেঝের ফাঁকা একটা জায়গায় একটা নারীমূর্তি দেখা গেল, নাচছে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যালে-রিনার প্রতিমূর্তি যেন। ল্যাম্পের আলোয় প্রতিটি আকৃতি, প্রতিটি ভাস্কর্য থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে লক্ষ-কোটি রঙচঙে আলোর কণা।

ঘোরের মধ্যে রয়েছে ওরা, ইতস্তত করতে করতে এক পা এক পা করে এগোলো। গুহার ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে সবাই। আবার দাঁড়ালো রানা, ওর পিছনে সবাই এমনভাবে সেঁটে এলো, মনে হলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে দলটা। ছাদ থেকে লাইম-স্টোনের টুকরো খসে পড়েছে, কিন্তু মাঝখানের মেঝেটা পরিষ্কার। আবর্জনা সরিয়ে ওখানে একটা মঞ্চ মতো তৈরি করা হয়েছে। বোঝা যায়, কাজটা মানুষের হাতের। লাইমস্টোনের বড়বড় চাঁই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে চারকোণা মঞ্চটা। মঞ্চের ওপর, বুকের কাছে হাঁটু তোলা, চিতার সোনালি ছালে গা ঢাকা, বসে রয়েছে মানুষের একটা শরীর।

'লোবেনগুলা!' একটা ভাঁজ করা হাঁটু মেঝেতে নামিয়ে নিচু হলো মাজুলেট 'প্রিয় রাজা লোবেনগুলা!'

রাজা লোবেনগুলা তাঁর হাঁটুজোড়া দুই হাতে আঁকড়ে ধরে

আছেন, সম্পূর্ণ মমি হয়ে গেছেন তিনি। মৃত্যুর পরও তাঁর হাতের নখ বেড়েছে। ওগুলো লম্বা আর বাঁকানো, প্রাগৈতিহাসিক কোনো প্রাণীর মতো। লোবেনগুলা নিশ্চয়ই পালক আর পশম দিয়ে তৈরি কোনো আবরণ পরেছিলেন মাথায়, সেটা খসে পড়েছে তাঁর পাশে। হীরণ পাখির পালকগুলো এখনো নীল, আর নিভাঁজ, যেন আজই ছেঁড়া হয়েছে পাখির ডানা থেকে।

সম্ভবত ইচ্ছে করেই, কিংবা হয়তো না বুঝেই, মঞ্চের ওপর লাশ-টাকে বসানো হয়েছে ছাদের একটা চিড়ের ঠিক নিচে। এমনকি ওরা তাকিয়ে থাকার সময়ও দেখলো, অনেক ওপর থেকে টপ করে আরেকটা ফোঁটা পড়লো লাশের কপালে, বিস্ফোরিত হলো ফোঁটাটা, তারপর মন্থরগতি অশ্রুর মতো এঁকেবেঁকে নেমে এলো লোবেনগুলার গাল বেয়ে। নিশ্চয়ই এই রকম অযুত কোটি ফোঁটা পড়েছে তাঁর ওপর, এবং প্রতিটি ফোঁটা তাঁর মাথায় রেখে গেছে চকচকে ক্যালশিয়াম।

লোবেনগুলা পাথরে পরিণত হয়েছেন, স্ফটিকের আবরণ ঢেকে দিয়েছে তাঁর চোখ, নাক, ঠোঁট, কান, কপাল, আর বুক। শুধু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের ভেতর এখনো চকচক করছে সাদা দাঁতগুলো।

ওদের গা ছমছম করতে লাগলো। নিস্তব্ধ, ভৌতিক লাগলো পরিবেশটা।

লোবেনগুলার সামনে লাইমস্টোনের নিচু একটা বেদি, গাঢ় রঙের পাঁচটা জিনিস রয়েছে তাতে। চারটে মাটির পাত্র, ছাগলের শুকনো ছাল দিয়ে প্রতিটির মুখ বন্ধ করা। পঞ্চমটা একটা ব্যাগ, সেটাও কোনো পশুর ছাল দিয়ে তৈরি।

'মাজুলেট, তুমি…,' মুখ খুললো রানা, কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর,

'তুমি এখন ম্যাটাবেলদের রাজা, এখানে যা কিছু আছে তাতে শুধু একা তুমি হাত দিতে পারো।'

এখনো মেঝেতে একটা হাঁটু রেখে নিচু হয়ে আছে মাজুলেট, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি। লোবেনগুলার মাথার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে।

মিরাণ্ডার দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো মাজুলেট। বেদির দিকে হাত বাড়িয়ে মাটির একটা পাত্র ধরলো সে।

দম বন্ধ করলো রানা, জানে না কি দেখতে পাবে। আরেকটা হাত বাড়ালো মাজুলেট, দু'হাতে ধরলো পাত্রটাকে।

পাত্রটা বুকের কাছে আনলো মাজুলেট, মৃদু একটা আওয়াজ হলো, সেই সাথে ভঙ্গুর মাটির পাত্র মাজুলেটের দু'হাতের ভেতর ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল।

যেন একরাশ টুকরো আলো ঝরে পড়লো। পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে ছুটলো হীরেগুলো, কোনোটা গড়াতে গড়াতে, কোনোটা লাফাতে লাফাতে। ল্যাম্পের আলোয় ঝলমল করছে প্রতিটি পাথর, ওগুলোর নিজস্ব আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারদিকে, ঠিক যেন জ্বলন্ত একেকটা কয়লা।

দশ

'এগুলো হীরে আমার বিশ্বাস হয় না,' ফিসফিস করে বললো মিরাণ্ডা। 'দেখে মনে হচ্ছে নুড়ি; সুন্দর, চকচকে নুড়ি, কিন্তু নুড়ি।'

লোবেনগুলার সামনে থেকে সরে এসে, স্ফটিক গুহার দরজার কাছে বসেছে ওরা। ক্যানভাস ব্যাগটা খালি করে বিছানো হয়েছে সামনে, সমস্ত হীরে জড়ো করা হয়েছে সেটার ওপর। খালি মাটির পাত্রগুলো, আর চামড়ার ব্যাগটা মমির সামনে রেখে এসেছে ওরা।

'গুজবের সবটুকু যে সত্যি নয় সেটা বোঝা গেল,' বললো রানা। 'পাত্রগুলো এক গ্যালনের নয়, বরং এক পাইন্টের মতো।'

শ্যাফটে নেমে গিয়ে মইয়ের ওপরের অংশ থেকে বাঁশের কয়েকটা ধাপ খুলে এনেছে রানা, গুহার মেঝেতে ছোট্ট একটা আগুন ধরানো হয়েছে। হীরের স্তূপটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে ওরা, ওদের ভিজে কাপড় আগুনের আভায় লালচে দেখালো।

মাজুলেট বললো, 'পাঁচ পাইন্ট হীরেও কি কম নাকি!'

'যদি ওগুলো হীরে হয়।' এখনো সংশয়ে ভুগছে মিরাণ্ডা।

'হীরে তো বটেই,' শান্ত কণ্ঠে বললো সোহানা। 'বিশ্বাস না হয়,

এই দেখো !' স্তূপ থেকে একটা পাথর তুলে নিলো সে। স্বচ্ছ হীরে, বারোকোণা, প্রতিটি কিনারা ক্ষুরের মতো ধারালো। ল্যাম্পের কাঁচের ওপর হীরের একটা কোণ ঠেকালো সে, তারপর টান দিলো নিচের দিকে। তীক্ষ্ণ, কর্কশ একটা আওয়াজ হলো, শিরশির করে উঠলো গা। কাঁচের গায়ে গভীর, সাদা একটা রেখা ফুটে উঠলো। 'আর কোনো সন্দেহ আছে ?'

'এতো বড় !' সবচেয়ে ছোটো যেটা পেলো তুলে নিলো মিরাণ্ডা। 'এরচেয়ে ছোটো তো দেখছি না, কিন্তু এটাও তো আমার আঙুলের প্রথম গিটের চেয়ে বড় !'

'ম্যাটাবেল শ্রমিকরা শুধু বড় হীরেগুলোই চুরি করেছিল,' মনে করিয়ে দিলো মাজুলেট। 'তাছাড়া, কেটে পালিশ করার পর ষাট ভাগ ছোটো হয়ে যাবে ওগুলো।'

'কতো রঙ !' ফিসফিস করে বললো মিরাণ্ডা। 'কতো বিচিত্র রঙ !'

লাল, নীল, সবুজ, সাদা, সব রঙেরই রয়েছে। কোনোটা হালকা, কোনোটা গাঢ়, এক নীলই রয়েছে পাঁচ-সাত রকম একটা সবুজ পাথর তুলে দু'আঙুলের মাঝখানে ঘোরালো রানা, প্রতিটির পাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের সবুজাভ দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো।

'এটা দেখো,' সোহানার হাতে একটা পাথর দেখা গেল। পাথরের গা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে লালচে নীল রঙ, কিন্তু একেবারে গভীরে জ্বলজ্বল করছে মধ্যদুপুরের গন গনে সূর্য।

'আর এটা ?' মিরাণ্ডার হাতে ওটা যেন ছেঁড়া ধমনী থেকে বেরিয়ে আসা তাজা রক্ত, এইমাত্র জমাট বেঁধেছে।

'এটা, এটা ?' স্বচ্ছ সবুজ, অসম্ভব সুন্দর, আলোর প্রতিটি কাঁপ-

নের সাথে বদলে যাচ্ছে রঙের বাহার।

বড় একটা হীরে তুলে রানাকে দেখালো মাজুলেট। 'এটার ওজন কতো হবে?' আকারে ওটা একটা গলফ বলের মতো।

'ওকে জিজ্ঞেস করো,' সোহানাকে দেখিয়ে বললো রানা। 'হীরে নিয়ে পড়াশোনা করেছে ও।'

'তিনশো ক্যারেটের কম নয়,' বললো সোহানা।

'দাম?' একটা ঢোক গিলে জানতে চাইলো মাজুলেট। 'এগুলোর দাম আন্দাজ করতে পারেন?'

'বলা মুশকিল,' কাঁধ ঝাঁকালো সোহানা। 'কিছু পাথর তো স্রেফ রাবিশ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি, শুধু মেশিন টুলসে ব্যবহার করা যাবে। বাকিগুলোর দাম···আসলে ওগুলো প্রত্যেকটি মহামূল্যবান—যাকে বলে অমূল্য রতন। এ-ধরনের একটা পাথরের দাম ঠিক হয় ধনী লোকদের পছন্দের ওপর। সবগুলো এক সাথে বিক্রি করা সম্ভব নয়। হীরের বাজার একসাথে এগুলোকে হজমই করতে পারবে না। প্রতিটি হীরে আলাদাভাবে বিক্রি করতে হবে। এগুলো থেকে কেউ একটা কিনতে চাইলে টাকার বিশাল একটা অংক হাতবদল করতে হবে তার, হীরের বাজারে রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে যাবে।'

'তবু কতো?' মাজুলেট নাছোড়বান্দা।

'সত্যিই জানি না আমি।' আরেকটা বড় পাথর তুলে নিলো সোহানা। 'অত্যন্ত দক্ষ একজন টেকনিশিয়ান কয়েক হপ্তা কাজ করবে এটার ওপর। শেষ পর্যন্ত যদি এটাকে নিখুঁতভাবে কাটা সম্ভব হয়, আর রঙটা যদি হয় ডি গ্রেডের, ধরো এটার দাম পাওয়া যেতে পারে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

বিষম খেলো মিরাণ্ডা। 'একটা পাথর এক মিলিয়ন ডলার!'

'হয়তো আরো বেশি,' বিড়বিড় করে বললো সোহানা, 'হয়তো আরো অনেক, অনেক বেশি।'

দু'হাত এক করে এক গাদা হীরে তুললো মাজুলেট। 'একটার দাম যদি দশ লাখ ডলার হয়, এগুলোর দাম কতো হবে?' আঙুলের ফাঁক গলে ধীরে ধীরে হীরেগুলো ঝরে পড়তে শুরু করলো।

'কম করে যদি আন্দাজ করি, পাঁচশো মিলিয়ন ডলার,' বললো সোহানা। 'এর তিনগুণও পাওয়া যেতে পারে, আমি জানি না।'

গুহার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। টাকার অংকটা এতোবড়, সবাই কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো মিরাণ্ডা। 'তারমানে জীবিত লোকদের মধ্যে আমরাই বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী।'

'হ্যাঁ, তা হয়তো সত্যি,' গম্ভীর সুরে বললো মাজুলেট। 'কিন্তু এই গোলকধাঁধা থেকে যদি বেরুতে না পারি, কি দাম ওগুলোর?'

শিউরে উঠলো মিরাণ্ডা। 'আচ্ছা, সত্যি যদি এখান থেকে বেরু-বার পথ আমরা না পাই?'

কেউ কোনো উত্তর দেয়ার আগেই ওদের নিচে পাথরের মেঝে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো। বসে ছিলো সবাই, ছিটকে পড়ে গেল দেয়ালের গায়ে। বহু উঁচু সিলিং থেকে খসে পড়লো লাইমস্টোনের বিশাল একটা চাঁই, প্রায় বিশ টন ওজন হবে। গাঢ় ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল গুহার ভেতরটা। খক খক করে কাশতে শুরু করলো ওরা। পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না। মিরাণ্ডার আর্তচিৎকারে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ওদের।

'রানা! কি ব্যাপার?' চিৎকার করে জানতে চাইলো মাজুলেট।

কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলেও, চুপ করে থাকলো রানা।

কাউকে আতংকিত করতে চায় না ও।

'শোনারা,' মৃদু কণ্ঠে বললো মাজুলেট, '…আমার মনে হয় শোনারা ডিনামাইট ফাটিয়ে ওপরের প্যাসেজ বন্ধ করে দিল।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মিরাণ্ডা। 'ওরা আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে…।'

আধ ঘণ্টা পর প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলো রানা। কোমরে রশি নিয়ে শ্যাফটে নেমেছিল ও, তারপর মই বেয়ে পানিতে। কিন্তু টানেলে ডুব দিয়ে নিচের লেকে পৌঁছুতে পারেনি, বিশাল আকারের পাথরের চাঁই পড়ে টানেলটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে লেকের ওপর ফাটলের মুখে কোথাও, কিন্তু বিভিন্ন প্যাসেজ আর গুহার ছাদ ধ্বসে পড়েছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

'কি দেখলে?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলো সোহানা। উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। রানা কিছু বললো না, কিন্তু ওর চেহারা দেখে উত্তরটা কারও বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না।

'প্ল্যাটফর্ম, সুড়ঙ্গ, আর গুহার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখতে হবে,' বললো মাজুলেট। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো রানা।

দশ মিনিট পর কাজ শুরু করলো ওরা। রানা আর সোহানা, মাজুলেট আর মিরাণ্ডা, ছুটো দলে ভাগ হয়ে খুঁজতে বেরুলো। ছু'ঘণ্টা পর আবার সবাই মিলিত হলো আগুনের ধারে। ব্যাটারি শেষ হয়ে আসায় টর্চের আলো অনেক নিস্তেজ হয়ে গেছে, ল্যাম্পেও কেরোসিন নেই।

'মঞ্চের পিছনে একটা সুড়ঙ্গ পেয়েছি আমরা,' রিপোর্ট করলো

রানা। 'বেশ অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু তারপর পাথরের দেয়াল। তোমরা?' হোঁচট খেয়ে গোড়ালিতে ব্যথা পেয়েছে সোহানা, চামড়া ছিলে গেছে, ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে রানা।

'আমরাও দুটো সুড়ঙ্গ পেয়েছি, কিন্তু খানিক দূর যাবার পর দেয়াল দেখে ফিরে এসেছি।'

'এখন কি করা?'

'মুখে কিছু দিয়ে বিশ্রাম নেবো,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'ঘুম দরকার। শক্তি এখন সবচেয়ে বড় পুঁজি আমাদের, সেটা হারানো চলবে না।'

দুশ্চিন্তায় কাতর হলেও, প্রচণ্ড ক্লান্ত বলে সবাই ওরা ঘুমাতে পারলো। ঘুম ভাঙার পর রানা দেখলো, ওর বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে সোহানা, নিঃশ্বাসের সাথে ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে বুক থেকে। শীত আর স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ ওদের সবাইকে ভোগাতে শুরু করেছে।

ছাদ চুইয়ে টপটপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে, আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। কান পেতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আরেকটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলো রানা, অনেক দূর থেকে আসছে। একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে লাগলো মনে, কিসের শব্দ ওটা? কোত্থেকে আসছে?

তারপর চিনতে পারলো, বাদুড়ের ডাক। মনে পড়লো, প্রথম যখন প্ল্যাটফর্মে আসে ও তখন আরো স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল। টর্চ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। গুহা থেকে সুড়ঙ্গে চলে এলো, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো প্ল্যাটফর্মে। টর্চটা মাত্র দু'একবার জ্বাললো ও, ব্যাটারির শেষটুকু খরচ করতে চাইছে না।

অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

জমাট বাঁধা দীর্ঘ নীরবতা, মাঝে মধ্যে ভাঙলো শুধু পানির ফোঁটা পতনের কোমল শব্দে, আর তারপরই আচমকা মৃদু কিচমিচ আওয়াজ, শুনতে পাওয়া যায় কি যায় না, শ্যাফটের চিমনি বেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে নেমে এলো। তারপর আবার জমাট নিস্তব্ধতা।

টর্চ জ্বাললো রানা, পাঁচটা বাজে। সকাল না সন্ধ্যে জানা নেই, কিন্তু ওপরে ওখানে কোথাও যদি বাদুড়রা বিশ্রাম নিতে জড়ো হয়ে থাকে পাতালপুরীর ওপরে বাইরের দুনিয়ায় নিশ্চয়ই এখন দিনের আলোই রয়েছে। দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে বসে পড়লো ও, আরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলো। হঠাৎ করে কিচমিচ শব্দগুলো বেড়ে গেল, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠছে বাদুড়ের বিশাল একটা ঝাঁক।

ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা। আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা, ছ টা পঁয়ত্রিশ। কল্পনার চোখে দেখতে পেলো ও, সুড়ঙ্গের একটা মুখ দিয়ে অন্ধকার আকাশে বেরিয়ে যাচ্ছে বাদুড়ের লম্বা একটা ঝাঁক, বেরিয়ে যাচ্ছে চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার মতো।

সাবধানে পা ফেলে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো রানা, পাশের দেয়ালে পাঁজর ঠেকিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গভীর শ্যাফটের ওপর ঝুঁকলো, পাশের দেয়ালের ক্ষুদে একটা গর্তের কিনারা ধরে আছে এক হাতে। ঘাড় বাঁকা করে মুখ তুললো ওপর দিকে, শ্যাফটের ওপরটা দেখতে চায়, টর্চ ধরা অপর হাতটা ওপর দিকে লম্বা করে দিলো সবটুকু। হলদেটে ম্লান আলো ওর মাথার ওপর অন্ধকারকে আরো যেন নিশ্ছিদ্র, আরো যেন গাঢ় করে

তুললো।

অর্ধবৃত্ত আকৃতি নিয়ে উঠে গেছে শ্যাফটটা, অপর দিকের দেয়াল প্রায় দশ ফিট দূরে। শ্যাফটের ওপরের অন্ধকার ভেদ করা এই ম্লান আলোর পক্ষে সম্ভব নয়। সে-আশা ছেড়ে দিয়ে ওর-উল্টো দিকে, শ্যাফটের দেয়ালে মনোযোগ দিলো ও। টর্চ ধরা হাতটা একদিক থেকে আরেক দিকে বারবার আনা-নেয়া করে বুঝতে চেষ্টা করলো দেয়ালের ধরন-ধারণ।

কাঁচের মতো মসৃণ দেয়াল, কোথাও একটু চিড় পর্যন্ত ধরেনি। শুধু একটা···ভালো করে দেখার জন্যে বুকের ঢিপ ঢিপ অগ্রাহ্য করে আরো এক ইঞ্চি ঝুঁকলো রানা··· দৃষ্টিসীমার ঠিক শেষ প্রান্তে অন্ধকারের ভেতর আরো গাঢ় একটা চিহ্ন, সরাসরি ঠিক ওর উল্টো দিকে, মাথা থেকে বেশ একটু ওপরে। চোখের ভুল, রঙের পার্থক্য, নাকি সত্যি একটা সরু ফাটল? নিশ্চিত করে বলা কঠিন, টর্চের আলো নিভে আসছে। বলা যায় না, হয়তো কিছুই নয়, স্রেফ আলো আর ছায়ার একটা চাতুরি।

'রানা?' ওর পিছন থেকে ডাকলো মাজুলেট। 'কি ব্যাপার?'

প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে সাবধানে সরে এলো রানা। টর্চ নিভিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় এই শ্যাফট বেয়ে উঠতে পারলে মাটির ওপর পৌঁছুতে পারবো।'

'কি বলছো! এই চিমনি বেয়ে?' মাজুলেটের গলায় অবিশ্বাস।

'ওখানে কোথাও বাদুড় আছে।'

'ওগুলোর মতো ডানা আছে তোমার? কতো উঁচু শ্যাফটটা, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

'জানি না। তবে মনে হচ্ছে উল্টো দিকে একটা ফাটল বা কার্ণিশ

আছে। ল্যাম্পটা জ্বালো, টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে এসেছে।

এবার ওরা দু'জনই প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে শ্যাফটের উল্টোদিকের দেয়াল পরীক্ষা করলো।

'কি মনে হচ্ছে?'

'কিছু একটা রয়েছে,' বললো মাজুলেট।

'ওখানে যদি পৌঁছুতে পারি...'

'পাগল নাকি! কিভাবে?'

'জানি না, আমাকে ভাবতে দাও...।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে পাশাপাশি বসলো ওরা, ওদের কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে।

খানিক পর মৃদু গলায় কথা বললো রানা, 'মইটা একজোড়া লম্বা বাঁশের পোলের সাথে ঝুলছে। সবচেয়ে লম্বা পোলটা যদি তুলে আনি, তোমার কি মনে হয়, উল্টোদিকের দেয়ালে পৌঁছুবে?'

'শ্যাওলা ধরা বাঁশ, শরীরের ভার সইতে পারবে বলে মনে হয় না। একটার কথা বলতে পারি, প্রায় পচে গেছে। শুধু একটা বাঁশ ফেলে তার ওপর দিয়ে তুমি যাবে কিভাবে?'

প্ল্যাটফর্মে দ্বিতীয় একটা আগুন জ্বাললো ওরা। কোমরে রশি নিয়ে আবার মইয়ের কাছে নামলো রানা। একটা পোল সত্যি পচে গেছে। দ্বিতীয়টা ওর কব্জির মতো সরু, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। নিচের দিকে এটারও পচন ধরেছে, তবে অক্ষত অংশ-টুকু লম্বায় ষোলো ফিটের মতো হবে। রশি দিয়ে বেঁধে পোলটাকে প্ল্যাটফর্মে তুলতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ওরা, সময় লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা।

পোলটাকে পরিষ্কার করা হলো। শ্যাওলা-মুক্ত করা সম্ভব হলেও,

পিচ্ছিল ভাব একটু থেকেই গেল। এরপর আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর পোলের একটা প্রান্ত ঠেকানো গেল ওদের উল্টোদিকে, শ্যাফটের দুর প্রান্তের দেয়ালের গায়ে। পোলের অপর প্রান্তটা থাকলো ওদের পিছনে টানেলের গায়ে। 'এবার পোলের ডগাটা আরো তুলতে হবে,' বিশ্রাম নিতে বসে বললো রানা। 'চেষ্টা করতে হবে ফাটলের মুখের কাছে যাতে পৌঁছায় ডগাটা—অবশ্য, সত্যি যদি ওটা ফাটল হয়।'

চেষ্টা করতে গিয়ে ওদের হাত ফস্কে দু'দু'বার পোলটা নিচের শ্যাফটে পড়ে যাবার উপক্রম করলো। ভাগ্যিস রশি দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল, প্রতিবার রশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পতনটা ঠেকালো ওরা। অবশেষে এতো খাটাখাটনি কাজে লাগলো, শ্যাফটের উল্টো-দিকের দেয়ালে, গাঢ় দাগটার মুখে পৌঁছুলো পোলের ডগা।

বাঁশের টুকরো ফেলে আগুনটাকে তাজা করলো সোহানা। বসলো সবাই, আগুনের আলোয় সদ্য সমাপ্ত কাজটা দেখলো।

শ্যাফটের ওপর এখন একটা ব্রিজ তৈরি করেছে ওরা। ব্রিজটা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেশ খাড়াভাবে উঠে গেছে, গোড়াটা আটকে আছে ওদের পিছনের দেয়ালে, আর ব্রিজের ডগা উল্টোদিকের দেয়ালের সরু ফাটলের ভেতর ঢুকে গেছে বেশ আঁটোসাঁটো ভাবে।

'এই ব্রিজ পেরোবে কে?' সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে বললো মিরাণ্ডা।

'শ্যাফটের ওপরে কি আছে?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'আগে পৌঁছুই, জেনে বলবো,' জবাব দিলো রানা।

'আমাকে যেতে দাও, রানা,' শান্তভাবে বললো মাজুলেট।

'রক ক্লাইম্বিঙের অভিজ্ঞতা আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো

রানা, মাজুলেট মাথা নাড়লো। 'তাহলে নামটা প্রত্যাহার করে নাও।'

'আমার আছে,' বললো সোহানা। 'আমাকে যেতে দাও। একা তুমি কতো ধকল সইবে?'

'দিতাম,' বললো রানা। 'কিন্তু গোড়ালিতে ব্যথা পেয়েছো তুমি।' সোহানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিলো রানা। 'আর কোনো কথা নয়। দু'ঘণ্টা বিশ্রাম—ঘুমাতে চেষ্টা করো সবাই।'

আসলে কেউই ওরা ঘুমাতে পারলো না। দু'ঘণ্টা পেরোবার আগেই রানার ডাকে উঠে পড়লো সবাই। ওর কোমরে রশি বাঁধলো মাজুলেট, পিঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জোড়া রশির একটা ফাঁস কাঁধে জড়িয়ে ফিরে এলো আবার, শেষ প্রান্তটা থাকলো মাজুলেটের হাতে। ক্যানভাস ছিঁড়ে কাঁধে একটা স্লিং বেঁধেছে রানা, স্লিঙের সাথে ঝুলছে টর্চটা। 'যদি পড়ে যেতে থাকি, পড়লাম বলে চিৎকার করবো,' ওদেরকে বললো ও। 'সাথে সাথে যেভাবে হোক রশিটাকে আটকাবে তোমরা।'

পোলের গোড়ার ওপর সোহানা আর মিরাণ্ডা চেপে বসলো, ওটা যাতে নড়াচড়া না করে।

পোলের ওপর বুক ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লো রানা, পা দুটো গভীর শ্যাফটের ওপর ঝুলছে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠে যাচ্ছে ও। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় দাঁড়িয়ে রশির লুপটা একটু একটু করে ছাড়ছে মাজুলেট।

কয়েক ফিট এগিয়ে রানার মনে হলো, ওপর দিকে বড় বেশি খাড়াভাবে উঠে গেছে পোল। পোলের গায়ে পায়ের আঙুল বাধিয়ে

চাপ দিতে হচ্ছে, একটু একটু করে ঠেলে তুলতে হচ্ছে শরীরটা। আগুনের আলো পিছিয়ে পড়লো দ্রুত, নিচের কালো শূন্যতা যেন বিশাল হাঁ করে আছে গ্রাস করার জন্যে। নিচের দিকে দ্বিতীয়বার আর তাকালো না ও। ওর ভারে পোলটা নিচের দিকে বেঁকে যেতে শুরু করলো, মাথার ওপর থেকে পাথরের পাতলা কিনারা ভাঙার মুট মুট আওয়াজ ভেসে এলো—ফাটলের ঠোঁটের সাথে পোলের ডগা ঘষা খাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত শ্যাফটের ঠাণ্ডা লাইমস্টোন-দেয়াল ছুঁতে পারলো ও।

দেয়ালের গা হাতড়ে ফাটলটা খুঁজলো রানা। ওটা আঙুলে ধরা পড়তে পরম স্বস্তি বোধ করলো ও। শ্যাফটের দেয়াল বেয়ে খাড়া উঠে গেছে, বাইরের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের কাছ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে, পোলের মাথাটা কোনো রকমে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। তারপর যতোই গভীর হয়েছে ফাটল, ততোই সরু হয়েছে চওড়ায়।

'হ্যাঁ, একটা ফাটল আছে,' ওদেরকে বললো রানা। 'চেষ্টা করে দেখি ওপরে ওঠা যায় কিনা।'

'রানা,' কেঁপে গেল সোহানার গলা, 'সাবধান!'

বাঁ হাতটা যতোটা সম্ভব উঁচু করে বাড়িয়ে দিলো রানা, ভাঁজ করা আঙুল সহ হাতটা সজোরে ঢুকিয়ে দিলো ফাটলের যতোটা ভেতরে সম্ভব। তারপর শক্ত মুঠো পাকালো হাতটা, আকৃতি বদলের সাথে সাথে ফুলে উঠলো ওটা, কঠিন ভাবে আটকে গেল ফাটলের ভেতর—এখন এই হাতের ওপর শরীরের ভার চাপাতে পারবে ও।

পোল ব্রিজের ওপর বসার ভঙ্গিতে নিজেকে তুলে আনলো রানা, একটা হাঁটু উঠে এলো বুকের কাছে। মুক্ত হাত ফাটলের আরো

একটু ওপরে ঢোকালো ও, এটাও প্রথমটার মতো ভেতরে শক্তভাবে আটকে গেল। এবার দু'হাতের ওপর শরীরের ভার চাপিয়ে পোলের ওপর দাঁড়াতে শুরু করলো ধীরে ধীরে।

দেয়ালের দিকে মুখ করে পোলের ওপর দাঁড়ালো রানা। নিচের হাতের মুঠো ঢিল করে দিতেই ফাটলের ভেতর থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এলো সেটা। হাতটা যতোটা সম্ভব ওপরে তুললো, তারপর আবার ঢোকালো ফাটলের ভেতর, ভেতরে আবার সেটা আটকালো। পোল থেকে সাবধানে একটা পা তুললো ও, খালি পায়ের পাঁচটা আঙুল ফাটলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাটাও তুলে নিলো পোল থেকে।

পোল ছেড়ে দেয়ালে চলে এসেছে রানা। দুই হাত আর একটা পা ফাটলের ভেতর আটকে নিয়ে ঝুলে আছে ও। দ্বিতীয় পাটা প্রথম পায়ের হাঁটুর কাছে তুলে, সেটাও ফাটলের ভেতর ঢোকালো, ফাটল থেকে বের করে আনলো নিচের হাত, তারপর দ্বিতীয় পায়ের ওপর শরীরের ভার চাপিয়ে নিয়ে উঁচু হলো খানিকটা। এভাবে পালা করে হাত আর পায়ের সাহায্যে উঠতে শুরু করলো ও।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতর চলে এসেছে রানা। শুধু স্পর্শ দিয়ে পাথরের দেয়াল আর ফাটলটা অনুভব করছে, নিচের গভীর শূন্যতা যেন কালো জিভ বের করে চাটছে ওর পায়ের তলা।

প্রতিবার আঠারো ইঞ্চির মতো উঠছে, এভাবে মোট কতোবার উঠলো গুণে রাখছে। চল্লিশ ফিটের মতো উঠেছে, এই সময় ফাটলটা চওড়া হতে শুরু করলো। শক্তভাবে আটকাবার জন্যে হাত আর পা আরো অনেক গভীরে ঢোকাতে হলো ওকে, ফলে প্রতিটি পদক্ষেপ আগের চেয়ে ছোটো হয়ে এলো, হাত পায়ের ওপর চাপও

পড়ছে এখন অনেক বেশি।

পাথরের ভেতর বারবার হাত ঢুকিয়ে মুঠো পাকানোয় চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো, নতুন করে ঢোকাতে গিয়ে অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো রানা। হাত-পা আর উরুর পেশীতে অনভ্যস্ত চাপ পড়ছে, ফলে লাফাতে শুরু করলো ওগুলো।

আর এগোনো সম্ভব নয়। বিশ্রাম দরকার ওর।

'রানা, থামলে কেন ?' রশি স্থির হয়ে আছে, ওরা সবাই উদ্বিগ্ন।

'রানা,' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলো সোহানা, 'তোমার সাহায্য দরকার ?'

'না।' পাথরে মুখ ঘষলো রানা, চোখে ঘাম পড়ায় অস্বস্তি বোধ করছে। আবার উঠতে শুরু করলো ও। ফাটলের ভেতর প্রতিবার হাত ঢোকাবার সময় ফোঁপাচ্ছে, শরীরের ভার নিয়ে থরথর কাঁপছে উরু।

আরো দশ ফিট এগোলো ও। মনে হলো, আর পারবে না। আরো উঠতে চেষ্টা করলে মারা পড়বে, পিছলে পড়ে যাবে নিচের কালো গহ্বরে। আবার থামলো ও, আবার উঠলো। বিশ ফিট। একুশ, বাইশ ফিট। ডান হাতটা তুলে দিলো মাথার ওপর···কিছু নেই, সব ফাঁকা।

উন্মাদের মতো হাতড়ালো রানা, কিন্তু দেয়াল বা ফাটলটা পেলো না। তারপর পাথরের সাথে বাড়ি খেলো হাতের উল্টোপিঠ—ফাটলটা অকস্মাৎ চওড়া হতে শুরু করে ইংরেজী ভি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে, একজন মানুষ অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

'থ্যাঙ্ক গড!' চওড়া খোপের ভেতর উঠে এলো রানা, খোপের

ভেতর নিতম্ব আর কাঁধ ঠেকিয়ে স্থির হলো, রক্তাক্ত হাত ছুটো বুকের কাছে তুলে ঘন ঘন ফুঁ দিলো।

'রানা!' অনেক নিচ থেকে মাজুলেটের চিৎকার ভেসে এলো।

'সব ঠিক আছে,' উত্তর দিলো রানা। 'ফাটলটা এখানে চওড়া হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিতে দাও।' জানে, বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারবে না, ক্ষত-বিক্ষত হাত ছুটো অসাড় হয়ে গিয়ে অকেজো হয়ে যাবে। বিশ্রামের সময়টুকু আঙুলগুলো বারবার ভাঁজ করলো ও। 'আবার উঠছি।'

খোপের ছ'ধারে হাতের তালু রেখে উঠতে শুরু করলো রানা শ্যাফটের দিকে মুখ করে। খোপের ওপরের অংশ আরো দ্রুত চওড়া হতে থাকলো, এক সময় লম্বা করে দেয়া হাত ছুটো পুরোটা বিস্তারের নাগাল পেলো না। পাশ ফিরতে হলো ওকে, একপাশে ঠেকাতে হলো কাঁধ, আরেক পাশে পা, পাথরের গায়ে কাঁধ ঘষে ঘষে প্রতিবার এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে উঠতে হলো। এরপর আবার সরু হতে শুরু করলো খোপ আবার সেই আগের আকৃতি ফিরে পেয়ে ফাটলে পরিণত হলো, ছুই ঠোঁট পরস্পরের কাছ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে। দেয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়লো রানা। ওপর দিকে আরো সরু হয়ে গেছে ওটা, একটা আঙুল পর্যন্ত ভেতরে ঢুকবে না।

শ্যাফটের দেয়ালে হাত বুলালো রানা। কাঁচের মতো মসৃণ লাইমস্টোন, একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই কোথাও।

'পণ্ডশ্রম!' বিড়বিড় করে বললো ও, কপাল থেকে গড়িয়ে নেমে ঠোঁটের কোণ দিয়ে খোলা মুখে ঢুকছে ঘামের ধারা। হঠাৎ করেই ব্যথায় কাতর সারা শরীর নিঃশব্দ চিৎকার জুড়ে দিলো যেন, মনে

হলো প্রচণ্ড ক্লান্তির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে সে। ফাটল বেয়ে আবার নিচে নামার শক্তি নেই ওর, এখানে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঝুলে থাকার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার, চমকে উঠে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলো রানা। মাথার ওপর থেকে এলো আওয়াজটা, একটা বাদুড় ডেকে উঠলো। শরীরের ভার নিয়ে পা দুটো থরথর করে কাঁপছে, তবু পাথরের গায়ে পিঠ ঘষে ঘষে খোপের বাইরের দিকের কিনারায় সরে এলো রানা। বাদুড়টা আবার কিচকিচ করে উঠলো, এবার সাড়া দিলো কয়েক শো বাদুড়। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সকাল হয়ে গেছে, ওপরে কোথাও নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসছে ওগুলো।

খোপের কিনারায় নিজেকে স্থির করলো রানা, বাইরের দিকের হাতটা মুক্ত রাখলো। ক্যানভাস স্লিং থেকে টর্চটা নিয়ে খোলা শ্যাফটের দিকে বাড়িয়ে দিলো হাত। ঘাড় বাঁকা করে ওপর দিকে মুখ তুললো ও, তারপর বুকের ভেতরের ধড়াস ধড়াস আওয়াজটাকে অগ্রাহ্য করে কিনারার দিকে আরো সরতে লাগলো, যতোক্ষণ না শুধু কাঁধের প্রান্তটুকু ঠেকে থাকলো খোপের শেষ সীমানায়।

খোপের তীক্ষ্ণ কোণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে রানার মাথা, ওপর আর নিচে অন্ধকার শ্যাফট। টর্চের বোতামে চাপ দিলো ও, সাথে সাথে সন্ত্রস্ত বাদুড়ের দল একযোগে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। রানার মাথা থেকে তিন ফিট উঁচুতে, ওর নাগালের বাইরে, পাথুরে দেয়ালে একটা জানালা রয়েছে, ওই জানালা পথেই আসছে বাদুড়গুলোর চেঁচামেচি। হাত বাড়ালো রানা, কিন্তু জানালার কার্ণিশ থেকে বারো ইঞ্চি দূরে থাকলো ওর আঙুল।

এক চুল এক চুল করে আঙুলগুলো বাড়াবার চেষ্টা করলো ও,

এই সময় নিভে গেল টর্চ। নিকষ কালো অন্ধকারে খোপের ভেতরে পিছিয়ে এলো রানা।

রাগে আর হতাশায় স্লিং থেকে ছিঁড়ে টর্চটা ফেলে দিলো রানা, শ্যাফটের দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে দ্রুত নেমে গেল সেটা, প্রতিটি আওয়াজ আগেরটার চেয়ে অস্পষ্ট শোনালো, এক সময় আর কোনো আওয়াজ এলো না। তারপর শোনা গেল মৃদু ছলাৎ শব্দ। নিচের পানিতে পড়লো ওটা।

'রানা!'

'টর্চটা ফেলে দিয়েছি।'

অন্ধকারে আরেকবার মাথার ওপর জানালাটার নাগাল পাবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো। ভি আকৃতির খোপ, আর ফাটল যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে ফিরে এসে থামলো ও।

'কি করছো তুমি, রানা?'

'করার কিছু নেই আর,' চিৎকার করে বললো রানা। 'আমরা শেষ, যদি না...'

'যদি না, কি?'

'যদি না তোমরা কেউ এখানে এসে আমাকে সাহায্য করো।'

নিচের অন্ধকার থেকে ওরা কেউ কথা বললো না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো মাজুলেট। 'আমি আসছি।'

'অসম্ভব। তুমি ভারি, তোমাকে আমি টেনে তুলতে পারবো না।'

আবার চুপ করে থাকলো ওরা, তারপর সোহানার গলা শোনা গেল, 'বলো কি করতে হবে।'

'রশির গোড়াটা দিয়ে নিজেকে বাঁধো, বো-লাইন নট ব্যবহার

করো।'

'ঠিক আছে।'

'এবার পোলের ওপর দিয়ে উঠে এসো।' উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে সোহানাকে দেখতে পেলো রানা, আগুনের আভার মধ্যে তার দেহ-কাঠামো ফুটে রয়েছে। রশিটা ঢিল হতে দিলো না রানা, সোহানা পড়ে গেলে ওকে টেনে রাখার জন্যে তৈরি হয়ে আছে ও।

'পোল পেরিয়ে এসেছি।'

'ফাটলটা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমি টেনে তুলবো। তবে ফাটলে পা বাধিয়ে শরীরটা ওপর দিকে তোলার চেষ্টা করতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'রেডি।'

সোহানা অনুভব করলো, তার শরীরের সমস্ত ভার টেনে নিয়েছে রশিটা, কাঁধের মাংসে ডেবে গেছে।

'ওঠো।' চিৎকার করলো রানা, ভারটা হালকা হতে রশির ঢিলটুকু টেনে নিলো ও।

'ওঠো।' আরো চার ইঞ্চি ওপরে উঠলো সোহানা।

'ওঠো।' সোহানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে চিৎকারটা বাজছে তার কানে, এই উঠে যাবার যেন কোনো শেষ নেই। এরপর হঠাৎ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে হড় হড় করে নেমে গেল রশি, চামড়া কেটে মাংসের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিলো যেন। একটা ঝাঁকি লাগলো, খোপ থেকে

প্রায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলো শরীরটা।

পিচ্ছিল নাইলন ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলো রানা, জানে, ওর আঙুলের ডগায় ঝুলছে সোহানার জীবন-মৃত্যু। তালুর ছাল উঠে গেল, ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠলো রানা। সোহানা এখনো চিৎকার করছে, তবে রানার হাতের মুঠোর ভেতর স্থির হয়ে গেছে রশি। পেণ্ডুলামের মতো শ্যাফটের দেয়ালের সামনে দুলছে সোহানা, রশির শেষ প্রান্তে।

'চুপ করো।' গর্জে উঠলো রানা। 'শান্ত করো নিজেকে।'

সোহানা থামলো, ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে এলো দোলার বিস্তার। 'ফাটল থেকে ফসকে গেছে পা।' কান্নায় বুজে এলো তার গলা।

'ফাটলটা আবার খুঁজে নিতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ফাটলে পা ঢোকাতে পারলে আমাকে জানাও।'

'আমি রেডি।'

'ওঠো।' আবার শুরু হলো। রানা ভাবলো, এই যন্ত্রণা শেষ হবে কখন? তারপর এক সময় সোহানার হাত নাগালের মধ্যে চলে এলো। 'গেছো মেয়ে,' ফিস ফিস করে বললো ও, 'এই তো পেরেছো।' খোপে, ওর নিচে সোহানার জন্যে খানিকটা জায়গা তৈরি করলো ও, সেখানে উঠে আসতে সাহায্য করলো তাকে। খোপের ভেতর কিভাবে শরীরটা আটকাতে হবে দেখিয়ে দিলো।

'এতো জোরে চাপ দিচ্ছো কেন, লাগছে।' বললো সোহানা, তার কাঁধ ধরা হাতটা একটু আলগা করলো রানা। 'এর বেশি আমি উঠতে পারবো না।'

'বাকিটুকু সহজ।' জানালার কথা বলবে না সোহানাকে—এখুনি নয়। 'শুনতে পাচ্ছো কিছু?' তাকে খুশি করার চেষ্টা করলো ও। 'বাদুড়। কাছেই কোথাও সারফেস, খুব কাছে। রোদের কথা ভাবো, তাজা বাতাস পাবে···।'

'ঠিক আছে, আমি রেডি,' অবশেষে বললো সোহানা। খোপের আরো ওপরে তাকে তুলে আনলো রানা।

খোপটা এখানে যথেষ্ট চওড়া, ইচ্ছে করলে একজন আরেকজনকে পাশ কাটাতে পারে। সোহানাকে সাহায্য করলো রানা, রানাকে ছাড়িয়ে একটু ওপরে উঠলো সোহানা।

'কিন্তু রানা! খোপটা সরু হতে হতে···একি, এ যে আঙুলের মতো হয়ে গেছে! তাহলে?'

'অমন কাঁপছো কেন?' ধমক দিলো রানা। 'শান্ত হও। হতাশ হবার কিছু নেই। ঠিক তোমার মাথার ওপর একটা জানালা আছে, খোপের কিনারার ঠিক বাইরে। এক কি দু'ফিট দূরে···।'

'আমি নাগাল পাবো না।'

'পাবে না মানে? পেতেই হবে। শোনো, আমার ওপর দাঁড়াবে তুমি···প্রথমে বসবে, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াবে—খোপের দু'দিকে পা আর হাত রেখে একটা ব্রিজ তৈরি করবো। কি, বুদ্ধিটা কেমন?'

'রিস্কি, রানা!' আঁতকে উঠলো সোহানা। 'আমার ভার তুমি সইতে পারবে না। দু'জনেই আমরা পড়ে যাবো···।'

'অবলা নারী, তোমার ভার আমি সইতে পারবো না! এ-কথা বলার স্পর্ধা হলো তোমার!'

কিন্তু আতংকিত সোহানাকে রানার কৌতুক স্পর্শ করলো না।

অস্ফুটে বললো সে, 'না, আমি পারবো না।'

'ট্রেনিং ভুলে গেছো?' তিরস্কার করলো রানা। 'বেশ, চলো তাহলে, নিচে নামি। কিন্তু মনে রেখো, দ্বিতীয়বার আর আমার পক্ষে এখানে ওঠা সম্ভব হবে না। আর, বাইরে বেরোবার এটাই একমাত্র পথ। যদি নামো, মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নামতে হবে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর শান্ত গলায় বললো সোহানা, 'ঠিক আছে। কিন্তু প্লিজ রানা, প্লিজ! আরেকবার ভেবে দেখো।'

জবাব না দিয়ে সোহানার নিচে নিজেকে তুললো রানা, সোহানার ঝুলে পড়া নিতম্ব ঠেকলো ওর তলপেটে। খোপের একদিকের দেয়ালে পা জোড়া আটকালো ও, আরেকদিকে দেয়ালে চেপে থাকলো ঘাড় সহ কাঁধ, সোহানার নিচে একটা ব্রিজে পরিণত হয়েছে শরীরটা।

'আস্তে আস্তে ঢিল দাও শরীরটা, আমার তলপেটে বসো।'

'রানা, আমি খুব ভারি...!' ফুঁপিয়ে উঠলো সোহানা, 'খুবই কষ্ট হবে তোমার!'

কাঁধের পেশী আপনা থেকেই ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। 'বসো!'

সোহানার ভার চাপলো ওর তলপেটে, কাঁধ আর পায়ের পেশী যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলো। চোখে শর্ষে ফুল দেখছে রানা। 'এবার দাঁড়াও।'

রানার পেটে হাঁটু গাড়লো সোহানা, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করলো রানা। গুঙিয়ে উঠে বললো, 'জলদি দাঁড়াও।'

সোহানার পা কাঁপছে, রানার নরম তলপেটে ডেবে গেল তার

গোড়ালি।

'মাথার ওপর দেয়াল পেয়েছো? হাত উঁচু করো! খোঁজো।'

'রানা, এখানে...একটা গর্ত।'

'জানালা। উঠতে পারবে?'

কোনো উত্তর এলো না। ডান পা থেকে বাঁ পায়ে শরীরের ভার চাপালো সোহানা, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল রানার চেহারা, ফোঁপাতে শুরু করলো ও। সোহানার বাঁ পা প্রচণ্ড চাপ দিলো পেটে, তারপর পেট ছেড়ে উঠে পড়লো শূন্যে। পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা, শ্যাফটের দেয়ালে ঘষা খাচ্ছে সোহানার পা। রশিটা দুলছে, রানার গায়ে সুড়সুড়ি লাগছে।

'রানা, এখানে একটা শেলফ রয়েছে।' সোহানার গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এলো, আনন্দে কেঁদে ফেলেছে সে।

'রশিটা কোথাও বাঁধতে পারো?'

এক মিনিট পেরোলো, তারপর আরো এক মিনিট। কাঁধ আর পায়ের ওপর শরীরটাকে রানা ধরে রাখতে পারছে না আর।

'বেঁধেছি।'

রশিটা টানলো রানা, শক্তভাবে আটকেছে। একটা লুপ তৈরি করে তার ভেতর কব্জি ঢোকালো ও, তারপর খোপের গা থেকে নামিয়ে নিলো পা দুটো। একটা দোল খেয়ে খোপ থেকে বেরিয়ে এলো ও, খোলা শ্যাফটের ওপর ঝুলতে লাগলো। রশি বেয়ে উঠতে শুরু করলো, পাথরের জানালার কার্নিশ ধরে সেটা টপকালো, ওকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিলো সোহানা। কথা বলার শক্তি নেই, শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে রানাও তেমনি সোহানাকে আঁকড়ে ধরে থাকলো।

'তোমরা ওখানে করছো কি ?' ধৈর্য রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠলো মাজুলেট।

'আরেকটা পথ পাওয়া গেছে,' বললো রানা। 'এটা নিশ্চয়ই কোথাও দিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। বাদুড় রয়েছে এখানে।'

'আমরা কি করবো ?'

'রশিটা নামিয়ে দিচ্ছি। এতে একটা লূপ থাকছে। প্রথমে মিরাণ্ডা পোলটা পেরিয়ে এসে লূপের ভেতর ঢুকতে হবে। তারপর আমরা দু'জন টেনে নেবো ওকে।

মিরাণ্ডা হালকা, তাকে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। অসুবিধে হলো মাজুলেটকে নিয়ে।

জানালার মুখে বসেছে রানা, ওর পিছনে সোহানা আর মিরাণ্ডা। টাগ অভ ওঅরের ভঙ্গিতে রানার বগলের তলা দিয়ে রশিটা পিছনে চলে গেছে, সোহানার বগলের নিচে দিয়ে পৌঁচেছে মিরাণ্ডার হাতে। অপরপ্রান্তে একটা লূপ, লূপে আটকানো রয়েছে মাজুলেট। তাকে খোপ পর্যন্ত টেনে তুলতে হাঁপিয়ে গেল ওরা, ওর পিছনে মেয়েরা ফোঁপাচ্ছে শুনতে পেয়ে রানা মাজুলেটকে জিজ্ঞেস করলো, 'খোপের ভেতর নিজেকে আটকাতে পারবে, কিছুক্ষণ ? আমরা একটু বিশ্রাম নিতাম ?'

রানা অনুভব করলো, ঢিল পড়লো রশিতে। একটা স্তূপের আকৃতি নিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলো ওরা।

'ঠিক আছে, ওঠো আবার,' পাঁচ মিনিট পর বললো রানা। এবার যেন আরো ভারি মনে হলো মাজুলেটকে, তবে শেষ পর্যন্ত জানালার কার্ণিশ টপকে উঠে এলো সে। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা ফুটলো না।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠে নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা। 'হীরের কথা ভুলে গেছি আমরা।'

হলদেটে আলো জ্বলে উঠলো। 'পেন্সিল টর্চ,' মাজুলেটের কয়লার মতো কালো মুখে দাঁতগুলো দুধের মতো সাদা দেখাচ্ছে, হাসছে সে। 'বিপদের সময় কাজে লাগবে মনে করে পকেটে গুঁজে রেখেছিলাম এটা।' পেন্সিল টর্চের আলোয় দেখা গেল হীরে ভরা ক্যানভাস ব্যাগটা তার কোলের কাছে পড়ে রয়েছে।

'বাহ্!' স্বস্তিবোধ করলো রানা। 'তোমার পেন্সিল টর্চের ব্যাটারিও বেশিক্ষণ টিকবে না, তাড়াতাড়ি নেভাও।'

টর্চটা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করলো ওরা, দু'চার সেকেণ্ডের জন্যে জ্বেলে আবার নিভিয়ে ফেললো। প্রথম বার আলো জ্বেলে ওরা দেখলো, নিচু ছাদের একটা গুহার গায়ে প্রকৃতি নিজের হাতে তৈরি করেছে প্রায় চৌকো জানালাটা। গুহাটা এতো চওড়া যে দু'পাশের দেয়াল কতোদূরে টের পাওয়া গেল না। ছাদের গায়ে সার সার অসংখ্য বাদুড় উল্টো হয়ে ঝুলছে, শুকনো আর নরম বিষ্ঠায় ঢাকা পড়ে আছে মেঝেটা।

মাঝে মধ্যে টর্চ জ্বাললো মাজুলেট, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দলটাকে। সবার পিছনে রানা, কুণ্ডলী পাকানো রশির বোঝাটা ওর কাঁধে। পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা, অন্ধকারে যোগাযোগ রাখার এটাই একমাত্র উপায়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোলো দলটা।

ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করলো মেঝে, সেই সাথে নিচু হলো ছাদ।

'থামুন!' বললো সোহানা। 'আর টর্চ জ্বালবেন না!'

'কি ব্যাপার?'

'সামনে—ঢালের ওপর। আমি কি ভুল দেখছি?'

অন্ধকার একরকম হয় না। সামনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানার মনে হলো, ঢালের ওপর একটা জায়গা যেন একটু কম কালো। 'আলো! ওপরে কোথাও বোধহয় আলো আছে!'

আবার এগোলো দলটা, ব্যস্ত হয়ে ওঠায় পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো, পিঠে ঠেলা খেয়ে আরো দ্রুত ছুটলো। সামনের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে দেখে হাসতে শুরু করলো ওরা। লম্বা হলো আলোটা, উজ্জ্বল হলো, পরস্পরের কাঠামো দেখতে পেলো ওরা। ধুলো ঢাকা নরম ঢালু মেঝে বেয়ে ওপরে উঠছে, আর পাগলের মতো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে একে অপরের গায়ে।

ক্রমশ আরো নিচু হলো ছাদ, মেঝেতে হাঁটু দিয়ে এগোতে হলো ওদেরকে, তারপর একেবারে শুয়ে পড়তে হলো, ক্রল করে এগোলো সবাই। সামনে সরু একটা আলোর রেখা দেখা গেল, ছুরির ফলার মতো। হাত তুলে চোখ চাপা দিলো ওরা।

শুকনো ধুলো উড়ছে মেঝে থেকে, খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করলো। রানা দেখলো, লজ্জা ভুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিরাণ্ডা, নতুন জীবন ফিরে পাবার আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। মাজুলেটের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ উল্টো, এ কান ও কান হাসছে সে।

সরু ফাঁকটা গলে বেরিয়ে যাবে মাজুলেট, ডাইভ দিয়ে পড়লো রানা, খপ করে তার পা ধরে ফেললো। 'থামো মাজুলেট, সাবধান!'

পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো মাজুলেট, ক্রল করে আরো এগোতে চায়, কিন্তু রানা তাকে ছাড়লো না।

'শোনা!' বললো রানা। 'বাইরে শোনারা আছে!'

মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল ওরা, সবাই চুপ। টানেলের ঠিক মুখে শুয়ে থাকলো দলটা, হাসি আর আনন্দ এক নিমেষে উধাও হয়েছে।

'রানা আর আমি বাইরেটা দেখে আসবো,' বললো মাজুলেট। ধুলোর ওপর হাত বুলিয়ে কয়েকটা পাথর পেলো সে, রানার হাতে গুঁজে দিলো একটা, বাস্কেট বলের চেয়ে একটু হয়তো বড়ই হবে। 'এরচেয়ে ভালো অস্ত্র আমার কাছে নেই আর।'

এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে মুখে-হাতে ঘষলো রানা, কালো করে নিলো চেহারা। রশির বোঝাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাজুলেটের পাশে চলে এলো। শেষ কয়েক ফিট ক্রল করে প্রবেশ-মুখে পৌঁছুলো ওরা। ওদের সামনে ফাঁকটা আঠারো ইঞ্চির মতো উঁচু, চওড়ায় কয়েক ফিট, ফাঁকের সামনে ছ'ফিট উঁচু ঘাস-বন। পুব দিকে মুখ করে রয়েছে ওরা, সকালের প্রথম রোদ ঘাসের ভেতর দিয়ে সরাসরি ফাঁকের সামনে এসে পড়েছে। ক'টা দিন অন্ধকারে থাকায় উজ্জ্বল রোদে ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ।

চোখে সয়ে এলো আলো, সাপের মতো নিঃশব্দে এগোলো মাজু-লেট। অপেক্ষা করলো রানা, পঞ্চাশ পর্যন্ত গোণা শেষ করে অনুসরণ করলো তাকে। পাহাড়ের ঢালে বেরিয়ে এলো ওরা, পিছনে মাথা-চাড়া দিয়ে আছে চূড়া, ঢালের গায়ে লাইমস্টোনের পুরু স্তর বাঁধের মতো চূড়ার দিকে উঠে গেছে। ছয় ফিট উঁচু ঘাস আর ঘন ঝোপে ঢাকা পড়ে আছে গোটা ঢাল, ঘন গাছপালায় ছাওয়া নিচের সেই উপত্যকা পর্যন্ত। সকালের রোদ এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে, ঘামতে শুরু করলো ওরা।

ওর খানিক নিচে শুয়ে আছে মাজুলেট, হাত নেড়ে সংকেত দিলো

সে, 'আমার বাঁ দিকটা কাভার দাও।'

সাবধানে সরে এসে পজিশন নিলো রানা, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে এগোলো।

'সার্চ!' আরেকটা সংকেত দিলো মাজুলেট। দশ মিনিট ধরে নিচের ঢাল, দু'পাশ, আর মাথার ওপর পাহাড় তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করলো, ওরা। প্রতি ইঞ্চি মাটি, পাথর, ঘাস, আর ঝোপের ওপর চোখ বুলালো।

'অল ক্লিয়ার!' রানার কাছ থেকে সংকেত পেয়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ের কাঁধের দিকে নামতে শুরু করলো মাজুলেট। রানা তার পিছনে আর ওপরে থাকলো, কাভার দিচ্ছে তাকে।

ওদের দিকে একটা পাখি উড়ে এলো। অস্বাভাবিক লম্বা হলুদ ঠোঁট, হর্ণবিল। মাজুলেটের ঠিক সামনে আর নিচে একটা ঝোপের ভেতর বসলো সেটা, সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু প্রায় সেই মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ, কর্কশ একটা ডাক ছেড়ে, ঝটপট ঝটপট ডানা ঝাপটে উঠে পড়লো শূন্যে, দ্বিতীয় আরেকটা ডাক ছেড়ে দ্রুত চলে গেল উড়ে।

'বিপদ!' জরুরী সংকেত পাঠালো মাজুলেট, স্থির হয়ে গেল ওরা।

এগারো

একগাদা পাথর, লম্বা ঘাস, আর ঘন কাঁটাঝোপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো রানা, বুঝতে চাইছে পাখিটা হঠাৎ অমন করে পালালো কেন।

কি যেন নড়লো, চোখে ধরা পড়ে কি পড়ে না, কিন্তু এতো কাছে যে দিয়াশলাইয়ের গায়ে কাঠি ঘষার আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেলো রানা। ঝোপের মাথায় সাদাটে একটু ধোঁয়া দেখা গেল, বারুদের গন্ধ ঢুকলো নাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলেই এবার স্টীল হেলমে-টের আকৃতিটা ধরা পড়লো চোখে, ক্যামোফ্লেজ নেটে ঢাকা। লোকটা আবার সিগারেট টান দেয়ায় হেলমেটটা একটু নড়লো।

এতোক্ষণে গোটা ব্যাপারটা দেখতে পেলো রানা। ক্যামোফ্লেজ স্মক পরা লোকটা তেপায়ার ওপর বসানো হালকা একটা মেশিন-গানের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, ফালি করা খাকি কাপড় দিয়ে মোড়া রয়েছে মেশিনগানের ব্যারেল।

'ক'জন?' সংকেতের মাধ্যমে প্রশ্ন করলো মাজুলেট, ঠিক তখুনি দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পেলো রানা। কাঁটাঝোপের গায়ে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে, চিতার নকশা ছাপা ক্যামোফ্লেজ ড্রেসের সাথে

তার মাথায় পড়া ঝোপের ছায়া হুবহু মিলে গেছে। লোকটা দশাসই, খালি মাথা, পাশে পড়ে রয়েছে একটা উজি মেশিনগান।

সংকেত দিতে যাচ্ছিলো রানা—দু'জন—এই সময় লোকটা তার বুক পকেট থেকে তোবড়ানো একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাতটা লম্বা করে দিলো। আরেকটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে রয়েছে তৃতীয় লোকটা, হাত বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট নিলো সে। একটা নিজের ঠোঁটের মাঝখানে রাখলো, দ্বিতীয়টা ছুঁড়ে দিলো আরেক দিকে। একটা গড়ান দিয়ে ঘাসের বাইরে বেরিয়ে এলো চার নম্বর শোনা।

'চার,' সংকেত দিলো রানা।

এটা একটা মেশিনগান পোস্ট, পাহাড়ের কাঁধের ওপর চমৎকার পজিশনে বসানো হয়েছে নিচের ঢাল কাভার দেয়ার জন্যে। পাতাল থেকে বেরুবার একাধিক রাস্তা থাকতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তাটা খেলে গেছে জেনারেল উমাঙ্গোর মাথায়। গোটা পাহাড়ে এরকম মেশিনগান পোস্ট আরো নিশ্চয়ই অনেকগুলো আছে। গানার লোকটা নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গীরা একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে শুয়ে-বসে রয়েছে। কারো ভাব-ভঙ্গিতেই কোনো রকম সতর্ক ভাব নেই। শিকার বেরুবে এই অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

ওদের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল সোহানা, টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। রানা আর মাজুলেটকে নিঃসাড় পড়ে থাকতে দেখে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিলো, নিঃশব্দে ক্রল করে নেমে এলো রানার পাশে। তার চোখে প্রশ্ন লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে সামনেটা দেখিয়ে দিলো রানা, একটা আঙুল রাখলো নিজের ঠোঁটে।

'আক্রমণের জন্যে পজিশন নাও,' সংকেত দিলো মাজুলেট। ক্রল করে পিছু হটছে সে।

এতো কাছে ওরা, গানার ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাতে থুথুতে ভেজা অংশটুকু পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা। ছোট্ট জায়গাটা আবর্জনায় ভরে আছে—খালি কাগজের মোড়ক, ঢাকনি-খোলা ফুড ক্যান, সিগারেটের টুকরো, চকলেটের তোবড়ানো বাক্স। আগ্নেয়াস্ত্র-গুলো অযত্নের সাথে পড়ে আছে আশপাশে। মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে থাকা লোকটার ঠোঁটে মোমবাতির মতো খাড়া হয়ে রয়েছে সাদা সিগারেট, চোখে একটা হাত চাপা দিয়ে রয়েছে সে। কাঁটা-ঝোপের দিকে পিছন ফিরে বসা লোকটা ট্রেঞ্চনাইফ দিয়ে গাছের একটা ডাল চেঁছে সরু করছে। তৃতীয় লোকটা শার্টের বোতাম খুলে গভীর মনোযোগের সাথে বুকের লোমের ভেতর উকুন খুঁজছে। শুধু মেশিনগানের পিছনে দাঁড়ানো লোকটাকে একটু সতর্ক মনে হলো।

সোহানার ডান পাশে রানা, বাঁ পাশে উঠে এলো মাজুলেট।

'রেডি?' একটা হাত দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করলো মাজু-লেট।

'রেডি।'

হাত তুললো মাজুলেট, তারপর ঝট্ করে হাতটা নামালো, এই সংকেতের অর্থ—কিল দেম!

তিনজন একসাথে ডাইভ দিয়ে পড়লো ওরা। শেষ কয়েক ফিট ঢাল গড়িয়ে পেরিয়ে এলো রানা, হাতের গোল পাথরটা সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠুকে দিলো ছুরি ধরা লোকটার চাঁদিতে। পরিষ্কার অনুভব করলো, খুলি ফেটে ডেবে গেল নিচের দিকে।

কোনো শব্দ না করে সামনের দিকে ঢলে পড়লো সার্জেন্ট, একই

সময়ে পিছনে মৃদু ধস্তাধস্তির আওয়াজ ঢুকলো রানার কানে। বুঝলো মেশিনগানারকে কাবু করার চেষ্টা করছে মাজুলেট, কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে উকুন বিদ্বেষী শোনাটার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো ও।

গানার দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকে নিয়ে দড়াম করে ঘাসের কিনারায়, পাথরের ওপর পড়লো মাজুলেট। তখুনি উঠে দাঁড়ালো সে, গানারের নিতম্বের ওপর একটা হাঁটু গাড়লো, তার গলাটা দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো ওপর দিকে। চিৎকার করার কোনো অবকাশই পেলো না গানার, মট আওয়াজের সাথে ভেঙে গেল তার শিরদাঁড়া।

ঢাল গড়িয়ে নেমে এসে এক সেকেণ্ডের জন্যে ইতস্তত করলো সোহানা, কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক বুঝতে পারলো না। পরমুহূর্তে মাটি থেকে একটা উজি ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সে, কক্ করলো। শুয়ে থাকা লোকটার বুকে একটা পা তুলে দিলো সে, উজির মাজল ঠেকালো তার গলায়। 'কেউ চিৎকার করলে খুন করে ফেলবো।'

ওরা ডাইভ দেয়ার পর মাত্র তিন সেকেণ্ড পেরিয়েছে।

উকুন শিকারীর গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। হাতে ট্রেঞ্চ নাইফ নিয়ে লোকটার দিকে ছুটে এলো মাজুলেট, খুনের নেশায় পেয়েছে তাকে। মাজুলেটের বুকে একটা হাত ঠেকিয়ে তাকে থামালো রানা।

সার্জেন্টের পালস্ দেখলো ও। চাঁদির কাছে খুলিটা ভেতর দিকে ডেবে যাওয়ায় সাথে সাথে মারা গেছে লোকটা। তার ব্যাটল্স্মক খুলে নিলো রানা। দু'জনের গড়ন প্রায় একই রকম, ভালোই ফিট করলো গায়ে। রানার দেখাদেখি গানারের ইউনিফর্ম খুলে ফেলেছে

মাজুলেট, ইউনিফর্মটা তার গায়ে হলো বটে, কিন্তু বুকের কাছে বড় বেশি টান টান হয়ে থাকলো। তবে স্টীল হেলমেটটা ঠিক মতোই ফিট করলো মাথায়। সে-ও একটা উক্তি তুলে নিলো।

রানার মাথায় অবশ্য বড় হলো হেলমেট, তবে তাতে লাভ হলো এই যে লম্বা চুলগুলো সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল ভেতরে।

বন্দী দু'জনের দিকে ফিরলো মাজুলেট। 'লাশ দুটো টেনে তুলবে তোমরা।'

লাশ দুটোর পা ধরে টানতে টানতে চাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো বন্দীরা, তাদের দিকে রাইফেল তাক করে রানা আর মাজুলেটও উঠে এলো। দৃশ্যটা দেখে টানেল থেকে বেরিয়ে এলো মিরাণ্ডা, বোবা বনে গেছে। টানেলের মুখ থেকে লাশ দুটোকে ঠেলে দেয়া হলো অন্ধকার গহ্বরে, গড়াতে গড়াতে নেমে গেল। 'কাপড় খোলো।' বন্দীদের নির্দেশ দিলো রানা। কাপড়চোপড় সব খুলে ফেললো তারা, পরনে থাকলো শুধু আণ্ডারপ্যান্ট। ওর ইঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুলো তারা, পা ভাঁজ করে নিতম্বের ওপর তুলে এনে কব্জির সাথে এক করে বাঁধা হলো। মোজাগুলো আগেই খুলে নেয়া হয়েছে, সেগুলো গোল পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো মুখের ভেতর।

ইতিমধ্যে মিরাণ্ডাকে ইউনিফর্ম পরানো শেষ করেছে মাজুলেট। অসম্ভব ঢিলে হলো গায়ে, কোমরের কাছে ভাঁজ করে বেল্ট বেঁধে দেয়া হলো, আস্তিন আর পায়া গুটিয়ে তুলে দেয়া হলো যতোদূর সম্ভব।

মেশিনগানের কাছে ফিরে এসে বাকি ইউনিফর্মটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিলো মাজুলেট। একটা ফিল্ড প্যাক পেলো সে, খালি করলো সেটা, তারপর হীরের ব্যাগটা তার ভেতর ভরে পিঠে

ঝুলিয়ে নিলো।

ট্রুপারদের ইকুইপমেন্ট ঘাঁটাঘাঁটি করছে রানা। মাজুলেটকে চারটে গ্রেনেড দিলো ও, নিজের পকেটে রাখলো ছ'টা, বাকি দুটো সোহানা পেলো। একটা টোকারেভ পিস্তল পাওয়া গেল, মিরাণ্ডার ভাগে পড়লো সেটা। সোহানা একটা উজি আগেই নিয়েছে, রানা নিলো এ-কে ফরটিসেভেন। দ্বিতীয় উজিটা নিলো মাজুলেট। পানির একটা বোতল নিয়ে নিজের বোঝা আরো একটু বাড়ালো রানা। চকলেটের একটা বাক্স খুলে উদার হস্তে সবাইকে বিলি করলো সোহানা।

'মাথায় থাকছি আমি,' মুখভরা চকলেট নিয়ে বললো রানা। 'গাছের আড়ালে থেকে উপত্যকায় নামার চেষ্টা করবো।'

পাহাড়ের কাঁধটাকে ঠিক পিছনে রেখে ঢাল বেয়ে সরাসরি নিচে নামতে শুরু করলো ওরা, আশা করছে ওদের ডান দিকে খোলা ঢালে কোনো শোনা নেই।

গাছের শেষ সারিটা পেরোতে যাবে, হেলিকপ্টারের আওয়াজ এলো। পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে আসছে, এখনো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তুমুল বেগে। কাউকে কিছু বলতে হলো না, ডাইভ দিয়ে যে যার ঝোপের সামনে পড়লো তিনজন, মিরাণ্ডার পিঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলো মাজুলেট।

রোটরের আওয়াজ বদলে গেল, শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে হেলি-কপ্টার। 'ল্যাণ্ড করছে!' ফিসফিস করে বললো সোহানা। খানিক বাদেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পেলো ওরা, অস্পষ্টভাবে, ভারি গলায় হুকুম দেয়া হচ্ছে। ক্রল করে পাহাড়ের কাঁধে উঠে এলো ওরা,

ধীরে ধীরে মাথা তুলে কিনারা দিয়ে নিচে তাকালো।

ওদের নিচে, সিকি মাইল দূরে, উপত্যকার ওপর সমতল একটা ছোট্টো জায়গা থেকে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা কেটে সাফ করা হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় বিশাল একটা তাঁবু দেখা গেল, মাঝখানে ল্যাণ্ড করেছে হেলিকপ্টার। পাইলটকে ফিউজিলাজ পোর্ট থেকে নামতে দেখলো ওরা। তাঁবুর কাছে, গাছের তলায় থার্ড ব্রিগেড ট্রুপারদের দেখা গেল, তাঁবুর ভেতর একটা টেবিলের সামনে বসে রয়েছে তিন চারজন শোনা।

'অ্যাডভান্সড হেডকোয়ার্টার,' বললো রানা।

'এই উপত্যকার নিচেই ঢুকেছিলাম আমরা, বড় গুহাটা ঠিক আমাদের নিচে,' বললো মাজুলেট।

'মনে হচ্ছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা,' বললো রানা। হাত তুলে উপত্যকার দক্ষিণ দিকটা দেখালো ও, গাছপালার ভেতর দিয়ে পাঁচজন শোনার একটা দল ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

'গুহার ভেতর ডিনামাইট ফাটাবার পর প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে ওরা;' বললো সোহানা, 'ধরে নিয়েছে আমরা মারা গেছি।'

'ক'জন, রানা?' জিজ্ঞেস করলো মাজুলেট।

'ক'জন?' চোখ কুঁচকে তাকালো রানা, গোণা শেষ করে বললো, 'অন্তত পনেরো জন, তাঁবুর ভেতর আরো কিছু থাকতে পারে। কিছু লোক ফিরে যেতেও শুরু করেছে।'

কিনারা থেকে একটু নিচে নেমে সোহানাকে জিজ্ঞেস করলো মাজুলেট, 'এ-ধরনের হেলিকপ্টার আগে কখনো চালিয়েছেন?'

হেলিকপ্টারের দিকে তাকালো সোহানা। 'সুপার ফ্রেলন।

পারবো।'

'ককপিটে পৌছুবার পর স্টার্ট দিয়ে আকাশে উড়তে কতোক্ষণ সময় নেবে?'

'দুই কি তিন মিনিট।'

মাথা নাড়লো মাজুলেট। 'তাহলে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সোহানা যখন স্টার্ট দেবে, আমরা তখন যদি ফাঁকা জায়-গাটা থেকে শোনাদের সরিয়ে দিতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো মাজুলেট। 'তাহলে সম্ভব।'

'তুমি উপত্যকার মাথায় চলে যাও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'আমি ওদের দু'জনকে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় পৌঁছে অপেক্ষা করি।'

'এখন থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর,' বললো মাজুলেট, রানার কব্জি ধরে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। 'ঠিক সাড়ে ন'টায় গ্রেনেড আর গুলি ছুঁড়ে শোনাদের চমকে দেবো আমি। গোলা-গুলির আওয়াজ শুরু হলেই হেলিকপ্টারের দিকে এগোবে তোমরা। যখন শুনতে পাবো হেলিকপ্টার আকাশে উঠেছে, দৌড়ে ওই ঢালে চলে যাবো আমি।' হাত তুলে ঢালটা দেখালো সে। 'ওখান থেকে তোমরা আমাকে তুলে নেবে।' হীরের বোঝাটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলো সে।

'প্ল্যানটা একটু রদবদল করতে হতে পারে,' বললো রানা। 'সম্ভব হলে জনা কয়েক শোনাকে বন্দী করতে চাই। উমাঙ্গোর কুকীর্তি সম্পর্কে ওদের সাক্ষ্য খুব কাজে আসবে। প্রথম গ্রেনেড ফাটাবার দশ মিনিটের মধ্যে যদি দেখো হেলিকপ্টার উঠছে না, ধরে নেবে

প্ল্যান বদল করা হয়েছে। অপেক্ষা না করে চলে আসবে তুমি, তোমার সাহায্য দরকার হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে,' পিঠে রানার একটা চাপড় খেয়ে রওনা হয়ে গেল মাজুলেট।

পাহাড়ের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এলো রানা, পিছনে মিরাণ্ডা আর সোহানা। সারি সারি গাছের ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, একটা নালা দেখে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়লো তাতে। একদিকে বেঁকে গিয়ে ফাঁকা জায়গাটার পাশ ঘেঁষে চলে গেছে নালাটা। কিছুদুর এগোলো রানা, একবার করে নালার কিনারা থেকে মাথা তুলে সামনেটা দেখে নিলো।

'এর বেশি কাছে যাওয়া উচিত হবে না,' ফিসফিস করলো রানা, নালার ঠোঁটের নিচে নেতিয়ে পড়লো মেয়েরা। কাঁধ থেকে ভারি বোঝাটা নামালো রানা, মাথা তুলে আরেকবার তাকালো।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পেট-মোটা ভোঁতা-নাক হেলিকপ্টার, দেড়শো ফিট দূরে। ফিউজিলাজের ছায়ায়, ল্যাণ্ডিং গিয়্যারের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে পাইলট। আবার সোহানার পাশে নিচু হলো রানা। হাতঘড়ি দেখে বললো, 'দশ মিনিট।'

'মেকআপ নিচ্ছো?' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলো মিরাণ্ডা। কালচে ধুলো নিয়ে মুখ আর হাতে ঘষছে সোহানা।

'দু'মিনিট,' বলে পাড়ের ওপর দিয়ে আবার তাকালো রানা।

ম্যাগাজিনটা বগলে নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠছে পাইলট। 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বিড়বিড় করে বললো ও।

খোলা জায়গার দূর প্রান্তের কিনারায় রয়েছে তাঁবুটা, মাঝখানে

হেলিকপ্টার থাকায় তাঁবুর সবটুকু দেখতে পেলো না রানা। তবে শোনা ট্রুপারদের মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব লক্ষ্য করা গেল। দু'জন ট্রুপার কাকে যেন স্যালুট করলো। তারপর হঠাৎ করে হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরতে শুরু করলো, জ্যান্ত হয়ে উঠলো স্টার্টার মটর। এগজস্ট ভেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো নীলচে ধোঁয়া, মেইন ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

তাঁবুর ভেতর থেকে দু'জন অফিসার বেরিয়ে এলো, ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগোলো তারা।

'সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে,' গম্ভীর হয়ে উঠলো রানা। 'চলে যাচ্ছে ওরা।' হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। 'গুড গড! ওই তো উমাঙ্গো!'

লালচে বেরেট পরে রয়েছে জেনারেল রট উমাঙ্গো, সাথে চিতার মাথা আকৃতির রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ। তার বুকে গিজ গিজ করছে পদক আর ফিতে। ব্যাটল-স্মকের ফাঁকে, ঘাড় আর বুক ঢাকা পড়ে আছে স্কার্ফে। বগলের নিচে স্টিক, হাতে একটা কালো ব্রিফকেস। খুব ধীর পায়ে হাঁটছে সে, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে সার্জেন্টের সাথে।

হেলিকপ্টার থেকে তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন আলোচনা করছে। পাহাড় আর বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে এই সময় বিস্ফোরিত হলো মাজুলেটের প্রথম গ্রেনেড। দ্রুত হেলিকপ্টারের দিকে পিছন ফিরলো ওরা, তাঁবুর ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালো। এরপর শোনা গেল অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ। তাঁবুর আশপাশ থেকে বজ্রকণ্ঠ হুংকার ভেসে এলো, ট্রুপারদের নির্দেশ দিচ্ছে কেউ। কয়েকজনকে

ছুটে তাঁবুর পিছন দিকে চলে যেতে দেখা গেল।

তাঁবুর পিছনের উপত্যকা থেকে আবার ভেসে এলো গ্রেনেড আর রাইফেলের আওয়াজ। তাঁবুর এদিকে কাউকে দেখা গেল না, সবাই পিছন দিকে ছুটে গেছে। বোঝাটা কাঁধে তুলে নিয়ে নির্দেশ দিলো রানা, 'এসো! কি করতে হবে জানো তোমরা!' নালা থেকে উঠে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা, এগোলো হেলিকপ্টারের দিকে।

'তাড়াহুড়ো করো না,' সাবধান করে দিলো রানা। ছুটছে না, হন হন করে হাঁটছে, একজনের পাশে আরেকজন। দ্রুত কাছে চলে আসছে উমাঙ্গো আর সার্জেন্ট।

হঠাৎ তাঁবুর দিকে ছুটলো সার্জেন্ট। উমাঙ্গোকে পাশ কাটালো সোহানা, প্রায় তার গা ঘেঁষে এগোলো সে। উমাঙ্গোর পিছনে মিরাণ্ডা নেই, একা শুধু রানা।

'এই, কে…?' পিস্তল হোলস্টারে হাত চলে গেল উমাঙ্গোর, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সোহানার পিঠের দিকে।

'পিস্তল থেকে হাত সরাও, উমাঙ্গো,' পিছন থেকে বললো রানা, রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো ওর চিৎকার।

ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো উমাঙ্গো। রানাকে চিনতে পেরে নিঃশ্বাস আটকে গেল তার, বিস্ময়ে বিকৃত হয়ে উঠলো চেহারা।

'এই রেঞ্জ থেকে তোমাকে আমি ইচ্ছে করলে দু'টুকরো করে দিতে পারি,' বললো রানা। উমাঙ্গোর পেটের দিকে তাক করে ধরেছে এ-কে ফরটিসেভেন। ধীরে ধীরে উমাঙ্গোকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করলো ও, তার ডান পাশে সরে এলো। 'হেলিকপ্টারের দিকে ফেরো,' নির্দেশ দিলো ও।

হেলিকপ্টারের দিকে এগোলো রানা, রাইফেলের মাজল অনুসরণ

করলো উমাঙ্গোকে। হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছুবার আগেই খোলা পোর্টে দেখা গেল পাইলটকে, হাত দুটো মাথার ওপর তুলে রেখেছে। তার পিছনে পিস্তল হাতে মিরাণ্ডাকে দেখা গেল।

'গেট আউট!' আদেশ করলো রানা। পাইলটের চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো, লাফ দিয়ে নামলো সে। তার পিছু পিছু মিরাণ্ডাও নামলো। 'ওকে নিয়ে সোহানার কাছে যাও,' মিরাণ্ডাকে নির্দেশ দিলো রানা।

পিঠে পিস্তলের মাজল নিয়ে তাঁবুর দিকে এগোলো পাইলট।

তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছে সার্জেন্ট, শিরদাঁড়ায় উজির মাজল ঠেকলো। 'পিস্তলটা ফেলে দাও,' বললো সোহানা। 'কোনো আশা নেই, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি তোমাদের।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো সার্জেন্ট, মাথার ওপর নেমে এলো উজির ব্যারেল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সে। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেলো সোহানা, পাইলটকে নিয়ে এগিয়ে আসছে মিরাণ্ডা। ঝুঁকে সার্জেন্টের মুঠো থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো ও।

পাইলটকে সামনে নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো ওরা, ভেতরে নেই কেউ। অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে পঞ্চাশ গজ এগোলো সোহানা, পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলো। বিকট শব্দের সাথে দাউ দাউ আগুন ধরে গেল তাঁবুতে।

আরো বিশ গজের মতো এগিয়ে একটা নালায় নামলো ওরা। কিনারায় দাঁড় করালো পাইলটকে, তার পায়ের ফাঁক দিয়ে সোহানা দেখলো, ঢাল বেয়ে উপত্যকার আরো ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রুপাররা। গাছ আর ঝোপের আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে তারা, অত্যন্ত সাবধানে, এক পা এক পা করে।

'ওদের বলো, জেনারেল উমাঙ্গোকে গ্রেফতার করা হয়েছে,' ইংরেজীতে নির্দেশ দিলো সোহানা। 'বলো, অস্ত্র ফেলে সারেণ্ডার করলে কারো গায়ে একটি আঁচড়ও লাগবে না।'

'হেলিকপ্টারে ওঠো!' আদেশ করলো রানা।

ধীরে ধীরে ঘুরে রানার সামনাসামনি হলো উমাঙ্গো। তার প্রকাণ্ড দেহ টান টান হয়ে আছে, চেহারায় মরিয়া একটা ভাব। এই লোকের দুঃসাহস আর ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে জানা আছে রানার, তাড়াতাড়ি বললো, 'বোকামি করো না, উমাঙ্গো। হেরে গেছো, মেনে নাও!' হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এক পা পিছিয়ে এলো ও।

এক পা সামনে বাড়লো উমাঙ্গো। কিছুই পরোয়া করছে না সে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হারাবার তার আছে কি!

'মুভ!' কঠিন সুরে বললো রানা। 'গেট আপ দ্য ল্যাডার!' ঝাঁপিয়ে পড়লো উমাঙ্গো। যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে, সরাসরি ছুটে এলো এ-কে ফরটিসেভেনের মাজলে। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে তৈরিই ছিলো রানা, ঝট্ করে ওপরে তুলে ব্যারেলটা নামিয়ে আনলো উমাঙ্গোর মাথায়। আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো উমাঙ্গো, হাঁটু ভেঙে নিচু হলো। তার হোল-স্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে সিধে হতে যাবে রানা, কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট। চর-কির মতো আধ পাক ঘুরলো রানা।

ঝোপের ভেতর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে তিনজন ট্রুপার, ছুটে আসছে। তাঁবু ছেড়ে চলে গিয়েছিল দলটা, গোলা-গুলির আওয়াজ শুনে ফিরে এসেছে। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো

রানা, সামনের লোকটাকে লক্ষ্য করে টেনে ধরলো রাইফেলের ট্রিগার।

পঞ্চাশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রুপার, পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল শিরদাঁড়া। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখলো, ক্রল করে ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে উমাঙ্গো। কিন্তু তার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই, সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখেও পিছনের ট্রুপার দু'জন থামেনি, গুলি করতে করতে ছুটে আসছে।

আবার গুলি করার আগে পাহাড়ের ওপর চোখ পড়লো রানার, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে আরো একদল ট্রুপার। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল সৈনিকরা, সবাই আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে।

গুলি করতে করতে হেলিকপ্টারের নিচে চলে এলো রানা। দ্বিতীয় ট্রুপারও মারা যাওয়ায় পিছনের লোকটার হুঁশ ফিরেছে, শুয়ে পড়েছে সে, কিন্তু গুলি বন্ধ করেনি।

ফাঁকা জায়গার কিনারায় আরো চার-পাঁচজন শোনাকে দেখা গেল। পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে পিন খুললো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ডান পাশে তাকিয়ে দেখল, একশো ফিট দূরে চলে গেছে উমাঙ্গো, তীরের মতো ছুটছে জঙ্গলের দিকে।

গ্রেনেডটা ছুঁড়ে ট্রুপারদের দ্বিতীয় দলটাকে থামিয়ে দিলো রানা। আরেকটা গ্রেনেড ফেললো শুয়ে থাকা লোকটার ওপর।

পাথরের আড়ালে শুয়ে এক নাগাড়ে গুলি ছুঁড়ছে ট্রুপাররা। নিঃসঙ্গ লোকটা থেঁতলে গেছে। পিছুতে শুরু করে মইয়ের কাছে চলে এলো রানা, মই বেয়ে উঠে পড়লো 'কপ্টারের ককপিটে। দোরগোড়া থেকে এক পশলা গুলি করলো, আরো একটা গ্রেনেড

ছুঁড়লো ফাঁকা জায়গাটার কিনারা লক্ষ্য করে।

স্টার্ট দেয়াই ছিলো, 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগলো রানার। স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা কোলের ওপর রাখলো ও, রাইফেল ধরা হাতটা খোলা ককপিটের দরজার কাছে, ব্যারেলটা বেরিয়ে রয়েছে বাইরে।

ফাঁকা জায়গাটাকে মাঝখানে রেখে একটা চক্কর দিলো রানা। ফিরে আসা ট্রুপারদের দ্বিতীয় দলে লোক রয়েছে পাঁচ জন, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে তৃতীয় আরেকটা দল, তারাও সংখ্যায় পাঁচজন। হেলিকপ্টারকে আকাশে উঠতে দেখে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে সবাই, আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওপর দিকে। প্রচুর গ্রেনেড থাকলে এদেরকে ধ্বংস করা কোনো সমস্যাই হতো না, কিন্তু রানার কাছে গ্রেনেড আছে আর মাত্র তিনটে। ওরা সবাই পাথরের আড়ালে থাকায় রাইফেল কোনো কাজেই আসবে না। তাছাড়া, ওদের কাছেও রাইফেল রয়েছে, লক্ষ্যস্থির করার জন্যে যতোটা নিচে নামা দরকার ততোটা নিচে নামতে পারবে না রানা।

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রানার মন দমে গেল। এক সেকেণ্ড চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলো, হেলিকপ্টার নিয়ে সরে যাবে ও।

•

পাইলট ঘোষণাটা শেষ করতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লো থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা। প্রথম এক পশলা গুলি ছুঁড়ে থামলো ওরা, দেখলো ওপরের নালা থেকে কালো কি যেন ছুটে আসছে।

নালার কিনারা থেকে মাথা তুলে উঁকি দিলো সোহানা। দেখলো,

শোনাদের কাছ থেকে তিন গজ দূরে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। নিমেষের মধ্যে ধরাশায়ী হলো দু'জন শোনা।

'আবার বলো!' পাইলটকে নির্দেশ দিলো সোহানা। শোনাদের গুলিতে আহত হয়েছে পাইলট, নালার ওপর শুয়ে আছে সে। ঘোষণাটা আবার একবার আওড়ালো সে। থামতেই জ্বলন্ত তাঁবুর পিছন থেকে ভেসে এলো গুলির শব্দ। প্রায় একই সাথে উপত্যকার মাথা থেকে ভেসে এলো আরেকটা গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ। 'রিপিট করো,' নির্দেশ দিলো সোহানা। 'বলো, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদের।'

শোনারা বুঝতে পারলো, পরিস্থিতি সুবিধের নয়। ইতিমধ্যে ঝোপ আর পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে ওরা, পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে যারা, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, কিন্তু কি করা হবে সে-ব্যাপারে একমত হতে পারলো না।

শোনারা গুলি করছে না, সোহানা আর মিরাণ্ডাও নড়ছে না। সময় বয়ে চললো।

উপত্যকার ঢাল থেকে মাজুলেট দেখলো, শোনারা তার দিকে আর এগোচ্ছে না। দেরি না করে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো সে, শোনাদের আরো কাছাকাছি পৌঁছুতে চায়।

জ্বলন্ত তাঁবুর পিছন থেকে ভেসে এলো গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ। একটু পরই আকাশে উঠতে দেখা গেল হেলিকপ্টারকে।

নালার দিকে আবার গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো শোনারা, ক্রল করে উঠে আসছে। আরেকটা গ্রেনেড ফাটিয়ে ওদেরকে থামিয়ে দিলো সোহানা।

খানিক পর ওদের মাথার ওপর উড়ে এলো 'কপ্টার। ইলেকট্রনিক

মেগাফোন মুখের সামনে ধরে ইংরেজীতে কথা বললো রানা, ওর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গমগমে শোনালো, 'গোটা এলাকা সীল করে দিয়েছি আমরা, পালাবার কারো কোনো উপায় নেই। প্রাণে বাঁচতে চাইলে, রাজসাক্ষী হতে চাইলে, সবাই তোমরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করো।'

ঘোষণাটা শুনে লাফাতে লাফাতে ছুটলো মার্জুলেট। শোনাদের কাছাকাছি এসে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করলো সে। কোণঠাসা শোনাদের আর কোনো উপায় থাকলো না, অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুললো তারা, একজন দু'জন করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো আড়াল থেকে।

মুখ তুলে 'কপ্টারের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। খোলা কক-পিট থেকে নাইলনের একটা রশি পড়লো নালার ভেতর, তারপর বেরিয়ে এলো রানার মুখ। মুখের সামনে মেগাফোন, রানা বললো, 'ওদের বাঁধার পর এখানেই থাকো তোমরা।' বিশাল একটা ইউ টার্ণ নিয়ে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল হেলিকপ্টার।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে পাহাড়ের পিছনে চলে এলো রানা, দশ ফিট ওপর থেকে চূড়াটাকে পেরিয়ে এলো। এরপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে গাছপালা ঢাকা পাহাড়ের গা, গাছগুলোর মাথা ঘেঁষে ফাঁকা জায়গাটার দিকে তীরবেগে নেমে এলো হেলিকপ্টার। যা আশা করেছিল রানা, তাই ঘটেছে। হেলিকপ্টারকে সরে যেতে দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে ট্রুপারদের দ্বিতীয় আর তৃতীয় দলটা, তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গা ধরে জ্বলন্ত তাঁবুর দিকে ছুট দিয়েছে।

'কপ্টার নিয়ে ফিরে এসে রানা ওদেরকে খোলা মাঠের ঠিক

মাঝখানে পেলো। বেকায়দায় পড়ে শুয়ে পড়লো সবাই, আড়াল নেয়ার কোনো জায়গা নেই।

'কপ্টার নিয়ে পরপর দু'বার ওদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল রানা। প্রথমবার একটা গ্রেনেড ফেললো, দ্বিতীয়বার ব্রাশ ফায়ার করলো। তারপর হেলিকপ্টারের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটলো ও। পালের গোদাটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

বারো

হতাশ হয়ে পড়লো রানা।

দক্ষিণের পাহাড় আর জঙ্গলে আধ ঘণ্টা ধরে খুঁজছে ও, উমাঙ্গোর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়নি। খুব বেশি সময় পায়নি উমাঙ্গো, অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার থেকে বড় জোর দু'আড়াই মাইল চলে আসতে পেরেছে। রানা জানে, পাথরের কোনো ভাঁজে বা ঝোপের কোনো আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে সে, অপেক্ষা করছে ফুয়েল শেষ হয়ে এলে 'কপ্টার নিয়ে ফিরে যাবে রানা, এই আশায়।

ফুয়েলের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, আর হয়তো আধ ঘণ্টা আকাশে থাকতে পারবে রানা।

কি করবে ভাবছে ও। মনে পড়লো, উমাঙ্গোর সাথে একটা ব্রিফ-

কেস আছে। ব্রিফকেসে রেডিও থাকা বিচিত্র নয়। হয়তো এরই মধ্যে রিইনফোর্সমেন্টের জন্যে মেসেজ পাঠিয়েছে উমাঙ্গো। ট্রুপার-দের বড়সড় একটা দল চলে এলে লড়াই করে টিকে থাকা কঠিন হবে।

এবার আরো বড় একটা এলাকার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে শুরু করলো হেলিকপ্টার। ধীরে ধীরে ছোটো করে আনবে রানা বৃত্তটা, তারপর ফিরে যাবে। সবাইকে নিয়ে খোঁজার জন্যে আবার ঢুকবে জঙ্গলে, পায়ে হেঁটে।

ব্রিফকেসটাই বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

একদিকে কাত হয়ে প্রথম চক্করটা শেষ করছিল 'কপ্টার, ডান দিকের একটা ঝোপের ভেতর রোদ লেগে কি যেন ঝিক করে উঠলো। চক্করটা শেষ করে আবার ঝোপের কাছে ফিরে এলো রানা।

ঘন ঝোপ, ভেতরে কি আছে না আছে কিছুই দেখা যায় না। মুখের সামনে মেগাফোন তুলে ইংরেজীতে কথা বললো ও, 'ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো, উমাঙ্গো।'

ঝোপ নড়লো না।

খোলা ককপিট দিয়ে রাইফেলের ব্যারেল বের করলো রানা। 'এবার কিন্তু গুলি করবো।' ঝোপের কিনারা লক্ষ্য করে একটা মাত্র গুলি করলো ও।

নড়ে উঠলো ঝোপ। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো ইউনিফর্ম পরা প্রকাণ্ড দানব।

ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। কি যেন নেই। তারপর মনে পড়লো। 'ব্রিফকেসটা, উমাঙ্গো। বের করো ওটা।'

নিষ্ফল আক্রোশে ঝট্ করে ওপর দিকে তাকালো উমাঙ্গো, ঘামে

ভিজে গাঢ় হয়ে উঠেছে ইউনিফর্মের রঙ। ঝোপের ভেতর হাত গলিয়ে ব্রিফকেসটা বের করলো সে। রানা বুঝলো, চকচকে ইস্পাতের হাতলে রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠেছিল।

'ডান দিকে, উমাঙ্গো,' মেগাফোনে বললো রানা। 'ওদিকে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে।'

পাগলের মতো আচরণ করলো উমাঙ্গো। হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো সে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালো, সেই সাথে বাড়িয়ে দিলো ছোটার গতি।

ফাঁকা জায়গাটা আধ মাইল দূরে, একটা পাহাড়ের কাঁধ। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো উমাঙ্গো। আছাড় খেয়ে পড়লো সে, কপাল কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে গেল প্রকাণ্ড মুখ। অসুরের শক্তি গায়ে, প্রতিবার পড়েই লাফ দিয়ে উঠলো, আবার ছুটতে শুরু করায় ইউনিফর্মের ভেতর কিলবিল করতে লাগলো পেশীগুলো।

পাহাড়ের কাঁধটা তেমন প্রশস্ত নয়, হেলিকপ্টারের লেজের দিকটা বেশ খানিক ঝুলে থাকলো শূন্যে। ওখানে উঠতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে উমাঙ্গোকে, ক্লান্তিতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছে সে। 'কপ্টার থেকে নেমে রানা দেখলো, কিনারার কাছাকাছি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে, বিশাল পিঠ ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। পাশে পড়ে রয়েছে কালো ব্রিফকেস।

সাবধানে এগিয়ে গেল রানা। 'উমাঙ্গো, ওঠো,' মৃদু কণ্ঠে বললো ও। দাঁড়ালো বিশাল ধড়ের পাশে।

ধীরে ধীরে চিৎ হলো উমাঙ্গো। ঘাম, রক্ত, আর ধুলো মাখামাখি হয়ে ভূতের মতো দেখালো কালো চেহারাটা। করুণ আবেদন

ভরা চোখে রানার দিকে তাকালো সে, মুখের সামনে একটা হাত তুলে পানি খাবার ভঙ্গি করলো।

'পানি? পানি কোথায় পাবো! পেশাব খেলে বলো!' প্রচণ্ড ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো রানার চেহারা, উমাঙ্গোর পাঁজর লক্ষ্য করে পা তুললো ও।

ইলেকট্রিক শক খেলো যেন রানা। খপ্ করে ওর পা ধরে ফেলেই মোচড় দিলো উমাঙ্গো। শক্ত পাথরের ঢালে ডান দিকে কাত হয়ে দড়াম করে পড়ে গেল সে। হাত ফসকে ছিটকে দূরে চলে গেল এ-কে ফরটিসেভেন। স্প্রিঙের মতো এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছে উমাঙ্গো, দু'পা এগিয়ে এসে রানার ওপর ঝুঁকলো সে, পাঁজরের ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা।

উমাঙ্গো যেন নিষ্ঠুর এক প্রাগৈতিহাসিক দানব, ওর পাশে রানা নিতান্তই অসহায়—ওকে দু'হাতে ধরে হেঁচকা টানে মাথার ওপর তুললো উমাঙ্গো, পিঠ আর বুকের পেশী জ্যান্ত এক একটা সরী-সৃপের মতো কিলবিল করে উঠলো, গায়ের জোরে আছাড় দিলো শক্ত পাথরে। কিনারা থেকে নিচের দিকে দেড়শো ফিট খাড়া নেমে গেছে কাঁধের গা, স্রেফ দয়া করে সেদিকে রানাকে ছুঁড়লো না উমাঙ্গো। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই ফেলবে, কিন্তু তার আগে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছে। আছাড় মেরেই এক সেকেণ্ড সময় না দিয়ে আবার তুলে নিচ্ছে মাথার ওপর।

টকটকে লাল চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো উমাঙ্গোর, খুনের নেশায় জ্বলজ্বল করছে। বার বার রানাকে শূন্যে তুলে আছাড় মারতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে সে। পাথরের ওপর পড়ে মোচড় খাচ্ছে রানার শরীর, ওর বুকের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়লো সে। তিন মন ওজ-

নের শরীরটা বুকে আঘাত করতে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রানার, হুস করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। ঘুসি মারলো উমাঙ্গো, নাক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত। কিছুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো রানা—কিন্তু নাকে হাত চাপা দিলে কপালের পাশে ঘুসি পড়ে, কপাল ঢাকলে কানের পাশে নরম মাংসে।

ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে রানা। বাধা না পেলে মেরে সুখ নেই, তাই অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করলো উমাঙ্গো। সে-ও ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, আবার রানাকে মাথার ওপর তুলে কিনারা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়ার জোর নেই গায়ে। রানার একটা পা ধরে টানতে শুরু করলো সে।

রানাকে কিনারায় নিয়ে এসে দিক বদল করলো উমাঙ্গো, ওর মাথার কাছে চলে এলো। চোখ বুজে নিথর পড়ে থাকলো রানা, জ্ঞান আছে কিনা বোঝা যায় না। ওর খোলা গলার ওপর একটা পা তুলে দিলো উমাঙ্গো। ফিসফিস করে বললো, 'অনেক ভুগিয়েছো, রানা, সব প্রায় বানচাল করে দিয়েছিলে।' গলার ওপর ধীরে ধীরে পায়ের চাপ বাড়ালো সে। প্রথমবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, নিস্তেজ হাত উমাঙ্গোর বুট পরা পায়ের কাছে পৌঁছুবার আগেই মাঝ পথে স্থির হয়ে গেল। কৌতুক ঝিক্ করে উঠলো উমাঙ্গোর চোখে। 'এখনো আশা করছো? এখনো হাল ছাড়োনি?'

আবার উমাঙ্গোর পা ধরার জন্যে হাত তুললো রানা, সেদিকে তাকিয়ে কালো রাবারের মতো ঠোঁট প্রসারিত হলো উমাঙ্গোর।

কোথেকে কি হলো, কিছুই বোঝা গেল না। উমাঙ্গো শুধু অনুভব করলো, গোড়ালি থেকে টান দিয়ে উরু পর্যন্ত লম্বা একটা শিরা

যেন ছিঁড়ে বের করে নিলো রানা। চোখের পলকও বুঝি পড়লো না, দেখলো, পাথরের ওপর পড়ে আছে সে, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রক্তাক্ত রানা। 'এইবার তোমার পালা, উমাঙ্গো।'

উন্মাদ, স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেল রানা। বাছাই করা জায়গায় উমাঙ্গোকে মারলো সে, যেখানে মারলো সাথে সাথে ফুলে উঠলো মাংস। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠলো উমাঙ্গো, আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করলো সে। কিন্তু রানা তাকে তিন পা-র বেশি কোনোদিকে ছুটতে দিলো না। যেদিকেই এগোলো উমাঙ্গো, দেখা গেল তার সামনে যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে রানা। মুখটা ফুলে ঢাউস হয়ে গেল উমাঙ্গোর, ঠোঁটের একটা কোণ ছিঁড়ে গিয়ে এক ইঞ্চি নেমে এসেছে। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এলো রানার একটা হাত, বেলুন ফাটার মতো আওয়াজ হলো, ইউনিফর্মের ভেতর এক নিমেষে ফুলে উঠলো পেটের এক পাশ। এরকম আরেক মার ওখানে পড়লে পেটটা ফেটে যাবে।

এবার আছাড় মারতে শুরু করলো রানা। যেন পাল্টা শোধ তুলছে। টলতে টলতে কোনমতে উঠে দাঁড়ালেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেঁটে যায় উমাঙ্গোর গায়ের সাথে, জু-জিৎসুর প্যাঁচে শূন্যে তুলে ফেলে—চেষ্টা করেও ঠেকানো যায় না। পরমুহূর্তেই দড়াম।

শেষবার মাটিতে পড়ে হাতের কাছে রাইফেলটা পেয়ে গেল উমাঙ্গো। একটা হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, রানার বুকের দিকে তাক করে ধরেছে মাজল। এক সেকেণ্ড দেরি না করে ট্রিগারে চাপ দিল সে। রানা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে হাসছে। গুলি বেরুলো না দেখে রাইফেলটা মাথার ওপর তুললো উমাঙ্গো, নামিয়ে আনলো রানার মাথা লক্ষ্য করে। এক হাতে তার কব্জি ধরে ফেলে

অপর হাতে তলপেটে ঘুসি মারলো রানা। উমাঙ্গোর হাত থেকে খসে পড়লো রাইফেল, সেটা লুফে নিলো রানা। পিছিয়ে এসে ছুঁড়ে দিলো একপাশে। উমাঙ্গোর দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও।

ইস্পাতের চকচকে ফলা রোদ লেগে ঝলমল করছে। উরুর ওপর ইউনিফর্মের চেইনটা খোলা দেখলো রানা, ভেতর থেকে অ্যাসে-গাই-টা বের করে বাগিয়ে ধরেছে উমাঙ্গো। নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে রয়েছে তার ঠোঁটে, জিভের ডগা বের করে ঠোঁটের ক্ষত-টায় একবার বুলালো সে। তারপর এগোতে শুরু করলো।

সাবধানে, এক পা এক পা এগিয়ে আসছে উমাঙ্গো। পিছু হটছে রানা, কিন্তু উমাঙ্গোর চেয়ে ধীর গতিতে। ওদের মাঝখানের দূরত্ব একটু একটু করে কমে আসছে।

পাহাড়ের কিনারায় চলে এসেছে রানা, আর পিছু হটার উপায় নেই। ওর সামনে, পাঁচ ফিট দূরে রয়েছে উমাঙ্গো। রানা দাঁড়িয়ে পড়ছে দেখে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়লো। অ্যাসেগাই-টা ধীরে ধীরে মাথার ওপর তুললো উমাঙ্গো। একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পাথরের ওপর শক্ত ভাবে দাঁড়ালো। তার পেশীতে টান পড়লো, মনে হলো রানাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেবে অ্যাসেগাই। তাকিয়ে আছে রানার বুকের দিকে।

অ্যাসেগাইটা ছুঁড়ে দেয়ারই ভঙ্গি করলো উমাঙ্গো। কিন্তু ছুঁড়ে না দিয়ে ছুটে এলো সে, কোপ চালালো রানার গলা লক্ষ্য করে। পিছু হটলো রানা, কিনারা থেকে নেমে গেল নিচে।

অ্যাসেগাইয়ের ফলার সাথে রানার গলার যোগাযোগ না হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেললো উমাঙ্গো। পাথরের কিনারা ধরে ঝুলে ছিল

রানা, উমাঙ্গো তাল সামলে সিধে হবার আগেই উঠে এলো ও। ডাইভ দিলো।

তাল প্রায় সামলে নিয়েছিল উমাঙ্গো, কিন্তু রানার উড়ে আসা শরীরের ধাক্কায় দড়াম করে পড়ে গেল সে। তার বুকের ওপর বসে হাত মুচড়ে ধরে অ্যাসেগাইটা কেড়ে নিলো রানা।

উমাঙ্গোর গলায় ঠেকলো ক্ষুরের মতো ধারালো ফলা। চামড়া কেটে ভেতরে একটু ঢুকে গেছে, রক্তের চিকন একটা ধারা নেমে এসে জমা হচ্ছে দুই কণ্ঠার মাঝখানের গর্তে।

রানার নিচে মোচড় খেতে শুরু করলো উমাঙ্গোর প্রকাণ্ড শরীর, প্রাণপণ চেষ্টা করলো সে গলা থেকে অ্যাসেগাইয়ের ফলা সরাতে। কিন্তু রানাকে টলানো গেল না।

শেষে কাকুতি মিনতি শুরু করলো উমাঙ্গো। 'আমাকে মেরো না, রানা। যা করেছি মাফ করে দাও। এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবো আমি, তোমার দেয়া যে-কোনো শাস্তি মেনে নেবো, শুধু আমাকে প্রাণে মেরো না।'

'মারতাম না,' বললো রানা। 'কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়েছো; আমাকে বিশেষ করে, সোহানাকে চরম অপমান করেছো। মানুষ নামের যোগ্য তুমি নও, উমাঙ্গো।' ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে অ্যাসেগাই চালালো রানা। খিঁচুনি উঠে গেল উমাঙ্গোর শরীরে, কিন্তু তার বুকের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলো রানা। ভীষণ মোটা গলা, ধারালো ফলা দিয়েও সহজে কাটা গেল না। কাটা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। রক্ত, চর্বি, মাংস আর শিরার ভেতর ধীরে ধীরে ডুবে গেল অ্যাসেগাই-এর চওড়া ফলা। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে শেষ কয়েকটা পোঁচ দিলো রানা, ধড় থেকে আলাদা হয়ে অল্প

সামান্য চামড়ার সাথে লেগে থাকলো মুণ্ডুটা।

স্থির হয়ে গেছে উমাঙ্গোর শরীর।

তাঁবুর আগুন নিভে গেছে, তবে একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনো। বন্দী শোনারা মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে আছে, নাইলনের রশি দিয়ে প্রত্যেকের হাত পা বাঁধা। রানা ককপিট থেকে নামতেই উজি হাতে ছুটে এলো সোহানা আর মাজুলেট।

'ফুয়েলের কি অবস্থা?' দ্রুত জানতে চাইলো মাজুলেট। 'এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা চলবে না। এরই মধ্যে সম্ভবত থার্ড ব্রিগেডের বড় দল রওনা হয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওরা।'

রানা হাসলো।

'উমাঙ্গো'? জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'শয়তানটাকে পাওনি তুমি?'

'রানা, ফুয়েল···?' ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মাজুলেট। '···আমাদের পালাতে হবে।'

'কোথাও পালাবার দরকার নেই,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো রানা। হাতের ব্রিফকেসটা দেখালো ও। 'এতে কি আছে জানো?'

এতোক্ষণে ব্রিফকেসটা লক্ষ্য করলো মাজুলেট। 'ওটা···আরে, ওটা তুমি কোত্থেকে পেলে?' ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। 'ওটা তো উমাঙ্গোর ব্রিফকেস।'

'হ্যাঁ।'

রানার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে ব্রিফকেসটা নিলো মাজুলেট। 'দেখি, দেখি! ডকুমেন্টগুলো সত্যি আছে এতে? উমাঙ্গো আমাকে দেখিয়েছিল···'

'এই নাও চাবি,' চাবিটা ছুঁড়ে দিলো রানা।

ব্রিফকেস খুলে পাগলের মতো কাগজ-পত্র হাতড়াতে শুরু করলো মাজুলেট। তারপর ঢিল পড়লো তার পেশীতে। মুখ তুলে তাকালো সে। হো হো করে হেসে উঠলো উন্মাদের মতো।

'কি, পালাতে হবে?' হাসছে রানা।

'এ-সবের মানে কি?' ঝাঁঝের সাথে ব্যাখ্যা দাবি করলো সোহানা। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সোহানার সামনে দাঁড়ালো মাজুলেট। 'ব্রিফকেসে কয়েকটা দলিল রয়েছে। উমাঙ্গোর ব্যক্তিগত একটা ডায়রীও আছে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, ম্যাটাবেলদের ধ্বংস করে, হারারে-র গদীতে বসতে চেয়েছিল উমাঙ্গো। তাকে সাহায্য করছিল একটা সুপার পাওয়ার। তাদের সাথে উমাঙ্গো কয়েকটা চুক্তিতে আসে, সেগুলোর কপি রয়েছে ব্রিফকেসে। একটা দলিলে আছে সামরিক অভ্যুত্থান কিভাবে ঘটাতে হবে তার নীল নক্সা···'

'উমাঙ্গো নিজের হাতে তার ডায়রীতে লিখে রেখেছে: মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে মাজুলেটকে ধ্বংস করেছি, এবার মাসুদ রানাকে সরাতে হবে··।'

'এতো কথা শুনতে চাই না,' বললো সোহানা। 'সংক্ষেপে বলো। আমরা কি কিংস হেভেন মিঃ রুবেনসনকে ফিরিয়ে দিতে পারবো? আমাদের ওপর থেকে কি সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে? মাজুলেটের বিরুদ্ধে রায়টা কি বাতিল করা হবে?'

'সব হবে, নিশ্চয়ই হবে, তারপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হাজার বার করে মাফও চাইবে নিজেদের ভুলের জন্যে,' আশ্বাস দিয়ে বললো

মাজুলেট।

'উমাঙ্গো? সে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'তার সাথে আমার একটা বোঝাপড়া…'

'দুঃখিত, সোহানা। আমাদের দু'জনের কাছ থেকে তার যা পাওনা হয়েছিল, আমি একাই তা মিটিয়ে দিয়েছি।'

রানার বুকের সাথে সেঁটে এলো সোহানা। 'ভালো করেছো, রানা। আমাকে কেউ অপমান করলে তুমিই তো তাকে শাস্তি দেবে।' রানার বুকে গাল ঠেকালো। 'এবার নিশ্চিন্তে দেশে ফিরতে পারবো আমরা, তাই না?'

মুচকি হেসে ওদের দিকে পিছন ফিরলো মাজুলেট, বন্দীদের কাছ থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে মিরাণ্ডা।

আলোচনা

কলি

ডি- ১৫০, পাঠানপাড়া, রাজশাহী।

এইমাত্র রানা সিরিজের 'অন্ধকারে চিতা' বইটা পড়ে শেষ করলাম। সোহানাকে পেয়ে এতো ভালো লাগলো যা আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছিলো আরো আগে বইটা কেন পড়িনি। কিন্তু শেষ হতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, ২য় খণ্ডের জন্য আরো কতোদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে!

❋ এই তো শেষ হলো অপেক্ষার।

সৈয়দ মাঈনুদ্দীন আহমেদ (লালু)

লোহাগড়া, নড়াইল।

ছোটবেলা থেকেই রানা পড়তাম। এক সময় এলো যখন ওকেও আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভাবা শুরু করলাম। মনে পড়ে সেদিন পরীক্ষায় 'তোমায় প্রিয় লেখক' রচনাটা এলো। আপনার কথা অর্থাৎ কাজী আনোয়ার হোসেনের কথাই লিখেছিলাম। যারপর নাই বেশী নম্বর পেলাম। আমার শ্রদ্ধা নিন।

সেদিন অগ্নিপুরুষ-১ পড়লাম। সবচেয়ে ভালো লেগেছে, আবার খারাপও লেগেছে, সেজন্য গালি দিতে ছাড়িনি।

অবশেষে অগ্নিপুরুষ-২ পড়ার সময় চারদিকের প্রকৃতিটা কেমন যেন লাগলো মনে হচ্ছিলো কিছু একটা ঘটবে। সত্যি, বইটার শেষের দিকে এসে রীতিমতো আপসেট হয়ে পড়লাম। প্রতিজ্ঞা

করলাম প্রতিশোধ নেবো। রক্তের বদলে রক্ত। ভাগ্যিশ শেষের পাতাটা লিখেছিলেন, নইলে...হয়তো অন্ধকারে চিতা কোনদিন হাতেই পেতাম না।

* কিংবা হাতে পেলেও হয়তো পড়তে হতো হাসপাতালের বেডে শুয়ে।

আজিজুন নাহার পান্না

সঃ আযিযুল হক মহাবিদ্যালয়, দ্বাদশ কলা, বগুড়া।

আপনার আসরে পাঠক হিসেবে আমি নতুন। School life-এ যখন 'মাসুদ রানা' বই পড়তে চাইতাম তখন বড়রা বলতো আমাদের নাকি মাসুদ রানা বই পড়তে নেই। তাই হাতের কাছে বই পেয়েও পড়তাম না। এখন স্কুল-গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ছি। মাঝে মাঝে মাসুদ রানা পড়ছি। এই তো সেদিন 'অগ্নিপুরুষ'-১, ২ পড়লাম। বই দুইটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। 'লুবনার' মৃত্যু আমাকে খুব মর্মাহত করেছে। সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছি রানার মৃত্যুতে। সত্যি বলতে কি, রানার মৃত্যুতে মনটা কয়েকদিন খারাপ ছিলো। দুই দিন আগে দুলাভাই অন্ধকারে চিতা-১ কিনে আনলেন, ব্যথিত মন নিয়ে অন্ধকারে চিতা-১ পড়তে লাগলাম, হঠাৎ রানার চরিত্র দেখে চমকে উঠলাম। তবে কি আমার প্রিয় রানা মারা যায়নি, সে এখনও বেঁচে আছে? বইটা সম্পূর্ণ পড়ে বুঝতে পারলাম রানা এখনও বেঁচেই আছে। তাই আজ আপনার কাছে লিখতে বসেছি। কাজীদা, রানাকে দয়া করে মারবেন না।

মুনীর

এ ৯৭/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১৭

আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে 'অগ্নিপুরুষ-২' আনলাম। নিয়ে আস-

বার সময় ও আমাকে বললো যে কাহিনীর একটি পাতা নেই। বইটা শেষ করবার পরদিন লাইব্রেরীতে যেয়ে পাতাটা পড়ে আসলাম। এদিকে মাসুদ রানার নতুন ভক্ত আমার ছোট ভাই বইটি পড়া শুরু করেছে (অবশ্য লুকিয়ে, যেহেতু ওর গল্পের বই পড়া আমি পছন্দ করি না)। একদিন সকালে রুমে ঢুকেই দেখি ওর চোখে পানি টল টল করছে, আর বইটি অদূরে মাটিতে পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করায় প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা হলো ওর। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, বললাম, 'আরেক জনের বই তুমি ওভাবে ফেলে দিলে কেন?' উত্তরে যা বললো তাতে হতভম্ব হয়ে গেলাম ; বললো 'সেবা-র কোনো বই আর পড়বো না।' সুমতি হয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হলেও জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন'? বললো, 'আমি রানা পড়ে মজা পেতে শুরু করলাম, আর কাজী দা রানা সিরিজ শেষ করে ফেললেন? রানার এই রকম বিশ্রী একটা পরিণতি হলো?' তখন সব বুঝতে পারলাম। হাসি চেপে রাখাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। আর হ্যাঁ, প্রকৃত ঘটনাটা এখনও আমার ভাই জানে না। আর জানানো কি উচিত হবে?

❋ আপনার খুশি। তবে আমার ধারণা, এতোদিনে ঠিকই সে জেনে গেছে।

মো: বরকত

৩৫৭/এ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, । ঢাকা-১৫

অন্ধকারে চিতা-১ পড়লাম। খু-উ-ব ভাল লাগল। ২৩৭ পৃষ্ঠায় এসে মেজাজটা বিগড়ে গেল। সোহানাদি'কে এই অপমান! জেনারেল উমাঙ্গোর কাজ দেখে রাগ হলো। ২৩৮ পৃষ্ঠায় গিয়ে আর সহ্য করতে পারলাম না উমাঙ্গোর এই নীচ, পাষণ্ড কাজ কর্ম দেখে

ধাঁই করে এক বিরাশি সিক্কা ঘুসি মেরে দিলাম উমাঙ্গোর মুখের উপর। ভেবেছিলাম অন্তত দু'চারটে দাঁত হারাবে ব্যাটা, কিন্তু যাঃ শালা, পড়পড় করে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে গেল বই থেকে। তারপর সম্পূর্ণ রাগ গিয়ে পড়ল আপনার উপর। এখন আমি বইটা কি করি বলুন তো, কাজী দা?

মোঃ আনোয়ার শাহ্ (খোকন)

সেকেরচর বাজার, পাঁচদোনা, নরসিংদী, ঢাকা।

ইন্টা মিন্টি রিন্টা নিন্টা কিন্টে ভিন্টা লিন্ট বিন্টা সিন্টি কিন্টা জিন্টেই যিন্ট দিন্টি জিন্টা নিন্টে রিন্ট মিন্টা রিন্টা থিন্টা কিন্টে তিন্টা হিন্ট সিন্টে রিন্টা নিন্টা কিন্টে ফিন্টি রিন্টি য়িন্টে ইন্টা নিন্টু নিন্ট।

ইন্টি তিন্টি—যিন্ট মিন্ট দিন্টু তিন্ট

* রিন্টা নিন্টা তিন্টো মিন্ট রিন্টে নিন্টি।

সোহানা আক্তার (হীরা)

ঘোপ, নেওয়াপাড়া, যশোর।

মাসুদ রানার যতগুলি বই পড়লাম সবগুলোতে লিখা আছে—সেবা বই, প্রিয় বই, অবসরের সঙ্গী।

প্রথম দুটি ঠিক কিন্তু শেষেরটা ঠিক না। যখন কোন কাজ-কর্ম থাকে না তখন তো অবসর।

মাসুদ রানার সব বই গুলোই আমার প্রিয়। অবসর হোক আর নাই হোক বইগুলো আমি পড়ি, কিন্তু কথা হলো এগুলো পড়তে হয় চুরি করে। যখন বাড়ীতে লোক আসে তখন ঘরের ছাদে কিংবা বান্ধবীর বাড়ীর নাম করে কোথাও গিয়ে পড়া। একে তো আর অবসর বলে না। তাই প্রথম দুটি রেখে অবসরের সঙ্গী কেটে দেয়া ভালো।

মোঃ মাহ্ফুজুর রহমান
পোঃ মন্নুনগর, টঙ্গী, ঢাকা।

এইমাত্র শেষ করলাম সদ্য প্রকাশিত কাজি মাহবুব হোসেন এর ওয়েস্টার্নের অষ্টাদশ বই-'এপিঠ-ওপিঠ।' সত্যি বলতে কি, এর অপূর্ব কাহিনী প্রতিটি পাঠক হৃদয়ে রুক্ষ শিহরণ জাগাবে। আমার মতে এই বইটিই প্রকৃত 'ওয়েস্টার্ন'। এক কথায় খু-উ-ব ভাল লেগেছে। ওনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ পৌছে দিবেন। আর, হ্যাঁ, প্রচ্ছদ শিল্পীকেও একটা টাটকা ধন্যবাদ দিবেন।

নাজমুল হোসাইন মিলন
শহীদ ডাঃ জি, এইচ, রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

একমাত্র মাসুদ রানার সিরিজ ছাড়া সেবা প্রকাশনীর অন্যান্য মোটা সাইজের বইগুলো আমি পড়ি না। মনস্থির করলাম 'নেশা'ও পড়ব না। কিন্তু হাতের কাছে কোন বই না থাকাতে বইটার (নেশা) প্রথম দিকে কেমন হবে তা একটু পরখ করার জন্য এক, দুই করে আট পাতা পর্যন্ত পৌছলাম। সত্যি, এই আট পাতা পড়তেই 'নেশা' আমাকে নেশা ধরিয়ে দিল।

সেবা প্রকাশনী যে অন্যান্য প্রকাশনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা আবার প্রমাণ করল 'নেশা'র মত একটি সুন্দর বই পাঠকদের উপহার দিয়ে। অনুবাদক খসরু চৌধুরীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আর রত্নদানোর প্রচ্ছদ শিল্পী শরাফত খানকে আমার শুভেচ্ছা পৌছে দিবেন। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবগুলো বইয়ের মধ্যে রত্নদানোর প্রচ্ছদই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ বলে আমি মনে করি।

কাজীদা, আপনার কি মতামত?

* আমি ভিন্ন মত পোষণ করি।

সেবা
প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

ওয়েস্টার্ন-২২

নীলগিরি

রচনা: রওশন জামিল

প্রকাশের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

বিষয়: পশ্চিমের দুর্মর হাতছানিতে সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছলো অ্যালান ওসমান। এবার সঙ্গে আছে রেবেকা, ওর মানসী।...বেশ শান্তিতেই কাটছিল, কিন্তু একদিন...

রানা-১৩৮

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অন্ধকারে চিতা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালাচ্ছে রানা-সোহানা—
এ-খবর জেনে গেছে জেনারেল রট উমাঙ্গো।
ওদেরকে দেখা মাত্র হত্যা করবার আদেশ দিয়েছে সে।
লেলিয়ে দিয়েছে কাছেপিঠের সব কটা ইউনিটকে।
রওনা হয়ে গেছে স্পটার প্লেন।

দিগন্ত ব্যাপী ধু-ধু মরুভূমির ওপর দিয়ে
চললো ওরা জিপ নিয়ে।
মনে প্রতিজ্ঞা।
দেখে নেবো, উমাঙ্গো!
তৈরি থেকো, আবার আসবো ফিরে।
দেখে নেবো কত শক্তি ধরো তুমি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

বিশ টাকা

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You
Like this Book!!

www.Banglapdf.net